মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আবদুল মান্নান সৈয়দ

অন্তর্বাস্তবতা বহির্বাস্তবতা

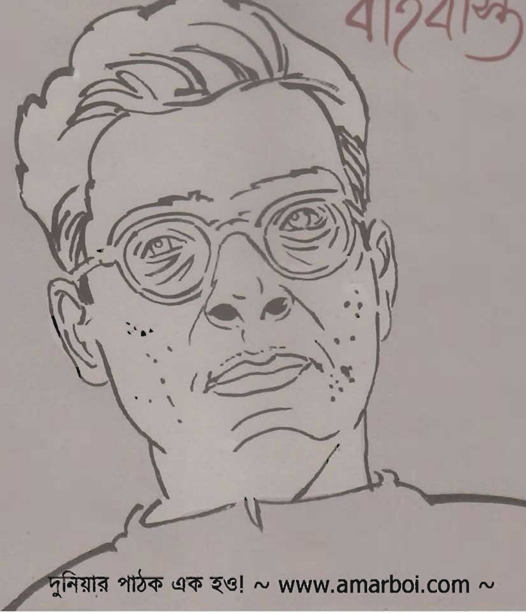

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল মান্নান সৈয়দের সৃজনশীল সত্তার চেয়ে তাঁর মননশীল সত্তাই কখনো কখনো অনেক বেশি আদৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। তাঁর গবেষণাকর্ম, প্রবন্ধ ও সমালোচনা দুই বাংলাতেই সমাদৃত। প্রিয় লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার সঙ্গে তিনি যাপন করেছেন দীর্ঘ সময়। প্রথমে চেয়েছিলেন মানিকের উপন্যাস নিয়ে লিখতে। পরে এর সঙ্গে যুক্ত হয় তাঁর ছোটগল্প ও কবিতা নিয়েও বিস্তৃত আলোচনা। সেদিক থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র সাহিত্যকর্মের একটি পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন এ বই।

ISBN 978 984 8765 46 3

9 789848 765463

Taka 400.00

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল মান্নান সৈয়দের পরিচয় কবি, কথাশিল্পী, নাট্যকার ও অনুবাদক হিসেবে। সেই সঙ্গে গবেষক ও সমালোচক হিসেবেও তিনি ছিলেন প্রবাদপ্রতিম খ্যাতির অধিকারী। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের খুব কম ব্যক্তিত্বই আছেন, যাঁরা তাঁর সমালোচক-সত্তার মনোযোগ আকর্ষণ করেননি। এর মধ্যে জীবনানন্দ দাশ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আজীবন তাঁকে প্রবল ও গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছেন। জীবনানন্দ বিষয়ে তাঁর মূল্যায়ন অনেক আগেই মলাটবন্ধ হয়ে তাঁকে সমালোচকের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে তাঁর বিবেচনা ও মূল্যায়ন এই প্রথম একত্রে বই হিসেবে প্রকাশিত হলো।

মানিকের উপন্যাস নিয়ে একসময় তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি পর্যায়ে গবেষণায় যুক্ত হয়েছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক ওই গবেষণা শেষ না-করলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে ভেবে ও লিখে গেছেন। মৃত্যুর আগে মানিকের সব ধরনের রচনা সম্পর্কে তাঁর সামগ্রিক মূল্যায়ন তিনি সূচিবদ্ধ করেছেন এ বইয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোকচিত্র : খালেদ সরকার

আবদুল মান্নান সৈয়দ

জন্ম ৩ আগস্ট ১৯৪৩, পশ্চিম বাংলার চব্বিশ পরগনায়। চার বছর বয়সে জন্মগ্রাম ছেড়ে আসেন। বড় হয়েছেন ঢাকা শহরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতক (সম্মান) ও এমএ। সরকারি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। পরে নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক হন। কবিতা, কথাশিল্প, নাটক, প্রবন্ধ, গবেষণা, সমালোচনা, অনুবাদ, সম্পাদনা সব মিলে তাঁর বইয়ের সংখ্যা শতাধিক। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই : প্রবন্ধ-গবেষণা— *শুদ্ধতম কবি, করতলে মহাদেশ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, নজরুল ইসলাম : কালজ কালোত্তর*, কবিতা— *জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ, জ্যোৎস্না রৌদ্রের চিকিৎসা, পরাবাস্তব কবিতা*; গল্প— *সত্যের মতো বদমাশ, চলো যাই পরোক্ষে*; উপন্যাস— *পরিপ্রেক্ষিতের দাসদাসী, কলকাতা, অ-তে অজগর*। পেয়েছেন বাংলা একাডেমি পুরস্কার, আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, একুশে পদক। মৃত্যু ৫ সেপ্টেম্বর ২০১০, ঢাকা।

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
অন্তর্বাস্তবতা বহির্বাস্তবতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল মান্নান সৈয়দ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্তর্বাস্তবতা বহির্বাস্তবতা

প্রথমা প্রকাশন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৈফিয়ত ৭
প্রবেশক ১১

প্রথম পর্ব

ব্যক্তিক পরিপ্রেক্ষিত ২০
সাহিত্যিক পরিপ্রেক্ষিত ৩৩
ফ্রয়েডবাদ ৪৫
বাস্তববাদ ৫১
অস্তিত্ববাদ ৫৬
উপন্যাসভাবনা ৬৪
শিল্পকুশলতা ৭৭

দ্বিতীয় পর্ব

উপন্যাস
- দিবারাত্রির কাব্য ১০০
- পদ্মানদীর মাঝি ১১৯
- পুতুলনাচের ইতিকথা ১২৪
- জীবনের জটিলতা ১৪৭
- অহিংসা ১৫৭
- ধরা-বাঁধা জীবন ১৮৮
- চতুষ্কোণ ২০১
- প্রতিবিম্ব ২২২
- চিন্তামণি ২৩৩

ছোটোগল্প ২৪৮
কবিতা ২৯০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় পর্ব

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধার্ঘ্য ৩০৩
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জন্মশতবার্ষিক স্মরণ—পত্রালাপ ৩১২

পরিশেষ

জীবনপঞ্জি ৩২২
গ্রন্থপঞ্জি ৩২৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৈফিয়ত

আবদুল মান্নান সৈয়দের *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : অন্তর্বাস্তবতা বহির্বাস্তবতা* অবশেষে প্রকাশিত হলো। পাণ্ডুলিপিটির বই হিসেবে আত্মপ্রকাশ সহজ ছিল না।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুণমুগ্ধ ছিলেন আবদুল মান্নান সৈয়দ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস নিয়ে পিএইচডি করার জন্য তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ শুরু করেছিলেন ১৯৮৫ সালে। পরে মানিকের রচনা নিয়ে অনেক লিখেছেন, ভাষণ দিয়েছেন, কিন্তু গবেষণা-কর্মটি আর শেষ করেননি। তাঁর গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ড. ক্ষেত্র গুপ্ত এই গবেষণার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী ছিলেন, কাজটি শেষ করার ব্যাপারে তিনি আবদুল মান্নান সৈয়দকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেছেন; মান্নান সৈয়দের গুণগ্রাহীদের কাছে বলেছেন গবেষণা শেষ করার ব্যাপারে তাঁকে উৎসাহ জোগাতে। কিন্তু কাজটি শেষ করা হয়নি।

ডিগ্রির জন্য গবেষণা-কর্মটি শেষ না-হলেও মান্নান সৈয়দ নিজের মতো করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা পাঠ ও তার মূল্যায়নে নিবিষ্ট ছিলেন শেষ পর্যন্ত। এভাবে কাজটি মানিকের উপন্যাস থেকে তাঁর গল্প, কবিতা অর্থাৎ তাঁর সামগ্রিক মূল্যায়নে বিস্তৃত হয়েছিল।

২০১০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমা প্রকাশনের আগ্রহে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়ে প্রথমাকে একটি পাণ্ডুলিপি দিতে সম্মত হন আবদুল মান্নান সৈয়দ। পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন অংশ তিনি ক্রমান্বয়ে দিতে থাকেন এবং সেসব কম্পোজ হতে থাকে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, ২০১০ সালের ৫ সেপ্টেম্বর আবদুল মান্নান সৈয়দ মৃত্যুবরণ করেন। এই শোক কাটিয়ে উঠে বইটির কাজ পুনরায় শুরু করতে তাঁর পরিবার এবং আমাদের একটু সময় লেগে যায়।

এ বইয়ের জন্য সব লেখা আবদুল মান্নান সৈয়দ আমাদের দিয়ে যেতে পারেননি। এ কাজে তাঁর হাতে লেখা একটা কাগজ আমাদের পথ দেখায়। সেই কাগজে লেখা ছিল বইয়ের নাম এবং বিস্তারিত সূচিপত্র। তাতে, বিষয়ের পাশে লেখা ছিল কোন কোন অধ্যায় আমাদের দিয়েছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং বাকি কোন অধ্যায় কবে দেবেন। যেসব অধ্যায় দেওয়া ছিল, সবই ছিল ফটোকপি। সেগুলো কম্পোজও হয়ে গিয়েছিল। প্রুফ সংশোধন করতে গিয়ে দেখা গেল প্রায় প্রতি পৃষ্ঠার ডান দিকে পৌনে এক ইঞ্চি-এক ইঞ্চি ফটোকপি করার সময় প্রিন্ট আসেনি—কাটা পড়েছে। তখন আমরা শরণাপন্ন হই মান্নান সৈয়দের স্ত্রী রানু সৈয়দের। অধ্যায়গুলোর মূল কপি তিনি সহসা খুঁজে পান না। ফলে দুজন সম্পাদনা সহকারী নিয়ে আমরা দিনের পর দিন সময় কাটাই এ পাণ্ডুলিপির সঙ্গে। একই সঙ্গে যে অংশগুলো লেখক দিয়ে যাননি, সূচিপত্র ধরে সেগুলো সংগ্রহের উদ্যোগ নিই। বারবার বিরক্ত করি রানু সৈয়দকে। তিনি নানা ফাইল ঘেঁটে একটা-দুটো করে লেখা উদ্ধার করে আমাদের ফোনে জানান। আমরা ছুটে যাই তাঁর গ্রিন রোডের বাসায়। কয়েকটি রচনা সংগ্রহ করে দেন মান্নান সৈয়দের স্নেহধন্য কবি পিয়াস মজিদ। এভাবে সূচিপত্র অনুযায়ী পাণ্ডুলিপিটি আমরা সম্পূর্ণ করি। কিন্তু ফটোকপিতে কাটা-যাওয়া লেখাগুলো নিয়ে সমস্যা তখনো থেকেই যায়। অবশেষে অনেক দিন পর রানু সৈয়দের ফোন পাই—কপিগুলো তিনি খুঁজে পেয়েছেন। গবেষণার শুরুর দিকের লেখা, কপিগুলো অনেক পুরোনো। স্ট্যাপলারের পিনে মরচে ধরেছে, ওল্টানোর সময় এদিক-ওদিক হলে হলুদ হয়ে আসা জীর্ণ পাতাগুলো ছিঁড়ে যাবে। সেগুলো হাতে পেয়ে আমাদের মনে হয়, আমরা এক বিরাট বিজয় অর্জন করেছি।

আমাদের পুরো কাজের কেন্দ্র ছিল ওই সূচিপত্রটি। তাতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে বিভিন্ন জনের সাক্ষাৎকারের একটি পর্ব ছিল। এর কোনো কোনো অংশের শব্দ বা বাক্য আমরা উদ্ধার করতে পারিনি। ওই অংশ এ বইয়ের সম্পূর্ণতার জন্য গুরুত্বপূর্ণও নয়। তাই সেটি আমরা এ বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করিনি।

পাণ্ডুলিপিটি কম্পোজ করার সময় আমার সহকর্মীরা অনেক জায়গায় মান্নান সৈয়দের হাতের লেখা বুঝতে পারেননি। *প্রথম আলোর* সাহিত্য সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করার সময় অসংখ্যবার তাঁর হাতের লেখা পড়েছি। তাঁর হাতের লেখা বুঝতাম। কম্পোজের সময় তাঁর যেসব শব্দ ও বাক্যাংশ উদ্ধার করা যায়নি, আমি ধীরে ধীরে সেসব উদ্ধার করি। বানান সমন্বয় করার সময় আমার সহকর্মী কমল কর্মকার ও শতাব্দী কাদের আমাকে সহযোগিতা করেছেন। এ কাজেও আমাদের অনেক সময় লেগে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাণ্ডুলিপি চূড়ান্ত করার পর এর একটা প্রিন্ট দেখে দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ আজিজুল হক। তাঁর পিএইচডির বিষয় ছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প। তিনি সময় নিয়ে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পুরো পাণ্ডুলিপি পাঠ করেন। শুধু কিছু তথ্যই সংশোধন করেননি তিনি, অনেক ভুলও শনাক্ত ও সংশোধন করেন। দু-একটি উদ্ধৃতির পুনরাবৃত্তি তিনি বর্জন করেছেন। সংশোধন করেন মানিকের গল্পের তালিকায় যে ত্রুটি ছিল তা-ও। হাতে লেখা সূচিপত্রে *পদ্মানদীর মাঝি* ছিল সবশেষে। অধ্যাপক সৈয়দ আজিজুল হকের যুক্তি, *দিবারাত্রির কাব্যর* পরই *পদ্মানদীর মাঝির* স্থান হওয়া উচিত। আমরা তা মেনে নিয়েছি। সূচিপত্রে *জননীর* স্থান ছিল শুরুতে। এ আলোচনাটি আমরা কোথাও খুঁজে পাইনি। এটি হয়তো তিনি পরে লিখতেন, কিন্তু সে সময় আর পাননি।

আবদুল মান্নান সৈয়দ বেঁচে থাকলে এ বইয়ের প্রকাশনা অনেক সহজ হতো নিঃসন্দেহে। বইটির প্রকাশকালে তাঁর অনুপস্থিতি আমাদের জন্য খুবই বেদনাবহ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার সঙ্গে তিনি যাপন করেছেন দীর্ঘ সময়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্রতা নিয়ে তাঁর বইটি প্রায় সেভাবেই প্রকাশিত হলো, যেভাবে তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন। এটা একটা সান্ত্বনা।

AMARBOI.COM

গবেষণায় তথ্য উপস্থাপনের রীতি ও বানানের ব্যাপারে আবদুল মান্নান সৈয়দের কিছু স্বকীয়তা ছিল। এ বইও তার ব্যতিক্রম নয়। আমরা যথাসম্ভব তা বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। লেখক বেঁচে থাকলে আমরা *জননী* বিষয়ে তাঁর আলোচনা এ বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করতে পারতাম, জানতে পারতাম কেন তিনি *পদ্মানদীর মাঝিকে* শেষে রেখেছিলেন এবং কেন এ উপন্যাসের আলোচনাটি সবচেয়ে ছোট। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত মানিকের রচনাবলিতে তাঁর আরও কিছু অগ্রন্থিত গল্প যুক্ত হয়েছে। এগুলো নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। মান্নান সৈয়দ বেঁচে থাকলে গল্পগুলো নিয়ে তাঁর মতামত জানা যেত। এসব সত্ত্বেও আবদুল মান্নান সৈয়দের *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: অন্তর্বাস্তবতা বহির্বাস্তবতা* বইটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্যকর্মের সমগ্রতার ওপর যে আলোকসম্পাত করেছে তা নিঃসন্দেহে গুরুত্ববহ।

এ বই সম্পূর্ণ করার কাজে রানু সৈয়দ আমাদের যে সহযোগিতা করেছেন তা অতুলনীয়। তাঁর কাছে আমাদের অনেক কৃতজ্ঞতা। কৃতজ্ঞতা জানাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যাপক সৈয়দ আজিজুল হককে। পিয়াস মজিদকে ধন্যবাদ। প্রথমার উপদেষ্টা মোরশেদ শফিউল হাসান, পাণ্ডুলিপি সম্পাদক আখতার হুসেনের কাছে যখনই গিয়েছি, সহায়তা করেছেন। বানান সমন্বয়কারী কমল কর্মকার ও শতাব্দী কাদের, উৎপাদন বিভাগের হুমায়ুন কবীর এবং কম্পিউটার বিভাগের ফারুক আহমেদ এ কাজে পূর্বাপর যুক্ত থেকেছেন।

এ বইয়ে কোনো ত্রুটি ও অসংগতি পাঠক-গবেষকের নজরে এলে প্রথমার ঠিকানায় বা ই-মেইলে জানানোর অনুরোধ জানাই। সেরকম কিছু পেলে পরের সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে।

জাফর আহমদ রাশেদ
প্রথমা
ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০১৩
z_a_rashed@yahoo.com

AMARBOI.COM

প্রবেশক

মাত্র কয়েক বছর পূর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা সাধারণের চোখে পড়ে। তাতে অনেকেই শক্তির ও নতুনত্বের আমেজ পান। ক্রমে সেটি বিকশিত হয়ে লেখকের প্রতিষ্ঠা অর্জনে সহায়ক হয়েছে। বাংলাদেশে তাঁর বই কিরকম বিক্রি হয় জানি না, কিন্তু এমন একাধিক অবাঙালি দেখেছি যাঁরা তাঁর রচনায় নিতান্ত আগ্রহশীল।.../...মানিকলালের* প্রায় সব রচনাই পড়েছি। পড়ে আমার সন্দেহ হয়েছে যে তাঁর কৃতিত্ব অশিক্ষিতপটুতা। অন্য ভাষায়, তাঁর প্রতিভা স্বভাবসিদ্ধ।...মানিকলালের চৈতন্য মার্জিত নয়—নচেৎ *পদ্মা নদীর মাঝি*, 'কুষ্ঠরোগীর বৌ'-এর মতন লেখার তাঁর য়ুটোপিয়া-প্রীতি সংযত হতো, বর্ণনার বুকে মন্তব্যের ভোঁতা ছুরি বসত না, যেমন বসেছে *অহিংসা*-য়। তাঁর রচনায় ধৃতি নেই। যদি আসে তবে বাংলা সাহিত্যের সৌভাগ্য বলতে হবে। কারণ চাপের ওজন কতটা হতে পারে একমাত্র তাঁর রচনাতেই ধরা পড়ে।

—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়[১]

AMARBOI.COM

Two of his [Manik Banerjee's] would seem to be advance the claim of his being counted as one among the great. ...Manik's *Padma Nadir Majhi*, however, is a more weighty novel. But it must not aligned with the great most of novels such as *War and Peace, Crime and Punishment*, *Ulysses*, *Joseph and his brothers* and the like.

—জীবনানন্দ দাশ[২]

Manik Bandyopadhyay with his first four or five volumes commenced us that he was about the most completely equipped writer is fiction we had ever had. We found in him both the rhythm and the impulsion of energy, a dramatic, impersonal, almost intangible style; in his novel of East Bengal boatman the most beautiful use of dialect in our literature; in his marionette legend a unity generally vase in long novels, more particularly ours.

—বুদ্ধদেব বসু[৩]

* 'মানিকলাল' নামটি ধূর্জটিপ্রসাদ কোথায় পেলেন জানি না। মানিক কখনো এ নাম স্বাক্ষর করেননি কোথাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে এসব মন্তব্য করা হয়েছিল সবই তাঁর জীবৎকালে—ধূর্জটিপ্রসাদের আলোচনা ১৯৪০ সালে, জীবনানন্দের বীক্ষণ ১৯৫০ সালে আর বুদ্ধদেবের ১৯৪৮ সালে। মানিক সাহিত্যে অবতীর্ণ হন ১৯২৮ সালে, গ্রন্থকাররূপে প্রথম প্রকাশিত হন ১৯৩৫ সালে। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত নির্বিঘ্নে টানা যায়: প্রথম প্রকাশের অত্যল্পকালের মধ্যেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রজ ও সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ কবি-সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এবং ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬১), জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) ও বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪) সকলেই মানিকের দুটি উপন্যাস—*পদ্মানদীর মাঝি* ও *পুতুলনাচের ইতিকথা*—১৯৩৬ সালে একই বছরে প্রকাশিত—সম্বন্ধে তাঁদের মতামত জানিয়েছিলেন। সন্দেহাতীত সত্য এটি যে *পদ্মানদীর মাঝি* ও *পুতুলনাচের ইতিকথা* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বাধিক বিখ্যাত উপন্যাস, লোকপ্রিয়ও বটে; মানিকের জীবৎকালেই দুটি উপন্যাসের বেশ কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ে মতো অসাধারণ সমালোচক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়ে ঔপন্যাসিকের ৩০/৩২ বছর বয়সে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লেখবার দরকার বোধ করেছেন, এটাই বিরাট ব্যাপার। *পুতুলনাচের ইতিকথা*কে তিনি *পদ্মানদীর মাঝি*র চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। আশ্চর্য, *পদ্মানদীর মাঝি*তে তিনি লক্ষ করেছেন ইউটোপিয়া বা স্বপ্নরাজ্য। আমাদের কাছে মানিকের বর্ণনাতেই, বাস্তবের ভূমিতেই স্বপ্নের স্থাপনা উপন্যাসটি। জীবনানন্দ দাশের কাছে *পুতুলনাচের ইতিকথা*র চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ববহ *পদ্মানদীর মাঝি*। জীবনানন্দ সম্ভবত প্রথম সমালোচক, যিনি তিরিশের তিন বন্দ্যোপাধ্যায়কে—মানিক, তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণকে—প্রথম একত্রিত মূল্যায়ন করেছিলেন। *পদ্মানদীর মাঝি*কে বহুতাৎপর্যবান উপন্যাস হিশেবে মনে করেন, কিন্তু তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি, জেমস জয়েস ও টমাস মানের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসসমূহ—*ওয়ার অ্যান্ড পিস, ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট, ইউলিসিস* বা *জোসেফ অ্যান্ড হিজ ব্রাদার্স*—এর মতো গরীয়ান বিবেচনা করেন না। বুদ্ধদেব বসু তাঁর *An Acre of Green Grass*-এ মানিকের প্রথম চার-পাঁচটি গ্রন্থকে—যার মধ্যে নিশ্চিতভাবেই আছে *পদ্মানদীর মাঝি* ও *পুতুলনাচের ইতিকথা*—মূল্য দিয়েছেন। *পদ্মানদীর মাঝি*র উপভাষা ব্যবহারের শংসা করেছেন। অত্যুচ্চ প্রশস্তি করেও বুদ্ধদেব মানিকের নতুন প্রত্যয়ে উত্তরণকে (মার্ক্সীয় ভাবাদর্শ গ্রহণ) অবনমনই মনে করেছেন। জীবনানন্দও বলেছেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানিক উত্তরকালে তাঁর ব্যক্তিগত সংবেদনের জগৎটিকে পরিত্যাগ করেন। এঁদের মন্তব্যের সঙ্গে মোহিতলাল মজুমদারের (১৮৮৮-১৯৫২) মন্তব্য সমান্তরালে মিলে যায়, 'চিন্ময় বাস্তবের পরিবর্ত্তে জড় বাস্তবের উপাসনায় তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে...রূপকার কবির আসন হইতে রূপবিদ্রোহী কর্ম্মকারের পদবীতে নামিয়াছেন।'

আমাদের অবাক লাগে ১৯৩৬ থেকে মানিকের গল্প-উপন্যাস বেরিয়েছে, অলোকসামান্য সব বই, অবশ্য রবীন্দ্রনাথের তখন বয়স ৭৫-৭৬, আর সাময়িকপত্রে মানিকের রচনাধারা তো প্রকাশিত হয়েই চলেছে, তার একটিও কি রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়েনি? যে-রবীন্দ্রনাথ তিরিশের প্রায় সব প্রধান কবি-কথকের প্রসঙ্গে কিছু-না-কিছু বলেছেন, মানিক বিষয়ে নীরব কেন তিনি?—এর অনুমেয় একটিই কারণ, মানিক তাঁর কোনো গ্রন্থ পাঠাননি রবীন্দ্রনাথকে। সাহিত্যজগতে যাঁর একজনও বন্ধু নেই, তিনি তাঁর ৪৮-বছর আয়ুষ্কালে ৫৭টি গ্রন্থের একটিও ব্যক্তিবিশেষকে উৎসর্গ করেননি, কমিউনিস্ট-কিন্তু-চূড়ান্ত ব্যক্তিত্ববাদী সেই মানিক তাঁর রচনার মতোই একক ও একচ্ছত্র। এই নাহলে মানিক মানিক হতেন না।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯০৮ সালে, পিতার তৎকালীন কর্মস্থল সাঁওতাল পরগনার দুমকা শহরে। মেধাবী ছাত্র ছিলেন। প্রবেশিকা ও আইএসসি পাশ করেন প্রথম বিভাগে। প্রেসিডেন্সি কলেজে গণিতে অনার্স নিয়ে বিএসসি পড়তে শুরু করেছিলেন। কিন্তু ১৯২৮ সালে *বিচিত্রা* পত্রিকায় প্রথম গল্প ছাপা হওয়ায় তাঁর জীবনধারা বদলে যায়। বিজ্ঞানমন্যতা কিন্তু অবাক জীবন ছাড়েনি তাঁকে। *বঙ্গশ্রী* পত্রিকায় চাকরি করেন বছর দুয়েক। ভারত সরকারের পাবলিসিটি বিভাগে কয়েক মাস। সম্প্রতি জানা গেছে, দিল্লির মিনিস্ট্রি অব ইনফরমেশন অ্যান্ড ব্রডকাস্টিংয়ে একজন বাঙালি সাংবাদিক হিশেবে যোগদানের জন্য ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন। ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন বাঙালিদের মধ্যে সুশীল জানা, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। নবেন্দু ঘোষের বর্ণনায়, '...একজন তিরিশ-বত্রিশ বছরের দীর্ঘকায় ও চশমা পরিহিত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছিল।'[৪] বলা বাহুল্য, মানিকের—এমনকি ওদের কারো—চাকরি হয়নি। জীবনানন্দ চাকরিবিরোধী ছিলেন—যদিও চাকরি করেছেন, চাকরি থেকে খারিজও হয়ে যেতেন। ১৯৪৬ সালে মানিক দাঙ্গাবিরোধী ভূমিকায় নেমেছিলেন—এমনকি ওকে এজন্যে শুনতে হয়েছে 'মুসলমানদের দালাল'। ১৯৪৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। প্রকৃতার্থে কমিউনিস্ট,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অকাতরে পার্টি ফান্ডে পৈতৃক বাড়ি বিক্রির অংশীদার হিশেবে প্রাপ্ত অর্থ দান করেছিলেন। কিন্তু কখনো প্রবল ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দেননি। এমনকি জীবনানন্দেরও কয়েকজন বন্ধু ছিল, মানিক চূড়ান্ত একাকী, একটিমাত্র উৎসর্গ তাঁর গ্রন্থের—*স্বাধীনতার স্বাদ* উপন্যাসের—সেও জনসাধারণের উদ্দেশে। *কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি* প্রভৃতি আধুনিকতার বাহক পত্রিকাগুলি ডিঙিয়ে তিনি লিখেছেন সমসাময়িক বিচিত্র-বিভিন্ন সব পত্রিকাতে। কোনো একটি পত্রিকার, এমনকি সাহিত্যিক আন্দোলনের শরিক তিনি ছিলেন না। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন বটে, মনে-প্রাণে তা-ই ছিলেন, জীবনধারায় ও সাহিত্যচেতনায়, কারো তোয়াক্কা করেননি। পার্টির সকলের সঙ্গে বনিবনা হয়েছে, তাও নয়। কবিদের মধ্যে নজরুল ইসলাম ও সুকান্ত ভট্টাচার্য ছিলেন তাঁর প্রিয় কবি, রবীন্দ্র-নজরুলোত্তর আধুনিক কবিতা পছন্দ করতেন না। অথচ আধুনিক কবিদের মধ্যে বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র—জীবনানন্দ পর্যন্ত—বিষ্ণু দে ও অচ্যুত গোস্বামীর সঙ্গে—এবং নিজের মতামত প্রকাশে স্বভাবশোভন নিষ্কণ্ঠ ছিলেন। ছিলেন কমিউনিস্ট পর্বে *পরিচয়*-পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীরও একজন। পরবর্তী কথাশিল্পী সমরেশ বসুর একটি গল্প নাকচ করেছিলেন তাঁর কাছ থেকে উৎকৃষ্টতর গল্প প্রত্যাশিত বলে—এবং সমরেশ বসু উত্তরকালে তা সানন্দে-সগর্বে উল্লেখ করেছেন। একান্নবর্তী পরিবারের জটিলতা রবীন্দ্রনাথ ও মানিক দুজনেই ভোগ করেছেন, দুজনার রচনায় স্বাক্ষরও আছে তার। দায়িত্বশীল মানিক তার আরো বড়ো-ছোটো ভাই থাকা সত্ত্বেও, নিজের বিপুল দারিদ্র্য সত্ত্বেও বৃদ্ধ পিতার ভার গ্রহণ করেন—যে-পিতা পুত্রের মৃত্যুর পরেও জীবিত থাকেন অনেক দিন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মৃত্যুবরণ করেন ৪৯ বছর বয়সে (জীবৎকাল ১৮২৪-৭৩)—কাজী নজরুল ইসলাম স্তব্ধ হয়ে যান, সেটাই তো আত্মিক মৃত্যু, মাত্র ৪৩ বছর বয়সে (আয়ুষ্কাল জন্ম ১৮৯৯—নীরবতা ১৯৪২—মৃত্যু ১৯৭৬) আর মানিকের ৪৮ বছর বয়সে। তিনজনেরই ঝোড়ো জীবন, তারই মধ্যে শিল্পের অকম্প্র শিখা প্রজ্বলিত রেখেছেন। আর বাংলা সাহিত্যে শাশ্বত স্বাক্ষর। এক-হিশেবে তিনজনই পূর্বাপরহীন। মানিকের পূর্বসূরি হয়তো খানিকটা রবীন্দ্রনাথ, খানিকটা প্রেমেন্দ্র মিত্র; উত্তরসূরি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, রমেশচন্দ্র সেন বা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী—কিন্তু উত্তরসূরিরাও আংশিক সাযুজ্য বহন করেন মাত্র। সত্যি কথা বলতে কি, তেমনভাবে রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ বা তারাশঙ্করেরও উত্তরাধিকারী আছে নাকি কেউ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানিক-মানস সন্ধান করতে প্রথমেই তাঁরই নিজের অন্তরঙ্গ চিঠিপত্রের শরণ নেওয়া যাক—

১. না-যাওয়ার একটা প্রায়-অবিশ্বাস্য কৈফিয়ত দিই। যাওয়ার আগ্রহ একটু বেশি প্রবল ছিল, তাই চুপচাপ ছিলাম।

[২-সংখ্যক চিঠি, ২৭ মাঘ ১৩৪২][৫]

[অজ্ঞাতনাম্নী এক মহিলাকে লেখা এক পত্র। সম্ভবত এই মহিলার প্রতি মানিকের একটি আকর্ষণ জন্মেছিল। *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* গ্রন্থে এই মহিলার পরিচয় গুপ্ত রেখেছেন সম্পাদক যুগান্তর চক্রবর্তী। পত্রের রচনাকাল ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দ।]

২. আমার যতদূর বিশ্বাস, সাহিত্য ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি নাম করিবার জন্য স্বাস্থ্যকে সম্পূর্ণ অবহেলা করাই আমার এই অসুখের কারণ। আমার প্রথম পুস্তক ১৩৪০ সালে প্রকাশিত হয়। তিন-চার বছরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ সমালোচক স্বীকার করিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পরবর্তী যুগে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক।

[৩-সংখ্যক চিঠি, ২৪/৯/৩৭]

[জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৯৩৭ সালে লিখিত পত্র। প্রকাশ্য সাহিত্যচর্চার দশ বছরও তখন হয়নি, মাত্র দুই বছর আগে তাঁর গ্রন্থকার হিশেবে আবির্ভাব। ধনী বড় ভাইয়ের কাছে কিছু অর্থ প্রার্থনা করেছিলেন। খুব সম্ভবত প্রার্থনা মঞ্জুর হয়নি। ৩০ বছর বয়সে মানিকের কী প্রবল আত্মপ্রত্যয় যে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পরে—নিশ্চিতভাবেই কথাসাহিত্য প্রসঙ্গে বলেছেন—রেখাঙ্কিত বাক্য এই সাক্ষ্য দ্যায়। আমাদের বিবেচনাও অনুরূপ।]

৩. চিঠিতে ন্যাকামিপূর্ণ মন-রাখা কথা লিখিয়া দশজনের কাছে আপনার নিন্দা করা কোনোদিন আমার দ্বারা হইয়া উঠে নাই। আপনার সম্বন্ধে আমার কোনো নালিশ থাকিলে সোজাসুজি আপনাকেই জানাইয়াছি।

[৯-সংখ্যক চিঠি, ২৩/১১/৪০]

[জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে লেখা এই পত্রটি অতিদীর্ঘ। ১০টি পয়েন্টে তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পারিবারিক বিষয়ে সরাসরি অভিযুক্ত করেছেন। এও ক্ষণিকের স্বভাবসুলভ।]

৪. প্রগতি আন্দোলনে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত কয়েকজনকে একান্তভাবে বিশ্বাস করে আমি সত্যই ঠকেছি। যুদ্ধের বাজারে আমার আগেকার প্রকাশকদের চটিয়ে এঁদের বই দিয়েছি—তারা আরো বেশি রয়ালটি দিতে চাওয়া সত্ত্বেও! তার ফলে মার খেয়েছি, প্রগতিবাদী সাহিত্যিক হিসাবে লজ্জায় মাথা হেঁট করতে হয়েছে।

[১৫-সংখ্যক চিঠি, ৯/৯/৫০]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে লেখা এই পত্রে তিনি তথাকথিত প্রগতিশীল প্রকাশকের মুখোশ উন্মোচন করেছেন। পত্রে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নাম ছিল না—প্রকাশক ও প্রকাশন প্রতিষ্ঠানটির নামগুলি বাদ দিয়েছেন সম্পাদক।*]

৫. ...শুধু সচেতন বুদ্ধি খাটিয়ে শিল্পসাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। বিষয়বস্তু নির্বাচন করা থেকে সব কাজ বুদ্ধি দিয়েই নয়—কিন্তু সমগ্র চেতনা সহযোগিতা না করলে 'সৃষ্টি' হয় না।

[২৬-সংখ্যক চিঠি, ১৯৫২]

[রেখাঙ্কিত বাক্যটি সমগ্র মানিক-সাহিত্যের জন্যে অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ ও প্রযোজ্য। ১৯৪৪ সালে মানিক-যে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন, তার পর থেকে কম-বেশি সব সমালোচক মানিক-সাহিত্যকে ফ্রয়েডপন্থী ও মার্ক্সপন্থী এই দুই ভাগে বিভাজিত করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। আমাদের বিবেচনায় আপাতভাবে এরকম ভাগ করা সম্ভব, কিন্তু গভীরে এক ও অনন্য মানিক। আমাদের আলোচ্য *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসটি থেকেই সুপ্রচুর সাক্ষ্য উৎকলন করা যায়—তখনই মানিক কী পরিমাণে শ্রেণীসচেতন। প্রথম পরিচ্ছেদের সেই অবিস্মরণীয় পঙ্‌ক্তি দুটি: 'ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এইখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।']

৬. আজ এমন ওষুধ খেয়ে ঘুমোলে কাল হাঁড়ি চড়বে না—খানিকটা অ্যালকোহল গিললে কিছুক্ষণের জন্য তাজা হয়ে হাতের কাজটা শেষ করতে পারব। এ অবস্থায় অ্যালকোহলের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় কি?

[৪১-সংখ্যক চিঠি, ৯/২/৫৫]

[মানিক মদ্যাসক্ত ছিলেন—যেমন দস্তয়েভস্কি ছিলেন জুয়ায়। এই দুজনই মৃগী রোগগ্রস্ত ছিলেন। মানিকের ডায়েরিতে রোগের বিস্তারিত বিশ্লেষণ আছে। দস্তয়েভস্কি যেমন জুয়ায় সর্বস্ব না-হারানো পর্যন্ত লেখায় বসতেন না, মানিকের কাছে আসরও ছিল তেমনি। তাঁর শেষ জীবনের প্রধানতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত।]

৭. পিতার সঙ্গে খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি করা চলে—পিতারও অনেক রকম দোষ থাকে। কিন্তু পিতৃত্বকে যে অস্বীকার করতে চাইবে, যে বলবে ঐতিহ্য বলে কিছু নেই—তাকে আমি অসভ্য অমানুষ বলব, তাকে আমি ধিক্কার দেবো।

[সংযোজিত চিঠি/৪, তারিখহীন]

[যুগান্তর চক্রবর্তীর অনুমান, পত্রটি ১৯৫২-৫৩ সালে রচিত। ঐতিহ্য বিষয়ে সব বড় লেখক-শিল্পীর সঙ্গে মানিকও শ্রদ্ধাশীল। ইতিহাস-চেতনার কথা

---

* বিষয়টি প্রয়াত দেবীপদ ভট্টাচার্য স্বয়ং আমাকে জানিয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বারংবার জানিয়েছেন জীবনানন্দ দাশ। এলিয়টের 'ঐতিহ্য ও ব্যক্তিমানুষ' প্রবন্ধটির কথাও মনে পড়ছে।]

এবার দেখা যাক মানিক-চরিত সম্পর্কে অন্যদের ধারণা কী।—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে মহত্তম* যিনি সেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনের গভীর, অশান্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে একেবারে কমিউনিস্ট পার্টির ভিতরে অবস্থান ও কর্মপ্রযত্ন নির্বাচন করেছিলেন (এ যেন রামায়ণের ভাষায়, 'কর্ম-ভূমিম্ ইমাম্ প্রাপ্য কর্তব্যম্ কর্ম যৎ শুভম্)। ...আরো ভাবছি ১৯৪৬ সালের জানুয়ারির কথা, মানিক বাবুর সঙ্গে আমি চলেছি চট্টগ্রামে; কম্যুনিস্ট প্রার্থী কল্পনা দত্ত-র সমর্থনে সভায় সেখানে উভয়ে বক্তৃতা করব, গোয়ালন্দ থেকে চাঁদপুরগামী স্টিমারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটল গল্পে, জ্যোৎস্নায় ভরা পদ্মার অপরূপ নিতম্ব-মাধুর্য দেখে মুগ্ধ হলাম, *পদ্মানদীর মাঝি*র যিনি স্রষ্টা তাঁকে পাশে রেখে সেই পাড়ি সহজে ভুলবার তো নয়।'[৬] জ্যোতির্ময় দত্তের বিশ্লেষণ, 'একজন [জীবনানন্দ] ওমনই লাজুক, সর্বদাই বিনয়ে ও আত্মসংশয়ে এমন আনত, সামাজিক আলাপে এমনই অক্ষম যে পরম হিতৈষী ভক্তের কাছে তাঁর সঙ্গ ছিল শ্বাসরুদ্ধকর। আর অন্যজন [মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়] অজস্র কথা বলতেন, অনায়াসে নিষ্ঠুর হতে পারতেন, সকলকে অবাক করে দিতেন তাঁর সরল নির্লজ্জতায়। আগন্তুকের আক্রমণে পশু কিংবা ত্রস্ত শিশুর মতো নিজেকে আত্মগোপনের চেষ্টা করতেন জীবনানন্দ দাশ, আর বালকের মতো নির্ভয় ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।/আকৃতিতেও ভিন্ন ছিলেন তাঁরা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গায়ের রঙ কালো, বাঙালির পক্ষে তাঁর দৈর্ঘ্য লক্ষণীয়, বড়ো বড়ো পা জীর্ণ জুতোয় আবৃত। ঘরে ঢুকতেন তাড়া-খাওয়া জন্তুর মতো হুড়মুড় করে।...আর জীবনানন্দের ভঙ্গি ছিল ভিতু, বড়ো বড়ো চোখ সর্বদা বিস্ময়ে বিস্ফারিত; প্রশস্ত কিন্তু অলস তাঁর খর্বকায় শরীর।'[৭] মানিকের কমিউনিস্ট পর্বের অন্তরঙ্গ সাথি চিন্মোহন সেহানবীশের বিবরণ, "...একদিন একান্তে পেয়ে তাঁকে সভয়ে জানিয়েছিলাম *প্রতিবিম্ব* সম্পর্কে আমাদের মতামত।

'সভয়ে' কারণ বড় লেখকের উত্তুঙ্গ আত্মাভিমানের পরিচয় তখন আমরা পাচ্ছি পদে পদেই। মানিকবাবু কিন্তু আমাকে দ্বিতীয়বার অবাক করলেন এই বলে : "অর্থাৎ গল্পটা [*প্রতিবিম্ব* ছোটো উপন্যাস] কিছুই হয়নি এই বলতে চান

---

* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন 'মহত্তম'; ঠিক এই অভিধাই নীহাররঞ্জন রায় দিয়েছিলেন জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে, কবির মৃত্যুর পরে-পরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো? তা কি করে হবে বলুন? কতটুকু জানি আপনাদের? যখন আপনাদের ঠিকমতো চিনব দেখবেন তখন গল্প উতরোয় কি উতরোয় না।"'[৮] লেখক হিশেবে মানিকের একই রকম বিনীত স্বভাবের কথা জানিয়েছেন সত্যপ্রিয় ঘোষও। তিনি মানিকের *সোনার চেয়ে দামী* উপন্যাসটির দুটি খণ্ডের (১৯৫১/৫২) সমালোচনা লিখেছিলেন *অগ্রণী* পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯ সংখ্যায়। লিখেছিলেন 'কল্যাণ কর' ছদ্মনামে। সত্যপ্রিয় জানাচ্ছেন, '...মানিকবাবুও সেই প্রফুল্লবাবুর কাছে জানতে চাইলেন কল্যাণ করটি কে, তার আর কোনো লেখা তিনি দ্যাখেননি। প্রফুল্লবাবু উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে অপাঙ্গে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, "রিভিউটা কি ভালো হয়নি?" [মানিক বললেন,] "ভালো হয়নি মানে? এইরকম রিভিউই তো আমি চাই, আমার দোষগুণ সব খোলাখুলি লিখে দিয়েছেন। কী ছিলাম কী হয়েছি সব পষ্টাপষ্টি। এই উপন্যাসে যা বলতে চেয়েছি তা যে ঠিকঠাক ফুটেছে সেটা জেনে আমি নিশ্চিন্ত। একে দিয়ে আমার বইগুলির আলোচনা করাতে পারেন? স্তবটবের দরকার নেই, আমি কি লিখেছি সেটা ভালো করে পড়ুন, কী লিখলে ভালো হতো সে-সব উপদেশ দয়া করে দেবেন না, খোদার উপর খোদকারির যত্তসব সমালোচক জুটেছে, আপনাদের এই কল্যাণ করকে আমি একটু দেখতে চাই, আমি তাঁকে অনুরোধ করব আমার ভালোমন্দ উনি পড়ে কিছু লিখুন।"/ আমি হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে ওঁকে প্রণাম করতেই উনি হকচকিয়ে গেলেন।'[৯] মতি নন্দীর অবলোকন, '...মানিকবাবুকে আমি একবারই দেখেছিলাম। একটা সাহিত্য-বাসরে বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন। বেশ লম্বা কালোপানা চেহারা, তীক্ষ্ণ একজোড়া চোখ। কথাবার্তায় ছিল রীতিমতো বাঙাল টান, বক্তা হিসেবে মোটেই সুবক্তা নন। সাহিত্যিক হিসেবে মনে করি তিনিই প্রথম আধুনিক নাগরিক বাঙালি সাহিত্যিক।/ *দিবারাত্রির কাব্য* আর *পদ্মানদীর মাঝি* বাংলা সাহিত্যের দুটি চিরকালীন অনবদ্য সৃষ্টি। ওঁর *জননী* উপন্যাসটিও আমার খুব প্রিয়।'[১০] উদয়ন ঘোষের স্মৃতিচারণা, 'রামমোহন হল, ১৯৫১, সকাল, প্রগতি লেখক শিল্পীসঙ্ঘের সম্মেলন। ডায়াসে অনেকের সঙ্গে বসে আছি আমি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একবারও না বসে এ-চক্র সে-চক্র ঘুরে ঘুরে দেখছেন আর এক এক বিষয়ের উপর টুকরো কথা বলছেন। তখন চলছিল গ্রুপ ডিসকাশন নানা বিষয়ের উপর—তাই নিয়ে এক একটি চক্র। আমার ডায়াস ও প্ল্যাটফর্ম হলো "ভাব ও বস্তু" নিয়ে।.../ মনে আছে এখনো ঐ বস্তু ভাব-এর কথা বলতে বলতে উত্তেজিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন অকারণে আমার কাঁধে চাপ মেরে বলেছিলেন, 'কি হে পঞ্চাশের দশক, মন কি ভাবো বস্তু নয়? পুরো বস্তু। এও জেনো, মন কিন্তু বুকে না, এমনকি হৃদয় অব্দি বুকে থাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না—ওসব মাথায় থাকে—মাথার ব্যাপার বুদ্ধি—বুদ্ধির শুশ্রূষা—বুকে যা থাকে তা কেবল হৃদপিণ্ড, ইংরেজিতে অবশ্য হার্ট—কিন্তু হার্টের হৃদয়ের অংশ হার্টলেস ভাই, কেবল তাই হলো হার্ট, বাংলায় হৃদপিণ্ড। আগাপাস্তলা বস্তু।'...[১১] নরেন্দ্রনাথ মিত্র লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে দেখছেন, 'কিন্তু এ কি ঘরদোর, আসবাবপত্রের এ কি ছন্নছাড়া চেহারা! শস্তা একজোড়া টেবিল-চেয়ার। একপাশে আচ্ছাদনহীন একখানা তক্তপোষ। দেয়ালে ঠেস-দেওয়া কাচ-ভাঙা আলমারিতে এলোমেলোভাবে রাখা একরাশ বই। বেশির ভাগই ছেঁড়াখোঁড়া পুরোনো মাসিকপত্র। বইপত্রে পাণ্ডুলিপির এলোমেলো পাতার অগোছালো অপরিচ্ছন্ন টেবিল। তক্তপোষের ওপর পাণ্ডুলিপির খানিকটা অংশ পড়ে আছে। / আমি বিস্মিত হলাম। মানিকবাবুর ঘরের এই চেহারাই যেন সবচেয়ে মানানসই। এ যেন বাইরের ঘর নয়, স্রষ্টার মনের অন্দরমহল। যেখানে ঝড়-ঝঞ্ঝা বৃষ্টি-বিদ্যুতের বিরাম নেই।'[১২]

তথ্যনির্দেশ

১. 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' : ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। *পরিচয়,* ১৯৪০।
২. 'The Bengali Novel Today': Jibanananda Das. *The Hindus Than Standard* ও September 1950.
৩. 'Modern Bengali Prose', *An Acre of Green Grass*: Buddhadeva Bose. Orient longman Ltd, Bombay, Calcutta, Madras.
৪. *একা নৌকার যাত্রী,* নবেন্দু ঘোষ। ২০০৮। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
৫. *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,* যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত। ১৯৭৬। প্রথম দে'জ সংস্করণ ১৯৯০। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। সব চিঠিই ঐ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।
৬. *তরী হতে তীর,* হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪। তৃতীয় প্রকাশ ১৯৯৫।
৭. 'জীবনানন্দ দাশ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' : জ্যোতির্ময় দত্ত, *কবিতা,* আশ্বিন ১৩৬৬।
৮. 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রগতি লেখক আন্দোলন' : চিন্মোহন সেহানবীশ। *মানিক বিচিত্রা,* বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত। সাহিত্যম, কলকাতা। ১৯৭১, পৃ. ৬৮।
৯. *মানিক সাহিত্যের যুক্তিতর্কগল্প,* সত্যপ্রিয় ঘোষ। ২০০৪। একুশ শতক, কলকাতা।
১০. 'যেদিন আমি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার পেলাম', মতি নন্দী। *বৈশাখী,* ২০০৮, মানিক-সংখ্যা।
১১. 'এখনো মানিক', উদয়ন ঘোষ। *অনুষ্টুপ,* শীত-গ্রীষ্ম সংখ্যা ২০০৮।
১২. স্মৃতি : নরেন্দ্রনাথ মিত্র। *মানিক-বিচিত্রা*। বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্র থ ম প র্ব

ব্যক্তিক পরিপ্রেক্ষিত

১. পরিচয়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-৫৬) **মধ্যবিত্ত** শিক্ষিত একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারের সন্তান। তাঁরা ছিলেন আট ভাই, ছয় বোন। পরিণত বয়স পর্যন্ত এঁদের মধ্যে জীবিত ছিলেন ছ-ভাই চার বোন। ভাইদের মধ্যে মানিকের অবস্থান ছিল চতুর্থ। বোনেরা সকলে মানিকের বড়ো ছিলেন। মানিকের পিতা ছিলেন সেকালের বিরল বিএ পাশ, প্রথম জীবনে শিক্ষক, পরে কানুনগো, এবং শেষ পর্যন্ত সাব-ডেপুটি কালেক্টর। পিতার ছিল বদলির চাকরি—মানিকের দুমকা শহরে জন্মও এই সূত্রে। মানিকের বাল্য-কৈশোর এবং ইস্কুল-জীবন কেটেছে বিভিন্ন জায়গায়—দুমকা, আড়া, সাসারাম, মেদিনীপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বারাসত, কলকাতা, টাঙ্গাইল প্রভৃতি জায়গায়। ছেলেবেলাতেই মানিকের বিশিষ্ট চারিত্রলক্ষণ দেখা দিয়েছিল—ছিলেন খুব দুরন্ত অথচ সহিষ্ণু। মানিক নিজেই লিখেছেন :

> ছেলেবেলা থেকেই আমি একটু অতিমাত্রায় দুরন্ত। হাঁটতে শিখেই প্রথমে মাছ-কাটা মস্ত বঁটিতে নিজের পেটটা দু-ফাঁক করি—আজও সেলায়ের চিহ্ন আছে। এমনি আরও অনেক দুরন্তপনার চিহ্নই সর্বাঙ্গে চিরস্থায়ী হয়ে আছে। শোনা যায়, আমার নাকি একটা উদ্ভট স্বভাব ছিল, দারুণ ব্যথা পেলেও কিছুতেই কাঁদতাম না। ['আমার কান্না', *কিশোর বিচিত্রা*, মা. ব.]

দুরন্তপনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তীব্র-তীক্ষ্ণ সন্ধিৎসা। এই তীব্র-তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী সন্ধিৎসার কথা না-জানলে মানিক-চারিত্র পুরোপুরি অনুধাবন করা যাবে না। মানিক লিখেছেন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্লাশে বসে মুগ্ধ হয়ে লেকচার শুনি, ল্যাবরেটরীতে মশগুল হয়ে এক্সপেরিমেন্ট করি : নতুন এক রহস্যময় জগতের হাজার সংকেত মনের মধ্যে ঝিকমিকিয়ে যায়! হাজার নতুন প্রশ্নের ভারে মন টলমল করে। ছেলেবেলা থেকে 'কেন?' নামক মানসিক রোগে ভুগছি, ছোট বড় সব বিষয়ের মর্মভেদ করার অদম্য আগ্রহ যে রোগের প্রধান লক্ষণ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জানা চাই।

['গল্প লেখার গল্প', *মা. গ্র.* ১২]

দুরন্তপনা ও সন্ধিৎসা—এই দুই মিলিয়ে তৈরি হয় মানিক-চারিত্রের এক আশ্চর্য কূটাভাস : সামাজিকতা ও নির্জনতা—একই সঙ্গে। আর তার ফলে জন্ম নেয় এক তীব্র আত্মচেতনা, যার বলে তিনি বলতে পারেন :

ছেলেবেলা থেকেই আমার অভিজ্ঞতা অনেকের চেয়ে বেশি।...আড়াই বছর বয়স থেকে আমার দৃষ্টিভঙ্গির ইতিহাস আমি মোটামুটি জেনেছি।

['কেন লিখি', *মা. গ্র.* ২]

১৯২৪ সালে—মানিকের বয়স তখন ষোলো—তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়। মেধাবী ছাত্র ছিলেন—প্রবেশিকা ও আই.এস-সি. পরীক্ষা পাশ করেন প্রথম বিভাগে। বি.এস-সি. ক্লাশে ভরতি হন, কিন্তু পড়াশোনায় তাঁর মন ছিল না, আকস্মিকভাবেই লিপ্ত হন সাহিত্যে।

মানিকের ব্যক্তিগত চরিত-মানস বুঝবার জন্যে তাঁর সেজদাদা হিমাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি[১] :

প্র। আপনাদের বাড়িতে কী ধরনের বই ছিল?

উ। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের বইয়ের কথা আমার মনে আছে।

প্র। আমাদের মনে হয় পুরাণ বা ভারতীয় দর্শনের অনেক কিছুই তিনি আয়ত্ত করেছিলেন, আপনার এ সম্বন্ধে কী ধারণা?

উ। আমাদের বাবা ছিলেন সংস্কৃতে পণ্ডিত। তাঁর কাছে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ও অনেক পুঁথিপত্র ছিল। মানিককে দেখতাম সেসব পড়তে। আমার পিতার প্রভাব মানিকের উপর পড়েছিল। হয়তো এর থেকেই সে এসব আয়ত্ত করেছিল, তার মতামত গড়ে উঠেছিল।

প্র। আপনাদের বাড়িতে কি কোনো রাঁধুনি ছিলেন যাঁর কথা মানিকের অনেক গল্পে রয়েছে?

উ। আমাদের বাড়িতে রান্নার অনেক লোকই ছিল। বাড়ি ছিল মেস-বাড়ির মতো। মা ছিলেন না, আমরা ঠাকুর রাঁধুনির হাতের রান্না খেতাম। আমি এ ব্যাপারে ঠিক বলতে পারব না।

প্র। মানিকবাবুর সঙ্গী-সাথি কারা ছিলেন? তাঁরা কোন স্তরের মানুষ, কী করতেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উ। সঙ্গী-সাথি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না।...টাঙ্গাইলে থাকার সময় মাঝে মাঝে ও বেরিয়ে যেত মাঝিমাল্লার সাথে। চার-পাঁচ দিন পরে বাড়ি ফিরত, ওদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকত। অনেক দিন সকাল থেকে ওখানেই পড়ে থাকত, তারপর একদিন লিখল *পদ্মানদীর মাঝি*। যখন টালিগঞ্জের বাড়িতে ছিল, তখন প্রায়ই বেরিয়ে গিয়ে পাশে কলাবাগান বস্তিতে নিম্নশ্রেণীর লোকেদের সাথে মেলামেশা করত। সারা দিন ওখানেই পড়ে থাকত, ওদের কাছে খাওয়াদাওয়া করত। ওরাও মানিককে খুব ভালোবাসত। মানিকের কথা শুনত।

প্র। মানিকের ধর্মচেতনা সম্বন্ধে কিছু জানেন?

উ। আমাদের পরিবারে ব্রাহ্মণ হিসাবে কোনোরকম গোঁড়ামি ছিল না। মানিকের পৈতে হয়েছিল। শোনা যায়, শেষে নাকি কালীভক্ত হয়েছিল। কিন্তু আমি ওকে কোনো দিন কালীঘাটের মন্দির বা প্রতিমা দর্শন করতে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।

প্র। মানিকবাবুর সাহিত্যচর্চা সম্বন্ধে যদি কিছু বলেন।

উ। আমাদের টালিগঞ্জের বাসার দোতলার পুবদিকের ঘরে বসে মানিক লিখত। ওই ঘরে বসেই অনেক লেখা লিখেছিল। আমার কাছে একটা Swan fountain pen ছিল, ওকে দিয়েছিলাম। অধিকাংশ লেখা ওতেই লিখেছিল। রোজই দিস্তে দিস্তে কাগজে লিখত। কোনো কিছুই পছন্দ হতো না। পরের দিন আমার স্ত্রী ওই কাগজে উনান ধরাতেন। এইভাবে ওর অনেক লেখা নষ্ট হয়েছে। রোজ রাতে আমার স্ত্রীর কাছ থেকে ফ্লাস্কে করে চা করে নিয়ে যেত। বেশ রাত অবধি লিখত। প্রায়ই দেড়টা-দুটো হতো। কোনো কোনো দিন ভোর হয়ে আসত। সারা রাত ওই চা খেত আর লিখত। মাঝে মাঝে দেখতাম আমার স্ত্রীর কাছে কোন কথা বাংলাদেশের টানে কীভাবে উচ্চারিত হয় তা জেনে নিচ্ছে—ওর লেখার জন্য।

[*বর্ণমালা*, মানিক-সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৮৫। পুনর্মুদ্রণ : *কোরক*, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, ১৪১৪]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর পরিমল গোস্বামী একটি রচনা প্রকাশ করেন। তাতে তিনি ১৯৪৪ সালে মানিকবাবুর কাছ থেকে গৃহীত তাঁর জীবন-তথ্য প্রকাশ করেন মানিকবাবুর জবানিতেই (সেজন্যে উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহার করেন)। আমরা এখানে তা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করলাম :

আমার জন্ম দুমকায়, বাবা তখন সেখানে গভর্মেন্ট অফিসার।

১৯২৬ সালে আমি ম্যাট্রিক পাশ করি ও তখন আমার বয়স সাড়ে পনেরো বছর।

প্রথম শিক্ষা কোথায়ও বাঁধাবাঁধি নিয়মে হয়নি, কখনও মহিষাদলে, কখনও টাঙ্গাইলে, কখনও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। সমস্ত স্কুলজীবনটাই কেমন যেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছন্নছাড়া। ক্লাশের পড়া খুব ভালো লাগত না। খেলায় ঝোঁক ছিল বেশ। মন মাঝে মাঝে দুর্দান্ত হয়ে উঠত, কখনও বা একা বসে বসে চিন্তা করতাম।

১৯২৮ সালে বাঁকুড়া কলেজ থেকে আমি আই.এস-সি. পাশ করি। সেখানে জ্যাকসন নামক এক অধ্যাপক আমার উপর খুব প্রভাব বিস্তার করেন। তিনি আমাকে বাইবেল পড়ান। সেন্ট জন অ্যাম্বুল্যান্স কোরে ভর্তি হই এবং কাজ শিখি এবং ডিপ্লোমা পাই। বাইবেল আমি খুব যত্ন করে পড়েছিলাম। এই সময়ে আমার মন থেকে ধর্ম বিষয়ে সকল রকম গোঁড়ামি দূর হয়ে যায়।

প্রেসিডেন্সি কলেজে বি.এস-সি. পড়ি। এইখানে সাহিত্য বিষয়ে বিতর্কে যোগ দিয়েছি খুব। আমি বলেছিলাম একটুখানি বুদ্ধি থাকলে যে-কোনো লোক পাঠযোগ্য গল্প লিখতে পারে।

অনেকে আমাকে চ্যালেঞ্জ করে বসলেন, আমিও সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম। বললাম, তিন দিন সময় চাই। আমার বন্ধুরা এই তিন দিন আমাকে খুব খাওয়ালে। আমি তিন দিনে গল্প লেখা শেষ করে নিয়ে গেলাম *বিচিত্রা*য় নিজে। মাসের মাঝামাঝি সময় সেটা। পরবর্তী সংখ্যাতেই সে গল্প ছাপা হলো। গল্পের নাম 'অতসী মামী'। ছাপার পর শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় স্বয়ং এলেন আমার কাছে পনেরো টাকা আর এক খণ্ড *বিচিত্রা* নিয়ে। বললেন—আরও গল্প চাই।

আমার মত এই ছিল যে, ৩০ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত আমি লেখা আরম্ভ করব না, কারণ আগে মনের বয়স বাড়ে না। কিন্তু উপেনবাবু ছাড়লেন না। অতএব আমার মত টিকল না।

'অতসী মামী' লিখেছিলাম ছদ্মনামে। ভেবেছিলাম ৩০ বছরে পৌঁছলে ছদ্মনাম ছেড়ে স্বনামে লিখব। কিন্তু কোনো ইচ্ছাই রইল না, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই রয়ে গেলাম, যদিও আমার আসল নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯৩০ সালের কোনো সময় আমার জ্যেষ্ঠের সঙ্গে লেখা নিয়ে আমার কিছু মনান্তর ঘটে, তিনি এ সময় আমার লেখায় মেতে থাকার বিরোধী ছিলেন এবং এ নিয়ে আমাকে একখানা চিঠি লেখেন। আমি এ জন্য সবার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে মেসে চলে আসি। পরে বছর দুই আমাকে ভাগ্যের সঙ্গে খুব লড়াই করতে হয়।

শেষ পরীক্ষা আমার দেওয়া হলো না, কিন্তু কারো চাকরীও কখনও করব না এই ছিল ইচ্ছা। কিন্তু সে ইচ্ছাও রাখতে পারিনি।

১৯৩৮ সালে কলকাতায় অবসরপ্রাপ্ত হেডমাস্টার সুরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী কমলার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়।

[*যুগান্তর*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৫৬]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমসাময়িক কয়েকজন লেখক মানিকের চরিত্রের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার কয়েকটি অংশ :

বুদ্ধদেব বসু : তাঁর দীর্ঘকায় শ্যামবর্ণ শরীরে ছিল তাঁর লেখার মতোই ঋজু বলশালিতা, চশমার পেছনে উজ্জ্বল ছিল চক্ষু। হাসিতে ছিল তীক্ষ্ণতা। তাঁর সঙ্গে রুচিতে বা মতামতে আমার মিল ছিল না, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব আমাকে আকর্ষণ করত—তা আমার সম্পূর্ণ বিপরীত, সেই জন্যেই।

[*অনিষ্ট*, মানিক সংখ্যা, ১৩৭৮]

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : 'একটা গল্প এনেছি বিচিত্রার জন্যে'—হাতে একটা লেখা, ছেলেটি হাত বাড়াল। / প্রখর একটা ক্ষিপ্রতা তার চোখে-মুখে, যেন বুদ্ধির সন্দীপ্তি। গল্প যেন এখুনি শেষ করেছে আর যদি কালবিলম্ব না করে এখুনি ছেপে দেওয়া হয় তা হলেই যেন ভালো হয়। / 'এই রইল—' ভঙ্গিতে এতটুকু কুণ্ঠা বা কাকুতি নেই। মনোনীত হবে কি না হবে সে সম্বন্ধে এতটুকু দ্বন্দ্ব নেই। আবার কবে আসবে ফলাফল জানতে, কৌতূহল নেই একরত্তি। যেন এলুম, লিখলুম আর জয় করলুম—এমনি একটা দিব্য ভাব।

[পৃ. ১৯৯, *কল্লোল যুগ*, চতুর্থ সং]

সজনীকান্ত দাস : মানিক তখন কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে বলিলেও চলে। মুখচোরা লাজুক ছেলে, কিন্তু 'সরীসৃপ' গল্পেই তাহার পোক্ত পরিণত মনের পরিচয় পাইয়াছিলাম, সে মন সরল সাধারণ নহে, কুটিল জটিল অসাধারণ।

[*আত্মস্মৃতি*, পৃ. ৪২৩]

AMARBOI.COM

পরিমল গোস্বামী : মানিক তখন নিতান্ত তরুণ, আমার তুলনায় তো বটেই, বয়সে প্রায় বারো বছরের ছোট। ব্যবহারে নম্র কিন্তু ব্যক্তিত্বে কঠোর। চেহারায়, ব্যবহারে, কথায় একেবারে স্বতন্ত্র। আপন ক্ষমতা বিষয়ে সচেতন নয়। কিন্তু আত্মশক্তি তার সমস্ত সত্তায় প্রতিফলিত।

[*যুগান্তর*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৫৬]

উত্তরকালের মানিক সম্পর্কে দেবীপদ ভট্টাচার্যের সাক্ষ্য :

তার চেহারা দেখে যুগপৎ বিস্মিত এবং ভীত হই। কারণ কঠিন মুখ, এবং বহুরেখাযুক্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং একটু অদ্ভুত ধরনের মানুষ বলে মনে হয়েছিল।

[*অরণি*, ১৯৬৭-৬৮]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : লিখছি—হঠাৎ এলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। সবলদেহ, তীক্ষ্ণদৃষ্টি—প্রাণবান মানিকবাবু প্রচণ্ড স্তিমিতদৃষ্টি, কল্পনা করা যায় না এমন কৃষ্ণচ্ছায়া পড়েছে সর্বাঙ্গে। যেন একটা কালজীর্ণ শৈবালাচ্ছন্ন ভয়াল-প্রায় জয়স্তম্ভ। খানিকটা হেঁটে এসে হাঁপাচ্ছেন। দেখে চোখে জল আসে।

[১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫, 'তারাশঙ্করের অপ্রকাশিত দিনলিপি', *জলার্ক*: শ্রাবণ-পৌষ, ১৩৯০, তারাশঙ্কর সংখ্যা/এক]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাসিক বসুমতীর সম্পাদক :

> লেখকের মৃত্যুর প্রায় দুই বছর পূর্বে থেকে লেখক এমন সব চিঠি দিতে থাকেন যা থেকে অনুমান করা যায় লেখকের মনের স্থিরতা নানা কারণে বিনষ্ট হয়েছিল।

[*মাসিক বসুমতী*, পৌষ ১৩৬৩]

১৯২৯ সালে সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগের দরুন কলেজি শিক্ষায় ইতি টানেন মানিক। ১৯৩৫ সালে মৃগী রোগে আক্রান্ত—তখন *পুতুলনাচের ইতিকথা* লিখছেন। আর এই বছরই তাঁর গ্রন্থকার হিশেবে প্রথম আবির্ভাব—ঐ রোগ তাঁর আমৃত্যু সঙ্গী। ১৯৫৫ সালে অতুলচন্দ্র গুপ্তকে লেখা পত্রে মানিকের আত্মবিশ্লেষণ :

> প্রথমদিকে "পুতুলনাচের ইতিকথা" প্রভৃতি কয়েকখানা বই লিখতে মেতে গিয়ে যখন আমি নিজেও ভুলে গিয়েছিলাম যে আমার একটা শরীর আছে এবং পরিবারের মানুষেরাও নিষ্ঠুরভাবে উদাসীন হয়ে গিয়েছিল তখন একদিন হঠাৎ আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। এক মাস থেকে দু তিন মাস অন্তর এটা ঘটতে থাকে। তখন আমার বয়স ২৮/২৯—৪/৫ বছরের প্রাণান্তকর সাহিত্য সাধনা হয়ে গেছে।

[পত্রসংখ্যা ২৪, *অ. মা. ব.*]

বিচ্ছিন্ন কয়েকটি চাকরি, বিবাহ, একটি ছোটো প্রেস ও প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা, তারই মধ্যে চলতে থাকে নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যসাধনা। ১৯৪৮ সালে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান এবং আমৃত্যু সদস্য। উত্তরকালে দাঙ্গাবিরোধী কাজে, পার্টির কাজে, মিছিলে সক্রিয় অংশগ্রহণ। ১৯৫১ সাল থেকে মানিকের দারিদ্র্য এবং অসুস্থতা চরম আকার ধারণ করে। ১৯৫৪ সাল থেকে তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরিতে এক-ধরনের লোকোত্তর বিশ্বাসের প্রসঙ্গ দেখা দেয়। ইসলামিয়া হাসপাতাল, লুম্বিনী মানসিক হাসপাতাল। ১৯৫৬ সালে দারুণ অর্থসংকট, অসুখ, বাড়িভাড়া দিতে না-পারায় উচ্ছেদ মামলায় সোপর্দ। মামলার তারিখ পিছানো। শেষ দিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাসিক ১০০ টাকা বৃত্তি হিশেবে দিচ্ছিলেন; মানিকের ঋণ পরিশোধের জন্য রাজ্য সরকার এককালীন ১৯০০ টাকা দিয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালের ২ ডিসেম্বর অচেতন অবস্থায় নীলরতন সরকার হাসপাতালে নীত; ৩ ডিসেম্বর (১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৬৩) সোমবার ভোরবেলায় মৃত্যু। মৃত্যু-পরবর্তী ঘটনাবলির দুটি বিবরণ সমসাময়িক পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত হলো :

১. বেলা চারিটার সময় লোয়ার সার্কুলার রোডস্থিত কমিউনিস্ট পার্টির কার্যালয় হইতে শোকযাত্রা বাহির হয়। শোকযাত্রা স্বাধীনতা কার্যালয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মতলা স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, আমহার্স্ট স্ট্রীট হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভবনে কিছুক্ষণের জন্য থামান হয়। সেখান হইতে শবযাত্রা বিডন স্ট্রীট হইয়া নিমতলা উপস্থিত হয়।

[*দৈনিক বসুমতী*, ৪ ডিসেম্বর ১৯৫৬]

২. বেলা ১০ ঘটিকায় হাসপাতাল হইতে তাহার মৃতদেহ লোয়ার সার্কুলার রোডের একটি বাড়িতে নিয়া রাখা হয়। তথা হইতে অপরাহ্ণ চার ঘটিকায় শোকযাত্রা সহকারে মৃতদেহ নিমতলীঘাটে নীত হয়। .../ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ, নিউ এজ, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, শান্তি পরিষদ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, নীলরতন সরকার স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, ছাত্র সংসদ, কৃষক সমিতি, আই এস আই ক্লাব, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন, কংগ্রেস প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে শবাধারে মাল্য দান করা হয়। বহু সাহিত্যিকের পক্ষ হইতেও মাল্য বা পুষ্পবলয় শবাধারে স্থাপন করা হয়।

[*আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৫ ডিসেম্বর ১৯৫৬]

৭ ডিসেম্বর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি : উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (*বিচিত্রা* সম্পাদক, মানিকের প্রথম গল্প 'অতসী মামী' যিনি ছেপেছিলেন)। বক্তা : প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, মনোজ বসু প্রমুখ। ১৯৩৯ সালে *আনন্দবাজার পত্রিকা*র শারদীয় সংখ্যায় মানিকের *সহরতলী* উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল। তার উল্লেখ করে ওই পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে বলা হয়, 'পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় পূর্ণ উপন্যাস প্রকাশ করিবার উহাই প্রথম দৃষ্টান্ত।'

[*আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৫ ডিসেম্বর ১৯৫৬]

দৈনিক *যুগান্তর*-এর ১৬ ডিসেম্বরের 'যুগান্তর সাময়িকী'তে লেখেন পরিমল গোস্বামী ও বেণু দত্তরায়। ওই পত্রিকারই ২৩ ডিসেম্বর সংখ্যায় কৃষ্ণ ধর লেখেন, 'একজন রিয়ালিস্টের মৃত্যু'। সাপ্তাহিক *দেশ* পত্রিকার ৮ ডিসেম্বর ১৯৫৬ সংখ্যায় স্মারক প্রবন্ধ লেখেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। এই পত্রিকার সম্পাদকীয়র অংশ :

> বৈষয়িক অর্থে মানিকবাবুকে কেহ সফল সাহিত্যিক বলিবেন না। অন্য অর্থে তিনি সফলতম সাহিত্যিক। সাহিত্যজীবনে সাম্প্রতিক কালে তাঁহার মত এতখানি দুঃখ যন্ত্রণা আর কেহ পাইয়াছেন কিনা জানি না, কিন্তু জনহৃদয়ের এত সুগভীর শ্রদ্ধাই বা আর কয়জন পাইয়াছেন? এক সুদুর্লভ নিষ্ঠায় তাঁহার শিল্পাদর্শকে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই আদর্শকে তিনি ধুলায় মলিন হইতে দেন নাই।

[*দেশ*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৫৬]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানিকের মৃত্যুর পরই তাঁর বিষয়ে মূল্যায়নমূলক প্রবন্ধ লেখেন বুদ্ধদেব বসু ('মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', *কবিতা*, পৌষ ১৩৬৩), নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ('সাহিত্যিকের জীবন, সাহিত্যিকের মৃত্যু', *মাসিক বসুমতী*, পৌষ ১৩৬৩), নারায়ণ চৌধুরী ('শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', *শনিবারের চিঠি*, পৌষ ১৩৬৩) প্রমুখ। অব্যবহিত পরেই *পরিচয়* (পৌষ ১৩৬৩) ও *নতুন সাহিত্য* (পৌষ ১৩৬৩) বিশেষ 'মানিক সংখ্যা' প্রকাশ করে। উত্তরকালে 'মানিক সংখ্যা' প্রকাশ করে আরো অনেকগুলি পত্রিকা।

২. বিশিষ্ট চারিত্রলক্ষণ

এখন, ব্যক্তি-মানিকের কয়েকটি চারিত্রলক্ষণ চিহ্নিত করব।

ক) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বভাবের দিক থেকে নির্জন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন।[২] বাল্যকালের স্মৃতিচারণায় তিনি নিজেই বলেছেন, 'মন মাঝে মাঝে দুর্দান্ত হয়ে উঠতো, কখনো বা একা বসে বসে চিন্তা করতাম।'[৩] নির্জনতা, চিন্তাশীলতা, বিশ্লেষণ প্রবণতা—এসব তাঁর সাহিত্যের কুললক্ষণ। জীবনানন্দ দাশকে বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন নির্জনতম কবি।[৪] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্জনতম কথাসাহিত্যিক (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্তত সহোদর ভ্রাতার সঙ্গে গভীর বন্ধুতায় যুক্ত ছিলেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অন্তত শনিমণ্ডলী তথা *শনিবারের চিঠি* পত্রিকার লেখক-সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ ছিলেন)। *বিচিত্রা* পত্রিকায় তিনি প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেও, *পূর্ব্বাশা* ও *মাসিক বসুমতী* পত্রিকায় অনেক লিখলেও, যাকে বলে নিজস্ব পত্রিকা-মাধ্যম তা মানিকের ছিল না—এমনকি *পরিচয়*[৫] বা *নতুন সাহিত্য*ও[৬] নয়। পরিবারে, পত্রিকাসূত্রে, লেখকগোষ্ঠীতে, পার্টিতে সর্বত্রই তিনি একটি অমোচনীয় দূরত্ব রক্ষা করেছেন। নির্জনতাই অস্তিত্বের বিবরের প্রবেশপথ। আধুনিক বাংলা কবিতা ও কথাসাহিত্যের দুই পুরোধা-পুরুষ জীবনানন্দ দাশ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—যে অসম্ভব নিঃসঙ্গ নির্জন ছিলেন, এটি গভীর তাৎপর্যময় বলে আমাদের বিশ্বাস।[৭] মানিকের কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধুর পরিচয় আমাদের অজ্ঞাত। হয়তো তাঁর মানসিক নৈঃসঙ্গ্য ও নৈর্ব্যক্তিকতার জন্য এক আশ্চর্য তথ্য লক্ষ করি আমরা: তাঁর একটিমাত্র গ্রন্থ ছাড়া কোনো বইয়েরই উৎসর্গপত্র নেই। আর সেই গ্রন্থ *স্বাধীনতার স্বাদ* (১৯৫১), উপন্যাসের উৎসর্গ নৈর্ব্যক্তিক: 'সম্প্রদায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্বিশেষে জনগণকে এই বইখানা উৎসর্গ করলাম—জনসাধারণই মানবতার প্রতীক'।

খ) নিঃসঙ্গ নির্জন হলেও মানিক আত্মকেন্দ্রী ছিলেন না, ছিলেন সামাজিক ও সন্ধিৎসু। নির্জনতা ও সামাজিকতা—এই আত্মবৈপরীত্য মানিকের অন্তর্বাস্তবতা ও বহির্বাস্তবতা নির্মাণ করেছে। মানিক তাঁর গল্পে উপন্যাসে জীবনের তথা মানুষের বৈপরীত্যকে অনেক সময় আবিষ্কার করেছেন। তাঁর ব্যক্তিচরিত্রে ছিল এই বৈপরীত্য : একদিকে নির্জন চিন্তা, বিশ্লেষণ, রহস্য ও সংকেত; অন্যদিকে বহির্বাস্তবের প্রতি বিপুল কৌতূহল। একটি কৈশোরক গল্পে তিনি তাঁর ওই আত্মস্বভাবের উন্মোচন করেছেন :

> ...ভালবাসতাম লাল ধুলোভরা সহরের নোংরা পুরানো ঘিঞ্জি লোকালয়, মোটেই হিসাব থাকত না যে যাদের সঙ্গে মিলছি, মিশছি, খেলাধুলো হৈ-চৈ করছি, তারা বয়সে বড় অথবা ছোট, সংসারের মাপকাঠিতে ভদ্র অথবা ছোটলোক...।

[‘অলৌকিক লৌকিকতা’, *কিশোর বিচিত্রা*]

‘লেখকের সমস্যা’ (*মা. গ্র.* ১২) প্রবন্ধে মানিক ‘সব সময় সর্বত্র জীবনকে দর্শন করার বিরামহীন শ্রমে’র কথা বলেছেন। এবং উদাহরণ হিসাবে একজন লেখক বাজারে গিয়ে কিরকম অনুপুঙ্খভাবে পরিপার্শ্ব লক্ষ করবেন, তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।[৮] বহির্জগৎ সম্পর্কে এই কৌতূহল মানিককে বাস্তববাদী শিল্পীতে পরিণত করেছে। মানুষের মনোলোক ও বহির্লোকের প্রতিটি বিষয়কে মানিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতে চেয়েছিলেন। মানুষই তার আগ্রহের একমাত্র বিষয় ছিল—মানুষের বস্তুজগৎ ও অন্তর্জগৎ—প্রকৃতিচিত্রণ তাই তাঁর রচনায় এত কম।

গ) স্পষ্টভাষিতা, অকপটতা, আপোসহীনতা মানিকচরিত্রের বিশিষ্টতা। পরিবার ও পার্টি—কারো সঙ্গেই তাই তাঁর বনে না। রচনাপ্রার্থী এক সম্পাদককে লেখেন, ‘টাকা পাঠাইবেন না, বেশী টাকাও নয়। আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। আমি আপনাদের লেখা দিতে পারিব না।’ (৬-সংখ্যক পত্র, তারিখ নেই, *অ. মা. ব.*) সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মতো ঘনিষ্ঠ অনুরাগী সম্পাদককেও লেখেন, ‘পূর্ব্বাশা আজকাল কিরকম মজুরি দিচ্ছে?’[৯] (১৮.৪.৫১) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা বিখ্যাত পত্রটি স্মরণীয় এ প্রসঙ্গে (৯-সংখ্যক পত্র, *অ. মা. ব.*) কিংবা ডায়েরিতে তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য, ‘দাদা চিরদিন অকৃতজ্ঞ অর্থপিশাচ! (২৫.১.৪৯, *অ. মা. ব.*) মেজদা সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে, ‘টাকা ভাগের সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাজির থাকবে।' (৩.২.৪৯, *অ. মা. ব.*) বাড়িওয়ালা সম্পর্কে, 'বাড়ীওলা সম্পর্কে প্রথম ধারণাই পরিপুষ্ট হচ্ছে—আদর্শ আত্মকেন্দ্রিক নিম্নমধ্যবিত্ত বিষয়ী এবং স্ত্রৈণ!' (৪.২.৪৯, *অ. মা. ব.*) এক সাহিত্যসভার সভাপতি সম্পর্কে, 'সভাপতি সেকেলে চালাক। কিছু না বলে সে অনেক কথা বলল—সবচেয়ে বেশি হাততালি পেল।' (২৭.২.৪৯, *অ. মা. ব.*) পার্টির অন্তর্বিরোধ সম্পর্কে, 'নতুন সাহিত্য বেরিয়েছে আমায় বাদ দিয়ে—পরিচয়ে লেখার অপরাধে! স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সুবিধাবাদী বুদ্ধিজীবীরা কিভাবে নিজেদের জোট বাঁধছেন। গোপালবাবু[১০] নেতা হতে উদ্যোগী। হীরেন বাবুর[১১] উপর অমর বাবু[১২] চটা।' (৫.৬.৫০, *অ. মা. ব.*) কম্যুনিস্ট পার্টিতে যুক্ত হওয়ার পর অ-বামপন্থী প্রকাশকেরা ও সম্পাদকেরা ('পয়সাওলা কাগজওয়ালারা'[১৩]) যেমন বিরূপ হয়েছেন, তেমনি '...আমার বইখানা যেন প্রগতির স্রোতের সঙ্গে সংযুক্ত বঞ্চনার চোরাবালিতে হারিয়ে গেছে।' (১৫-সংখ্যক পত্র, *অ. মা. ব.*) এই সার্বিক আপোসহীনতা, স্পষ্টভাষিতা, অকপটতা (আর সবই আদর্শের জন্যে) তাঁকে দরিদ্র ও নিঃসঙ্গ করে দিয়েছে; কিন্তু তা আবার অন্যদিক থেকে তাঁর সাহিত্যকে দান করেছে আদর্শের দাহ ও দীপ্তি।

ঘ) আকস্মিকভাবে সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে[১৪] মানিক সেই যে রচনাকর্মে লিপ্ত হলেন, মৃত্যু অবধি তাঁর আর কোনো ছেদ ছিল না। অসম্ভব সৃষ্টিশীল এই শিল্পী প্রথম রচনা ('অতসী মামী') থেকে মৃত্যুকাল অবধি সাহিত্যসৃষ্টিতে অবিরলভাবে সচেষ্ট, এমন একটি বছর যায়নি যে-বছর তাঁর বই বেরোয়নি (১৯৩৫-৫৬), এমনকি মৃত্যুর পরও তাঁর অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, এবং তেরো খণ্ড গ্রন্থাবলির বাইরেও এখনো অগ্রন্থিত রচনার সংখ্যা কম নয়। তাঁর এই উদ্দাম সৃষ্টিশীলতার অন্য একটি পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর উপন্যাস-চর্চা ও পরিকল্পনায়, যে-উপন্যাস ছিল, তাঁর সাহিত্যচর্চার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ও অন্বিষ্ট মাধ্যম[১৫] : তাঁর প্রণীত বেশ-কয়েকটি উপন্যাসের পরবর্তী খণ্ড তাঁর পরিকল্পিত ছিল, কিন্তু অরচিত রয়ে গেছে (*পুতুলনাচের ইতিকথা*র দ্বিতীয় পর্ব, *সহরতলী* উপন্যাসের তৃতীয় পর্ব, *দর্পণ* ও *জীয়ন্ত*র দ্বিতীয় পর্ব); একেবারেই লেখা হয়নি, অথচ পরিকল্পনা করেছেন, এমন উপন্যাসের সংখ্যাও কম নয় (দুটি অপ্রকাশিত উপন্যাসের খসড়া ড. সরোজমোহন মিত্রের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *জীবন ও সাহিত্য* গ্রন্থের পরিশিষ্টে মুদ্রিত হয়; *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* গ্রন্থে 'ষড়রিপু', 'কর্মী', 'বন্ধু',

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপশোষ', 'রাজধানী' প্রভৃতি)। চিকিৎসাতীত ব্যাধি ও অপরিসীম দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও মানিক তাঁর সৃষ্টিকর্মে এক-তিল ক্ষান্তি দেননি।

ঙ) বিজ্ঞানমনস্কতা। মানিক ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র এবং এই বিষয়টিতে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর আনুপূর্বিক সমস্ত রচনার মধ্যেই হৃদয় ও আবেগ সরিয়ে নিরাবেগ, নির্মোহ ও নিরাসক্ত দৃষ্টিতে জীবনকে দেখবার চেষ্টা আছে—ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে 'অতসী মামী'র (প্রথম প্রকাশ : ১৯২৮) মতো গল্প ও *দিবারাত্রির কাব্যের* (প্রথম প্রকাশ ১৯৩৪) মতো উপন্যাসকে। তাঁর ব্যক্তি-জীবনদৃষ্টির মধ্যেও যে এই আবেগহীন নিরাসক্তি কাজ করেছিল তাঁর ডায়েরি ও চিঠিপত্রে, যেখানে মানুষের অন্তরঙ্গ প্রকাশ ঘটে, তার সাক্ষ্য আছে। মানিক নিজে বৈজ্ঞানিক ছিলেন না, কিন্তু তাঁর জীবনে ও রচনায় বিজ্ঞান-প্রবণতা প্রতিফলিত হয়েছে। ফ্রয়েড (১৮৫৮-১৯৩৯) ও মার্ক্স (১৮১৮-৮৩) জীবনের পূর্ব ও উত্তর দুই পর্বে এদের প্রভাব মানিকের বিজ্ঞানমানসেরই সাক্ষ্য।

['উপন্যাসের ধারা', *মা. গ্র.* ২]

চ) রাজনীতিমনস্কতা। সমাজচেতনা মানিককে ক্রমশ তীব্রভাবে রাজনীতিচেতন করে তোলে। ১৯৪৪ সালে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। তারপর ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘে, প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘে, সভাপতি, সম্পাদক ও সদস্য হিশেবে যুক্ত থাকেন। এ সময় তাঁকে বিভিন্ন মিটিংয়ে, মিছিলের পুরোভাগে দেখা গেছে। রচনা স্বাভাবিকভাবে বিপুলভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

ছ) দর্শনমনস্কতা। মানিকের ভিতরে একটি সহজাত দার্শনিকতা ছিল। তাঁর স্বাভাবিক বিশ্লেষণশীলতা যেমন অন্য মানুষকে, তেমনি নিজেকেও চিরে চিরে দেখতে চেয়েছে। তাঁর সমস্ত রচনায় যে-পরীক্ষামূলকতা, যে thought-experiments,[১৬] যে জীবনার্থ-সন্ধান, তা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেরই প্রতিফলন; বিজ্ঞানমনস্ক মানিকের জীবনের উপান্ত্যে এসে কালীমাতার শরণ[১৭] কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়, তাঁর অন্তঃসন্ধানের একটি পরিচায়ক। তাঁর ডায়েরিতে যেমন বাজারের আলু-পটলের হিশাব আছে, তেমনি আছে দার্শনিকতাও।[১৮]

জ) মানস-সচলতা। মানসিকভাবে মানিক ছিলেন অসম্ভব সচল ও পরিবর্তমান। এর মূলে ছিল তাঁর সন্ধান। মানুষের অন্তর্লোক ও বহির্লোক—দুই ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সন্ধানী। মানুষই ছিল তাঁর কেন্দ্রীয় বিষয়, এই মানুষের মুক্তির সন্ধানেই তাঁর মধ্যে বাস্তব ও আদর্শের একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমন্বয় ও সংঘর্ষ হয়েছিল। এই সন্ধানে মানিক কোথাও থেমে থাকেননি, ফ্রয়েড থেকে মার্ক্স, মার্ক্স থেকে অধ্যাত্মবাদ—তাঁর ব্যক্তিবিশ্ব এইভাবে ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়েছে।

মানিকের ব্যক্তিপ্রকৃতিতে এইভাবে বিচিত্র ও বিরোধী লক্ষণ ও গুণের সন্নিপাত ঘটেছিল: তিনি ছিলেন স্পষ্টভাষী, অকপট, নিরাবেগ, একনিষ্ঠ, নির্জন অথচ সমাজরাজনীতি-সচেতন, বিজ্ঞানমনস্ক অথচ স্বভাবদার্শনিক, বিশ্বাসে দৃঢ়-দীপ্ত অথচ পরিবর্তমান অগ্রসরমাণ।

তথ্যনির্দেশ

১. এই সাক্ষাৎকার যখন গ্রহণ করা হয় তখন হিমাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অবসরপ্রাপ্ত, টালিগঞ্জে বাস করছেন। *বর্ণমালা* পত্রিকার পক্ষে এই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন অরুণ কুমার রায় ও রুদ্রদেব মিত্র।

২. পৃ. ১৫, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ জিজ্ঞাসা*, নিতাই বসু।

৩. পূর্বোদ্ধৃত পরিমল গোস্বামীর লেখায় মানিকবাবুর জবানি (*যুগান্তর*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৫৬)।

৪. *কবিতা* পত্রিকায় 'বনলতা সেন'-এর কাব্যালোচনায় বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন, 'আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ সবচেয়ে নির্জন, সবচেয়ে স্বতন্ত্র।' [*কালের পুতুল*, বুদ্ধদেব বসু]

৫. কম্যুনিস্ট সাহিত্যসেবীদের মধ্যে যে তীব্র তর্কবিতর্কের ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হয়েছিল *পরিচয়* ও অন্যান্য বামপন্থী পত্রিকায় তা থেকে মানিককেও রেয়াত করা হয়নি। ('মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়তি', অশ্রুকুমার সিকদার, *জিজ্ঞাসা*, শ্রাবণ ১৩৮৭।) *পরিচয়*-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও লেখক হিশেবে সচল থেকেও ওই পত্রিকার সংখ্যার পর সংখ্যায় তিনি অনুপস্থিত থেকেছেন।

৬. *নতুন সাহিত্য* পত্রিকা থেকে তাঁর লেখা প্রত্যাখ্যাতও হয়েছে। 'মানিক বিচিত্রা' প্রসঙ্গে অনিলকুমার সিংহ, *মানিক বিচিত্রা*।

৭. এই শতাব্দীর খ্যাততম চিত্রশিল্পী পাবলো পিকাসোর (১৮৮০-১৯৭৩) উক্তি: 'It is impossible to do anything without solitude, and have created solitude for myself that no one suspects.'

৮. প্রকৃতিবাদী ঔপন্যাসিক এমিল জোলা (১৮৪০-১৯৫০) রঙ্গমঞ্চ নিয়ে উপন্যাস লিখতে হলে তার করণীয়ের যে-নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা অবিকল এ রকম।

৯. সঞ্জয় ভট্টাচার্য দুঃখ করে লিখেছেন উত্তরকালে:

> আমার কিন্তু আশা ছিল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যৌনতার মোহমুক্তির পর যখন বামপন্থায় আসক্ত হলেন (জাপান-আক্রমণ ও স্টালিনপন্থীদের 'জনযুদ্ধে'র অপলাপী দশকে) তখন তিনি "রাঙামাটির চাষী"তে ('পূর্ব্বাশা'য় প্রকাশিত, যেমন "পদ্মানদীর মাঝি"তেও) বাংলার আদিম কৃষক কৃষ্টির মূল থেকে স্থূল ও ফুল পর্যন্ত অঙ্কিত [...]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্তত স্টালিনপন্থী সোলোকভ পর্যায়ের শিখরে গিয়ে পৌছুতে পারবেন কিন্তু আমাকে নিরাশ হতে হল। সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদকের এটুকু আশাও তিনি পূরণ করতে পারলেন না, অসহিষ্ণুতা দোষে হয়তো। সন্ন্যাস-রোগে তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়তো রক্তের অসহিষ্ণুতা। ['পূর্বাচলের পানে তাকাই', *পূর্ব্বাশা*, পৌষ [...]]

১০. গোপাল হালদার।

১১. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

১২. অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র। *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* বিষয়ে এঁর একটি পত্র প্রকাশিত হয় *পরিচয়* পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩৮৪)। সেখানে তিনি বলেন, 'মানিকবাবুর ডায়েরিটা মানিকবাবুরই ডায়েরি। মূল্যবান। নিঃসন্দেহেই তার আপন মনের মাধুরীতে ও অমাধুরীতে ভরপুর। ডায়েরির ব্যক্তি মানসিক চরিত্র বিবেচনা না করে পার্টিগত ব্যাপারে ডায়েরির প্রতিটি মন্তব্যই সেদিনকার পার্টি ইতিহাসের সত্য বিবরণ অর্থাৎ অকাট্য প্রমাণ, এটা ধরে নেওয়া ঐতিহাসিকের পক্ষে একটা বড় রকমের ভুল।'

১৩. কথাটি মানিকেরই। *মাসিক বসুমতীর* সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটককে মানিক এক পত্রে লিখেছিলেন, 'পয়সাওলা কাগজওয়ালারা আমাকে আবার একরকম বয়কট করেছেন।' [চিঠির রচনাকাল ২৭.৬.৫১; *মাসিক বসুমতী*, পৌষ ১৩৬৩]

১৪. আকস্মিকভাবে তর্কে জিতবার জন্যে তাঁর লেখা প্রথম গল্প 'অতসী মামী'। মানিক একাধিকবার এই কাহিনী বলেছেন। ['গল্প লেখার গল্প', 'সাহিত্য করার আগে'; *মা. গ্র.* ১২]

১৫. মানিকের উক্তি: 'সাধ করলে কবি হয়তো আমি হতেও পারি কিন্তু ঔপন্যাসিক হওয়াটাই আমার পক্ষে হবে উচিত ও স্বাভাবিক।'

১৬. কথাটি কলিন উইলসনের। তাঁর উক্তি:

The novel is a born of thought-experiment. Like thought-experiments of the philosopher, its aim to teach us something about the real world. [*The Craft of the Novel*, Colin wilson]

১৭. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্রোহী সত্তার সঙ্গে নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) বিদ্রোহী সত্তার তুলনা দিয়েছেন কেউ-কেউ। দুজনের এক বিস্ময়কর সাযুজ্য এই যে, দুজনেই উপান্ত্য-জীবনে কালীমাতার আশ্রয় নিয়েছিলেন।

১৮. একটি উদাহরণ:

মূল নিয়ম কী?

আমরা নিয়মের সূত্রে বাঁধা। মূল নিয়ম জানার জন্য—শুধু বুদ্ধি দিয়ে জানা নয়, জীবন দিয়ে জানা—আমরা ক্রমাগত নিয়মের শাখা-প্রশাখাই জেনে এসেছি, এবং চিরকাল তাই আমাদের করে যেতে হবে। এরই নাম প্রগতি। সমস্ত ধর্ম আর মতবাদের ভিত্তিও এই। সৃষ্টিরহস্য, বিশ্বের মূলনীতি কোনো দিনই জানা সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে—সে জ্ঞান অনন্ত, সীমাহীন; কিন্তু সেটাই আশীর্বাদের মত। কারণ জেনে জেনে এগিয়ে যাওয়া কোনদিন আমাদের শেষ হবে না। [রচনা: ১৯৫৪, পৃ. ১৫২, *অ. মা. ব.*]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্যিক পরিপ্রেক্ষিত

১. পরিপ্রেক্ষিত

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যরচনাকাল ('অতসী মামী'র প্রথম যাত্রারম্ভ থেকে মৃত্যুকাল অবধি) : **১৯২৮-৫৬**—মোট এই উনতিরিশ বছর বা প্রায় তিন দশক। ১৯২৮ সালে মানিকের বয়স কুড়ি, মৃত্যুকালে আটচল্লিশ।

মানিকের উন্মেষকালে বা অব্যবহিত কাল আগে কথাসাহিত্যের জগতে রাজত্ব করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) ও কল্লোল যুগের লেখকেরা।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় ১৯৪১ সালে। (তত দিনে মানিকের প্রথম পর্যায়ের রচনাধারা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তার হাত থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে বাংলা সাহিত্যের যুগান্তকারী কয়েকটি উপন্যাস; কিন্তু সমকালীন সাহিত্য সম্পর্কে নিরন্তর আগ্রহী হয়েও সেগুলি রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়েনি, বা অন্তত সে-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কোনো মন্তব্য নেই।) রবীন্দ্রনাথের অন্ত-পর্যায়ের উপন্যাসগুলি লেখা হয়েছে মানিকের এই উন্মেষ পর্বে: *শেষের কবিতা* (১৯২৯), *যোগাযোগ* (১৯২৯), *দুই বোন* (১৯৩৩), *মালঞ্চ* (১৯৩৩), *চার অধ্যায়* (১৯৩৪)।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৯৩৮ সালে। তাঁর শেষ দিককার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস (মোটামুটি মানিক-সমকালীন): *পল্লীসমাজ* (১৯১৬), *গৃহদাহ* (১৯২০), *শ্রীকান্ত* (তৃতীয় খণ্ড, ১৯২৭; চতুর্থ খণ্ড, ১৯৩৩), *পথের দাবী* (১৯২৬), *শেষ প্রশ্ন* (১৯৩১)।

তিরিশের দশকে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র পূর্ণ কিন্তু শেষ দীপ্তিতে প্রজ্বলিত। ততদিনে বাংলা সাহিত্যে পালাবদলের ঘণ্টা বেজে উঠেছে। বস্তুত এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবর্তন শুরু হয়েছে বিশের দশকের সূচনাতেই। ঢাকায়। ঢাকায় তখন ছিলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪), মোহিতলাল মজুমদার[১] (১৮৮৮-১৯৫২), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪) প্রমুখ সাহিত্য-নায়কেরা। এঁদের কয়েকটি সামান্য সাযুজ্য ছিল: ক) এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন রবীন্দ্রবিরোধী; খ) রবীন্দ্রবিধর্মী নতুন সাহিত্যের রচয়িতা ও পোষক; গ) বস্তুধর্মী সাহিত্যের পক্ষে। কিছুকাল পরেই এঁরা কলকাতায় স্থানান্তরিত হন। এবং কল্লোলকেন্দ্রী 'অতি আধুনিক'[২] (এঁদেরই আত্মপরিচায়ক শব্দবন্ধ) সাহিত্য পুরো দানা বাঁধে। কলকাতায় তথা পশ্চিমবঙ্গে মাটি প্রস্তুত হয়েই ছিল: শরৎচন্দ্র ও নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) রবীন্দ্রযুগেই রবীন্দ্রধর্মী কথাসাহিত্য ও কবিতা, রচনা করে (এক্ষেত্রেও দুজনের সাযুজ্য বস্তুধর্মিতায়, জনবোধ্যতায় ও জনপ্রিয়তায়) পরবর্তী সাহিত্যের পথ প্রশস্ত করেছিলেন। নতুন কয়েকটি পত্রিকা হয়ে উঠল নতুন সাহিত্যের বাহন: *কল্লোল* (প্রথম প্রকাশ: ১৯২৩। কলকাতা। সম্পাদক: দীনেশরঞ্জন দাশ), *কালিকলম* (প্রথম প্রকাশ: ১৯২৬। কলকাতা। সম্পাদক: মুরলীধর বসু) এবং *প্রগতি* (প্রথম প্রকাশ ১৯২৭। ঢাকা। সম্পাদক: বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত)। *সবুজ পত্র*-এর (প্রথম প্রকাশ: ১৯১৪। সম্পাদক: প্রমথ চৌধুরী) পরে *কল্লোল* সবচেয়ে প্রভাবশালী সাহিত্যপত্রিকা—সবচেয়ে খ্যাতিমান, আধুনিক সাহিত্যের মর্মকেন্দ্রে তার স্থান। *সবুজ পত্র* ছিল রবীন্দ্র-কেন্দ্রিক ও মননশীল আর *কল্লোল* ছিল নতুন সাহিত্যকেন্দ্রী ও সৃষ্টিশীল (*কল্লোল*, ও *কালিকলম—প্রগতি* তো বটেই—অন্তত প্রথম বর্ষে রবীন্দ্রনাথকে পরিবর্জন করেছিল। *কল্লোল* প্রকাশিত হওয়ার পরের বছর তার বিরুদ্ধবাদী পত্রিকা *শনিবারের চিঠি*[৩] (প্রথম প্রকাশ: ১৯২৪। কলকাতা। সম্পাদক: সজনীকান্ত দাস) বেরিয়েছিল। বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে *শনিবারের চিঠি* কল্লোলীয় সাহিত্যকে আরো জনপ্রিয় করে। *কল্লোল*-এর পৃষ্ঠায় লিখেছিলেন যেমন একটু বয়স্ক এবং পূর্বেই-খ্যাতিমান ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়[৪] (১৮৯৪-১৯৬২) ও নজরুল ইসলাম, তেমনি উঠে এসেছিলেন অজস্র তরুণ—উত্তরকাল যাঁদের নায়ক-পদে বৃত করেছে: জীবনানন্দ দাশ[৫] (১৮৯৯-১৯৫৪), বিষ্ণু দে (১৯০৯-৮২), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-৭৬), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), বুদ্ধদেব বসু।

'কল্লোলে'র কথাসাহিত্যিক প্রধান পুরুষেরা হলেন: গোকুলচন্দ্র নাগ (১৮৯৪-১৯২৫), জগদীশচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০০-৭৬), মনীশ ঘটক বা 'যুবনাশ্ব' (১৯০২-৭৯), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২), প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৭-৮৩) প্রমুখ। কল্লোলের অন্বিষ্ট ছিল: ১. 'রবীন্দ্রোত্তর'৬ বা 'উত্তররৈবিক'৭ সাহিত্য সৃষ্টি করা; ২. কবিতায় দ্রোহী চেতনা (মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ১৮৮৭-১৯৫৪ ও নজরুল, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার—বিশের ও তিরিশের দশকের বিদ্রোহী কবিপুরুষেরা এই পত্রিকার পৃষ্ঠায় একত্রিত হয়েছিলেন); ৩. কথাসাহিত্যে দ্রোহী চেতনা (*কল্লোল* পত্রিকার প্রচ্ছদপটে প্রথম বছর দেড়েক ধরে লেখা থাকত 'বাংলার মাসিক গল্প-সাহিত্য পত্রিকা'); ৪. বস্তুবাদী সাহিত্য সৃষ্টি করা (ফ্রয়েড ও মার্ক্স-এর প্রস্তাবে বস্তুবাদী সাহিত্য সৃষ্টি; কবিতায় ও কথাসাহিত্যে শরীরী ও সামাজিক চৈতন্য—নিম্নশ্রেণী সম্পর্কে সচেতনতা; নরেশচন্দ্র, জগদীশ গুপ্ত, এবং অন্যান্য প্রায়-সব কথাশিল্পীর কাজ); ৫. বিদেশি সাহিত্য থেকে পরিগ্রহণ (কল্লোলের লেখকদের প্রিয় পাঠ্যের মধ্যে ছিল রুশ—তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি, তুর্গেনিভ, চেখভ ও গোর্কি, ফরাসি—রোমাঁ রোলাঁ ও আনাতোল ফ্রাঁস, ইংরেজি—লরেন্স ও হাক্‌সলি এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ান সাহিত্য—য়োহান বোয়ায় ও নুট হামসুন)।

অব্যবহিত আগের *ভারতী* পত্রিকার রোমান্সবক্রিমা অন্তত সোচ্চার বস্তুবাদী বক্তব্যে ঘুচিয়ে দিয়েছিল *কল্লোল*। কল্লোলের পূর্বসূরি লেখক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, যাঁর যৌনতার মিশেল-দেওয়া গল্প উপন্যাসে সেদিনকার পাঠক সচকিত হয়ে উঠেছিল। গোকুলচন্দ্র নাগের *পথিক* (১৯২৫) 'আধুনিক উপন্যাসের পথ দেখাইছে।'৮ জগদীশ গুপ্ত একাধিকভাবে (মোহহীন বাস্তবতা, নিয়তিচেতনা) আধুনিক গল্প-উপন্যাসের অগ্রদূত। তাঁর গল্পগ্রন্থ *বিনোদিনী* (১৯২৭) পরবর্তী বাংলা গল্পের একটি যাত্রাস্থল। 'শৈলজানন্দই সর্ব্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে regional অর্থাৎ অঞ্চলবিশেষ ও সমাজ-বিশেষের জীবনকে উপন্যাসের বিষয়ীভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার "কয়লাকুঠি"র গল্পগুলিতে একটি নূতন রসের সৌরভ পাওয়া গিয়াছিল।'৯ অচিন্ত্যকুমারের *বেদে* (১৯২৮) উপন্যাসে অনেকগুলি কল্লোলী লক্ষণ ফুটে উঠেছিল—বাস্তবতা, যৌনতা, যাযাবরী কল্পনা। বুদ্ধদেব বসু ও অচিন্ত্যকুমার 'কাব্যধর্মী'১০। কিন্তু কাব্যধর্মী-শব্দে অচিন্ত্যকুমারের সবটা নিহিত নেই—মফস্বলী মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের জীবনকে তিনি বস্তুসম্মতভাবেও উপস্থিত করেছেন অনেক স্থানে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প-উপন্যাসে মানবমনের গভীর জটাজাল কুশলতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। মনীশ ঘটক নিচুতলার জীবনকে ধরেছেন তাঁর স্বাদে গন্ধে (*পটলডাঙ্গার পাঁচালী*, ১৯৫৭)। প্রবোধকুমার সান্যালের রচনায় প্রেম ও পথিকবৃত্তি রূপায়িত। অন্নদাশঙ্কর ও ধূর্জটিপ্রসাদ গল্প-উপন্যাসে মননের যাত্রিক। 'বহুকালাগত প্রাচীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতীয় বিশ্বাসকে একালের পটে নবমূল্য প্রদানে (সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী), জীবনের সুস্থ স্বভাবকে খোঁজার অক্লান্ত প্রয়াসে বিচিত্র বিশাল জনজীবনকে একটা নৈতিক ব্যাখ্যাদানের চেষ্টায়, তারাশঙ্কর স্মরণীয়।'[১১]

বলা বাহুল্য, 'কল্লোলে'র কালেই আরো অনেক ভালো ও প্রভাবশালী সাহিত্যপত্রিকা ছিল: *বিচিত্রা* (মানিকের প্রথম গল্প প্রকাশ করেছিল, এই পত্রিকায় উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদকতা ১৩৩৪-৪৪), *বঙ্গশ্রী* (প্রথম প্রকাশ: মাঘ ১৩৩৯। সম্পাদক: সজনীকান্ত দাস), *পূর্ব্বাশা* (১৯৩২-৩৮; ১৯৪৩-৫৩; ১৯৬৪-৬৯। সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য), *চতুরঙ্গ* (প্রথম প্রকাশ: ১৩৪৫। সম্পাদক: হুমায়ুন কবির ও বুদ্ধদেব বসু), *পরিচয়* (১৯৩১-৪৩: সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত), *দেশ*, *আনন্দবাজার পত্রিকা*, *প্রবাসী* ইত্যাদি। তেমনি 'কল্লোলে'র বাইরে শক্তিশালী কথাশিল্পীরও অভাব ছিল না: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বা বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০), বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৮৭), সঞ্জয় ভট্টাচার্য (১৯০৯-৬৯), গোপাল হালদার (১৯০২-৯৩), মনোজ বসু (১৯০১-৮৭) প্রমুখ।

বাংলাদেশে চল্লিশের দশকে সমাজতন্ত্রী সাহিত্যের ভরা জোয়ার গেছে। মূলত কবিতায়। চল্লিশের দশকে সমাজতন্ত্রী কবিদের জয়জয়কারের সময়। তার পূর্বসূত্র রচিত হয়েছিল বিশের দশকে—নজরুল ইসলামের মাধ্যমে। ১৯২২ সালে 'বিদ্রোহী' কবিতা (এবং একই বছরে 'বিদ্রোহী'সংবলিত *অগ্নিবীণা*) ও ১৯২৫ সালে *সাম্যবাদী* কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ, নজরুল সম্পাদিত *ধূমকেতু* (১৯২২), *লাঙল* (১৯২৫) ও *গণবাণী* (১৯২৬) পত্রিকা, এবং সামগ্রিকভাবে নজরুল-সাহিত্য সাধারণ মানুষকে তার আত্মমূল্যে প্রথমবারের মতো অধিষ্ঠিত করে। চল্লিশের দশকে সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-৪৭), সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩), সমর সেন (১৯১৬-৮৭) ও আরো অসংখ্য কবি সমাজতান্ত্রিক ধারায় কবিতা রচনা করেন। নবপর্যায় *পরিচয়*, *নতুন সাহিত্য*, *চতুষ্কোণ*, *সাহিত্যপত্র*, *স্বাধীনতা*, *কালান্তর*, *মার্কসবাদী*, *অগ্রণী*, *ক্রান্তি*, *অরণি*, *প্রতিরোধ* প্রভৃতি পত্রিকাই ছিল মূলত এই নতুন তত্ত্বালোচনা ও সাহিত্যের বাহন।

২. ধারণা ও বিবেচনা

রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং কল্লোল যুগ ও তার কোনো-কোনো লেখক সম্পর্কে মানিক মন্তব্য করে গেছেন।[১২]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মানিক স্বভাবতই সশ্রদ্ধ ছিলেন। বিভিন্ন সাহিত্যসভায় তিনি রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন, নিজে রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছেন, কন্যাদের গাইয়েছেন। 'বাংলা সাহিত্যে বস্তুবাদের আবির্ভাবকে সাহায্য করার দায়িত্ব থেকে' রবীন্দ্রনাথকে তিনি 'রেহাই' দিয়েছিলেন ('সাহিত্য করার আগে', *মা. গ্র.*), তিনি বলেছেন রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে তিনি ছিলেন প্রশ্নহীন, কিন্তু তাঁর বলার ভঙ্গিতেই প্রশ্ন জেগেছিল। পূর্বজ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে শরৎচন্দ্র সম্পর্কেই মানিক ছিলেন সবচেয়ে সশ্রদ্ধ। শরৎচন্দ্রের *শ্রীকান্ত* (প্রথম খণ্ড ১৯১৭, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯১৮, তৃতীয় খণ্ড ১৯২৭, চতুর্থ খণ্ড ১৯৩৩), *চরিত্রহীন* (১৯১৭) ও *শেষ প্রশ্ন* (১৯৩১) উপন্যাসের বিমুগ্ধ কিন্তু যুক্তিজাগর পাঠক ছিলেন মানিক। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে একটি প্রশ্নই তিনি শুধু তুলেছিলেন: 'শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলিও হৃদয়সর্বস্ব কেন, হৃদয়াবেগ কেন সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে—মধ্যবিত্তের হৃদয়।' ('সাহিত্য করার আগে', *মা. গ্র.* ১২) কল্লোল সম্পর্কেই মানিক সবচেয়ে বেশি ভাবিত ছিলেন। গোপাল হালদার[১৩] বা আরো কোনো-কোনো সাহিত্যিক বা সাহিত্যের ইতিহাসরচয়িতার মতো তিনি কল্লোল যুগকে উড়িয়ে দেননি, শান্ত বিবেচনায় তার ভালো ও মন্দ চিহ্নিত করেছিলেন। তীব্র সমালোচনা একদিকে :

১. জোরের সঙ্গে দাবি করা হয়েছিল যে, আমরা বস্তুপন্থী সাহিত্য সৃষ্টি করছি, কিন্তু প্রকৃত বস্তুবাদী আদর্শ কল্লোল, কালিকলমীয় সাহিত্যিক অভিযানের পিছনে ছিল না।

[‘সাহিত্য করার আগে', *মা. গ্র.* ১২]

২. অঙ্কশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি.এস-সি. পড়বার সময় আমি সাহিত্য করতে নামি—বাড়ির লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে। কারণ, তখন আমি অনুভব করছিলাম যে সাহিত্যজগতে একটা বড় রকম পরিবর্তন ঘটতে চলছে, এরকম সন্ধিক্ষণে সাহিত্য সৃষ্টি করার বদলে অন্য কাজে সময় নষ্ট করা যায় না। তখন কল্লোল যুগের সমারোহ কিন্তু আমি টের পেয়েছিলাম সাহিত্য যে মোড় ঘুরছে কল্লোলী সাহিত্য তার লক্ষণমাত্র, আসল পরিবর্তন আসবে অন্যরূপে—সাহিত্য ক্রমে ক্রমে বাস্তবধর্মী হয়ে উঠবে।

[২৩-সংখ্যক পত্র, *অ. মা. ব.*]

অন্যদিকে, স্বস্থ স্বীকৃতি। ১৯৫৬ সালে তাঁর মৃত্যু হয় : অগ্রহায়ণ ১৩৬৩-তে। ওই বছরই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩-তে অজাতশত্রু-কর্তৃক গৃহীত মানিকের একটি সাক্ষাৎকার মুদ্রিত হয় *নতুন সাহিত্য* পত্রিকায়। সেখানে 'কল্লোল প্রচেষ্টা কি ব্যর্থ?' ওই প্রশ্নের উত্তরে মানিক যে-দীর্ঘ বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করেছিলেন, তার প্রথম অনুচ্ছেদ :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশ্যই নয়। বাংলা সাহিত্যে কল্লোল এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ, 'কল্লোল যুগ' বাংলা সাহিত্যে এক বিপ্লবের যুগ, কল্লোল গোষ্ঠীর বা কল্লোলের আদর্শে আস্থাবান সমসাময়িক কবি-কথাশিল্পীরা দুর্দম, অপরাজেয় যৌবনের প্রতীক, নতুন আশা-আনন্দ, নতুন জীবনাদর্শের সূত্রধার। সাম্প্রতিক কালের বাংলা কথাশিল্পে গর্ব করবার মতো কোন সম্পদই যদি থেকে থাকে তবে সেজন্যে অধুনাকালীন গল্পকার-ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব যতখানি, কল্লোলের দান তার চেয়ে কম নয়। কল্লোলের মাধ্যমে যে নতুন জীবনচেতনা, যে নতুন সাহিত্যাদর্শ জন্ম লাভ করেছিল, আজকের প্রগতিবাদী সাহিত্য তো সেই নতুন পথেরই অনুসারী।

[*নতুন সাহিত্য*, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩]

অন্য-একটি অসম্পূর্ণ গদ্যরচনায় (২-সংখ্যক রচনা, 'ছিন্ন লেখা', *এক্ষণ*, শারদীয়া ১৩৮৪) মানিক কল্লোল যুগ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন: 'বাংলার সমাজ ও সাহিত্যের এক অতি বিচিত্র ও বিস্ময়কর যুগ'। একই লেখায় তিনি 'কল্লোল যুগ' কথাটি সম্পর্কে আপত্তি তুলেও জানিয়েছিলেন: 'প্রকৃতপক্ষে কল্লোলযুগীয় বন্ধুরা সাহিত্যে কল্লোল যুগ...আরম্ভ করে না দিলে আমার সাহিত্যজীবন আরম্ভ হতে পাঁচ সাত বছর দেরী হত।'

কল্লোল যুগ সম্পর্কে মানিকের সিদ্ধান্তের সারাৎসার সংক্ষেপে এরকম: ক) কল্লোল একটি নতুন জীবনচেতনা ও নতুন সাহিত্যাদর্শ সৃষ্টি করেছিল, তাই আন্দোলন হিশেবে এ সফল; খ) কিন্তু কল্লোল প্রকৃত বস্তুপন্থী সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেনি—এটুকু তার ব্যর্থতা; গ) তাহলেও কল্লোল নতুন বস্তুপন্থী সাহিত্য সৃষ্টির পথ তৈরি করেছিল।

৩. সম্বন্ধ ও অসম্বন্ধ

এখন, অনিবার্য এই প্রশ্নটি ওঠে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কল্লোলীয় কি না। এ বিষয়ে আমরা তিন ধরনের বিবেচনা লক্ষ করব: ক) মানিকের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ; খ) স্বয়ং কল্লোলীয়দের দৃষ্টিকোণ; এবং গ) পরবর্তী সমালোচকদের দৃষ্টিকোণ।

বয়সের দিক থেকে মানিক কল্লোলীয়দের সমকালীন—অধিকাংশ কল্লোলীয় লেখক ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে জন্মেছেন। মানিক বুদ্ধদেব বসুর সমবয়সী: দুজনেরই জন্মবর্ষ ১৯০৮। কিন্তু, যে-কোনো কারণেই হোক, মানিক *কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি*তে ছিলেন অনুপস্থিত। সমবয়সী হয়েও একটি দূরত্ব রক্ষা করে তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্লোলকে দেখতে পেয়েছেন মোহহীনভাবে। কল্লোলী আবেগে ভেসে না-যাওয়ায় এই সূক্ষ্ম কিন্তু জরুরি পার্থক্য তাঁর নজরে পড়ে :

> মাদার পড়তে পড়তে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম—হ্যামসুন আর গোর্কিকে প্রেমেন বাবু মেলাবেন কি করে?
>
> আমার তখন হ্যামসুনেও আপত্তি ছিল না, গোর্কিতেও আপত্তি ছিল না। কিন্তু ভাবের আকাশের ঝড় আর মাটির পৃথিবীতে জীবনের বন্যার পার্থক্য কি ধরা না পড়ে পারে?
>
> ['সাহিত্য করার আগে', *মা. গ্র.* ১২]

কল্লোল গোষ্ঠী বা যুগ সম্পর্কে যেভাবে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন, তাতে এটি স্পষ্ট যে, নিজেকে তিনি এ গোষ্ঠী বা যুগের লেখক বলে মনে করতেন না।

কল্লোলের নায়কদের ধারণা ছিল অন্য। অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব ও প্রেমেন্দ্র মিত্র—কল্লোলের এই তিন নায়কই মানিককে স্বীকৃতি ও সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন। অচিন্ত্যকুমার ও বুদ্ধদেব মানিককে মনে করতেন কল্লোলীয়। অচিন্ত্যকুমার তাঁর *কল্লোল যুগ* গ্রন্থে মানিককে অন্তর্ভূত করেছেন; ওই গ্রন্থে মানিক সম্পর্কে তিনি লিখেছেন : 'আসলে সে "কল্লোলেরই" কুলবর্ধন।' (পৃ. ১৯৯) বুদ্ধদেব লিখেছেন : 'তিরিশের যুগে যাঁরা প্রথম তাঁর রচনাসমূহ পড়েছেন তাঁদের বুঝতে দেরি হয়নি যে সদ্যমৃত "কল্লোলে"র সর্বশেষ, বিলম্বিত ও পরিপক্ব ফলের নামই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।' ['মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', *স্বদেশ ও সংস্কৃতি*]

AMARBOI.COM

কিন্তু সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো প্রাজ্ঞ উপন্যাসের ইতিহাস-রচয়িতা মানিককে উত্তর-কল্লোল ঔপন্যাসিক হিশেবেই চিহ্নিত করেছেন। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : 'তিরিশের উপন্যাসিকবৃন্দ সেদিক থেকে যেমন কল্লোলের তেমন শরৎচন্দ্রেরও সীমাবদ্ধতাকে উপলব্ধি করেছিলেন গভীরভাবে।' (পৃ. ২৮৩, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*; অধোরেখা আমাদের) 'তিরিশ' ও 'কল্লোল' এই দুটি শব্দ প্রয়োগ করে সরোজ 'কল্লোল' (বুদ্ধদেব, অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র, প্রবোধ প্রমুখ) ও 'তিরিশে'র (তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক, অন্নদাশঙ্কর ও ধূর্জটিপ্রসাদ) ঔপন্যাসিকদের মধ্যে একটি বিভাজন সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছেন। আমাদের প্রশ্ন : 'কল্লোলে' না-লেখার জন্য মানিক যদি অকল্লোলীয় হন, তাহলে 'কল্লোলে' লিখেও তারাশঙ্কর, ধূর্জটিপ্রসাদ ও অন্নদাশঙ্করকে 'কল্লোলের নন—তিরিশের' এ কথা কী করে বলা যাবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একই কারণে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই উক্তির সঙ্গে আমরা একমত হতে পারি না :

> ...মানিক কল্লোলের ধারাবাহী নন, তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণের স্থানিক সাহিত্যও তাঁকে প্রেরণা দেয়নি।...বাংলা কথাসাহিত্যে তিনি স্বয়ংসিদ্ধ—জগদীশ গুপ্তের সঙ্গে তাঁর ক্ষীণ ভাবসূত্রটি অনুমান না করলেও চলে।
>
> [ভূমিকা, ১ জানুয়ারি ১৯৬২। নিতাই বসু রচিত *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*]

বরং অচ্যুত গোস্বামীর বিশ্লেষণ আমরা মনে করি সত্যের নিকটতর :

> মানিকবাবু তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথমদিকে কল্লোলকালীনদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন একথা অস্বীকার করা যায় না। তাঁর "দিবারাত্রির কাব্য" বা "পুতুলনাচের ইতিকথা" বা "পদ্মানদীর মাঝি"তে যৌন-কামনা যে মানুষের জীবনে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে তার স্বীকৃতি রয়েছে। কল্লোলকালীনদের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক যৌন-বৃত্তি নিরোধের বিরুদ্ধে অবাধ যৌন-অধিকারের বিদ্রোহ ঘোষণার ভাবটা স্পষ্ট ছিল। মানিকবাবুর মধ্যে এই তারুণ্য-সুলভ উচ্ছ্বাস-প্রবণতার অভাব ছিল গুরু থেকেই। তিনি বরং স্থির মস্তিষ্কে যৌন-কামনা কীভাবে মানুষের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে সেইটে বিশ্লেষণ করতে অগ্রসর হলেন।
>
> ['মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বিষয়বস্তু', *পরিচয়*, মানিক-সংখ্যা, পৌষ ১৩৬৩]

AMARBOI.COM

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যে-কথা বলেছেন, সাধারণভাবে তা সব বড়ো শিল্পীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যে-কোনো বড়ো শিল্পীর, এক্ষেত্রে লেখকের, আবির্ভাব যেমন স্বাভাবিক তেমনি আকস্মিক। কবিতায় মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ আর কথাসাহিত্যে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ যেমন বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিকতায় বেরিয়ে এসেছেন তেমনি তাঁদের সৃষ্টিতে এমন-এক অভিনবত্ব আছে যা বিস্ময়কর। মানিকের আবির্ভাবও বাংলা সাহিত্যে যেমন স্বাভাবিক তেমনি আকস্মিক। তিনি নিষ্ক্রান্ত হয়ে এসেছেন বাংলা সাহিত্যের স্বভাবী ধারাবাহিকতায়, আবার তাঁর সাহিত্যে এমন-এক বিস্ময়কর মৌলিকতা আছে যা বাংলা সাহিত্যে কেন পৃথিবীর সাহিত্যেই নতুন। সব বড়ো শিল্পীই পৃথিবীতে বয়ে নিয়ে আসেন এই নতুনত্ব। এর জন্য প্রভাব সন্ধান, দেশি-বিদেশি প্রভাব সন্ধান, বৃথা। আবার যে-স্বাভাবিকতায় মানিকের উদ্ভব সেখানে পূর্বগামীদের মধ্যে আছেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং কল্লোল। রবীন্দ্রনাথের *শেষের কবিতা* (১৯২৯)-র সমান্তরাল স্থাপনা হতে পারে *দিবারাত্রির কাব্য* (১৯৩৫), *দুই বোন* (১৯৩৩)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

*মালঞ্চ*র (১৯৩৩) পাশাপাশি *ধরা-বাঁধা জীবন* (১৯৪১)-এর; শরৎচন্দ্রের *পল্লীসমাজ* (১৯২৩)-এর সঙ্গে *পুতুলনাচের ইতিকথা*র (১৯৩৬), রবীন্দ্রনাথের *চার অধ্যায়* (১৯৩৪) ও শরৎচন্দ্রের *পথের দাবী* (১৯২৬) আর *জীয়ন্ত* (১৯৫০) একই সন্ত্রাসবাদের ছায়ায় লেখা। আর কল্লোলের ধারাবাহিকতাও তাঁর মধ্যে অনুস্যূত। *দিবারাত্রির কাব্য* এবং 'অতসী মামী' (*অতসী মামী* গ্রন্থভুক্ত)—অন্তত এই একটি উপন্যাস এবং এই একটি গল্প এই সাক্ষ্য দেয় যে, মানিকের সাহিত্যের শুরু হয়েছে কল্লোলের এলাকা থেকেই। 'অতসী মামী'[১৪] মানিকের প্রথম গল্প, *দিবারাত্রির কাব্য* প্রথম উপন্যাস, 'অতসী মামী'র রচনা ও প্রকাশকাল ১৯২৮, *দিবারাত্রির কাব্য*-এর রচনাকাল ১৯২৯। পরিষ্কার বোঝা যায়, মানিক প্রথম প্রেরণা পেয়েছেন কোনখান থেকে। তারপর মানিক ক্রমাগত পৃথক হয়ে গেছেন, ক্রমাগত নিজস্ব পথ নির্মাণ করেছেন, অনবরত নিজেকে নতুন-নতুনভাবে উপস্থিত করেছেন। কল্লোলের কয়েকজন লেখকের সঙ্গে তাঁর সাযুজ্য স্বয়ম্প্রকাশ : জগদীশ গুপ্তের[১৫] সঙ্গে তাঁর সাযুজ্য পরিষ্কার; 'প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ ও যুবনাশ্বের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা সুস্পষ্ট।' (বুদ্ধদেব); এর সঙ্গে অচিন্ত্যকুমারেরও উল্লেখ করা চলে। জগদীশ গুপ্ত ও মানিক দুজনই মোহহীন বস্তুসন্ধানী এবং বস্তুর স্বরূপসন্ধানী; জগদীশ গুপ্ত ও প্রথম-পর্যায়ী মানিক অদৃষ্ট-তাড়িত উত্তর-মানিক প্রতিবাদী; জগদীশ গুপ্ত কখনো-কখনো কাব্যিক, আর মানিক এক *দিবারাত্রির কাব্য* বাদে আর সব সময়ই শুষ্ক, রূঢ় ও পরুষ এবং উক্ত উপন্যাসেও পল্লবগ্রাহী কবিত্ব পরিহার করেছেন। মানিকের মানস-সচলতা ও -সম্প্রসার জগদীশ গুপ্তের চেয়ে অনেক বেশি ও ব্যাপক। শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, যুবনাশ্ব ও অচিন্ত্যকুমার—এঁদের সঙ্গে মানিকের মিল নিচুতলার জীবনচিত্রণে। পূর্ববঙ্গের জীবনচিত্রণে তাঁর পূর্বসূরি যুবনাশ্ব ও অচিন্ত্যকুমার[১৬], শৈলজানন্দ আঞ্চলিক সাহিত্যের পুরোধা পুরুষ। প্রেমেন্দ্র মিত্রের[১৭] সঙ্গে মানিকের সাযুজ্যসূত্র অনেকগুলি : ক) নিচুতলায় জীবনচিত্রণে; খ) মনোজগতের রূপায়ণে; গ) ইঙ্গিতধর্মিতায়; ঘ) দ্রুতরেখ বাতংযমে। এই সাদৃশ্য অনেকখানি লুক্কায়িত আছে এজন্যে যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাফল্যের মূল ক্ষেত্র ছোটোগল্প, আর মানিকের উপন্যাস। কল্লোলের সঙ্গে মানিকের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সম্বন্ধগুলি, অতঃপর, এরকম কয়েকটি শব্দ-বাক্যে আমরা চিহ্নিত করে নিতে পারি :

ক) কবিত্বময়তায় (প্রথম পর্যায়ে);

খ) বাস্তববাদিতায়;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ) সমাজসচেতনতায়;
ঘ) নিম্নবিত্তের জীবনচিত্রণে;
ঙ) আঞ্চলিকতার ব্যবহারে;
চ) যৌনতায়;
ছ) মনোবিশ্লেষণে;
জ) ইঙ্গিতধর্মিতায়;
ঝ) মানস-সচলতায়।

তথ্যনির্দেশ

১. সমালোচক মোহিতলাল মন্তব্য করেছিলেন মানিক সম্পর্কে :

> মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "দিবারাত্রির কাব্য" ও "পুতুলনাচের ইতিকথা"য়—বিশেষত প্রথম উপন্যাসখানিতে—এই তরুণ লেখকের যে প্রতিভার লক্ষণ আমাকে আশান্বিত করিয়াছিল, দুঃখের বিষয়, পরে তাঁহার লেখাগুলিতে রচনার যে ভঙ্গি ও কল্পনার যে দৈন্য উত্তরোত্তর প্রকট হইতে লাগিল, তাহাতে তাঁহার সেই শক্তির অপচয় লক্ষ্য করিয়াছি। প্রথম দিকের গল্পগুলিতে কাব্য-কল্পনা ও মনস্তত্ত্বের যে সমন্বয়, এবং নারীচরিত্র-বিশ্লেষণে যে অপূর্বভঙ্গির পরিচয় পাইয়াছিলাম, লেখকের বয়সের তুলনায় তাহা বিস্ময়কর বটে। কিন্তু পরে, সৃষ্টি-কল্পনাকে সম্পূর্ণ বিদায় দিয়া তিনি সেই দৃষ্টি হারাইয়াছেন—চিন্ময়-বাস্তবের পরিবর্তে জড়-বাস্তবের উপাসনা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে; তাঁহার রচিত কাহিনীগুলিতে সে রস আর কোথাও নাই। অতিশয় কুশ্রী, কুরূপ ও অকিঞ্চিৎকর যাহা তাহারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা এবং ভাষারও অনুরূপ অপরিচ্ছন্নতার ফলে, তিনি শেষে রূপকার কবির আসন হইতে রূপ-বিদ্রোহী কর্ম্মকারের পদবীতে নামিয়াছেন। তাঁহার "পদ্মানদীর মাঝি" বিষয়বস্তু ও নামের জোরেই পদ্মাপারের পাঠকগণের বড় প্রিয় হইয়াছে; এই পুস্তকে তাঁহার শক্তির পরিচয় আছে, কিন্তু সে-শক্তি রস-সৃষ্টির শক্তি নয়। [পৃ. ৩৭৮, 'বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্য', রচনাকাল : কার্তিক ১৩৪৯, "সাহিত্য বিতান"]

২. সাক্ষ্য : *কল্লোল*-এ (আষাঢ় ১৩৩৪) অমলেন্দু বসুর প্রবন্ধ 'অতি-আধুনিক বাঙলা সাহিত্য', *প্রগতি*-তে (চৈত্র ১৩৩৪) বুদ্ধদেব বসুর একই নামের প্রবন্ধ (বুদ্ধদেবের প্রবন্ধটি *কল্লোল*, চৈত্র ১৩৩৪ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত)।

৩. প্রথমে সাপ্তাহিক রূপে প্রকাশিত হয়েছিল, পরে মাসিক। প্রথমে সম্পাদক : যোগানন্দ দাস।

৪. ধূর্জটিপ্রসাদ মানিক বিষয়ে প্রথম প্রবন্ধ-রচয়িতা ('মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', *পরিচয়*, কার্তিক ১৩৪৭)। তাঁর প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদ :

> মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা সাধারণের চোখে পড়ে। তাতে অনেকেই শক্তির ও নতুনত্বের আমেজ পান। ক্রমে সেটি বিকশিত হয়ে লেখকের প্রতিষ্ঠা অর্জনে সহায়তা করেছে। বাংলাদেশে তাঁর বই কিরকম বিক্রি হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানি না, কিন্তু এমন একাধিক অ-বাঙালি দেখেছি যাঁরা তাঁর রচনা সম্বন্ধে নিতান্ত আগ্রহশীল। অনেক দিন ধরে তাঁর বিশেষত্ব কি বুঝতে ও বোঝাতে উৎসুক হয়েছি, কিন্তু পারিনি। কাজটা কোন ক্ষেত্রেই সোজা নয়, মানিকের বেলা আরো শক্ত, কারণ, প্রথমত, তিনি এখনও অপরিণত; দ্বিতীয়ত, তাঁর আঙ্গিক আমাদের কাছে অপরিচিত। সেই জন্য একটু গোড়ার কথা বলার প্রয়োজন।

৫. জীবনানন্দ বাংলা ভাষায় নয়, ইংরেজিতে সমকালীন বাংলা উপন্যাস সম্পর্কে একটি সমালোচনা লিখেছিলেন ১৯৫০ সালে ('The Bengali Novel Today', *The Sunday Hindustan Standard Magazine*, September 3, 1950)। এই প্রবন্ধে তাঁর আলোচ্য ছিলেন তিনজন—তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিক সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হলো এখানে :

> Another Bengali novelist as notable as Bibhutibhusan has evincew that vitality, Going over an equal, if not a greater extent and experience than Tarasankar, Manik Banerjee brings to his profuse material the gift of imagination substantial as Bibhutibhusan's but one less nostalgic, move brooding and more analytical. Though his novels provide much useful clue, I am not, however, very much same, at this stage, if the imagination in this case is as distinctive as of the greatest novelists of Europe. Two of his novels would seem to advance the claim of his being counted as one among the great. But his "Putul Nacher Itikatha" an a careful first reading does not appear to have the unpact of any thing a more than a highly successful story and subsequeant readings may farther injure its claim to be considered as any thing more than that. It would no be, I believe, profitable to enter here into the discussion whether and if so why Tagore's "Gora" is more perfect than this novel. Sarat Chandra had written in the same masterly way (though he had not the decadent formalists inordinate passion for psychology) as Manik Banerjee quite a numer of novels dealing almost with the same substance and Manik has hardly extanted the traditions thus handed down in any very remarkable manner. Manik's "Padma Nadir Majhi" however, is more weighty novel. But it must not be aligned with the greatness of novels such as "War and Peace", "Crime and Punishment", "Ullysses", "Joseph and his Brothers" and the like. These novels are cost in a more cosmic mould, the spirit indwelling them is more searching and historically profound and their appeal more universal. But "Padma Nadir Majhi" makes the best of its material and makes one wonder if the author of the book will, with all his diversified and searching experience and emagination, ever come out with a novel whose greatness is less parochial. Manik Banerjee has written so many novels. Only one stands out. And his later novels indicate that drained of all perceptible talent, he has retired into the private chamber of his sensibility.

৬. নতুন-প্রচলিত এই শব্দটিকে ঠাট্টা করে রবীন্দ্রনাথ বলতেন 'রবিন-ধুত্তোর'।

৭. 'উত্তররৈবিক' শব্দটি জীবনানন্দ দাশের সৃষ্ট।

৮. পৃ. ৩২৫, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (চতুর্থ খণ্ড), সুকুমার সেন।

৯. পৃ. ৩৭২, 'বর্তমান বাংলা সাহিত্য', *সাহিত্য বিতান*; মোহিতলাল মজুমদার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০. পৃ. ৪৫১, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

১১. পৃ. ২৯৬, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১২. 'উপন্যাস ভাবনা' পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১৩. একটি সাক্ষাৎকারে গোপাল হালদারের উক্তি :

> একথা বলতে কুণ্ঠা নেই যে 'কল্লোল' কোনো 'যুগ' নয়, একটা 'হুজুগ'। 'কল্লোল' বলে একটি পত্রিকা ছিল, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের বিস্তীর্ণ ভূমিতে তার কতটুকু দাম সে-যুগের সাহিত্য-জিজ্ঞাসু হিসাবে আমরা তা বেশ জানি। যে সময়ে 'কল্লোল' প্রকাশিত হত সে যুগের প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময়কার কথা যদি কারো রচনার মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তবে সে রবীন্দ্রনাথ, আর সে যুগের এমন কয়েকজন তরুণ লেখক—'কল্লোল' পত্রিকার সঙ্গে হয় যাদের সম্পর্ক ছিল না, নয় সম্পর্ক ছিল সামান্য। যেমন বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, তারাশঙ্কর।
> [*নতুন সাহিত্য*, শ্রাবণ ১৩৬৩]

১৪. 'অতসী মামী' গল্পে ক্ষয়রোগে মৃত্যু, এবং মৃত্যু-রোমান্টিকতা কল্লোলের একটি প্রিয় বিষয়। এবং তা যে অবাস্তব নয়, গোকুল নাগের ক্ষয়রোগে অকালমৃত্যু তাঁর প্রমাণ। এবং মৃত্যু-রোমান্টিকতার প্রসঙ্গ অচিন্ত্যকুমারও তুলেছেন তাঁর *কল্লোল যুগ* গ্রন্থে।

১৫. জগদীশ গুপ্ত ও মানিকের কয়েকটি গল্পের প্রতিতুলনা করে দেখিয়েছেন একজন সমালোচক—'কলঙ্কিত সম্পর্ক' ও 'ফাঁসি'; 'চার পয়সায় এক আনা' ও 'নিচু চোখে দু'আনা আর দু'পয়সা'; 'রতি ও বিরতি' এবং 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে'। ['সাদৃশ্যের সন্ধানে : রতি ও বিরতি এবং কে বাঁচায়, কে বাঁচে' : সুবীর রায়চৌধুরী, *জলার্ক*, জগদীশ গুপ্ত সংখ্যা, শ্রাবণ-চৈত্র, ১৩৮৮]

১৬. *পরিচয়*-এর পৃষ্ঠায় এক সময় অচিন্ত্যকুমারকে নিয়ে আলোচনা-প্রত্যালোচনার ঝড় বয়ে গিয়েছিল। তাতে অন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিষ্ণু দে।

১৭. প্রেমেন্দ্র মিত্র কোনো-কোনো দিক থেকে (যেমন, ইতিহাস-ভূগোল বিহারে) জীবনানন্দেরও অব্যবহিত পূর্বসূরি। নিজের নানাবিধ সাহিত্যিক সাফল্য বাদ দিলেও, তিরিশের শ্রেষ্ঠ কবি ও শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীকে প্রাথমিকভাবে প্রভাবিত করার জন্যেও প্রেমেন্দ্র মিত্র স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফ্রয়েডবাদ

১. পরিচয়

সিগমুন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৮-১৯৩৯) মনঃসমীক্ষণতত্ত্বের (psychoanalysis) প্রবর্তক। তাঁর প্রবর্তিত মতবাদকে ফ্রয়েডবাদ (freudism) বলা যেতে পারে। ফ্রয়েড ও তাঁর কয়েকজন শিষ্যের মাধ্যমে এই মতবাদ জগদ্বিখ্যাত হয়[১]। ফ্রয়েডবাদের প্রধান অবদান : অবচেতন ও অচেতনের আবিষ্কার, বাল্যকালের অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব আরোপ, স্বপ্ন-ব্যাখ্যা, অবাধ অনুষঙ্গ-পদ্ধতির আবিষ্কার। ফ্রয়েডবাদ এই শতাব্দীর সবচেয়ে প্রভাবশালী দু-তিনটি বিষয়ের একটি। সাহিত্য, ইতিহাস, জীবনী, সমাজতত্ত্ব, নন্দনতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, শিক্ষা, ধর্ম প্রভৃতিতে ফ্রয়েডবাদ বিপুলভাবে প্রভাবসম্পাতী। ফ্রয়েডবাদ মানুষের শৈশব ও বয়ঃপ্রাপ্তিকে অর্থাৎ এক কথায় মানবচরিত্রকেই নতুন ভাষ্যে ও আলোকে দাঁড় করিয়েছে; নিদ্রা, স্বপ্ন, দিবাস্বপ্নের নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছে; স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক মনের ব্যাখ্যায় জানিয়ে দিয়েছে মানুষের অসংলগ্ন কার্যকলাপের, মনোরোগের, উন্মাদনার পিছনেও আছে নিগূঢ় কার্যকারণ-সম্বন্ধের লীলা। ফ্রয়েড দেখিয়েছেন, বস্তুগত যে-কোনো ঘটনার মতো মানসিক যে-কোনো ঘটনার পিছনে কোনো-না-কোনো কারণ এবং কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবেই। এখন, ফ্রয়েডবাদের কেন্দ্রীয় বক্তব্যসমূহের সারাৎসার পেশ করা যাক।

ত্রিস্তর মন : ফ্রয়েড মনকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন : ১. চেতন (conscious); ২. অবচেতন (sub-conscious); এবং ৩. অচেতন (unconscious)। ফ্রয়েডের আগে শুধু চেতন মনের অস্তিত্ব মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণায় আলোচিত হয়েছে—অবচেতন ও অচেতন মন আবিষ্কার করে ফ্রয়েড প্রথম মনের প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের ভিত্তি স্থাপন করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেতন মন মনের ক্ষুদ্রতম অংশ যা বাস্তবের সঙ্গে ব্যক্তির সংযোগ ঘটায়। দ্বিতীয় স্তর অবচেতন মন। অবচেতন মন আগে চেতন ছিল, এখন সুপ্ত অবস্থায় আছে। একটু চেষ্টা করলেই অনেক সময় অবচেতন মনকে চেতন স্তরে তুলে আনা যায়। স্মৃতি এরকমই এক বিষয়। তৃতীয় স্তর, অর্থাৎ অচেতন মন, মনের বৃহত্তম অংশ। চেতন মনে আছে শৃঙ্খলা ও সংহতি, অচেতন মনে বিশৃঙ্খলা ও অসংহতি। সামাজিক ও নৈতিক অনুশাসনের চাপে আমাদের নিবিড় বাসনাসমূহ আশ্রয় নেয় অচেতনের অন্ধকারে। ফ্রয়েডের মতে, অচেতন মনই সবচেয়ে শক্তিশালী এবং তা আমাদের প্রতিটি কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। (অচেতন মনের মুক্তির জন্য সম্মোহন দরকার। যাদের সহজে সম্মোহিত করা যায় না তাদের জন্য ফ্রয়েডের বিখ্যাত আবিষ্কার: অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতি—method of free association।)

ত্রিস্তর মন: ফ্রয়েড মনকে আবার এ রকম তিনটি স্তরেও ভাগ করেছেন: ১. অদম (id); ২. অহম (ego); এবং ৩. অধিশাস্তা (super-ego)।[২] অদম পরিপূর্ণ অচেতন, লিবিডোর আদিম আশ্রয়, বন্য, যুক্তিহীন। তার একমাত্র নীতি সুখভোগ-নীতি (pleasure principle), বাস্তবের ধার সে ধারে না। অহম চেতনে-অচেতনে মিশ্রিত। তার আশ্রয় বাস্তব নীতি (reality principle)। অদমকে সে ঠেকিয়ে রাখে। এই ঠেকানোর দুটি প্রধান অস্ত্র: অ) অবদমন (repression) এবং আ) উন্নয়ন (sublimation)। অধিশাস্তা, প্রচলিত অর্থে যাকে বিবেক বলে, অনেকটা তাই। অহমকে সে পথনির্দেশ করে। মানবমনে এই তিনের—অদম, অহম ও অধিশাস্তায়—নিরন্তর দ্বন্দ্ব চলে।

দোটানা: জীবন ও মৃত্যু: মানুষের সহজাত আদিম প্রবৃত্তিকে ফ্রয়েড দু-ভাগে ভাগ করেছেন: ১. প্রাণশক্তি বা জীবনপ্রবৃত্তি (eros of life instinct); এবং বিনাশশক্তি বা মরণপ্রবৃত্তি (thanatos of death instinct)। ফ্রয়েডের বিবেচনায়, প্রাণী মাত্রেরই মধ্যে যেমন আছে বাঁচার ইচ্ছা, তেমনি তার পাশাপাশিই আছে মৃত্যুর ইচ্ছা। প্রাণশক্তি দুরকমভাবে কাজ করে: অ) আত্মসংরক্ষণ ও আত্মসম্প্রসারে; এবং আ) জাতি সংরক্ষণে। মরণশক্তিও দুভাবে কাজ করে: অ) আত্মনির্যাতনে, আত্মহননে; এবং আ) নিষ্ঠুরতায়, বিনাশ বা ধ্বংসের চেষ্টায়। মানবমনে জীবন ও মৃত্যুর এই অন্তর্বিরোধিতা অবিরলভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

লিবিডো: প্রাণশক্তির যে আধার, ফ্রয়েড তার নাম দিয়েছেন লিবিডো (libido)। লিবিডো যৌনধর্মী—কিন্তু যৌনতাসর্বস্ব নয়। আমরা যৌনতাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি সর্বপরিব্যাপী বলে চিহ্নিত করি, তাহলে লিবিডোকে বোঝানো যায়। লিবিডো, বা প্রাণশক্তির যে আধার তা মূলত যৌনধর্মী। এই যৌনতার শুরু একেবারে বাল্যকালে। শিশু সম্পর্কে দেবতা বা ফেরেশতার যে-ধারণা, ফ্রয়েড তাকে ভেঙে চুরমার করেছেন। ফ্রয়েডের মতে, শরীর সম্ভোগবিলাসী, সুখকামী। ফ্রয়েড-বর্ণিত যৌনতার পাঁচটি স্তর : ১. মুখস্তর (oral phase); ২. পায়ুস্তর (anal stage); ৩. লৈঙ্গিক স্তর (phallic phase); ৪. সুপ্ত যৌনস্তর (latency stage) এবং ৫. স্বাভাবিক যৌনস্তর (genital phase)। স্বাভাবিক যৌনতার ক্রমবিকাশের স্তরপরম্পরা এরকম। কোনো-কোনো সময় এই ক্রমবিকাশ ব্যাহত হয়ে সৃষ্টি করে লিবিডোর সংবন্ধন (fixation of libido)—কোনো-একটি স্তরে আটকে যাওয়া; বা লিবিডোয় প্রত্যাবৃত্তি (regression of libido)—স্বাভাবিক স্তরে পৌঁছানোর পর কোনো-একটি প্রাথমিক আসক্তিতে ফিরে যাওয়া। লিবিডোর ক্রমবিকাশ ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে বিভিন্ন হয়ে থাকে। ফ্রয়েডের বিবেচনায়, লিবিডোই হলো ব্যক্তির বিকাশের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক। নরনারীর শরীরের মিলনই লিবিডোর প্রধান লক্ষ্য ঠিকই, কিন্তু মানবমনের অন্যান্য যে-কোনো প্রবল ও তীব্র আসক্তিই লিবিডোর অন্তর্ভূত।

AMARBOI.COM

২. ধারণা ও বিবেচনা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়ে প্রথম প্রবন্ধরচয়িতা ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'তাঁর [মানিকের] কৃতিত্ব অশিক্ষিতপটুতা। অন্য ভাষায় তাঁর প্রতিভা স্বভাবসিদ্ধ।'৩ মানিকের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে গোপাল হালদার লেখেন, 'এ প্রতিভা আত্মসচেতন প্রতিভা নয়, আত্মবিচার ও আত্মগঠন এ প্রতিভার ধর্ম নয়।'৪ মানিকের গ্রন্থাবলি এবং দিনলিপি, চিঠিপত্র ইত্যাদি পাঠের পরে এসব উক্তি মনে হয় সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বরং মানিককে মনে হয় অতিচেতন: 'আড়াই বছর বয়স থেকে আমার দৃষ্টিভঙ্গির ইতিহাস আমি মোটামুটি জেনেছি।' ('কেন লিখি', *মা. গ্র.* ২) আরো দু-একটি উক্তি উদ্ধৃত করব :

> ১. নিত্যনতুন আবিষ্কারে বিজ্ঞান বদলে দিয়ে চলে সমাজ জীবনকে, বদলে দিয়ে চলে মানুষের চেতনাকে। এই চেতনায় জাগে সাহিত্যের কাছে নতুন চাহিদা এবং এই চেতনা প্রতিফলিত হয় নতুন আঙ্গিকে উপন্যাস রচনায়।
> ['উপন্যাসের ধারা', *মা. গ্র.* ২]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. ঘরে শিল্প-সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুঁজি ঘাঁটা আর ঘরের বাইরে সর্বত্র সব সময় মানুষকে আর জীবনকে তন্নতন্ন করে দেখা ও জানা এবং মনের মধ্যে তাই নিয়ে তোলপাড় করা, যোগ-বিয়োগ করা, মিলিয়ে দেখা আর অমিল খোঁজা ও সবকিছুর মানে বোঝার চেষ্টা—লেখকের বিরামহীন এই শ্রম মাপাই বা হবে কিসে, দামই বা কষা হবে কোন নিরিখে? / শ্রমটা লেখকের ধাতে দাঁড়িয়ে যায়। পুরো হোক আর খানিকটাই হোক, এ রকম ধাত ছাড়া লেখক হওয়া যায় না।

[লেখকের সমস্যা, *মা. গ্র.* ১২]

কোনো স্বভাবসিদ্ধ বা আত্মসচেতন প্রতিভার পক্ষে এসব উক্তি চিন্তা অসম্ভব।

মানিক ছিলেন ফ্রয়েডের নিবিষ্ট পাঠক। এবং তা তাঁর সাহিত্য-রচনায় নিমগ্ন হওয়ার আগেই। দুটি উদ্ধৃতি :

১. আমার সাহিত্য করার আগের দিনগুলিকে দু ভাগে ভাগ করা যায়—স্কুল থেকে শুরু করে কলেজে প্রথম ও এক বছর কি দু বছর পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র প্রভাবিত সাহিত্যই ঘেঁটেছি এবং তারপর কতদিন খুব সোরগোলের সঙ্গে বাংলায় যে আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছিল তার সঙ্গে এবং সেই সঙ্গে হ্যামসুনের 'হাঙ্গার' থেকে শুরু করে শ-র নাটক পর্যন্ত বিদেশি সাহিত্য এবং ফ্রয়েড প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করেছি।

['সাহিত্য করার আগে', *মা. গ্র.* ১২]

২. ...আমি ছিলাম বিজ্ঞানের ছাত্র এবং যেমন আগ্রহ নিয়ে বিজ্ঞান পড়তাম তেমনি আগ্রহ নিয়েই আরম্ভ করেছিলাম যৌনবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব আর বিশ্বসাহিত্য পড়া।

[ঐ]

*মানিক গ্রন্থাবলী*র সম্পাদক সরোজমোহন মিত্র জানিয়েছেন যে, মানিকের এই প্রবন্ধটির রচনা ও প্রকাশকাল পাওয়া যায়নি। মানিক-সাহিত্য বিশ্লেষণে মূল্যবান এই প্রবন্ধটি আমরা অনুমান করে নিতে পারি, মানিকের উপান্ত্য পর্যায়েরই রচনা। মানিক তাঁর পূর্ব-পর্যায়ে, যে-পর্যায়ে তিনি ছিলেন ফ্রয়েডের রচনায় আমূল আবিষ্ট, বিস্তারিত কিছু লেখেননি। মার্ক্সবাদে দীক্ষিত হওয়ার পর বিস্ময়কর সৎ, স্পষ্টভাষী ও তেজস্বী লেখক মানিক ফ্রয়েডকে আক্রমণ করেন তাঁর স্বভাবশোভন তীব্রতা ও তেজে। যে-গুচ্ছে এই রচনাটি মুদ্রিত হয়েছিল সেই 'ছিন্ন লেখা'র (*এক্ষণ*, শারদীয়া ১৩৮৪) সম্পাদক যুগান্তর চক্রবর্তী এটুকু জানিয়েছেন : 'একই রচনার দুটি ভিন্ন পাঠ লেখকের কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া যায়—উভয় পাঠই একই রকম অসম্পূর্ণ।' 'অশান্তি চাই' শিরোনামের এই অসম্পূর্ণ রচনাটির প্রথম লেখনটি (শেষ অনুচ্ছেদ বাদে) সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করি :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অশান্তি চাই

But just becamse Freudism is not a science, it fails as a theory.
C. Caudwell, *Studies in a Dying Culture,* P. 183

কডওয়েলের কথাতেই বলি, মনোবিজ্ঞানের অন্যতম পথপ্রদর্শক হিসেবে ফ্রয়েডকে আমরা চিরদিন সম্মান করব, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন কেপলারকে করে থাকি, কিন্তু এ বিষয়েও আমাদের সচেতন থাকতে হবে যে ফ্রয়েডের চিন্তাধারা পৌরাণিক সংস্কারে আচ্ছন্ন। 'মন' 'বুদ্ধি' 'ভাব' 'স্বপ্ন' 'ইচ্ছা' ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্ব্বে একেবারে গোঁড়া ধর্ম-দর্শনের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যাই আমাদের সম্বল ছিল, বাস্তব পরীক্ষা ও তথ্যাদির সঙ্গে ওসব মিশিয়ে ফ্রয়েড আধুনিকতা ও বুর্জোয়া চিন্তাজগতের উপযোগী একটি খিচুড়ি প্রস্তুত করেছেন। তাঁর অনুসন্ধান মনগড়া কাল্পনিক বিশ্লেষণ খুঁজে পেয়েছে কারণ তিনি কাল্পনিক কারণ বা উৎস ধরে নিয়ে তারই সাপেক্ষে খুঁজেছেন ব্যাখ্যা। ঈশ্বর থেকে শুরু করে জগৎকে ব্যাখ্যা করা বা জগৎকে ব্যাখ্যা করতে করতে ঈশ্বরে গিয়ে পৌঁছানো প্রকৃতপক্ষে একই ব্যাপার। Jung, Adler প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরাও ফ্রয়েডের বহু মতের বিরোধিতা করেও নিজেরা কমবেশি ওই জালে জড়িয়ে পড়েছেন। তাঁদেরও সঞ্চিত তথ্যের ব্যাখ্যা দিতে অনুমান করে নিতে হয়েছে রহস্যময় নিয়ম—বা কারণ।

[*এক্ষণ*, শারদীয়া ১৩৮৪]

একই রচনার দ্বিতীয় অংশ :

...ফ্রয়েডের প্রথম ও প্রধান ত্রুটি—ব্যক্তির মধ্যে তার সমস্ত সমস্যা ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সীমাবদ্ধ রাখার ফলে প্রকৃত বিজ্ঞান বহুদূরে ফেলে রেখে তাকে দার্শনিক মীমাংসা দিতে হয়েছে—বহু রোগী পরীক্ষা করার বাস্তব তথ্যকে ভিত্তি করে গড়তে হয়েছে নীতি-ধর্মগত (স্বভাবতই সুনীতি বা ঈশ্বরও নয় সোজাসুজি—ধর্ম ঈশ্বরের পাশে শয়তানকে গড়েছে পুণ্যের পাশে পাপকে গড়েছে—সমস্ত মিলিয়ে যে দুটি ব্যাপার তারই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট) ব্যাখ্যা।...ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তির বিকার ও তার ব্যাখ্যা খুঁজতে হলে (ব্যক্তির অনেক স্বাভাবিকতা ইতিহাস ও সমাজের হিসাবে 'বিকার', আবার অনেক 'বিকার' ঐ হিসাবে 'স্বাভাবিক') the [...], the Ego, the super-ego, the Id, the Oedipus Complex, the Inhibition ইত্যাদি অর্থহীন দুর্বোধ্য কল্পনা খাড়া করতে হয় : [ঐ]

পরিষ্কার বোঝা যায় : মানিকের ফ্রয়েড সম্পর্কে ধারণা ও বিবেচনা উত্তরকালে আমূল পরিবর্তিত হয়েছিল। এই ধারণা ও বিবেচনা মানিকের উপন্যাসে কি অবিকল প্রতিফলিত হয়েছিল? পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা তা পরীক্ষা করে দেখব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথ্যনির্দেশ

১. উত্তরকালে ফ্রয়েড-শিষ্যরা কেউ কেউ স্বাধীন মতাদর্শীরূপে বিখ্যাত হন—যেমন ইয়ুং ও অ্যাডলার।

কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং (১৮৭০-১৯৬১) : প্রথমে ফ্রয়েড মতাবলম্বী, পরে মতবিরোধ ও বৈশ্লেষিক মনোবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা। ইয়ুং-এর প্রধান আবিষ্কার যৌথ অচেতন (collective uncouscious)। এর নিহিতার্থ ব্যক্তির অবচেতন মনের নিচে আরো একটি স্তর আছে—আদিম কালের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, কুসংস্কার, অভিজ্ঞতা, ব্যক্তির অচেতনে লুকিয়ে থাকে, কোনো দিন নিঃশেষিত হয় না।

আলফ্রেড অ্যাডলার (১৮৭০-১৯৩৭) : তিনিও প্রথমে ফ্রয়েড-শিষ্য, পরে স্বাধীন মতাবলম্বী। ফ্রয়েড ও ইয়ুং-এর মতো তিনি অবচেতনের অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না। তাঁর মূল কথা : হীনম্মন্যতাই (inferiority complex) সব মানসিক সমস্যার কেন্দ্র। তাঁর বিবেচনায়, বাল্যকালে মানুষের মধ্যে যে-হীনতাবোধ দেখা যায় জীবনভর সে তা জয় করে আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন করতে সচেষ্ট হয়।

ফ্রয়েড-গোষ্ঠীর বাইরে মনঃসমীক্ষণ সূত্রে অপরিহার্য নাম আইভান পাভলভ, তাঁর সামান্য পরিচিতি এখানে যুক্ত করা হলো।

আইভান পাভলভ (১৮৪৯-১৯৩৬) : তাঁর প্রধান অবদান : সাপেক্ষ প্রতিবর্ত (conditional reflex)। তাঁর সিদ্ধান্তের সারকথা : মানসিক সমস্ত কিছুই শরীরতত্ত্বের দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। অস্মিতা (personality) ও উদ্বায়ু (neurosis) বিষয়ে তাঁর বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ অতি গুরুত্বপূর্ণ।

২. এই পরিভাষা আমরা প্রয়োগ করেছি কাজী আবদুল ওদুদ সংকলিত 'ব্যবহারিক অভিধান'-এ উদ্ধৃত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত পরিভাষা থেকে। অন্যত্র কোথাও-কোথাও প্রচলিত পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছি।

৩. 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। *পরিচয়,* কার্তিক ১৩৪৭

৪. 'মানিক-প্রতিভা', গোপাল হালদার। *পরিচয়,* পৌষ ১৩৬৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাস্তববাদ

১. পরিচয়

বাস্তববাদের প্রথম সূচনা হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। দুই প্রতিষ্ঠাতা ড্যানিয়েল ডিফো (১৬৬০-১৭৩১) ও হেনরি ফিল্ডিং (১৭০৭-৫৪)। 'ফিল্ডিং' থেকেই প্রকৃতপক্ষে বাস্তবধর্মী উপন্যাসের প্রতিষ্ঠা।'[১] বিকাশ ঊনবিংশ শতাব্দীতে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। 'বাস্তববাদ' (realism) আন্দোলন হিশেবে চলেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে। মুখ্যত 'রোমান্টিসিজম'-এর বিরুদ্ধে—যে-রোমান্টিসিজম দুরকমভাবে চিহ্নিত: সাহিত্যে আন্দোলন হিশেবে এবং একটি শৈল্পিক বা সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ হিশেবে বা ব্যক্তিগত, বেসরকারি, স্বেচ্ছাচারী, অগতানুগতিক, আবেগোচ্ছল। বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং দর্শনের যুক্তিবাদের প্রসার বাস্তববাদকে এগিয়ে দেয়। বাস্তববাদের লক্ষ্য ছিল জীবনকে সম্পূর্ণভাবে এবং নিরাসক্ত চিত্তে দেখা—ঠিক যেভাবে বাস্তবে আছে। আদর্শবাদ ও রোমান্টিকতাকে বাস্তববাদী শিল্পী বর্জন করেন। জোর পড়ে সাধারণ মানুষ, সাধারণ জিনিশ, দৈনন্দিনের তুচ্ছ সব বিষয়ের প্রতি, এমনকি যা কদর্য ও জান্তব তারও প্রতি। উপন্যাসে এবং চিত্রকলায়[২] 'বাস্তববাদ' চূড়ান্ত সিদ্ধিতে পৌঁছোয়। কেন্দ্র ছিল ফ্রান্স, ইংল্যান্ড এবং আমেরিকা। 'বাস্তববাদে'র চূড়ান্ত রূপকে বলা হয় 'প্রকৃতিবাদ' (naturalism)।[৩] ফ্রান্সে মুখ্য বাস্তববাদী শিল্পী বালজাক (১৭৯৯-১৮৫০), ইংল্যান্ডে জর্জ এলিয়ট (১৮১৯-৮০), আমেরিকায় মার্ক টোয়েন (১৮৩৫-১৯১০)। শ্রেষ্ঠ বাস্তববাদী ঔপন্যাসিকেরা হচ্ছেন: স্তাঁদাল (১৭৮৩-১৮৪২), বালজাক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুস্তাভ ফ্লবেয়ার (১৮২১-১৮৮০), হেনরি জেমস (১৮৪৩-১৯১৬), টলস্টয় (১৮২০-১৯১০), দস্তয়েভস্কি (১৮২১-৮১) প্রমুখ।

বাস্তববাদী শিল্পী উপন্যাসের প্রচলিত পথ পরিহার করেন। রোমান্টিক কথাশিল্পে ছিল যা-কিছু অলীক, অতিরঞ্জিত ও সেন্টিমেন্ট-নির্ভর, বাস্তববাদী শিল্পী তাঁর কাজের মাধ্যমে তার প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল বস্তুর সত্য প্রয়োগ। তাঁর লক্ষ্য ছিল শিল্পীর ব্যক্তিগত ব্যাখ্যাকে বাদ দিয়ে বিষয়কে আলোকচিত্রের যথাযথতায় উপস্থিত করা। জীবন, তাঁর বিবেচনায়, সুসমঞ্জস নয়—বিশৃঙ্খল। জীবনের প্রতিরূপ যে-কথাসাহিত্য, তাতেও তাই থাকতে পারে না কোনো সামঞ্জস্য। স্বচ্ছ, সরল, ঋজু গদ্য হবে বাস্তববাদী সাহিত্যের মাধ্যম। আর ঔপন্যাসিকের নিরাসক্তি হবে তাঁর যথার্থ দৃষ্টিকোণ। মানুষ ও মানুষীর প্রকৃত অবস্থা ও অবস্থানকে চিহ্নিত করা হবে বাস্তববাদী উপন্যাসের নিধান। জীবনের বহির্ভাগের বিশদ বর্ণনা (surface details), সাধারণ প্রাত্যহিক জীবনাচরণ আর মধ্যবিত্ত সমাজের রূপায়ণ ছিল বাস্তববাদী আন্দোলনের প্রধান বিষয়। সাধারণভাবে রিয়ালিস্ট শিল্পীরা আশাবাদী, ক্বচিৎ-কখনো বিষণ্ন (হেনরি জেমস)। বাস্তববাদী শিল্পী ব্যক্তিকে মনে করেন অসীম মূল্যবান, আর উপন্যাসের প্রধান কাজ চরিত্রায়ণ (characterization)। তাই উপন্যাসে চরিত্রের উপরে কোনো কাজ বা ঘটনার প্রতিক্রিয়া, অর্থাৎ মনস্তত্ত্ব ব্যবহারের সুযোগ, বাস্তববাদী কথাশিল্পীর বেশি। চরিত্রের অন্তর্গত সত্তা আবিষ্কারের এই কুশলতা হেনরি জেমসে এত প্রগাঢ় যে তাঁকে বলা হয় 'মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের জনক'।

AMARBOI.COM

২. ধারণা ও বিবেচনা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আবাল্য আত্মচেতন: 'আড়াই বছর বয়স থেকে আমার দৃষ্টিভঙ্গির ইতিহাস আমি মোটামুটি জেনেছি।' ('কেন লিখি', *মা. গ্র.* ২) বাস্তবতা বিষয়ে তাঁর ধারণার সৃষ্টিশীল প্রয়োগ যেমন তাঁর গল্প-উপন্যাসে তেমনি তাঁর কয়েকটি ভাবনামূলক প্রবন্ধেও। মানিকের কয়েকটি প্রবন্ধে, বস্তুত, বাস্তবতার প্রসঙ্গ পৌনঃপুনিক ও উপর্যুপরি। অন্য কোনো প্রসঙ্গকে তিনি এতবার আলোচনায় নিয়ে আসেননি। এই আলোচনা থেকে বাস্তবতা বিষয়ে তাঁর নিজস্ব বিবেচনার পরিচয় আমরা পাই। এবং তা থেকে মানিকের উপন্যাসে বাস্তবতার ব্যবহার বিষয়ে ধারণা স্পষ্টতর হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানিকের বিবেচনায়, উপন্যাস সভ্যতার ধারাবাহিক অগ্রগতির একটি ফল। উপন্যাসের উন্মেষ, তাই, বিজ্ঞান তথা বস্তুবাদী চেতনার ক্রমবিকাশেই :

> নিত্যনতুন আবিষ্কারে বিজ্ঞান বদলে দিয়ে চলে সমাজজীবনকে, বদলে দিয়ে চলে মানুষের চেতনাকে। এই চেতনায় জাগে সাহিত্যের কাছে নতুন চাহিদা এবং এই চেতনা প্রতিফলিত হয় নতুন আঙ্গিকে উপন্যাস রচনায়। / গদ্য ভাষায় সাহিত্য এবং বাস্তব জীবনের পরিবেশ, চরিত্র ও ঘটনা; নতুন পদ্ধতিতে মানুষের জীবনবোধের আকাঙ্ক্ষা মেটাতে আরম্ভ করল উপন্যাস। বিজ্ঞানকে, মানুষের বস্তুবাদী চেতনার ক্রমবিকাশকে, একেবারে আর উপেক্ষা করতে না পেরে সাহিত্যকে নতুন একটি বিভাগ খুলতে হলো : অধ্যাত্মবাদের জের এবং ভাববাদ আত্মরক্ষার খাতিরে যুক্তিবাদের সাহায্যে বাস্তবতাকে কাজে লাগিয়ে শুরু করল উপন্যাসের ধারা।[৪]
>
> ['উপন্যাসের ধারা', *মা. গ্র.* ২]

মানিক তাঁর পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার সন্ধান করে ব্যর্থ হয়েছিলেন :

> ...ছোট বড় লেখকের বই ও মাসিকের লেখা পড়তে পড়তে এ প্রশ্নটাই ক্রমে ক্রমে আরো স্পষ্ট জোরালো হয়ে উঠতে লাগল যে, সাহিত্যে বাস্তবতা আসে না কেন, সাধারণ মানুষ ঠাঁই পায় না কেন?
>
> ['সাহিত্য করার আগে', *মা. গ্র.* ১২]

অব্যবহিত অগ্রবর্তী 'কল্লোল যুগ'কে তিনি গভীরভাবে লক্ষ করেছিলেন কাছ থেকে, কিন্তু দূরত্বের চোখে, তাই তখনই তিনি বুঝেছিলেন :

১. জোরের সঙ্গে দাবি করা হয়েছিল যে আমরা বস্তুপন্থী সাহিত্য সৃষ্টি করছি, কিন্তু প্রকৃত বস্তুবাদী আদর্শ কল্লোল, কালিকলমীয় সাহিত্যিক অভিযানের পিছনে ছিল না।

['সাহিত্য করার আগে', *মা. গ্র.*]

২. তখন কল্লোল যুগের সমারোহ কিন্তু আমি টের পেয়েছিলাম। সাহিত্য যে মোড় ঘুরছে কল্লোলীয় সাহিত্য তার লক্ষণ মাত্র। আসল পরিবর্তন আসবে অন্যরূপে—সাহিত্য ক্রমে ক্রমে বাস্তবধর্মী হয়ে উঠবে।

[২৩-সংখ্যক চিঠি, *অ. মা. ব.*]

মানিকের সাহিত্য এই নিরিখেই বিচার্য। একদিকে সংকীর্ণ মধ্যবিত্ত জীবনের নির্মোহ নির্মম বিশ্লেষণ, অন্যদিকে 'ভদ্রেতর' বিস্তৃত সাধারণ নিম্নবিত্তের রূপায়ণ। আর এই দুয়েরই কেন্দ্রে আছে বাস্তবতার ঘনিষ্ঠ তাপ :

> আমার ভাবকে সরস করে ফেনিয়ে তুলে, কল্পনা স্বপ্নকে আরো রঙদার করে আমাকে মুগ্ধ ও মশগুল করে রাখে বাংলা সাহিত্য। আবার বাস্তবকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না পেয়ে, মধ্যবিত্ত জীবনে কৃত্রিমতা, বিকৃতি ইত্যাদির মুখোশ খুলে না দেওয়ার উদাসীনতা পরোক্ষ প্রহসন হয়ে দাঁড়ানোয় এবং বাস্তব-ঘেঁষা সতেজ ও বলিষ্ঠ জীবনের অধিকারী মানবতার বিরাট অংশকে ঠাঁই না দেওয়ায়, বরং আপসোস আর রাগ হতো।

['সাহিত্য করার আগে', *মা. গ্র.* ১২]

মানিক শুধু বাস্তবতার উপরতলের কথাই বলেননি, প্রাসঙ্গিক যে-বিষয়, উপন্যাসে কল্পনার ব্যবহারের প্রসঙ্গও তুলেছিলেন, দেখিয়েছিলেন, উপন্যাসে কল্পনার ব্যবহারের জন্যও নিয়ম হলো 'বাস্তবকে আশ্রয় করা'। কবিতার কল্পনার সঙ্গে উপন্যাসের কল্পনার চমৎকার পার্থক্য নির্ধারণ করেছিলেন 'ভাববাদী কল্পনা' আর 'বস্তুবাদী কল্পনা' এই গ্রহণযোগ্য ব্যবহারযোগ্য দুরকম শর্তে। বস্তুবাদী কল্পনার ব্যবহার করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক

...যে ভাব আর ভাবনাই সাজিয়ে দিন উপন্যাসে, ভিতটা তাঁকে গাঁথতেই হবে খাঁটি বাস্তবতায়। যতই খাপছাড়া উদ্ভট হোক উপন্যাসের চরিত্র, মাটির পৃথিবীর মানুষ হয়ে তাকে খাপছাড়া উদ্ভট হতে হবে। যত অসম্ভব ঘটনাই ঘটুক, উপন্যাসের সম্ভাব্য ঘটনাকে আশ্রয় করেই তাকে কাল্পনিক অসম্ভবতার স্তরে উঠতে হবে।

['উপন্যাসের ধারা', *মা. গ্র.* ১২]

বহির্বাস্তব আর এই 'কাল্পনিক অসম্ভবতা' এই দুয়ের জটিল বুননে হয়তো গড়ে ওঠে, মানিক যাকে নাম দিয়েছিলেন 'বাস্তবতার সমগ্রতা'। মানিক নিজে 'বস্তুবাদের আদর্শ' গ্রহণ করে এ অভাব মেটাতে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাই তাঁর বিনীত দাবি :

সচেতনভাবে বস্তুবাদের আদর্শ গ্রহণ করে সেই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সাহিত্য করিনি বটে—কিন্তু ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সাহিত্যে আমাকে বাস্তবকে অবলম্বন করতে বাধ্য করেছিল। কোন সুনির্দিষ্ট জীবনাদর্শ দিতে পারিনি কিন্তু বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার অভাব খানিকটা মিটিয়েছি নিশ্চয়।'

['সাহিত্য করার আগে', *মা. গ্র.* ১২]

পরবর্তী পরিচ্ছেদে এই দাবির সত্যতা ও চারিত্র আমরা বিশ্লেষণ করব।

তথ্যনির্দেশ

১. পৃ. ২৫, *উপন্যাসের কথা,* দেবীপদ ভট্টাচার্য।
২. চিত্রকলায় রিয়ালিজম বা বাস্তববাদের প্রধান কাজ ছিল সমাজের দরিদ্র, নিপীড়িত ও অবহেলিতদের চিত্রায়ণ। মধ্য-উনিশ শতাব্দীর 'আদর্শবাদী' চিত্রধারার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিবাদ। মোটামুটি গুস্তাভ কুর্বে (১৮১৯-৭৭) থেকে শুরু ধরা যায়। 'প্রকৃতিবাদ', জর্মান 'সামাজিক বাস্তববাদ', এবং ইংরেজ 'নব্য-বাস্তববাদ' থেকে 'বাস্তববাদ' অনেকখানি আলাদা।

৩. ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে প্রকৃতিবাদের অভ্যুদয়। উপন্যাসে গঁকুর-ভ্রাতৃদ্বয় ও এমিল জোলা (১৮৪০-১৯০২) প্রকৃতিবাদের প্রধান শিল্পী। বাস্তববাদের চেয়ে বাস্তবের বিশদীকরণে বিশ্বাসী, আরো ঘনিষ্ঠ, আরো নিরাসক্ত ও ফটোগ্রাফপ্রতিম।

৪. ডি এইচ লরেন্স আরো অগ্রসর হয়ে বলেছিলেন একসময় :

> The novel is a great discovery : far greater than Galileo's telescope or somebody else's wireless. The novel is the highest form of human expression so far attained.

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্তিত্ববাদ

১. পরিচয়

অস্তিত্ববাদ একটি দার্শনিক মতবাদ। নির্বস্তুকতা বা থিয়োরির উপর নির্ভর না-করে এ জোর দিয়েছে ব্যক্তির অস্তিত্বের উপরেই। এ আইডিয়া প্রাচীন হলেও এর বর্তমান বিকাশের মূলে আছেন সোয়েন কিয়েরকেগার্দ (১৮১৩-৫৫)। ফ্রিডরিখ নিৎশে (১৮৪৪-১৯৮০), কার্ল জ্যাসপার্স (১৮৮৩-১৯৬৯), মার্টিন হাইডেগার (১৮৮৯-১৯৭৬), মিগুয়েল দ্য উনামুনো (১৮৬৪-১৯৩৬) প্রমুখ দার্শনিক অস্তিত্ববাদের বিভিন্ন মতামতের ধারক-বাহক।[1] ফিওদোর দস্তয়েভস্কি (১৮২১-৮১), ফ্রানৎস কাফকা (১৮৮৩-১৯২৪) প্রমুখের গল্প-উপন্যাসে অস্তিত্ববাদের সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায়। জাঁ-পোল সার্ৎ (১৯০৫-৮০) এবং তাঁর অনুসারীরা সার্ৎ-প্রতিষ্ঠিত *Les Temps Modernes* ('আধুনিক কাল') পত্রিকার মাধ্যমে এই শতাব্দীর চল্লিশের দশকে অস্তিত্ববাদকে জনপ্রিয় এবং বিখ্যাত করেন। বস্তুত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে এবং কালশেষেই অস্তিত্ববাদ হয়ে ওঠে বহুলপরিচিত। নিছক দর্শনে আবদ্ধ থাকলে, সাহিত্যে প্রতিফলিত ও প্রবাহিত না-হলে অস্তিত্ববাদ সম্পর্কে সাধারণ মানুষ এত সজাগ ও আগ্রহী হয়ে উঠত না। আলবেয়ার কাম্যুর (১৯১৩-৬০) মতো লেখকও প্রবলভাবেই অস্তিত্ববাদী, যা তিনি ঠিক ওই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না।

অস্তিত্ববাদের কেন্দ্রীয় বক্তব্য এই :

মানুষ এবং বস্তুপুঞ্জ আমাদের চারপাশে বর্তমান; কিন্তু যতক্ষণ না আমরা তাদের মধ্যে অর্থ সঞ্চার করছি, তাদের মধ্য থেকে অর্থ নিষ্কাশন করে আনছি, ততক্ষণ তা আমাদের জন্যে অর্থহীন। নিরর্থ মানুষ ও বস্তুকে অর্থময় করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোলা যায় একমাত্র কর্মের মাধ্যমে। 'আমি চিন্তা করি, তাই আমি আছি' : দেকার্ত-এর এই উক্তি আছে অস্তিত্ববাদের মর্মমূলে। মানুষ তাই হয়ে ওঠে যেভাবে সে নিজেকে তৈরি করে—তার ভাগ্য ঈশ্বর, সমাজ বা জীববিদ্যার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত নয়।

তার আছে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি (free will) এবং তার সঙ্গে যুক্ত দায়িত্ববোধ (responsibility)। যদি সে নির্বাচনে সক্ষম হয় বা বহিঃশক্তিসমূহ তাকে নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে সে ঘৃণ্য ও অবজ্ঞেয়। অস্তিত্ববাদ জোর দেয় কর্মের উপরে, মানুষের মৌলিক গুণসমূহের উপরে, তার অচেতন ও অবচেতন মনের অযৌক্তিকতাকেও সে স্বীকার করে নেয়। অস্তিত্ববাদীর বিবেচনায়, জীবন অবিরাম গতিশীল, নিরন্তর প্রবহমান, মানবজীবন এক ধারাবাহিকতা। নির্বস্তুকতা নয়, বস্তুর উপরেই জোর দেয় অস্তিত্ববাদ। অস্তিত্ববাদীর মতে, অস্তিত্বের ধারণার চেয়ে স্বয়ং অস্তিত্বই বেশি মূল্যবান। তাঁদের মতে, প্রচলিত দর্শন ভাসা-ভাসা, একাডেমিক ও জীবন থেকে সুদূর, তাই প্রচলিত দর্শনে আস্থা স্থাপন করা যায় না।

দর্শন মূলত তিনটি জিজ্ঞাসায় কেন্দ্রীভূত : অ) আমি কে? আ) জগৎ কী? ই) জগতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী? অস্তিত্ববাদের মূল বিষয় ঐ প্রথম প্রশ্নটি। অস্তিত্ববাদ আত্মচেতনার জাগরণ ঘটায়। মানব-অস্তিত্ব অ্যাবসার্ড, তবু মানুষের গৌরব সে স্বাধীন।[২] তার জীবন, তার সকল সম্ভাবনা ও বিকাশ, সব ফুল ফোটাবার দায়িত্ব তার উপরেই। আমাদের সত্তা স্বাধীন, আমাদের হয়ে ওঠা আর হতে থাকা আমাদের স্বকীয় সিদ্ধান্তের উপরেই নির্ভরশীল। আমরা স্বাধীন এই অর্থে যে আমরা যা করি তা পূর্ববর্তী ঘটনার দ্বারা নির্ধারিত বা কার্যকারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, আমরা যা করি তা আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার পরিপ্রেক্ষিতেই কর্ম হয়ে ওঠে। প্রতিবন্ধকতা স্বাধীনতাকে অর্থহীন করে না, বরং স্বাধীনতার জন্যেই প্রতিবন্ধকতাকে আমরা প্রতিবন্ধকতা বলে চিহ্নিত করতে পারি। আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণেই আমাদের স্বাধীনতা সূচিত হয়। প্রতিবন্ধকতার ফলে যদি আমরা ব্যর্থও হই, সে-ব্যর্থতা মূল্যবান, কেননা আমরা তো কর্মের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম; সিদ্ধান্ত গ্রহণ, তারপর প্রয়াস ও সংগ্রামেই আমাদের স্বাধীনতা। অস্তিত্ববাদ এক 'ব্যক্তিগত অঙ্গীকার' (personal commitment)। স্বাধীনতাও একক ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ও কর্মপ্রচেষ্টার ফলেই এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে দারুণ উৎকণ্ঠা (anguish)। কোনো ব্যক্তি তার জীবন ও কর্মপ্রয়াস স্থির করে যে-মূল্যবোধ দিয়ে তার দায়িত্ব অন্য কেউ নিতে পারে না। একান্তভাবে তা তারই। আর তাই উৎকণ্ঠা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর তাই হতাশা, ভীতি, ব্যর্থতা, মৃত্যু, আত্মহত্যা ফিরে-ফিরে এসেছে কিয়েরকেগার্দ, হাইডেগার, জ্যাসপার্স ও সার্ৎ-এর রচনায়।

এখন, অস্তিত্ববাদের কেন্দ্রীয় বিষয় কয়েকটি সূত্রে সংবদ্ধ করা যাক:

অ) স্বাধীনতা: অস্তিত্ববাদী সব দার্শনিকের মত, মানুষের কোনো পূর্বনির্ধারিত সূত্র নেই। কিয়েরকেগার্দ-এর মতে, মানুষের অস্তিত্ব নিখুঁত যুক্তিবাদে সম্পন্ন হতে পারে না; নিৎশে মনে করেন, মানুষ চলেছে 'অতিমানুষ' ('superman') এর দিকে; সার্ৎ বলেছেন, মানব-অস্তিত্ব কোনো তৈরি-করা জিনিশ নয়। এঁরা প্রত্যেকেই বলেছেন, মানুষ অসম্পূর্ণ। এবং অসম্পূর্ণ বলেই নিজেকে নিজে গড়বার স্বাধীনতা তার আছে।

আ) আত্মতা: শরীরে ও মনে প্রত্যেকটি মানুষ স্বতন্ত্র, একক, আলাদা। প্রত্যেকের সমস্যা ও সমাধানও নিজস্ব পথে হবে। প্রত্যেকটি মানুষ তার 'ব্যক্তিগত অঙ্গীকারে' আবদ্ধ।

ই) কর্ম: অস্তিত্ববাদ নিষ্ক্রিয়তার দর্শন নয়, কর্মের দর্শন। মানুষ তখনই অস্তিত্ববান, যখন সে নিজেকে নির্মাণ করে তার সিদ্ধান্ত অনুসারে।

ঈ) দায়িত্ব: কর্মপন্থা নির্বাচন করতে গিয়ে আমরা একটি দায়িত্ববোধে যুক্ত হয়ে পড়ি। এই দায়িত্ববোধ প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত। প্রচলিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক প্রথার বাইরেও মানুষ যেতে পারে ঐ ব্যক্তিগত দায়িত্বের কারণে।

উ) আত্মমুক্তি: নিজের অস্তিত্বকে অর্জন করতে গিয়ে মানুষ নিজের গণ্ডি অতিক্রম করে এবং তার মধ্য দিয়েই সে অন্য সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়। আমাদের ব্যক্তিসত্তার দায়িত্ব থেকে সমগ্র মানবজাতির দায়িত্ববোধ এসে পড়ে আমাদের উপরে। অস্তিত্ববাদ তাই কোনো খেয়ালি দর্শন নয়, কেননা অস্তিত্ববাদী ব্যক্তিমানুষ সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে যুক্ত।

২. ধারণা ও বিবেচনা

ফ্রয়েড ও মার্ক্স প্রসঙ্গে মানিক যেমন সুনির্দিষ্ট উল্লেখ করেছেন, অস্তিত্ববাদী দর্শন বা সাহিত্য সম্পর্কে তেমন কোনো উল্লেখ তাঁর রচনায় নেই।

৩. প্রযুক্তি

মানিকের পূর্ব ও উত্তর পর্যায়ের অনেক উপন্যাসের নায়ককেই অস্তিত্ববাদী আখ্যা দেওয়া যায়। পূর্ব পর্যায়ের *পুতুলনাচের ইতিকথার* শশী, *পদ্মানদীর*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝির কুবের, *প্রতিবিম্বর* তারক, *জীবনের জটিলতার* বিমল আর উত্তর পর্যায়ের *চতুষ্কোণ*-এর রাজকুমার, *আরোগ্যর* কেশব—প্রত্যেকেই নিজস্ব ধরনে অস্তিত্ববাদী।

পুতুলনাচের ইতিকথা ও *পদ্মানদীর মাঝি* (দুটি উপন্যাসেরই প্রকাশকাল ১৯৩৬)—মানিকের প্রথম পর্যায়ের এই দুটি উপন্যাসের মধ্যে বিপুল ব্যবধান সত্ত্বেও, এই একটি সামান্য সাযুজ্য আছে যে শশী ও কুবের দুজনই পুরোপুরি নিয়তিনিয়ন্ত্রিত। এই দুই উপন্যাসের মতো মানিকের আর-কোনো উপন্যাস নিয়তিচালিত নয়। শশী ও কুবের দুজনে প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল, কিন্তু পরিবেশের পরিবর্তন তাদের মধ্যে কুলোয় না। 'হারুর মরণের সংশ্রবে অকস্মাৎ' এসে পড়ে শশী। তারপরই সে দায়িত্বে আবদ্ধ হয়ে যায়। তার ভাবনা : 'জোর করিয়া বাড়িতে আটকাইয়া রাখিলে আর সকলকেই হয়তো সে [মতি : হারুর মেয়ে] ক্ষমা করিবে, নিয়তিকে পর্যন্ত, কিন্তু শশীকে সে সহজে মার্জনা করিবে না।' (পৃ. ৭) কলকাতা থেকে ডাক্তার হয়ে গাওদিয়া গ্রামে এসেছে শশী। এই উপন্যাসে মৃত্যু, আত্মহত্যা, বিচ্ছেদ, আত্মনির্বাসন উপর্যুপরি; শশী এইসব প্রতিরোধ করতে যায়, কিন্তু দেখা যায় বারবারই, অধিকতর শক্তিশালী অন্য এক শক্তি (নিয়তি বারবারই তার সমস্ত চেষ্টা বানচাল করে দেয়। উপন্যাসের শুরু আকস্মিকতায় (বজ্রাঘাতে হারুর মৃত্যু), শেষও আর-এক আকস্মিকতায় (গোপালের স্বেচ্ছানির্বাসনে)। অন্তর্বর্তী মুহূর্তগুলিও ভরে উঠেছে মৃত্যুতে (গাছ থেকে পড়ে ভূতোর মৃত্যু, ছেলের জন্ম দিতে গিয়ে সেনদিদির মৃত্যু, কুসুমের অন্তরের প্রেমের মৃত্যু[৩]), আত্মহননে (যাদব ও পাগলদিদি), বিচ্ছেদে (কুসুমের শেষ চলে যাওয়া)। শশী এইসব ব্যক্তি ও ঘটনার সঙ্গে কোনো-না-কোনোভাবে যুক্ত থাকে, কিন্তু অনিবার্যকে ঠেকানোর সাধ্য তার নেই। অথচ অস্তিত্ববাদী নায়কের দায়িত্ব গ্রহণ শশী চরিত্রের মূল বিষয়। কয়েকটি উদ্ধৃতি :

১. হারু ঘোষের পরিবারে ভালমন্দের দায়িত্ব শশীকে কেহ দেয় নাই, তবু চিরদিন ওদের মঙ্গল করিতে চাহিয়াছে বলিয়া আপনা হইতে দায়িত্ব যেন তাহার জন্মিয়াছে।

২. বিন্দুকে সে-ই নন্দর কবল হইতে ছিনাইয়া আনিয়াছে—ওর সম্বন্ধে সমস্ত দায়িত্ব তাহার।

[পৃ. ৯৯, ঐ]

৩. কলেরা, বসন্ত, কালাজ্বর, টাইফয়েড এবং আরও অনেক ছোট-বড় রোগে আক্রান্ত যাদের সে ফেলিয়া আসিয়াছে, একে একে তাদের মনে পড়িলে আর একটা দিনও অকারণে কলিকাতায় বসিয়া থাকিবার সংকল্পে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেকে তাহার খেয়ালী, বর্বর মনে হইতেছে! কে জানে ওদের কে ইতিমধ্যে গিয়াছে মরিয়া, কার অবস্থা গিয়াছে খারাপের দিকে! ফিরিয়া গিয়া আবার ওদের রোগ-শয্যাপার্শ্বে বসিতে না পারিলে মনে তো স্বস্তি পাইবে না। একি বন্ধন, একি দাসত্ব?/ শশীর রাগ হয়। এ দায়িত্ব সে মানিবে না, এত কিসের নীতিজ্ঞান?

[পৃ. ১০৫, ঐ]

৪. কাজ আর দায়িত্ব ছিল জীবনে, কাজ আর দায়িত্বের জীবনটা আবার ভরপুর হইয়া উঠিল। [পৃ. ২১৭, ঐ]

দায়িত্ব গ্রহণ অস্তিত্ববাদী চরিত্রের আবশ্যিক লক্ষণ। শশীর দায়িত্ব গ্রহণ শুরু হয়েছিল উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই—হারুর মৃত্যুতে; উপন্যাসের শেষে চিরকালের জন্যে গোপালের স্বেচ্ছানির্বাসনে যাওয়ার পর গাওদিয়া গ্রামেই শশী থেকে যায় 'কাজ আর দায়িত্বে' আবদ্ধ হয়ে। এই আলোচনার প্রথম পরিচ্ছেদেই অস্তিত্ববাদের চারিত্রলক্ষণ হিশেবে 'কর্ম' ও 'দায়িত্ব'কে নির্দেশ করা হয়েছে। শশীর জীবনে আমরা এই দুয়েরই প্রয়োগ দেখতে পাই; 'কাজ' আর 'দায়িত্ব' দুই ছিল শশীর জীবনে, পরবর্তীকালেও থাকবে—এই ইঙ্গিতে উপন্যাস শেষ হয়। শশীর 'কাজ' ও 'দায়িত্বে'র বিরুদ্ধে আছে নিয়তি :

> যে বিষয়ে সে দায়িত্ব গ্রহণ করে তাই ভেস্তাইয়া যায়। একটা অদৃশ্য দুর্বার শক্তি যেন অহরহ তার বিরুদ্ধে কাজ করিতেছে। [পৃ. ৯৯, ঐ]

উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই আমরা জেনেছি : 'শশীর বিষণ্ণতা ঘুচিবার নয়।' (পৃ. ৯) অনেক তরঙ্গে ওঠা-পড়ার পরে উপন্যাসের শেষে আমরা দেখলাম শশীর বিষণ্ণতা ঘোচেনি, বরং তার হৃদয়মন আরো বিমর্ষ রঙে ভরে গেছে : 'জোরে আর আজকাল শশী হাঁটে না, মন্থর পদে হাঁটিতে হাঁটিতে গ্রামে প্রবেশ করে।' (পৃ. ২১৭) পরাজিত, এক অর্থে শশী ব্যর্থ ও পরাজিত; তাই তার এই বিষণ্ণতা, মন্থরতা। কিন্তু গোপালের চিরতরে আত্মনির্বাসনের পরের 'কি আর করিবে শশী, এ ভার তো ফেলিবার নয়।' (পৃ. ২১৭) অর্থাৎ কাজ আর দায়িত্বকে গ্রহণ। এই শান্ত, অপরাজেয় সত্তায় শশী পুরোপুরি অস্তিত্ববাদী নায়কে পরিণত হয়েছে।

যে-সব প্রতিকূলতা বা প্রতিবন্ধকতা একের পর এক এসেছে শশীর জীবনে, তা তাকে ব্যর্থ করে দেয়নি, তার অস্তিত্বকে, সিদ্ধান্ত ও সংগ্রামকেই অর্থময় করে তুলেছে। যে-স্বাধীনতা অস্তিত্ববাদীর আবশ্যিক শর্ত, শশী সর্বপ্রযত্নে তা অর্জন করতে সচেষ্ট। বাধা যতই আসুক। কেননা আমরা জানি :

> ... যখন দেখি দৃশ্য অদৃশ্য অকল্পনীয় নানা বাধা আমাদের প্রচেষ্টা বারবারই ব্যর্থ করে দেয়, তখন সেখানে স্বাধীনতা কি বারবারই বিপন্ন হয় না? এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তরে সার্ত্র বলেন, প্রতিবন্ধকতা স্বাধীনতাকে অর্থহীন করে দেয় না বরং স্বাধীনতার আলোকেই প্রতিবন্ধকতাকে আমরা প্রতিবন্ধকতা বলে চিহ্নিত করতে পারি। দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতা আমাদের সিদ্ধান্তে, প্রতিবন্ধকতায় অভাবে ও সাফল্যে নয়। প্রতিবন্ধকতায়, ব্যর্থতায় যদি আমাদের কর্মধারা বিফল হয়, তবু আমি যে কর্মের সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তাকে যে রূপায়িত করবার চেষ্টা করছি—এই সিদ্ধান্ত, প্রয়াস ও সংগ্রামেই আমার স্বাধীনতা।

['সার্ত্র-এর দর্শন : একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা' : কল্যাণ সেনগুপ্ত, 'প্রমা', জুলাই, ১৯৮০]

এইভাবে শশী হয়ে ওঠে উপন্যাসে প্রথম বাঙালি অস্তিত্ববাদী নায়ক এবং *পুতুলনাচের ইতিকথা* প্রথম বাংলা অস্তিত্ববাদী উপন্যাস।

*পদ্মানদীর মাঝি*র নায়ক কুবেরও নিয়তিচালিত। তার ক্ষেত্রে বিরুদ্ধতা করেছে প্রকৃতি (ঝড়, বন্যা) ও মানুষ (শীতল, মেজো কর্তা, রাসু, হোসেন মিয়া)। মানিকের উপন্যাস মানুষপ্রধান; একমাত্র এই উপন্যাসটিতেই আছে প্রকৃতির ভূমিকা (অন্যত্র প্রকৃতির ভূমিকা প্রায় শূন্য)। নিয়তির কাছে কুবেরের আত্মসমর্পণ অবশ্য শশীর চেয়ে বেশি। শশী ও কুবের দুজনেই বিবাহিতা নারীর প্রেমে পড়েছিল; কিন্তু শশী বৃহত্তর দায়িত্বে আবদ্ধ হয়ে কুসুমের প্রেমের মর্যাদা দিতে পারেনি—আর কুবের হয়তো নিয়তিনির্বন্ধেই কপিলাকে নিয়ে ঘর বাঁধবার আয়োজন করে। শশী সক্রিয় (active) অস্তিত্ববাদী; আর কুবের অক্রিয় (passive) অস্তিত্ববাদী।

যে-আত্মতা বা ব্যক্তিত্ব অস্তিত্ববাদী নায়কের চারিত্রলক্ষণ, তা আছে তারক (*প্রতিবিম্ব*, ১৯৪৩), বিমল (*জীবনের জটিলতা*, ১৯৩৬), রাজকুমারের (*চতুষ্কোণ*, ১৯৪৮)। অস্তিত্ববাদী চরিত্রের অমোঘ স্বাধীনতার চমৎকার দৃষ্টান্ত *প্রতিবিম্বের* তারক। পরিবারগত (পিতা, শ্বশুর ও স্ত্রীর) এবং পার্টিগত (রামবাবু এবং শৈলেশ, নিশীথ, সীতানাথ, মনোজিনী, সেক্রেটারি প্রমুখের) চাপ থেকে বেরিয়ে সে মুক্ত স্বাধীন স্বেচ্ছানির্বাচিত চাকরিহীন জীবন বেছে নেয়। *জীবনের জটিলতা*র বিমলও স্বাধীনচেতা: একশো পঁচিশ টাকার চাকরি ছেড়ে সে সাতাশ টাকার চাকরি নেয়; ধনীকন্যা আত্মসমর্পিতা কুমারী লাবণ্যকে বাদ দিয়ে অশিক্ষিতা পরস্ত্রী শান্তার প্রেমকেই মূল্য দেয়। আর শান্তার আত্মহত্যার পর, প্রেমপ্রত্যাখ্যাতা আত্মহত্যাকামী সহোদরা প্রমীলার 'সব ভার' নেয়। এখন 'তার অনেক কাজ।' (পৃ. ৫৩৭. *মা. গ্র.* ১) এই দায়িত্বশীলতায় শেষ হয় *চতুষ্কোণ* উপন্যাসও, যাকে একজন উপন্যাসের ইতিহাস-রচয়িতার মতো আমরা 'গৌণ আসন'[৪] দিতে পারি না। শরীর-মনের সম্বন্ধ-নির্ণয়কারী[৫]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজকুমারের সন্ধান-যে 'খেলার জিনিষ' (পৃ. ৩৫০, *মা. গ্র.* ৬) ছিল না, অসুস্থ মানসিক রোগগ্রস্ত রিণির ভার গ্রহণ করায় তা প্রমাণিত হয়। বিমল ও রাজকুমারের এই দায়িত্বশীলতা তাদের অন্তর্গত অস্তিত্ববাদী সত্তাকেই উদ্‌ঘাটিত করে দেয়।

শেষ-পর্যায়ে অস্তিত্ববাদী-মার্ক্সবাদী একটি সম্মিলন সাধন করেছিলেন মানিক। *আরোগ্য* (১৯৫৩) তার সাক্ষ্যবহ। অস্তিত্ববাদের যে-চারিত্রলক্ষণ কর্মে, দায়িত্বশীলতায় ও আত্মমুক্তিতে চিহ্নিত, স্বভাবতই তা মার্ক্সবাদের অভিমুখী। মানিক-সম্পর্কে একটি স্বভাব-সত্য এই যে, তিনি যখন বিশুদ্ধ মার্ক্সবাদী, তখনো তাঁর পূর্ব-পর্যায়ের ফ্রয়েডবাদ ও অস্তিত্ববাদকে বর্জন করেননি। বস্তুত এজন্যেই তাঁকে নির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করা যায় না। এবং এভাবেই তিনি শিল্পীর স্বাধীনতাকে চিরকাল অক্ষুণ্ন রেখেছেন। মানবপ্রকৃতির অন্তঃসন্ধান তাঁকে চিরকাল জিজ্ঞাসু ও সচল রেখেছে। কেশব আবিষ্কার করে, তার 'ব্যক্তিগত' অসুখের কারণ 'সামাজিক'। 'সংসারে গলদ থাকলে মানুষের মধ্যে গলদ থাকবে না?' (পৃ. ৪৮৮, *মা. গ্র.* ৯) কেশবের মুক্তি ঘটে দায়িত্বশীলতা ও কর্মের সিদ্ধান্তে। 'সবার জীবন শুধরে দেবার লড়াই' শুরু করায়। ব্যক্তিগত অসুখের এই সামাজিক নিরাময় একাধারে মার্ক্সবাদী ও অস্তিত্ববাদী।

কিয়েরকেগার্দ, হাইডেগার, জ্যাসপার্স, সার্ৎ, কাম্যু প্রমুখ অস্তিত্ববাদী দার্শনিক ও লেখকদের মতো মানিকের উপন্যাসে (এবং গল্পে) হতাশা, ভীতি, ব্যর্থতা, মৃত্যু, আত্মহত্যা ভরপুর। মানবজীবনের এইসব তীব্র ঘটনা তীব্র বিদ্যুচ্চমক আমাদের অন্তর্লোক পর্যন্ত আলোড়িত করে তোলে। পূর্বোক্ত দার্শনিক-লেখকদের সঙ্গে, আশ্চর্য হতে হয়, কোনোরকম যোগাযোগ ছাড়াই মানিক আবিষ্কার করে নিয়েছিলেন অস্তিত্ববাদের সারাৎসার। আর, অন্য সব বিষয়ের মতো, অস্তিত্ববাদের দার্শনিক অনুসন্ধানেও মানিক কোনো স্থির প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ ছিলেন না; ছিলেন সচল, পরিবর্তমান, ক্রম-অগ্রসরমাণ। মানিকের অস্তিত্ববাদী নায়ক অন্তত তিনটি স্তর উত্তীর্ণ হয়েছে :

ক) প্রথম পর্যায়ের অস্তিত্ববাদী নায়ক নিয়তিতাড়িত, কিন্তু নিরন্তর সংগ্রামশীল। (শশী, কুবের)

খ) দ্বিতীয় পর্যায়ে অস্তিত্ববাদী নায়ক মূলত স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও দায়িত্বশীল। (তারক, বিমল, রাজকুমার)

গ) তৃতীয় পর্যায়ে অস্তিত্ববাদী নায়ক একাধারে অস্তিত্ববাদী ও মার্ক্সবাদী, তার ব্যক্তিত্ব আত্মতায় লীন নয়, সামাজিকতায় প্রমুক্ত। (কেশব)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথ্যনির্দেশ

১. খ্রিষ্টীয় অস্তিত্ববাদের অন্য একটি ধারা আছে। এর প্রবক্তা গ্যাব্রিয়েল মারসেল (১৮৮৯-১৯৭৩)। এঁরা মনে করেন অস্তিত্ববাদের শেষ গন্তব্য ধর্ম বা ঈশ্বরে। এই ধারারও সাহিত্যিক প্রকাশ আছে মারসেল-এর লেখা কয়েকটি নাটকে। তবে এই ধারা তত উজ্জ্বল বা প্রভাবসম্পাতী নয়।

২. উদাহরণ হিশেবে জাঁ-পল সার্ৎ-এর বিকাশের ধারাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। অ্যাবসার্ডিটি ও বিবমিষা-বিবিক্তি থেকে সার্ৎ মুক্তি খুঁজেছেন প্রথমে শিল্পসাহিত্যের বা আর্টের জগতে (যেখানে আছে ছন্দ ও বিন্যাস), পরে শিল্পসাহিত্যের বিমূর্ত জগৎ থেকে তরঙ্গিত জীবনে।

৩. কুসুমের উক্তি : 'কাকে ডাকছেন ছোটবাবু, কে যাবে আপনার সঙ্গে? কুসুম কি বেঁচে আছে? সে মরে গেছে।' [পৃ. ১৯২, *মা. গ্র.* ৩]

৪. পৃ. ৩১৩, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর,* সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই উপন্যাস সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত বিবেচনার জন্যে বর্তমান অভিসন্দর্ভের 'চতুষ্কোণ' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৫. শরীর-মনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে মনঃসমীক্ষক পাভলভ বিশ্বাসী ছিলেন। ফ্রয়েড-বিরোধী পাভলভকে তাঁর মার্ক্সবাদী পর্যায়ে মানিকের বেছে নেওয়া একান্ত স্বাভাবিক।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপন্যাসভাবনা

১. পরিচয়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গল্প-উপন্যাস রচনার ফাঁকে-ফাঁকে কিছু প্রবন্ধ[১] রচনা করেছিলেন;—যদিও টমাস মান (১৮৭৫-১৯৫৫) বা হেনরি জেমস (১৮৪৩-১৯১৬), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪) বা অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২)-এর মতো তাঁকে ঔপন্যাসিক-প্রাবন্ধিক বলা যাবে না। মানিকের উপন্যাসভাবনা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর এরকম কিছু গ্রন্থিত ও অগ্রন্থিত প্রবন্ধে, কয়েকটি উপন্যাসের ভূমিকায়, এমনকি উপন্যাসের মধ্যেই, এবং কিছু কিছু চিঠিপত্রে। এসব থেকে তাঁর উপন্যাসভাবনার মননময় জগৎটি সংকলিত ও উদ্ধৃত করে নিতে চাই বর্তমান রচনায়। এসব থেকে তাঁর উপন্যাসে নতুন আলো এসে পড়ে। মানিকের উপন্যাসবিচারে এসব থেকে আলো ও দিশা পাওয়া যেতে পারে। তাঁর উপন্যাসবিচারে এসবই অবশ্য চূড়ান্ত বিচারনীতি হতে পারে না;—যেহেতু সৃষ্টিশীলতা ও মননপদ্ধতি সব সময় চলে না এক রেখায়। মানিকের উপন্যাসভাবনার আলোকে তাঁর উপন্যাসবিচার সহজ যদিও হয়, তবু তা-ই যে একমাত্র মানদণ্ড হবে, তা কখনো নয়। তাঁর অগ্রজ, সমকালীন ও অনুজ দেশি ও বিদেশি ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসভাবনার তুলনায় তাঁর বিশিষ্টতা স্পষ্ট হয়।[২]

এক-হিশেবে মানিকের সমস্ত সাহিত্যচিন্তা-ও-চর্চার প্রবেশক বলে গ্রহণ করা যেতে পারে তাঁর (অতিব্যবহারে ক্ষয়িত একটি শব্দ ব্যবহার করেই বলছি) অসাধারণ প্রবন্ধ 'কেন লিখি'[৩]-কে। 'লেখা ছাড়া অন্য কোন উপায়েই যে-সব কথা জানানো যায় না সেই কথাগুলি জানাবার জন্যই আমি লিখি।'—প্রবন্ধের প্রথম এই বাক্যেই ঘোষিত হয় মানিকের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপ্রতিরোধ্য লেখকসত্তা। প্রতিভা—শব্দটিতে মানিকের অবিশ্বাস ছিল প্রবল। তিনি স্পষ্ট বলেছেন, 'প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণের কথাটা বাজে।' বলেছেন, 'লেখার ঝোঁকটা অন্য দশটা ঝোঁকের মতোই। অঙ্ক শেখা, যন্ত্র বানানো, শেষ মানে খোঁজা, খেলতে শেখা, গান গাওয়া, টাকা করা ইত্যাদির দলেই লিখতে চাওয়া।' এই বিষয় নিয়ে, আশ্চর্য, একটি প্রবন্ধ পর্যন্ত লিখে ফেলেছিলেন, যার নামই 'প্রতিভা' (*মা. গ্র.* ১২)। কিন্তু এরই মধ্যে একটু তফাত নেই কি—মনোভঙ্গির তফাত? তা না হলে একজন কেন লেখক হয়, অন্যেরা অন্য কিছু হয়? কেনই-বা একজন 'লেখা ছাড়া অন্য কোনো উপায়েই' নিজের বলতে পারেন না? মনোভঙ্গির পার্থক্যের জন্যই আবার লেখকদের মধ্যে কেউ হন কবি, কেউ ঔপন্যাসিক। আর লেখকের উপরে যা প্রকাশের এক অপ্রতিরোধ্য তাগিদ : 'জীবনকে আমি যেভাবে ও যতভাবে উপলব্ধি করেছি অন্যকে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ভাগ দেওয়ার তাগিদে আমি লিখি। আমি যা জেনেছি এ জগতে কেউ তা জানে না (জল পড়ে পাতা নড়ে জানা নয়)।'[৪] ঔপন্যাসিকও এই নতুন ও মৌলিক অকথিত ও অপ্রতিরোধ্য বাণীর বাহক।

AMARBOI.COM

২. উৎস ও অম্বিষ্ট

অতঃপর মানিকের উপন্যাসভাবনাকে এরকম একটি ছকে বা নকশায় সাজিয়ে নেওয়া যায় :

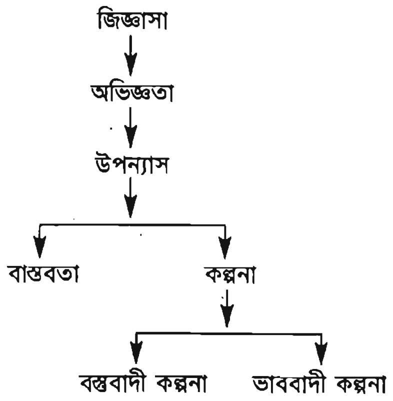

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানিকের উপন্যাসভাবনার উৎস ও উপকরণ এই নকশায় পাওয়া যাবে।

ক) জিজ্ঞাসা : মানিক বলতে চান উপন্যাস-রচনায় প্রথম বীজ জীবন ও মানুষ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন, কৌতূহল, সন্ধান, ঔৎসুক্য। মানিকের উক্তি : "ছেলেবেলা থেকে 'কেন?' নামক মানসিক রোগে ভুগছি, ছোট বড় সব বিষয়ের মর্মভেদ করার অদম্য আগ্রহ যে রোগের প্রধান লক্ষণ।" ('গল্প লেখার গল্প', *মা. গ্র.* ১২) 'সাহিত্য করার আগে কয়েকটা বিষয়ে সকল হবু লেখকের মিল থাকে। যেমন, সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ, জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ও জবাব খোঁজার তাগিদ, সাহিত্যে প্রতিফলিত জীবনকে বাস্তব জীবনে খুঁজে নেবার চেষ্টা, নতুন অভিজ্ঞতাকে চিন্তাজগতে সাহিত্যের টেকনিকে ঢেলে সাজা ইত্যাদি—এ সমস্তই সাহিত্য জীবনের জন্য প্রস্তুতির প্রক্রিয়াটা ঘটানোর কারণস্বরূপ।' ['সাহিত্য করার আগে', *মা. গ্র.* ১২]

খ) অভিজ্ঞতা : জিজ্ঞাসা ও সন্ধান নিয়ে যায় অভিজ্ঞতার কাছে; মানিকের উক্তি : "ছেলেবেলা থেকেই গিয়েছিলাম পেকে। অল্প বয়সে 'কেন' রোগের আক্রমণ খুব জোরালো হলে এটা ঘটবেই। ভদ্র জীবনের সীমা পেরিয়ে ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল নিচের স্তরের দরিদ্র জীবনের সঙ্গে।" ('সাহিত্য করার আগে', *মা. গ্র.* ১২) 'কেন লিখি' (*মা. গ্র.* ২) প্রবন্ধে 'মানসিক অভিজ্ঞতা' নামে একটি কথা ব্যবহার করেছেন। শুধু 'অভিজ্ঞতা' নয়, অর্থাৎ শুধু বাইরের দেখা নয়, বাইরের দেখাকে নিজের ভিতরে গ্রহণ করা, 'দেখা'কে 'দৃষ্টি'তে রূপান্তরিত করা। 'চিন্তার আশ্রয় মানসিক অভিজ্ঞতা। ছেলেবেলা থেকেই আমার অভিজ্ঞতা অনেকের চেয়ে বেশি।' এই মানসিক অভিজ্ঞতা যেমন ঔপন্যাসিকের উপার্জন, তেমনি তা উপন্যাসপাঠকেরও উপার্জন : 'আমার লেখাকে আশ্রয় করে সে [পাঠক] কতকগুলি মানসিক অভিজ্ঞতা লাভ করে—আমি লিখে পাইয়ে না দিলে বেচারি যা কোনো দিন পেতো না।' হ্যাঁ, গ্রন্থপাঠকেও অতিচেতন মানিক জীবনকে দেখার মতোই অভিজ্ঞতার অংশ বলে মনে করতেন। অভিজ্ঞতা বলতে মানিক এই দুরকম আহরণই বুঝতেন : 'ঘরে শিল্প-সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুঁজি ঘাঁটা আর ঘরে-বাইরে সর্বত্র সব সময় মানুষকে এবং জীবনকে তন্নতন্ন করে দেখা ও জানা...।' ['লেখকের সমস্যা', *মা. গ্র.* ১২]

গ) বাস্তবতা : মানিকের উক্তি : 'গল্প উপন্যাস পড়ে নাড়া খেতাম গভীরভাবে, গল্প উপন্যাসের জীবনকে বুঝবার জন্য ব্যাকুল হয়ে তল্লাশ করতাম বাস্তব জীবন।' '...ছোট বড় লেখকের বই ও মাসিকের লেখা পড়তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়তে এই প্রশ্নটাই ক্রমে ক্রমে আরও স্পষ্ট জোরালো হয়ে উঠতে লাগল যে, সাহিত্যে বাস্তবতা আসে না কেন, সাধারণ মানুষ ঠাঁই পায় না কেন?' 'শৈশব থেকে সারা বাংলার গ্রামে শহরে ঘুরে যে জীবন দেখেছি, নিজের জীবনের বিরোধ ও সংঘাতের কঠোর চাপে ভাবালুতার আবরণ ছিঁড়ে ছিঁড়ে জীবনের যে কঠোর নগ্ন বাস্তব রূপ দেখেছি—সাহিত্যে কি তা আসবে না? এই বাস্তব জীবন যাদের—সেই সাধারণ বাস্তব মানুষ?' ('সাহিত্য করার আগে', *মা. গ্র.* ১২) নিজের সাহিত্যিক সাফল্যের ক্ষেত্রে এই বাস্তবতার দাবিই মানিক করেছেন এ প্রবন্ধে।

মানিক যে-বাস্তবতার অনুধ্যান করেছেন, তার প্রধান নিয়ামকশক্তি 'বৈজ্ঞানিক বিচারবোধ'। 'উপন্যাসের ধারা'[৫] (*মা. গ্র.* ২) প্রবন্ধে মানিক এ বিষয়টি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন, 'প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিজ্ঞান-প্রভাবিত মন উপন্যাস লেখার জন্য অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন।' 'নিত্য নতুন আবিষ্কারে বিজ্ঞান বদলে দিয়ে চলে সমাজ ও জীবনকে, বদলে দিয়ে চলে মানুষের চেতনাকে। এই চেতনায় জাগে সাহিত্যের কাছে নতুন চাহিদা এবং এই চেতনা প্রতিফলিত হয় নতুন আঙ্গিকে উপন্যাস রচনায়।' বৈজ্ঞানিক বিচারবোধ বলতে মানিক বুঝেছেন 'সরাসরি বিজ্ঞানে কিছু শিক্ষা পাওয়া নয়'—বরং সাধারণ যুক্তিবোধ 'সাহিত্যে উপন্যাসের নব-বিধান যেন যুক্তিবাদেরই জয়গান।'

ঘ) কল্পনা : মানিক কল্পনার দুটি ধরন চমৎকার ব্যাখ্যা করেছিলেন : বস্তুবাদী কল্পনা ও ভাববাদী কল্পনা। মানিক তাঁর 'উপন্যাসের ধারা' প্রবন্ধে এবং অন্যত্র বলেছেন, উপন্যাসের কাজ 'বাস্তবতার সমগ্রতা'কে নির্মাণ করা। ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে : উপন্যাসে 'অনেক রকমের অনেক মানুষকে তাদের বাস্তব জীবন ও পরিবেশ-সমেত টেনে এনে কাহিনী ফাঁদতে হয়। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই কবিতার চেয়ে উপন্যাসে ভাববাদী কল্পনার স্থান বস্তুবাদী কল্পনা অনেক সহজে ও দৃঢ়ভাবে দখল করেছে।' মানিকের বিবেচনায়, কবিতায় ও নাটকে ভাববাদী কল্পনা বেশি ব্যবহৃত হয়।[৬] 'সাহিত্য করার আগে' প্রবন্ধে মানিক তাঁর কথিত দুরকম কল্পনার যথার্থ বিশ্লেষণ করেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের একই সঙ্গে হামসুন আর গোর্কির নামোচ্চারণে বিস্মিত হয়েছিলেন মানিক। 'মনে আছে "মাদার" পড়তে পড়তে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম, হ্যামসুন আর গোর্কিকে প্রেমেনবাবু মেলাবেন কি করে? আমার তখন হ্যামসুনেও আপত্তি ছিল না, গোর্কিতেও আপত্তি ছিল না। কিন্তু ভাবের আকাশের ঝড় আর মাটির পৃথিবীতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনের বন্যার পার্থক্য কি ধরা না পড়ে পারে?' ('সাহিত্য করার আগে', *মা. গ্র.* ১২) হামসুন : ভাবের আকাশের ঝড় : ভাববাদী কল্পনা; আর গোর্কি : মাটির পৃথিবীতে জীবনের বন্যা : বস্তুবাদী কল্পনা। মানিক, বলা বাহুল্য, গোর্কিরই পক্ষপাতী।

প্রসঙ্গত, 'পাঠকগোষ্ঠীর আলোচনা' (*মা. গ্র.* ১২) প্রবন্ধে মানিক লিখছেন, 'অচিন্ত্যকুমার ভালো গল্প লিখতেন। আজ আরও ভালো গল্প লিখছেন। তাঁর পূর্ণতর বিকাশ হয়েছে। বিকাশ পরিবর্তন নয়। ধারা পরিপুষ্ট হওয়া ধারাবাহিকতাই। সমাজ ভাঙা জর্জর বাংলার চাষী জীবনের আসল বাস্তবতা কোথায় তাঁর সাহিত্যে? কোথায় বাঁচার সংগ্রাম, যা তাদের হাসি-কান্না আনন্দ-বেদনা প্রেম-বিরহ নীতিদুর্নীতি কলহবিবাদ একতা প্রতিরোধ—জীবনের সমস্ত অভিব্যক্তিকে প্রভাবান্বিত করেছে?' অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—তিরিশের ঐ দুই ঔপন্যাসিকই নিম্নবিত্ত জীবনের কাহিনী লিখেছেন; তাঁদের দুজনের রচনায় আমরা দেখতে পাই মানিক-কথিত ঐ দ্বিভাজনই : ভাবের আকাশের ঝড় আর মাটির পৃথিবীতে জীবনের বন্যা।[৭]

চমৎকার বিশ্লেষণ করে মানিক দেখিয়েছেন উপন্যাসে কল্পনাকেও হতে হবে বস্তুভিত্তিক। মানিকের উক্তি : 'লেখক যে ভাব আর ভাবনাই সাজিয়ে দিন উপন্যাসে, ভিতটা তাকে গাঁথতে হবে খাঁটি বাস্তবতায়। যতই খাপছাড়া উদ্ভট হোক উপন্যাসের চরিত্র, মাটির পৃথিবীর মানুষ হয়ে তাকে খাপছাড়া উদ্ভট হতে হবে। যত অসম্ভব ঘটনাই ঘটুক উপন্যাসে, সম্ভাব্য ঘটনাকে আশ্রয় করেই তাকে কাল্পনিক অসম্ভবতার স্তরে উঠতে হবে।' 'কাহিনী যদি দাঁড় করাই প্রেমাত্মক অবান্তর কল্পনার, গল্পের চরিত্রগুলিকে করতে হবে বাস্তব রক্ত-মাংসের মানুষ।' ['উপন্যাসের ধারা', *মা. গ্র.* ২]

মানিক তাঁর উপন্যাসে যেমন তেমনি উপন্যাসবিবেচনাতেও প্রতিটি পথঘাট অন্ধিসন্ধি জানতেন। ফলে বাস্তবতার এত পক্ষপাতী হয়েও শিল্পের সীমা বা অসীমা তিনি জানতেন ও মানতেন। তাই তাঁর কণ্ঠে এই সৎ ও সতর্ক উচ্চারণ : 'বস্তুবাদী লেখক অবশ্যই বাস্তবতার রিপোর্টার নন, তিনি শিল্পী—তিনিও কল্পনার রঙে-রসেই তাঁর কাহিনী রূপায়িত করবেন, কিন্তু মিথ্যার সঙ্গে তাঁর কল্পনার কারবার থাকবে না। এই জন্যেই তাঁর বাস্তব জীবনের গতি-প্রকৃতি ভালো করে জানা দরকার—তাঁর কল্পনা যাতে বাস্তবতাকে অতিক্রম করে ফাঁকা আদর্শবাদিতার মিথ্যায় পরিণত না হয়, জীবন-বিরোধী না হয়ে ওঠে।' ('সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গ', *মা. গ্র.* ২) কিংবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"...শুধু সচেতন বুদ্ধি খাটিয়ে শিল্পসাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। বিষয়বস্তু নির্বাচন করা থেকে সব কাজ বুদ্ধি দিয়েই হয়—কিন্তু সমগ্র চেতনা সহযোগিতা না করলে 'সৃষ্টি' হয় না।" [২৬-সংখ্যক পত্র, *অ. মা. র.*]

৩. টেকনিক

তাঁর কয়েকটি উপন্যাসের ভূমিকায় মানিক উপন্যাসের টেকনিক সম্পর্কে অন্তরঙ্গ আলোচনা করেছেন। উপন্যাসগুলি এই: *প্রতিবিম্ব* (১৯৪৩), *সহরবাসের ইতিকথা* (১৯৪৬) *চিহ্ন* (১৯৪৭), *চতুষ্কোণ* (১৯৪৮), *সার্বজনীন* (১৯৫২) ও *শুভাশুভ* (১৯৫৪)।

প্রতিবিম্ব: অন্তত দুটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তির দিকে তাকানো দরকার। মানিকের যে-বিখ্যাত নৈর্ব্যক্তিকতা, তার সাক্ষ্য: 'নিজেকে সমর্থন করে একথা বলার অধিকার আমার আছে যে "প্রতিবিম্ব" পড়ে ভুল ধারণা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকার কারণ লেখার ত্রুটি নয়। বইখানা যে মনের বিব্রত দৃষ্টিভঙ্গী ও চেতনার আপেক্ষিক সঞ্চরণশীলতার প্রান্তগ্রাহী প্রতিবিম্ব, সেই চেতনাশ্রয়ী মনই এজন্যে দায়ী। পরিবেশের দ্রুত আবর্তনশীল আকর্ষণ ও বিকর্ষণের চাপ মনকে এই অবস্থায় এনে দেয়। অতিক্রান্ত মনের সংখ্যা বেশি নয়।' অর্থাৎ লেখক নয়, চরিত্র-পাত্র স্বয়ং তার গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করবে। অন্যত্র ('শেষ প্রশ্ন', *মা. গ্র.* ১৩), উপন্যাসের চরিত্র সম্পর্কে মানিকের একটি অসাধারণ বিশ্লেষণ: 'উপন্যাসের চরিত্র পাঠকের ইচ্ছা ও ভাল লাগাকেই সমীহ করে পরিণতির দিকে চলবে না, তার গতির মধ্যে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। এমনকি লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রভাব পর্যন্ত এড়িয়ে নিজের ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলবে।' দ্বিতীয়ত, "বলা বাহুল্য, তারক বদলে যাবে। ইতিমধ্যেই কিছুটা বদলেছে। কিছুকাল পরে 'প্রতিবিম্ব' হয়ে যাবে 'পুরানো ছবি'।" মানিক তাঁর মধ্য পর্যায়ের উপন্যাসে (এবং গল্পে) দ্রুত পরিবর্তমান দেশ-কালের ভাঙচুরের যেন অন্তহীন ফটোগ্রাফ সঞ্চয় করে গেছেন।

সহরবাসের ইতিকথা: মানিকের উক্তি: '...কোনো চরিত্রের বিকাশ বা কাহিনীর গতি এমন জায়গায় থামানো চলে না যাতে প্রশ্ন জাগে: তারপর কি হল? গতিটা কোন পরিণতির দিকে এটুকু অন্তত ধরিয়ে দিতেই হবে—যাতে ধারাটা কল্পনা করে অনুভব করে নেওয়া সম্ভব হয়।' এ নিশ্চিত রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প-প্রাসঙ্গিক 'শেষ হয়ে হইল না শেষ'-এর বিপরীত বিশ্বাস;

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোটোগল্প ও উপন্যাসের স্বভাবের বৈপরীত্যের প্রতীতিই প্রতিফলিত হয়েছে হয়তো এখানে। মানিকের উপন্যাসে চরিত্র বা কাহিনীর আত্মসম্পূর্ণতা বা শিল্পসম্পূর্ণতা এই সূত্রে বিবেচ্য।

শুভাশুভ : উপরের উক্তির বিরুদ্ধতা মনে হতে পারে মানিকের এই উচ্চারণকে : 'উপন্যাস লেখার পুরানো একটি রীতি অথবা নীতি আজও অনেকে আঁকড়ে আছেন—সেটা এই যে উপন্যাসে কোন চরিত্র আনলে তার একটা গতি ও পরিণতির সম্পূর্ণতা দিতেই হবে। শেষ পর্যন্ত মানুষটার কি হল।/ আমার প্রথম[৮] উপন্যাস "পুতুলনাচের ইতিকথা"য় আমি প্রথম এই নিয়ম ভঙ্গ করি।' এটা ঠিকই যে মানিকই প্রথম এই ধরনের নিরুদ্দেশ যাত্রী চরিত্র সৃষ্টি করেন। সেদিক থেকে আগের অনুচ্ছেদের বিরুদ্ধ উক্তি বলে মনে হতে পারে একে—কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় : মানিক এক-ধরনের নিরুদ্দিষ্ট চরিত্র সৃষ্টি করেছেন *পুতুলনাচের ইতিকথা*র মূল কাহিনীতে নয়, উপকাহিনীতে, মতি-কুমুদকে নিয়ে যে উপকাহিনী তৈরি হয়েছিল, সেখানে। কেন্দ্রীয় কাহিনী বা চরিত্রকে মানিক সব সময় কোনো-না-কোনো সম্পূর্ণতা দান করেছেন। *শুভাশুভ* উপন্যাসের ভূমিকার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উক্তি : 'এটি আমার পরীক্ষামূলক উপন্যাস। আমার বিশ্বাস, প্রধান নায়ক ও নায়িকাদের প্রধান করে বজায় রেখেও সংশ্লিষ্ট আরও অনেক চরিত্র আমদানি করলে উপন্যাসের শ্রেণীগত সামাজিক বাস্তবতা রূপায়ণে সাহায্য হয়।' মানিকের উত্তরকালীন অনেক উপন্যাসেই শ্রেণীভিত্তিক অজস্র চরিত্র এনে সামাজিক বাস্তবতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

চতুষ্কোণ : মানিকের উক্তি : 'রাজকুমারের মত অসংখ্য ছেলে দেখেছি। তারা নানারকম, কিন্তু আসলে এক। রাজকুমারকে 'টাইপ' বলে ধরলে ভুল করা হবে। একজনের মধ্যে অনেককে রূপ দেবার চেষ্টা করেছি।' এদিক থেকে রাজকুমার একটি প্রতিভূ-চরিত্র।

চিহ্ন : মানিকের উক্তি : 'বইখানা নতুন টেকনিকে লেখা, একে উপন্যাস বলা চলবে কিনা আমার জানা নেই। এ ধরনের কাহিনী, যার ঘটনা অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুতগতিতে ঘটে চলে, এভাবে সাজালেই জোরালো হয় বলে মনে করি।' *চতুষ্কোণ*-এর বিপরীত : *চতুষ্কোণ*-এ নায়ককে ঘিরে সমস্ত ঘটনা ও পরিবেশ আবর্তিত হয়েছে, *চিহ্ন*-এ ঘটনা বা পরিবেশকে ঘিরে চরিত্রগুলি আবর্তিত হয়েছে।

সার্বজনীন : *পদ্মানদীর মাঝি*তে সকলেই আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেছে, *সার্বজনীন*-এ পূর্ববঙ্গত্যাগী চরিত্ররাও আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেনি। 'একই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রেণীর মানুষদের' মধ্যে সংলাপে বিভিন্নতা সৃষ্টি করা উচিত নয় বলে মানিক তাঁর ভূমিকায় জানিয়েছেন।

৪. অন্য ঔপন্যাসিক ও আন্দোলন

সাধারণভাবে বাঙালি ঔপন্যাসিকদের সম্পর্কে মানিক খুব বেশি মন্তব্য করেননি;—বিদেশি ঔপন্যাসিকদের সম্পর্কে আরো কম (গোর্কি, হামসুন, শোলোকভ, হেমিংওয়ে প্রমুখ কয়েকজনের উল্লেখ আছে)। যে-জগদীশ গুপ্তকে (১৮৮৬-১৯৫৭) বলা হয়ে থাকে মানিকের পূর্বসূরি, তাঁর উল্লেখমাত্র নেই তাঁর রচনায়।[৯] ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছেন কয়েকজন বাঙালি ঔপন্যাসিক সম্পর্কে—একমাত্র শরৎচন্দ্র সম্পর্কেই পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ লিখেছেন একটি; বিভিন্ন সময়ে কল্লোল যুগের উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর স্বভাবসুলভ স্পষ্ট, নির্দিষ্ট ও নির্দ্বিধ মন্তব্য করেছেন—এবং আশ্চর্য লক্ষ্যভেদী।

বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-৯৪) : 'বঙ্কিমকে আমি চিরদিন প্রতিক্রিয়াশীল বলেই জেনে এসেছি। কিন্তু বঙ্কিমের মধ্যেও প্রগতির কিছু কিছু চমক আছে।' ['বাংলা প্রগতি-সাহিত্যের আত্মসমালোচনা', *মা. গ্র.* ১৩]

রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) : 'রবীন্দ্রসাহিত্যও পড়তাম, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাস পড়েও আমার মনে কোন প্রশ্ন বা নালিশ জাগতো না। কবি বলে রবীন্দ্রনাথকে সত্যিই আমি রেহাই দিয়েছিলাম। ...বাংলা সাহিত্যে বাস্তববাদের আবির্ভাবকে সাহায্য করার দায়িত্ব থেকে আজ আমি তাঁকে রেহাই দিই। কেন দিই, সেটা এ প্রবন্ধে বলা সম্ভব নয়।'[১০] ['সাহিত্য করার আগে', *মা. গ্র.* ১২]

শরৎচন্দ্র (১৮৭৬-১৯৩৮) : পূর্বজ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে শরৎচন্দ্র সম্পর্কেই মানিক ছিলেন সবচেয়ে মুগ্ধ ও সশ্রদ্ধ : 'শরৎচন্দ্রের বই পড়ে মনে হতো তিনি অন্যায় আর গোঁড়ামিকে আঘাত করেছেন কিন্তু অন্য কোন লেখক সম্পর্কেই এরকম ভাবা সম্ভব হতো না।' ('সাহিত্য করার আগে', *মা. গ্র.* ১২) শরৎচন্দ্রের তিনটি উপন্যাস সম্পর্কে মানিক মন্তব্য করেছেন : *শ্রীকান্ত*, *চরিত্রহীন* ও *শেষ প্রশ্ন*। *শ্রীকান্ত* উপন্যাসের রাজলক্ষ্মী প্রসঙ্গে : 'বাংলা সাহিত্যে নারীত্ব অভিনব মর্যাদা পেলো, কিন্তু বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে কেন?' (ঐ) *চরিত্রহীন* সম্পর্কে : 'বাংলা সাহিত্যের কত দৃঢ়মূল সংস্কার আর গোঁড়ামি যে চুরমার হয়ে গিয়েছিল এই উপন্যাসে।' (ঐ) কোনো ঔপন্যাসিক সম্পর্কে মানিকের একটিমাত্র পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ 'শেষ প্রশ্ন'—শরৎচন্দ্রের সাতান্নতম জন্মদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপলক্ষে রচিত। *শেষ প্রশ্ন* শরৎচন্দ্রের বিতর্কিততম উপন্যাস।[১১] মানিকের প্রবন্ধটি খানিকটা বিপক্ষের জবাবের ভঙ্গিতে লেখা। শুরুর অনুচ্ছেদ : 'আমি "শেষ প্রশ্ন" লিখলে লোকে আমার প্রতিভায় অবাক হয়ে যেত। কারণ তাহলে "শেষ প্রশ্নে"র বিচারই লোকে করত, লেখকের পূর্বতন সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে বইখানার সর্বাঙ্গীণ অমিলটা অপরাধ বলে গণ্য করত না।' বইটি সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত : *শেষ প্রশ্নের* রসসৃষ্টি সম্পূর্ণ কলাসম্মত ও গভীর। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে একটি আপত্তি মানিক তুলেছিলেন : হৃদয়াবেগ কেন সব-কিছু নিয়ন্ত্রণ করে—মধ্যবিত্তের হৃদয়?

কল্লোল যুগ : 'বাংলা সাহিত্যে এই আধুনিকতা একটা বিপ্লবের তোড়জোড় বেঁধেই এসেছিল কিন্তু বিপ্লব হয়নি, হওয়া সম্ভবও ছিল না—সাহিত্যের চলতি সংস্কার ও প্রথার বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত তারুণ্যে বিক্ষোভ বিপ্লব এনে দিতে পারে না। জোরের সঙ্গে দাবি করা হয়েছিল যে, আমরা বস্তুপন্থী সাহিত্য সৃষ্টি করছি, কিন্তু প্রকৃত বস্তুবাদী আদর্শ কল্লোল, কালি-কলমীয় সাহিত্যিক অভিযানের পিছনে ছিল না।' ('সাহিত্য করার আগে', *মা. গ্র.* ১২) 'তখন কল্লোল যুগের সমারোহ কিন্তু আমি টের পেয়েছিলাম সাহিত্যে যে মোড় ঘুরছে কল্লোলী সাহিত্য তার লক্ষণমাত্র, আসল পরিবর্তন আসবে অন্য রূপে—সাহিত্য ক্রমে ক্রমে বাস্তবধর্মী হয়ে উঠবে।' (২৩-সংখ্যক চিঠি, *অ. মা. ব.*) মানিক অন্যত্র বলেছেন, কল্লোল যুগ পার হয়ে এসেছিলেন বলেই তিনি নিজের পথের স্বাতন্ত্র্য বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন।[১২] কারো কারো মতো তিনি কল্লোল যুগের বিরুদ্ধে অন্ধ আক্রোশের পরিচয় দেননি। শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমারের উল্লেখ করেছেন; কল্লোলীয় বস্তুপন্থার বিশ্লেষণ ও স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। এবং এসবের সঙ্গে নিজের আরাধ্য ও আচরিত বস্তুপন্থার পার্থক্য ঘোষণা করেছেন।

শৈলজানন্দ (১৯০০-৭৬) : 'আধুনিকতার আন্দোলন যদি শৈলজানন্দের খাঁটি গ্রামের মানুষ আর কয়লাখনির কুলিদের সাহিত্যে আনা সম্ভব করে থাকে, বস্তির জীবনকে অন্তত সাহিত্যে প্রবেশের পথ করে দিয়ে থাকে,—শুধু এইজন্যই রাশিকৃত জঞ্জালের আবির্ভাবটা ক্ষমা করা চলে। / ...শৈলজানন্দের গ্রাম্য জীবন ও কয়লাখনির জীবনের ছবি হয়েছে অপরূপ—কিন্তু শুধু ছবিই হয়েছে।' ['সাহিত্য করার আগে', *মা. গ্র.* ১২]

অচিন্ত্যকুমার (১৯০৩-৭৬) : 'অচিন্ত্যকুমারের যে বিশেষ পরিণতির কথা বলছেন [বিষ্ণু দে] তার বিশেষত্ব, নতুন দৃষ্টি, নতুন চেতনা, নতুন জীবনবোধ বা মানসজগতের সমাজমানসগত মৌলিক কোন পরিবর্তন নয়—পরিণতি শুধু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই যে, তিনি নতুন বিষয়কে উপাদান করে আরও পাকা হাতে লিখছেন। তাঁর আগের স্টাইল আরও দৃঢ়বদ্ধ হয়েছে, তাঁর আগের দৃষ্টি আরও ব্যাপক, জীবনক্ষেত্রকে আরও পরিষ্কারভাবে দেখছে, অভিজ্ঞতার সাহিত্যিক রূপায়ণ আরও ঘন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়েছে। তাঁর চিন্তাজগতে কোনও মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি।' ['পাঠকগোষ্ঠীর আলোচনা', *মা. গ্র.* ১২]

৫. সারাৎসার

মানিকের উপন্যাসভাবনা ছড়িয়ে আছে মূলত তাঁর প্রবন্ধগুচ্ছে—যেগুলি অধিকাংশ ('কেন লিখি' বাদে) তাঁর উত্তর পর্যায়ের রচনা: উপন্যাসের ভূমিকাগুলিতে তিনি প্রধানত উপন্যাসের টেকনিক নিয়ে ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতাজাত তাঁর বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন; অন্য ঔপন্যাসিক ও আন্দোলন সম্বন্ধে মন্তব্য থেকেও তাঁর ঔপন্যাসিক অন্বিষ্ট ও গন্তব্য সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হয় আমাদের কাছে। মানিকের উপন্যাসভাবনার সারাৎসার এরকম:

ক) উপন্যাসে মানিকের আরাধ্য ছিল বাস্তবতা—ভাবলুতা-বর্জিত প্রকৃত বাস্তব জীবন। [বহির্বাস্তব]

খ) কিন্তু সেই বাস্তবতা কেবল বস্তুর উপরিতলে লিপ্ত ছিল না। বস্তুর অন্তর্লোকেরও ছিল সে সন্ধানী, কেন-ধর্মী জীবনজিজ্ঞাসায় চঞ্চল। [অন্তর্বাস্তব]

গ) অনায়ক নায়ক—চাষী, মাঝি, মজুর। [অনায়ক নায়ক]

ঘ) মানিকও কল্পনায় বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু সে-কল্পনা বস্তুবাদী কল্পনা, বস্তুভিত্তিক কল্পনা। [বস্তুবাদী কল্পনা]

ঙ) উপন্যাসে চরিত্র, ঘটনা, পরিবেশের প্রতিটি ধাপ হবে যুক্তির ক্রমে, হৃদয়াবেগ-সর্বস্ব হবে না, হবে বুদ্ধিচালিত। [বৈজ্ঞানিক বিচারবোধ]

চ) কিন্তু আবার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'শুধু সচেতন বুদ্ধি'র ফল নয়, সমগ্র চেতনার ফল, অর্থাৎ অচেতন ও অবচেতনেরও। [সমগ্র চেতনা]

ছ) সংলাপে উপভাষার প্রয়োগ হতে পারে (*পদ্মানদীর মাঝি*), না-ও পারে (*সার্বজনীন*), ঔপন্যাসিকের অভীষ্ট অনুযায়ী তা হবে। [উপভাষার প্রয়োগ-অপ্রয়োগ]

জ) কাহিনী পরিণামবহ বা অন্তত পরিণামের ইঙ্গিতবহ হতে হবে। [পরিণামী কাহিনী]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝ) উপন্যাসের কোনো-কোনো চরিত্র অসম্পূর্ণ থাকতে পারে (*পুতুলনাচের ইতিকথার* মতি ও কুমুদ)। [অসম্পূর্ণ চরিত্র]

ঞ) নায়ক কখনো প্রতিভূ-চরিত্র (*চতুষ্কোণ*), কখনো পরিবেশ বা জনগোষ্ঠী (*চিহ্ন*)। [নায়ক]

ট) উপন্যাসের চরিত্র লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রভাব এড়িয়ে নিজস্ব ব্যক্তিত্বে উত্তীর্ণ ও চিহ্নিত হবে। [চরিত্র]

ঠ) সব-মিলিয়েই (অন্তর্বাস্তবতা, বহির্বাস্তবতা) তৈরি হয় সমগ্র বাস্তব, যে-বাস্তবতায় সমগ্রতাকেই মানিক মনে করেন উপন্যাসের সমগ্রতা। [বাস্তবতার সমগ্রতা]

তথ্যনির্দেশ

১. প্রবন্ধধর্মী গদ্যরচনা : *লেখকের কথা* (১৯৫৭) প্রবন্ধগ্রন্থে ষোলোটি; *মা. গ্র.* ১২ ও *মা. গ্র.* ১৩-য় সংকলিত তেরোটি; *এক্ষণ* (শারদীয়া ১২৮৪) পত্রিকায় 'ছিন্ন লেখা' শিরোনামে প্রকাশিত ষোলোটি।

২. মানিকের অসাধারণ আত্মজ্ঞান ও সংযম এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, তিনি উপন্যাস সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, কিন্তু কবিতা সম্পর্কে নিঃশব্দ। সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার অনুরাগী হয়েও, বিষ্ণু দে-কে দু-একবার আক্রমণ করলেও তিনি কবুল করেন, 'কাব্য-সমালোচনার সঠিক পদ্ধতি আমার জানা নেই...।' ['কবিও পেয়ে গেছে নতুন যুগ', *মা. গ্র.* ১৩]

৩. একমাত্র 'কেন লিখি' রচনাটিই মানিকের মার্ক্সবাদী-পূর্ব পর্যায়ের প্রবন্ধ। লেখাটি ১৯৪৪ সালের জানুয়ারি মাসে একটি সংকলনে প্রকাশিত হয়; তার আগে বেতারে প্রচারিত। এদিক থেকে মানিকের প্রবন্ধগুলি তাঁর উত্তর-পর্বের ভাবনাই ধারণ করেছে—প্রথম পর্বের নয়।

৪. 'আমি যা জেনেছি এ জগতে কেউ তা জানে না' তিরিশের প্রধান ঔপন্যাসিকের এই উচ্চারণের পাশেই উপস্থিত করা যেতে পারে তিরিশের প্রধান কবির উক্তি : 'কেউ যাহা জানে নাই—কোনো এক বাণী—আমি বহে আনি।' ['কয়েকটি লাইন', *ধূসর পাণ্ডুলিপি* : জীবনানন্দ দাশ]

৫. 'উপন্যাসের ধারা' প্রবন্ধটি প্রথম 'উপন্যাসের কথা' নামে *পূর্বাশা* (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লেখা মানিকের একটি চিঠি উত্তরকালে *পূর্বাশা* (আশ্বিন ১৩৭২)-তেই প্রকাশিত হয় :

186A Gopal Lal Tagore Rd
Alam Bazar
Calcutta-35
7.4.51

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রিয়বরেষু,

আপনার পত্র পেলাম। যে লেখাটি চেয়েছেন তার দৈর্ঘ্য সম্পর্কে খটকা রয়ে গেল। কয়েকটি কথায় লিখে দেব মানে কি এক পৃষ্ঠা দেড় পৃষ্ঠার মত—যাতে কয়েকজন লেখকের বক্তব্য একসঙ্গে ছাপা যায়? অথবা প্রত্যেকেই ছোট প্রবন্ধাকারে (৪-৫ পৃ.) লিখবেন?

এ বিষয়ে জানালে সুখী হব এবং যথাসম্ভব শীঘ্র লেখাটি দেবার চেষ্টা করব।

আশা করি কুশল।

প্রীতিকামী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব্বাশায় আসলে উপন্যাস বিষয়ে তিরিশের 'কয়েকজন লেখকের বক্তব্য'ই মুদ্রিত হয়েছিল। এঁরা হচ্ছেন: অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু ('কবিতা ও উপন্যাস'), অন্নদাশঙ্কর রায় ('উপন্যাসের সাধনা'), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ('উপন্যাসের কথা')। মানিকের উপন্যাসভাবনার কেন্দ্রীয় জিনিশ ধরা আছে এই প্রবন্ধে।

৬. উপন্যাসের উল্টো দিকে কবিতার মূলধন কল্পনা, বিশেষত ভাববাদী কল্পনা। মানিকের সমকালীন কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধের শুরু করেছেন এভাবে: 'সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি; কবি—কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে...' ('কবিতার কথা', *কবিতার কথা*) উপন্যাসে মানিক যে জোর দিয়েছিলেন বাস্তবতার উপরে, কবি জীবনানন্দ সেই গুরুত্বই আরোপ করেন কল্পনার উপরে—এবং মানিক-উল্লিখিত 'অভিজ্ঞতা' শব্দটি তিনিও ব্যবহার করেন।

৭. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ব্যক্তিগতভাবেও ছিলেন নুট হামসুন-এর অনুরক্ত। নোবেল প্রাইজ-প্রাপ্ত হামসুনের *প্যান* উপন্যাসটি তিনি অনুবাদ করেছিলেন। কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের অনেকেই হামসুনের, এবং নরোখের আরো কোনো-কোনো লেখকের, অনুরাগী ছিলেন।

৮. স্পষ্টত স্মৃতিবিভ্রম। মানিকের প্রথম রচিত উপন্যাস *দিবারাত্রির কাব্য* (প্রকাশ: ১৯৩৫), প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস *জননী* (প্রকাশ: ১৯৩৫)।

৯. সর্বপ্রথম কে মানিকের উপরে জগদীশ গুপ্তের প্রভাবের কথা বলেছিলেন, যা আজ প্রায় প্রবাদবাক্যের মতো চালু হয়ে গেছে—এবং অপরীক্ষিত? খুব সম্ভবত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *পরিচয়* পত্রিকায় (পৌষ ১৩৬৩) মানিক স্মৃতি-সংখ্যায়। তিনি দুজনের কথা বলেছিলেন জগদীশ গুপ্ত ও শৈলজানন্দ।

১০. এই প্রশ্নের জবাব মানিক অন্য কোথাও দেননি।

১১. আরো অনেকের মতো 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্রে'র লেখক মোহিতলাল মজুমদার *শেষ প্রশ্নের* একটি বিরূপ সমালোচনা লিখেছিলেন। তার অংশ:

মানুষের জীবন, তাহার চরিত্র ও নিয়তির চিরন্তন রহস্য—যাহা দেশে ও কালে বিচিত্র হইলেও, কবিকল্পনার সত্যসন্ধানী দৃষ্টিতে চিরকাল একই রসের উৎস—এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থে তাহার আভাস মাত্রও নাই; ইহার যাবতীয় পাত্রপাত্রী সেই মানুষ নয়, সৃষ্টির অতি জটিল দুর্ভেদ্য নিয়ম-জাল যাহার মধ্যে একটি অনির্ব্বচনীয় রসরূপে সরল অথচ চির রহস্যময় হইয়া প্রকাশ পায়।..."শেষ প্রশ্নে"র এই সকল নরনারীকে আমরা অতিশয় ক্ষুদ্র বলিয়াই অনুভব করি ...।

['দুইখানি উপন্যাস', *সাহিত্য-বিতান*]

১২. এই কথাটিই অন্যভাবে ঘুরিয়ে বলেছেন বুদ্ধদেব বসু :

দৈবাৎ এবং অল্পের জন্য, '**কল্লোল**'-গোষ্ঠীর লেখক তিনি হননি, কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক স্থান সেখানেই চিহ্নিত ছিলো; প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ ও 'যুবনাশ্বে'র সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা সুস্পষ্ট। প্রভেদ এই, তাঁর রচনায় কোনো সচেতন বিদ্রোহ ছিলো না, কেননা যার জন্য 'কল্লোলে'র বিদ্রোহ, সে-জমি ততদিনে জেতা হয়ে গেছে, এবং, একই কারণে, মণীন্দ্রলাল-গোকুলচন্দ্রের স্কুলেও তাঁকে কখনো হাত পাকাতে হয়নি। তিরিশের যুগে যাঁরা প্রথম তাঁর রচনাসমূহ পড়েছেন তাঁদের বুঝতে দেরি হয়নি যে সদ্যমৃত 'কল্লোলে'র সর্বশেষ, বিলম্বিত ও পরিপক্ক ফলের নামই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

['মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', *স্বদেশ ও সংস্কৃতি*]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিল্পকুশলতা

'উপন্যাস গদ্যে লেখা সাহিত্য।'[১] অর্থাৎ ঔপন্যাসিকের মাধ্যম গদ্যভাষা; যা-কিছু তাঁর কৃত্য সবই তাঁকে সম্পন্ন করতে হয় ঐ গদ্যভাষায়; কাজেই ঔপন্যাসিকের কাছে গদ্য অসম্ভব শক্তিশালী মাধ্যম। ঔপন্যাসিককে তাঁর স্বকীয় সত্তার বাইরের জগৎকে, বহির্জগৎকে রূপ দিতে হয়—আবার তারই মধ্যে তাঁর নিজস্ব অন্তর্জগৎও প্রবিষ্ট হয়ে থাকে। বহিঃপৃথিবীর রূপায়ণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিবীক্ষাকে ফুটিয়ে তোলা—ঔপন্যাসিকের এ এক সমস্যা। এর জন্য তাঁকে অবলম্বন করতে হয় মোহহীন সর্বত্রগামী গদ্য। 'গদ্য যেমন বলার বা লেখার কাজে মানবিক জগতে সর্বত্রগামী, গদ্যকে নিয়ে উপন্যাস একা সেই সর্বগামিত্ব অর্জন করেছে।'[২] এদিক থেকে উপন্যাসের সঙ্গে গদ্যের একটি আত্মিক সম্বন্ধ আছে। আবার, 'উপন্যাস একটি কলা-পরিণতি। তার গদ্যকে তার থেকে আলাদা করা প্রকৃত পক্ষে যায় না।'[৩] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের সঙ্গে তাঁর গদ্যের সম্পর্কও অবিচ্ছেদ্য। এখানে আমরা সূত্রাকারে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঔপন্যাসিক গদ্যের চারিত্র বিশ্লেষণ করব।

১. সাধু ও চলতি গদ্য : তিরিশের অর্থাৎ সমকালীন সব কথাশিল্পীর মতো মানিকও সাধু ও চলতি দুরকম গদ্যেই উপন্যাস (এবং গল্প) লিখতেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস *দিবারাত্রির কাব্য* এবং জীবিতকালে প্রকাশিত শেষ উপন্যাস *মাশুল* চলতি গদ্যে লেখা। মধ্যবর্তীকালে কয়েকটি উপন্যাস তিনি লিখেছেন সাধু ভাষায়। সাধু ও চলতি গদ্যে লেখা তাঁর উপন্যাসসমূহের একটি কালানুক্রমিক তালিকা এখানে উদ্ধৃত করছি :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধু গদ্য	চলতি গদ্য
জননী	দিবারাত্রির কাব্য
পদ্মানদীর মাঝি	প্রতিবিম্ব
পুতুলনাচের ইতিকথা	দর্পণ
জীবনের জটিলতা	চিন্তামণি
অমৃতস্য পুত্রাঃ	চিহ্ন
সহরতলী (১-২)	জীয়ন্ত
অহিংসা	পেশা
ধরা-বাঁধা জীবন	স্বাধীনতার স্বাদ
সহরবাসের ইতিকথা	সোনার চেয়ে দামী (১-২)
আদায়ের ইতিহাস	ছন্দপতন
চতুষ্কোণ	ইতিকথার পরের কথা
	পাশাপাশি
	সার্বজনীন
	আরোগ্য
	তেইশ বছর আগে পরে
	নাগপাশ
	চালচলন
	শুভাশুভ
	হরফ
	পরাধীন প্রেম
	হলুদ নদী সবুজ বন
	মাশুল

AMARBOI.COM

এই তালিকা থেকে বেরিয়ে আসছে: অ) মানিকের এক-চতুর্থাংশ উপন্যাস সাধু গদ্যে লেখা; বাকি তিন ভাগই চলতি রীতি আশ্রয়ী; আ) প্রথম পর্যায়ের অধিকাংশ উপন্যাস সাধু গদ্যে রচিত; উত্তর পর্যায়ের অধিকাংশ উপন্যাস চলতি গদ্যে; ই) যদিও তাঁর চলতি গদ্যে লেখা উপন্যাসের সংখ্যা অনেক বেশি, তবু *পদ্মানদীর মাঝি*, *পুতুলনাচের ইতিকথা*, *সহরতলী* ও *অহিংসার* মতো অসাধারণ উপন্যাসগুলি তিনি সাধু গদ্যেই রচনা করেছেন।

উপযুক্ত সাধু-চলতি রীতির দ্বিভাজনী তালিকা ওই কুসংস্কার অপনোদন করবে যে মানিক সাধু গদ্যেই বেশি লিখেছেন।[৪] তাঁর অধিকাংশ এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তরপর্যায়ী উপন্যাস (এবং গল্প) চলতি গদ্যেই লিখেছেন মানিক—এদিক থেকেও তিরিশের ঔপন্যাসিকদের গোত্রলক্ষণ তাঁর মধ্যে আছে।

এখন, মানিকের সাধু-চলতি রীতির গদ্যের কয়েকটি বিশিষ্টতা শনাক্ত করতে চাই : অ) সাধু গদ্যের ক্ষেত্রেও তাঁর গদ্যের বিশিষ্টতা মৌখিক ধরন; তার চলতি গদ্যেও তিনি চেয়েছিলেন সংহতি আয়ত্ত করতে। তাই চারিত্রিক দিক থেকে তাঁর এই দুই ধরনের গদ্যের মধ্যেই এমন এক ব্যাপার আছে যে এদের হঠাৎ আলাদা বলে মনে হয় না—খুঁটিয়ে বের করতে হয় কোন উপন্যাস সাধু ভাষায় লেখা, কোনটি চলতিতে। ক্রিয়াপদ সাধু কিন্তু বাকভঙ্গি মৌলিক রীতির অনুসারী—এই এক বিশিষ্টতা মানিকের। এদিক থেকে তিনি শরৎচন্দ্রের উত্তরসূরি। এরই ফলে তাঁর গদ্যে সৃষ্টি হয়েছিল জলপ্রবাহের সচ্ছল সাবলীলতা। এক সাক্ষাৎকারে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গদ্য বিষয়ে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য প্রসঙ্গত স্মরণীয় : 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শৈলী বিষয়ে সবচেয়ে বড় কথা এই যে সেটা কোনো বিশেষ শৈলী বলে প্রতিভাত হয় না। তাঁর পরম্পর বাক্যপর্যায় যেন সুস্থ মানুষের নিশ্বাসপ্রশ্বাসের মতই অবচেতন ও স্বচ্ছন্দ।' (*অন্বিষ্ট*, মানিক সংকলন, মাঘ ১৩৭৮); আ) সাধু গদ্যে কম লিখলেও, আমাদের বিবেচনায়, এই গদ্যেই মানিক তুলনামূলকভাবে দক্ষতা দেখিয়েছেন বেশি। সাধু ভাষায় যে পেশলতা, গাম্ভীর্য, নিরাবেগ দূরত্ব, মানিকের জীবনদৃষ্টির তা অনুকূল; ফলে তাঁর বিষয়ের সঙ্গে ভাষা ওতপ্রোত সম্বন্ধ রচনা করেছে।

২. ঋজু, রূঢ়, পেশল, নিরাবেগ, অনন্যমনস্ক গদ্য : মানিকের কালে রবীন্দ্রপ্রভাব বাংলা কবিতার মতো গদ্যেও তীব্রভাবে সক্রিয়। মানিকের অব্যবহিত আগে রবীন্দ্রপ্রভাবী গদ্য এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪) তাঁর মধ্যে নতুন-ধরনের কবিত্ব সঞ্চার করে (উত্তরকালে কবিতার আবেগের ও নির্বাচিত শব্দ সঞ্চয়ের সঙ্গে গদ্যের শৃঙ্খলা যুক্ত করে); অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-৭৬) বাক্যে নাটকীয়ত্ব ও নতুন শব্দ সৃষ্টি করে; অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২) সহজ কিন্তু অতরল অচপল সৌষম্যযুক্ত ছোটো-ছোটো বাক্য রচনা করে; শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০০-৭৬) কাহিনীবাহী সাবলীল গদ্যে; প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-৮৮) চেনা শব্দ বাক্যকেই একটু রহস্যময়ভাবে সংস্থাপন করে; জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) গদ্যে নিরাবেগ শুষ্কতা সৃষ্টি করে। মানিক বুদ্ধদেব বসুর সমসাময়িক হয়েও (দুজনেরই জন্ম ১৯০৮-এ) একটু দেরিতে এসেছেন সাহিত্যে—*কল্লোল*-এ তিনি লেখেননি। মানিক রবীন্দ্রপ্রভাবকে যেমন অতিক্রম করেছেন, তেমনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্লোলীয়দেরও। মানিকের গদ্যের পূর্বসূরি হিশেবে তিনজনকে চিহ্নিত করা যায়—শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও জগদীশ গুপ্ত। তবু শৈলজানন্দের মতো মানিকের গদ্য নিছক সংবাদবাহী নয়; প্রেমেন্দ্র মিত্রের পেলবতা ও মৃদুতা সঞ্চারেরও চেষ্টা নেই তাঁর; জগদীশ গুপ্তের মতো হঠাৎ-হঠাৎ কবিত্ব করার দুশ্চেষ্টাও তিনি করেননি। মানিকের গদ্য ঋজু ও দৃঢ়, পেশল ও নিরাবেগ—এবং অনন্যমনস্ক। রাবীন্দ্রিক লালিত্য, বুদ্ধদেবী কবিত্ব, অচিন্ত্যকুমারীয় নাটকীয়ত্ব, বীরবলী চাতুর্য থেকে তাঁর গদ্য একেবারেই স্বতন্ত্র। এই ঔপন্যাসিক গদ্যের গাম্ভীর্যে প্রাত্যহিক জীবনকে যেমন নিরাবেগভাবে রূপায়িত করা সম্ভব হয়েছে, তেমনি প্রাত্যহিক জীবনের অন্তরালবর্তী মানবাত্মার যে-সন্ধান (আধ্যাত্মিক নয়, কিন্তু দার্শনিক সন্ধান অর্থাৎ জীবনার্থ সন্ধান) তাকেও। বহির্বাস্তব ও অন্তর্বাস্তবকে যে-ঔপন্যাসিক ধারণ করার চেষ্টা করেছেন, যিনি বহির্লোক ও অন্তর্লোক-সন্ধানী, স্বাভাবিকভাবেই তাঁর গদ্য কিছুতেই অপ্রযত্নরচিত হতে পারে না। মানিকের আদি সমালোচকদের কেউ-কেউ মনে করেছিলেন 'তাঁর কৃতিত্ব অশিক্ষিতপটুতা' (ধূর্জটিপ্রসাদ)[৫], কিংবা 'এ প্রতিভা আত্মসচেতন প্রতিভা নয়, আত্মবিচার ও আত্মগঠন এ প্রতিভার ধর্ম নয়।' (গোপাল হালদার)[৬] কিন্তু সমগ্র মানিক-সাহিত্য এর প্রতিবাদ। তাঁর প্রবন্ধগুচ্ছেই প্রমাণিত হয় মানিক অসচেতন নন কখনোই ও কোনো অবস্থাতেই। মানিক বরং সতত জাগ্রত, সন্ধিৎসু, গ্রহণশীল। তাঁর গদ্যেও তাই শিথিলতা বা অন্যমনস্কতা নেই। '...মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষাকে আমরা ভাবের ভাষা না বলে বলতে পারি ভাবনার ভাষা।'[৭] দু-একটি উদাহরণ :

ক) দুর্নীতি, দারিদ্র্য, অন্তহীন সরলতার সঙ্গে নীচু স্তরের চালাকি, অবিশ্বাস ও সন্দেহের সঙ্গে একান্ত নির্ভর, অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে অধমকে অনায়াসে সহিয়া চলা—এসব যাদের জীবনে একাকার হইয়া আছে, পদ্মার বুকে নৌকা ভাসাইয়া যারা ভাবুক কবি, ডাঙায় যারা গরিব ছোটলোক, মেজবাবু কেন তাদের পাত্তা পাইবেন? ও কাজ হোসেন মিয়ার মত মানুষের পক্ষে সম্ভব, মেজবাবুর চেয়ে বেশি টাকা রোজগার করিয়াও যার মাঝিত্ব খসিয়া যায় নাই।

[পৃ. ১২৭, 'পদ্মানদীর মাঝি', *মা. গ্র.* ১]

খ) হারুকে সহজে এখানে কেহ আবিষ্কার করিবে, এরূপ সম্ভাবনা কম। এদিকে মানুষের বসতি নাই। এদিকে আসিবার প্রয়োজন কাহারো বড় একটা হয় না, সহজে কেহ আসিতেও চায় না। গ্রামের লোক ভয় করিতে ভালবাসে। গ্রামের বাহিরে খালের এপারের ঘন জঙ্গল ও গভীর নির্জনতাকে তাহারা ওই কাজে লাগাইয়াছে। ভূত-প্রেতের অস্তিত্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়তো গ্রামবাসীরই ভীরু কল্পনায়, কিন্তু স্থানটি যে সাপের রাজ্য তাতে আর সন্দেহ নাই।

[পৃ. ১, 'পুতুলনাচের ইতিকথা', *মা. গ্র.* ৩]

গ) পাঁচুর সাইকেলের লাইট নেই। মফস্বলের শহরে আবার সাইকেলের লাইট! অমাবস্যার অন্ধকারেও তারা চেনা রাস্তায় বন্‌বন্‌ সাইকেল চালায়। তবে শহরের বাইরে রাস্তাটা বড় খারাপ। নিজের টর্চটা সে পাঁচুকে দেয়। পাঁচুর উৎসাহে একটু ভাটা পড়েছে মনে হয়। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে ইতস্তত করে পাকা না গেলে একা যাবে কিনা। তারপর হঠাৎ বুঝি আটুলিগাঁয়ে মা-মাসী ভাই বোনের মাটির দেয়াল টিনের চাল নিকানো উঠানে ধান-খড় গোয়ালগন্ধী নীড়টির জন্য প্রাণটা আবার আনচান করে ওঠে তার।

['জীয়ন্ত', *মা. গ্র.* ৭]

৩. কাব্যিক গদ্য : বস্তুবাদী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও প্রথম পর্যায়টি ছিল রোমান্টিক ও কাব্যিক। *দিবারাত্রির কাব্য* (আদি রচনা : ১৯২৯) ও 'অতসী মামী' গল্প (রচনা : ১৯২৮) মানিকের এই রোমান্টিক ও কাব্যিক পর্যায়ের উদাহরণ। '*দিবারাত্রির কাব্য* শুধু নামত কাব্য নয়, সারত তাকে একটি দীর্ঘ গদ্যকবিতা বললে অত্যুক্তি হয় না।'[৮]—বুদ্ধদেব বসুর মতো সমকালীন প্রধান একজন কবি ও কাব্যধর্মী ঔপন্যাসিকের এই মন্তব্য প্রসঙ্গত স্মরণীয়। যে-দুটি প্রধান কাব্যকুশলতা এই উপন্যাসে প্রযুক্ত হয়েছে, তা হচ্ছে অ) উপমা-উৎপ্রেক্ষা, এবং আ) প্রতীক। উপমা-উৎপ্রেক্ষার উদাহরণ :

ক) ছিল অন্ধকারের সেই নিরন্ধ্র-কুলায়, যেখানে নব জন্মলাভের প্রতীক্ষায় কঠিন আস্তরণের মধ্যে হৃদয় নিস্পন্দ হয়েছিল।

[পৃ. ১৮৫, 'দিবারাত্রির কাব্য', *মা. গ্র.* ১]

খ) লণ্ঠনের এত কাছে আনন্দ বসেছে যে তাকে মনে হচ্ছে জ্যোতির্ময়ী, আলো যেন লণ্ঠনের নয়।

[পৃ. ২০৪, ঐ]

গ) সুপ্রিয়া হয়ে থাকে এই পরিচয়ের মধ্যবর্তিনী কান্তা, রৌদ্রতপ্ত দিনের ধূলিরুক্ষ কঠোর বাস্তবতায় একটি কাম্য পানীয়ের প্রতীক।

[পৃ. ২১৮, ঐ]

ঘ) আত্মবিস্মৃত পাখির মত নিঃসীম আকাশে পাখা মেলে অনন্তযাত্রায় তাকে প্রস্তুত হতে দেখে এই নীড়লুব্ধ বিহংগমী তার কাছে পৃথিবীর আকর্ষণ টেনে এনেছে, তাকে মনে পড়িয়ে দিচ্ছে আকাশে আশ্রয় নেই, খাদ্য নেই, পানীয় নেই।

[পৃ. ২৫১, ঐ]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতীকের দৃষ্টান্ত :

আকাশ মেঘে ঢাকা। ওদিকে বিদ্যুৎ চমকায়। শুকনো ঘাসে ঢাকা মাঠে হেরম্ব আস্তে আস্তে পায়চারি করে। আজ রাত্রে যদি বৃষ্টি হয় কাল হয়তো মাঠের বিবর্ণ বিশীর্ণ তৃণ প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। [পৃ. ১৬৪, ঐ]

মানিকের কাব্যিক-রোমান্টিক জগৎ ক্রমশ বস্তুপৃথিবীতে লীন হয়ে গেছে।

৪. **স্কেচধর্মী গদ্য :** সংক্ষিপ্তি, পেশলতা, ঘনত্ব মানিকের গদ্যের অসামান্য গুণ। অতিসংক্ষিপ্তি তাঁর শেষ দিককার গদ্যকে স্কেচধর্মী করেছে এবং উপন্যাসের গদ্য হিশেবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। একটি নমুনা :

শান্তিলতার রঙ খুব কালো।
গড়ন-পিটন আশ্চর্যরকম।
খাঁটি ভীল সাঁওতাল মেয়েদের পর্যন্ত যেন হার মানিয়ে দিতে পারে।
এমন স্বাস্থ্য খুব কম দেখা যায়।
খায় তো ডালভাত পার শাকচচ্চড়ি।
কী করে তার এমন স্বাস্থ্য হল—বড় বড় ডাক্তাররা মাথা ঘামিয়ে তার হদিস পাবে মনে হয় না।
রোগ-ব্যারামের ব্যাপারটা রোগ-ব্যারামের ব্যাপার।
স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা স্বাস্থ্যের ব্যাপার।
ডাক্তাররা যেন হিসেব করতে পারছে না।
হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।
এলোমেলো চিকিৎসা চালাচ্ছে।

[পৃ. ১, 'শান্তিলতা', *মা. গ্র.* ১২]

৫. **শব্দ :** 'উপন্যাসের ভাষা জীবনের বাস্তবতা এবং জীবনের কাব্য দুইকেই ধারণ করে।'[৯] মানিকের উপন্যাসও জীবনের গদ্য ও কবিতা দুইকেই ধারণ করেছে। তাই শব্দ ব্যাপারে তাঁর কোনোরকম শুচিবায়ুগ্রস্ত ভাব নেই। উপভাষিক শব্দ, ইংরেজি শব্দ, সংস্কৃত শব্দ, দেশজ শব্দ তাঁর উপন্যাসে অনায়াসে পাশাপাশি এসে দাঁড়ায়। কোনো-কোনো শব্দ তাঁর স্বরচিত। যেমন :

ক) যেদিন থাকে সেদিন বড়লোকের বাড়ির পোষা কুকুরের মত উদাস চোখে এসব সে [কুবের] চাহিয়া দেখে, স্নেহ-মমতার এইসব খাপছাড়া কাণ্ডকারখানা। দেখিতে দেখিতে সে হাই তোলে, বড়লোকের পোষা কুকুরের মতই চাটাই-এ একটা গড়ান দিয়া উঠিয়া বসে, মুখখানা করিয়া রাখে গম্ভীর।

[পৃ. ৪৫, 'পদ্মানদীর মাঝি', *মা. গ্র.* ১]

খ) এত বেশী খাটে সকলে আর এত কম খায় যে ঘুমের টনিক ছাড়া বাঁচাই অসম্ভব তাদের। ঘুমের জন্য তপস্যা করতে হয় না, চাটাই-মাটাই যাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোক গা এলিয়ে ছেঁড়া বালিশ বা ন্যাকড়া-জড়ানো খড়ের পুঁটুলিতে মাথা রাখলেই ঘুম যেন মশার ঝাঁকের আগেই এসে যায়।

[পৃ. ৩৪৭, 'ইতিকথার পরের কথা', *মা. গ্র.* ৮]

গ) বাচ্চাটা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠছে, গৌরী শীর্ণ বুকের প্রায় দুধহীন মাই গুঁজে দিচ্ছে তার মুখে।

[পৃ. ৭১, 'হলুদ নদী সবুজ বন', *মা. গ্র.* ১১]

ঘ) সে এক স্মরণীয় বিতর্ক গোপন বৈঠকের পাঁচজনের সঙ্গে, গভীরভাবে আত্মনাড়া খাওয়ার অভিজ্ঞতার মতোই বহুদিন চারজনের মনের মধ্যে গাঁথা হয়েছিল।

[পৃ. ১৪২, 'জীয়ন্ত', *মা. গ্র.* ৭]

৬. সরল ও যৌগিক বাক্য : এমনিতে মানিক ব্যবহার করতেন সরল, সংক্ষিপ্ত বাক্য। শেষ দিকে এই ভাষা সংক্ষিপ্ততর ও দ্রুতটান স্কেচের মতো হয়ে ওঠে। সরল বাক্যের মধ্যেই মাঝে-মাঝে যৌগিক বাক্য তৈরি করা মানিকের অভ্যাস :

ক) যাকে সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভয় করে প্রমীলা তাকে ওভাবে তুচ্ছ করিয়া দেয় কি করিয়া বুঝিতে চাওয়ার মধ্যেই যেন নিজের বেশীরকম দুর্বলতা আছে, এমনিভাবে বিমল কৌতূহলটা চাপিয়া রাখে।

[পৃ. ৪৫৬, 'জীবনের জটিলতা', *মা. গ্র.* ১]

খ) মুখে এ কথা বলিলেও মনে মনে তিনি এত খুশী হইয়াছিলেন যে উপভোগে বাধা পড়িবে ভয়ে বিমল ও প্রমীলাকে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেও ডাকিবার চেষ্টা করিলেন না।

[পৃ. ৪৭৮, ঐ]

গ) সর্বনাশ যদি বিমল আজ তাহাকে দেয় বিমলের দান বলিয়াই সে আজ মাথা পাতিয়া নিবে এমনি একটা ভাব সে যদি আগাগোড়া বজায় রাখিয়া চলিতে পারে শান্ত হইতে সময় লাগিবে না।

[পৃ. ৪৯৩, ঐ]

ঘ) মায়া আর মায়ার জীবন ও জগতকে ভালবেসেও সে রাত্রির অন্ধকারে মায়াকে ভোগদখল করেছে, তাকে বাঁধবার জন্য মিথ্যা মায়ার ফাঁদ পেতেছে জেনেও সে তো মায়াকে এড়িয়ে যায়নি, এতটুকু রেহাই দেয়নি মায়াকে।

[পৃ. ৪৮৫, 'আরোগ্য', *মা. গ্র.* ৯]

৭. অসমাপিকা ক্রিয়া : সাধারণত অসমাপিকা ক্রিয়া ভাষাকে দুর্বল করে দেয়, কিন্তু আবার কোনো-কোনো উপন্যাসের উপযোগী অসমাপিকা ক্রিয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্কিমচন্দ্র প্রচুর অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন তাঁর উপন্যাসে, কিন্তু শরৎচন্দ্র সচেতনভাবেই এড়াতে চেয়েছেন।[১০] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ে, প্রথম পর্যায়ে, অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ প্রচুর :

ক) একহাত একখানি কাপড়কে নেংটির মত কোমরে জড়াইয়া ক্রমাগত জলে ভিজিয়া, শীতল জলোবাতাসে শীতবোধ করিয়া বিনিদ্র আরক্ত চোখে লণ্ঠনের মৃদু আলোর নদীর অশান্ত জলরাশির দিকে চাহিয়া থাকিয়া কুবের ও গণেশ সমস্ত রাত মাছ ধরে।

[পৃ. ৪, 'পদ্মানদীর মাঝি', মা. গ্র. ১]

খ) বহুদূর নদীবক্ষ হইতে হাঁক আসিতেছিল, মানব-কণ্ঠের একটানা একটা ক্ষীণ আওয়াজ। দুই কানের পিছনে হাত দিয়া হাঁক শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কুবের সাড়া দিয়া উঠিল। এ এক ধরনের ভাষা, পূর্ববঙ্গের মাঝি-শ্রেণীর লোক ছাড়া এ ভাষা কেহ জানে না। এ ভাষায় কথা নাই, আছে শুধু তরঙ্গায়িত শব্দ। উন্মুক্ত প্রান্তরে বিস্তৃত নদীবক্ষে এ শব্দ দূর হইতে দূরে চলিয়া যায়, ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসে, কিন্তু তরঙ্গের তারতম্য অবিকল থাকিয়া যায়। অস্ফুট গুঞ্জনের মতো মৃদু হইয়াও যদি কানে আসিয়া লাগে, পদ্মানদীর মাঝি কান পাতিয়া শুনিয়া অর্থ বুঝিতে পারে। শব্দের দুর্লক্ষ্য উৎসের দিকে চাহিয়া সে বুক ভরিয়া বাতাস গ্রহণ করে। বাঁ হাত কানের পিছনে রাখিয়া ডান হাতটি মুখের সম্মুখে আনিয়া সঞ্চালিত করিয়া উচ্চারিত একটানা আওয়াজে সে তরঙ্গের সৃষ্টি করে।

['পদ্মানদীর মাঝি', মা. গ্র.]

গ) অনেক রাতে বোধহয় বারোটার পর শান্তা আসিয়া জানালা খুলিয়া এবং কয়েকটি অস্ফুট কাতরানির শব্দ করিয়া মুহ্যমানের মত ঠেস দিয়া জানালায় বসিয়া রহিল।

[পৃ. ৫০৩, 'জীবনের জটিলতা', মা. গ্র. ১]

৮. বিরোধাভাস বা oxymoron : বহির্বাস্তবতার তুল্য অন্তর্বাস্তবতার প্রতি লক্ষ্য ছিল বলেই মানিক মানবচরিত্রের অনেক কূট প্রদেশে আলো ফেলেছেন। তার একটি মানবচরিত্রের আত্মবৈপরীত্য। মানিক তাঁর উপন্যাসে (এবং গল্পে) মানবচরিত্রের এই আভ্যন্তর বৈপরীত্য উন্মোচন করেছেন অনেক সময়।[১১] ফলে বিরোধাভাস বা oxymoron তাঁর গদ্যের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অলংকার হিশেবে দেখা দিয়েছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হলো :

ক) সে বিমলকে ভালবাসে নাই, তবু বিমলের জন্য তার ভালবাসা সত্য হইয়া উঠিয়াছে। এ ঘরে আসিবারও কল্পনা তাহার ছিল না, তবুও এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘর ছাড়িয়া যাইতে তার ইচ্ছা হইতেছে না, এই বিছানায় শুইয়া দুটি শ্রান্ত চোখ বুঝিবার সাধ হইতেছে।

[পৃ. ৪৯৫, 'জীবনের জটিলতা', *মা. গ্র. ১*]

খ) ...একেবারে নাটকীয় প্রথায় প্রমীলা মূর্ছা গেল। তার মূর্ছাটা নাটকীয় নয়।

[পৃ. ৫২১, ঐ]

গ) কে জানে কেন, এ আশ্রমে কোন ব্যাপারে সকলের চেয়ে মাধবীলতার সাহসটাই সবচেয়ে বেশী হইতে দেখা যায়। বোধ হয় কোন কোন ব্যাপারে সে সকলের চেয়ে ভীরু বলিয়া।

[পৃ. ৬৩, 'অহিংসা', *মা. গ্র. ৪*]

ঘ) আশ্রম নির্জন, কিন্তু সে অনেক নরনারীর নির্জ্জনতা, আশ্রমের নিয়মে বাঁধা জীবন শান্ত, কিন্তু সে নিয়মও অসাধারণ, সে শান্তিও অসামান্য।

[পৃ. ৮৭, ঐ]

ঙ) সদানন্দের সংযম সত্যই অসাধারণ ছিল, কারণ তার মধ্যে সমস্তই প্রচণ্ড শক্তিশালী, অসংযম পর্য্যন্ত।

[পৃ. ১৫৩, ঐ]

৯. উপভাষা : উপন্যাসের গদ্যভাষার দুটি স্তর : অ) বর্ণনা; আ) সংলাপ। বর্ণনার গদ্যে মানিক সাধু বা চলতি রীতি প্রয়োগ করেছেন; কিন্তু সংলাপের গদ্যে মানিক কখনো প্রাচীন ধরনে সাধু রীতির ব্যবহার করেননি। সব সময়ই চলতি গদ্যই আশ্রয় করেছেন, কখনো-কখনো উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষাও। বস্তুত অসাধারণ সংলাপ-দক্ষতাই মানিকের অনেক চরিত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে। বাস্তবতা তাঁর আরাধ্য ছিল বলেই তিনি অনেক সময় চরিত্রের মুখে উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা বসিয়েছেন। কিন্তু আবার একমাত্র উপরতলের বাস্তবতা (surface reality) তাঁর লক্ষ্য ছিল না বলে, তিনি প্রয়োজনমতো উপভাষার ব্যবহার করেনওনি। মোটামুটি একই অঞ্চলের মানুষ নিয়ে লেখা হলেও *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬) ও *মাঝির ছেলে* (১৯৫৯) উপন্যাসের সংলাপে উপভাষা প্রযুক্ত হলেও *পুতুলনাচের ইতিকথা* (১৯৩৬) ও *সার্বজনীন* (১৯৫২) উপন্যাসে হয়নি। আত্মসচেতন শিল্পী মানিক *সার্বজনীন* উপন্যাসের ভূমিকায় লিখেছেন :

> এই উপন্যাসের পূর্ববঙ্গত্যাগী চরিত্রগুলির মুখে তাদের কথ্য ভাষা, এমনকি, বিশেষ টানটুকু দেবারও চেষ্টা করিনি। তার কারণ, এই উপন্যাসে আরও অনেক প্রধান চরিত্র আছে যারা ও ভাষায় কথা বলে না, যাদের কথায় ওরকম টান নেই। এক্ষেত্রে কতগুলি চরিত্রের মুখে স্বাভাবিক আঞ্চলিক ভাষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা টান দিলে চরিত্রগুলির মধ্যে একটা ভাগাভাগি এনে দেওয়া হত। / কোন কাহিনীতে দু'চারটি বিশেষ চরিত্রকে আঞ্চলিক ভাষার কথা বলানো যায়—তাতে চরিত্র ক'টির বৈশিষ্ট্য আরও স্পষ্ট ও স্বাভাবিক হয়। বিশেষ কাহিনীতে বিশেষ প্রয়োজনে ছাড়া চরিত্রগুলিকে মোট দুটি ভাগ ক'রে দুরকম আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলানো উচিত নয়—বিশেষ ক'রে চরিত্রগুলি যদি একই শ্রেণীর মানুষ হয়।

['লেখকের কথা', 'সার্বজনীন', *মা. গ্র.* ৯]

বর্ণনার মধ্যেও উপভাষার প্রয়োগ করে মানিক পরিবেশ ও চরিত্রকে জীবিত করে তুলেছেন :

ক) কাউয়াচিলা পাখিগুলি ক্রমাগত জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে।

[পৃ. ৯২, 'পদ্মানদীর মাঝি', *মা. গ্র.* ১]

খ) হ্, ময়নাদ্বীপ ব্যাপিয়া একদিন মানুষের জীবনের প্রবাহ বহিবে বলিয়া যে কাজে হোসেন হাত দেয় সেই কাজ খোদাতালা সফল করিয়া দেন।

[পৃ. ৯৪, ঐ]

গ) না? লইয়া যাইবে না কুবের? আই গো কুবেরের পাষাণ প্রাণ।

[পৃ. ১১৬, ঐ]

মানিক তাঁর উপন্যাসে পূর্ব বাংলা (*পদ্মানদীর মাঝি* ও *মাঝির ছেলে*) এবং চব্বিশ পরগনার (*চিন্তামণি*) আঞ্চলিক ভাষাই মূলত প্রয়োগ করেছেন।

১০. তির্যক গদ্যবাক্য : সরল ও যৌক্তিক বাক্যবন্ধের মধ্যে ঋজুতা ও জটিলতা সঞ্চার করেন যেমন মানিক, তেমনি কখনো-কখনো রচনা করেন তির্যকতাও। এই তির্যকতা—ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, ট্যারচা দৃষ্টিকোণ—এ-ও তাঁর জীবনদৃষ্টিরই অন্তর্গত। কয়েকটি উদাহরণ :

ক) গলির নাম জীবনময় লেন, দু পাশের বাড়ির চাপে বহুকাল জীবন ত্যাগ করিয়াছে—শবের মত শীতল।

[পৃ. ৪৩৯, 'জীবনের জটিলতা', *মা. গ্র.* ১]

খ) সকলেই তাহারা সমভাবে ধর্মের চেয়ে এক বড় অধর্ম পালন করে—দারিদ্র্য!

[পৃ. ৩২, 'পদ্মানদীর মাঝি', *মা. গ্র.* ১]

গ) বাগবাদা গাঁয়ের সেই যে মহেশ চৌধুরী, যার ছেলে বিভূতি গিয়াছে আসল সরকারী জেলে, যার দুটি মেয়ে গিয়াছে শ্বশুরবাড়ী নামক নকল সামাজিক জেলে, যার উপর রাজা সায়েবের ভয়ানক রাগ, আশ্রমে যে একেবারেই আমল পায় না, সুযোগ পাইলেই সকলের সামনে যাকে অপদস্থ করিবার জন্য সদানন্দকে বিপিন বিশেষভাবে বলিয়া রাখিয়াছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষটা সে একটু খাপছাড়া কিন্তু তুচ্ছ নয়।

[পৃ. ৫২, 'অহিংসা', *মা. গ্র.* ৪]

ঘ) কিন্তু পায়ে আছড়াইয়া পড়ার (তিন টাকা প্রণামী দেওয়ার পরেও) আর হাউহাউ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করার (প্রণামী—আড়াই টাকা) ফল দেখিয়া সকলের সাহস গেল।

[পৃ. ১৫৫, ঐ]

ঙ) মনুষ্যত্বকে অতিক্রম করিয়া, মানুষের নিজেকে জানিবার, নিজের আর বিশ্বের সমস্ত মানুষের মুক্তির পথ খুঁজিয়া পাওয়ার, একটা উপায়ের কথা যে শাস্ত্রে লেখা আছে, মহেশ চৌধুরীও তা জানে, আমিও জানি। তবে, শুধু লেখা আছে, এটুকুই আমরা দুজনে জানি।

[পৃ. ২০১, ঐ]

চ) চাকরী করবে, পার্টিতে থাকবে, বৌকে আনবে, আত্মীয়কে খুশী করবে, এ যে চারতলা জীবন হবে তার?—রাজা, গোলাম, বিবি এবং টেক্কার তাস দিয়ে গড়া জীবন!

[পৃ. ৪০৮, 'প্রতিবিম্ব', *মা. গ্র.* ২]

ছ) ভিজে চুপসে গিয়েও তারক তার আসনে অনড় অচল হয়ে বসে রইল। তার মনে হল, বাংলার জীবন যৌবন ধন মান কালস্রোতের বদলে শুধু জলস্রোতে ভেসে যাচ্ছে!

[পৃ. ৪১২, ঐ]

AMARBOI.COM

যে-তির্যকতা মানিকের গদ্যরীতির একটি বিশিষ্টতা, তা তাঁর জীবনদৃষ্টিরই জাতক। এ তথ্যটিও সতত স্মরণযোগ্য যে মানিকের ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, তির্যকতা কখনো লঘু চাপল্যের দৃষ্টান্ত নয়—সিরিয়াস দৃষ্টিভঙ্গিরই একটি প্রকাশ।

এখন, আমাদের বিবেচিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গদ্যচারিত্রের কেন্দ্রীয় লক্ষণগুলি এভাবে সংকলন করা যেতে পারে :

ক) সাধু ও চলতি দুই রীতিতেই মানিক গদ্য লিখেছেন। সাধু রীতি প্রথম পর্যায়ে, চলতি রীতি উত্তর পর্যায়ে। চলতি রীতিতে বেশি লিখলেও মানিকের কুশলতা সাধু রীতিতেই অধিক।

খ) নানা রকম গদ্য লিখেছেন মানিক। একেবারে প্রথম পর্যায়ে কাব্যিক গদ্য আর উপান্ত্য পর্যায়ে স্কেচধর্মী গদ্য। কিন্তু তাঁর সব পর্যায়ের গদ্যই চিন্তাশীল, গম্ভীর, পেশল, নিরাবেগ ও অনন্যমনস্ক গদ্য।

গ) রচনা করেছেন সরল বাক্যবন্ধ ও যৌক্তিক বাক্যবন্ধ। প্রথম পর্যায়ে দীর্ঘ বাক্যে অনেক সময় অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যাপক ব্যবহার করেছেন। আবার ঋজু গদ্যের পাশে তির্যক বাকভঙ্গির প্রয়োগও করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘ) কোনো-কোনো উপন্যাসে সংলাপে ও বর্ণনায় উপভাষা প্রয়োগ করেছেন স্থানিক বর্ণিমা ফোটানোর জন্যে; আবার সচেতনভাবে উপভাষার প্রয়োগ বর্জনও করেছেন।

ঙ) শব্দ প্রয়োগে শুচিবায়ুহীন। দেশি ও বিদেশি যে-কোনো প্রচলিত শব্দ ব্যবহারে অকুণ্ঠ; আবার সংস্কৃত, এমনকি স্বরচিত শব্দও প্রয়োগ করেছেন।

চ) প্রতীক, রূপক, উপমা ও উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগও তিনি করেছেন, কিন্তু বিরোধাভাস (oxymoron) তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ও উপযোগী অলংকার।

ছ) তাঁর উপন্যাসের গদ্যরীতি তাঁর জীবনদৃষ্টি ও উপন্যাসপ্রত্যয়ের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য যুক্ত।

রূপবন্ধন

> The novel must find a form that will hold together in some firm nexus of stracture the individual human being and the social being.
>
> [*The Craft of Fiction*: P. Lubbuck]

AMARBOI.COM

ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তা ও সামাজিক সত্তাকে দৃঢ় বন্ধনে বাঁধতে হয় উপন্যাসের রূপবন্ধনে। তার জন্যে উপন্যাসের রূপবন্ধন সাহিত্যের অন্যান্য মাধ্যমের চেয়ে আলাদা এক চারিত্র অর্জন করে যেমন, তেমনি ঔপন্যাসিকে-ঔপন্যাসিকে আবার ঐ রূপবন্ধন নিজস্ব রূপ পরিগ্রহ করে। আবার ঐ রূপবন্ধন উপন্যাসের অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িত বলেই প্রত্যেকটি উপন্যাসের রূপবন্ধের স্বাতন্ত্র্য রচিত হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বিষয় ও বক্তব্য যেমন তাঁর পূর্বজ ও সমকালীন লেখকদের থেকে এক স্বতন্ত্র নিজস্ব বিশিষ্টতায় অধিষ্ঠিত, তেমনি তাঁর রূপবন্ধন বা ফর্মও অন্যদের থেকে আলাদা। রবীন্দ্রনাথের কবিতাগ্রন্থগুলি যেমন পরস্পর সূত্রে যোজিত অথচ প্রত্যেকটি পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র, মানিকের উপন্যাসগুলিও তেমনি এক ধারাবাহিকতায় যুক্ত অথচ প্রত্যেকটি অন্যটি থেকে ভিন্ন। সেদিক থেকে তাঁর উপন্যাস (এবং গল্পের) যে-বিভাজন করে থাকেন সমালোচকেরা সেগুলি যথার্থ নয় এই অর্থে যে মানিক-মানস ক্রমচলিষ্ণু, তাঁর রচনাও। তাঁর উপন্যাসের রূপবন্ধনও এভাবে ক্রমশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবর্তিত হয়েছে। উপন্যাসের রূপবন্ধে তিনি সমকালীন ঔপন্যাসিক বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, ১৮৯৯-১৯৭৯)-এর মতো অক্লান্ত পরীক্ষাশীল। কিন্তু বনফুলের সঙ্গে মানিকের মৌল পার্থক্য এখানে যে বনফুলের উপন্যাস আঙ্গিকমুখ্য আর মানিকের উপন্যাস বিষয়মুখ্য। উপন্যাসে বিষয়, বক্তব্য ও রূপবন্ধন সমান গুরুত্ববহ; কিন্তু আলাদাভাবে রূপবন্ধনের কোনো মূল্য নেই। আসলে আধার ও আধেয় পরস্পরের শক্তিতেই মহার্ঘ হয়ে ওঠে। মানিকের উপন্যাসের বিষয়ের ও বক্তব্যের মহত্ত্বে, অভিনবত্বে ও জটিলতায় আমরা এমনই অভিভূত থেকেছি যে তার রূপবন্ধের দিকে আমাদের তেমন নজরই পড়েনি। মানিকের উপন্যাসের রূপবন্ধের আলোচনা তাই এত কম।

আমরা এখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের রূপবন্ধনের কয়েকটি প্রধান চারিত্রলক্ষণ নির্ণয় করব।

ক) পুরুষ-চরিত্র-প্রধান : মানিকের উপন্যাস পুরুষ-চরিত্র-প্রধান বা নায়ক-প্রধান। এমনিতে তিরিশের উপন্যাসের একটি চারিত্রলক্ষণই এই। মানিকও তার ব্যতিক্রম নন।[১২] হেরম্ব (*দিবারাত্রির কাব্য*), কুবের (*পদ্মানদীর মাঝি*), শশী (*পুতুলনাচের ইতিকথা*), বিমল (*জীবনের জটিলতা*), ভূপেন (*ধরা-বাঁধা জীবন*), তারক (*প্রতিবিম্ব*), কৃষ্ণেন্দু (*দর্পণ*), রাখাল (*সোনার চেয়ে দামী*), শুভ (*ইতিকথার পরের কথা*), রাজকুমার (*চতুষ্কোণ*), কেশব (*আরোগ্য*), কালাচাঁদ (*হরফ*)—এরাই মানিকের বাণী বহন করেছে। এদের কিছু সামান্য সাধর্ম্য আছে: এরা মূলত গম্ভীর, সিরিয়াস, চিন্তাশীল, সন্ধিৎসু, কর্মময়, দায়িত্বশীল ও সংগ্রামশীল। শ্যামা (*জননী*) ও চিন্তামণি (*চিন্তামণি*)—মাত্র দুটি উপন্যাসে এই দুটি নারীচরিত্র প্রাধান্য পেয়েছে।[১৩] মূলত ঐ পুরুষ চরিত্রগুলির সংগ্রাম ও সন্ধান এক-একটি উপন্যাসের আয়তনে রূপ পেয়েছে।

খ) নিরুদ্দিষ্ট চরিত্র : উপন্যাস জীবনের নিকটতম শিল্পকলা বলেই জীবনের প্রতিরূপ বহনের দায় তার সবচেয়ে বেশি। জীবনে আমাদের এমন অনেক মানুষের দেখা এমনকি ঘনিষ্ঠতা হয় যাদের সঙ্গে পরবর্তীকালে আর কোনো দিনই আমাদের দেখা হবে না। কিন্তু উপন্যাসে আমরা সব সময়ই চরিত্রদের 'গতি ও পরিণতির সম্পূর্ণতা' দেখতে অভ্যস্ত *পুতুলনাচের ইতিকথায়* (১৯৩৬) মানিক ঐ অভ্যাসের যান্ত্রিক গতানুগতি ভেঙে মতি-কুমুদের চরিত্র সৃষ্টি করেও তাদের পরিণাম ও সম্পূর্ণতা আর দেখাননি, উপন্যাস থেকেই তারা হারিয়ে গিয়েছিল। প্রথমবারের মতো নিরুদ্দিষ্ট চরিত্র সৃষ্টির দাবি মানিক নিজেই করেছেন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপন্যাস লেখার পুরানো একটি রীতি অথবা নীতি আজও অনেকে আঁকড়ে আছেন—সেটা এই যে উপন্যাসে কোন চরিত্র আনলে তার একটা গতি ও পরিণতির সম্পূর্ণতা দিতেই হবে। শেষ পর্যন্ত মানুষটার কি হল। / আমার প্রথম উপন্যাস[১৪] "পুতুলনাচের ইতিকথা"য় আমি প্রথম এই নিয়ম ভঙ্গ করি। / কয়েকটি ছোটখাট চরিত্রের বেলা তো বটেই, দুটি প্রধান চরিত্র মতি ও কুমুদের বেলাতেও কুমুদের সঙ্গে মতিকে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়ে সেইখানে ছেদ টেনেছিলাম—লিখেছিলাম যে সন্তানের প্রয়োজনে হয়তো ওদের কোনদিন নীড় বাঁধার প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু সেটা ভিন্ন কাহিনী, দরকার হলে ভিন্ন কাহিনী লিখে সে কাহিনীকে রূপ দেব।

['লেখকের কথা', 'শুভাশুভ', *মা. গ্র.* ১০]

গ) অজস্র চরিত্র : উপন্যাস স্বভাবত সমগ্রসন্ধানী বলে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রদের বাইরেও অনেক চরিত্রের ভিড় জমে। মানিকের প্রথম দিকের উপন্যাসে—*জননী, পদ্মানদীর মাঝি, পুতুলনাচের ইতিকথা* ইত্যাদিতে—অনেক মানুষই এসেছে। কিন্তু তাঁর উপান্ত্য উপন্যাসসমূহে অজস্র চরিত্রের ভিড় চোখে না-পড়ে পারে না। এটি লেখকের একটি সচেতন প্রয়াসই। তার সাক্ষ্য দেবে লেখকের এই উক্তি :

আমার বিশ্বাস, প্রধান নায়ক ও নায়িকাদের প্রধান করে বজায় রেখেও সংশ্লিষ্ট আরও অনেক চরিত্র আমদানি করলে উপন্যাসের শ্রেণীগত সামাজিক বাস্তবতা রূপায়ণে সাহায্য হয়।

['লেখকের কথা', 'শুভাশুভ', *মা. গ্র.* ১০]

AMARBOI.COM

কেবল শেষ-পর্যায়ের একটি উপন্যাসের চরিত্রদের তালিকা প্রণয়ন করলে বোঝা যাবে মানিক কী করতে চাচ্ছিলেন। *জীয়ন্ত* (১৯৫০) উপন্যাসের চরিত্র : পাকা (প্রকাশ রায়)। ভৈরবচন্দ্র (রায়বাহাদুর)। পাঁচু। কানাই। নরেশ। তিনু। ভুবন। অনন্তলাল। কালীনাথ। অমিতাভ। সুধা (সুধাময়ী)। সুরেন। অনুরাধা। মায়া। ছায়া। খুকী। এম. এন. ঘোষাল (রায়বাহাদুর)। নারায়ণ। ভবতোষ। ডাক্তার রায়চৌধুরী। নরেন দস্তিদার। চপলা। প্রতিমা। হরেন। ধনদাস। জ্ঞানদাস। সুব্রতা। শ্যামল জানা। সরমা। অরবিন্দ। জয়শ্রীতিলক। কার্লটন। হার্টলি। ইন্দ্র চক্রবর্তী। মহম্মদ আলী আবদুরী। গণেশ। দুকলি। হেমন্ত। নকুল দাস। মধু ভটচাজ। বসন্ত।

ঘ) নায়ক পরিবর্তন : মানিক এই অভিনব কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন। *জীয়ন্ত* (১৯৫০) উপন্যাসের নায়ক ছিল পাকা। মধ্যবিত্ত এই নায়ক সরে দাঁড়ালে তার স্থান দখল করে, উপন্যাসের শেষে, পাঁচু। উপন্যাসের প্রসঙ্গ ও প্রকরণ যে অবিচ্ছেদ্য, নতুন আইডিয়াই যে নতুন আঙ্গিকের জনক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলাদাভাবে আঙ্গিক যে মূল্যহীন, তার প্রমাণ মানিকের বিশ্বাসই তাঁর উপন্যাসের রূপবন্ধনে এরকম একটি আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটায়। ঔপন্যাসিকের প্রত্যয়ই তাঁর উপন্যাসপ্রত্যয়।

ঙ) জনতাই নায়ক : *চিহ্ন* (১৯৪৭) এই উপন্যাস কোনো ব্যক্তির ইতিবৃত্ত নয়। ১৯৪৫ সালের ২১-২৩ নভেম্বর কলকাতায় ছাত্র আন্দোলন হয় আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীদের মুক্তির দাবিতে। এটাই এ উপন্যাসের পেক্ষাপট। ঘটনার বিলোড়নে অনেক মানুষের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াই ধরে রেখেছেন মানিক। জনতাই নায়ক হয়ে উঠেছে এই উপন্যাসে।

চ) কবিতার ব্যবহার : দুটি উপন্যাস *দিবারাত্রির কাব্য* (১৯৩৫) ও *ছন্দপতন*-এ (১৯৫১) কবিতার ব্যবহার আছে। (কবিতার কলাকৌশলের ব্যবহারও মানিক করেছেন।)[১৫] দুটি উপন্যাসে কবিতার ব্যবহার দুরকম : *দিবারাত্রির কাব্য* প্রথম রচনা ও প্রকাশকালে কবিতা ছিল না, পরবর্তীকালে উপন্যাসের তিনটি অংশের জন্য তিনটি কবিতা যোজিত হয়েছে (আমাদের বিবেচনায় এই কবিতাত্রয়ের সঙ্গে উপন্যাসের আত্মার যোগ সাধিত হয়নি)[১৬]; কিন্তু *ছন্দপতন*-এর নায়ক নবনাথ রায় নিজেই কবি, সুতরাং ঐ উপন্যাসে কবিতার ব্যবহার স্বতঃস্ফূর্ত এবং চরিত্র বিকাশেরই স্বাভাবিক প্রয়োজনে।

ছ) পত্রের ব্যবহার : *চিন্তামণি* (১৯৪৬) উপন্যাসে চিন্তামণির দিদির ছয়টি পত্র (শেষ পত্রটি অসম্পূর্ণ) ব্যবহৃত হয়েছে। উপন্যাসের শুরু ও শেষ চিন্তামণির দিদির পত্রেই। এই পত্রগুলি কোনো শৌখিন আঙ্গিকবিলাস থেকে আসেনি—উপন্যাসের সর্বাত্মক বিনষ্টির চেতনার সঙ্গেই অনুস্যূত। পত্ররচয়িত্রী পরোক্ষে থেকেও উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র।

জ) ছোটো উপন্যাস : মানিক কয়েকটি ছোটো উপন্যাস[১৭] লিখেছিলেন : *জীবনের জটিলতা* (১৯৩৬), *ধরা-বাঁধা জীবন* (১৯৪১), *প্রতিবিম্ব* (১৯৪৩), *চিন্তামণি* (১৯৪৬) প্রভৃতি। *জীবনের জটিলতা* ও *ধরা-বাঁধা জীবন* অনেকখানি ব্যক্তিবৃত্তায়িত; *প্রতিবিম্ব* ও *চিন্তামণি* সমাজবলয়িত। প্রথম উপন্যাস দুটিতে ব্যক্তিজীবনের ঘূর্ণি উঠেছে; *প্রতিবিম্ব* উপন্যাসের কেন্দ্রীয় দোলকটি ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে দোলায়িত থেকেছে; *চিন্তামণি* উপন্যাসজুড়ে আছে সামাজিক সংকট। তবে সব উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রই—বিমল, ভূপেন, তারক বা চিন্তামণি (কিংবা গৌর)—বিশ্লেষিত হয়েছে। এবং সব-মিলিয়ে এই ছোটো উপন্যাসগুলি পরিপূর্ণ উপন্যাসেরই স্বাদ সঞ্চার করেছে।

ঝ) কাহিনীর ক্রমপ্রসারণ : মানিক তাঁর *সহরবাসের ইতিকথা* (১৯৪২) উপন্যাসের প্রবেশকে জানিয়েছেন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> এই সোজা কথাটা সব লেখকই জানেন যে কোন চরিত্রের বিকাশ বা কাহিনীর গতি এমন জায়গায় থামানো চলে না যাতে প্রশ্ন জাগে : তারপর কি হল? গতিটা কোন পরিণতির দিকে এটুকু অন্তত ধরিয়ে দিতেই হবে—যাতে ধারাটা কল্পনা করে অনুভব করে নেওয়া সম্ভব হয়।
>
> ['লেখকের কথা', 'সহরবাসের ইতিকথা', *মা. গ্র.* ৫]

অর্থাৎ চরিত্র ও কাহিনীর সম্পূর্ণতা সাধন ঔপন্যাসিককে করতে হয় শিল্পের নিয়মেই। জীবন স্বভাবত বিশৃঙ্খল; শিল্প সেই বিশৃঙ্খলাকে একটি বিন্যাস বা শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসে। কাজেই উপন্যাসশিল্পীকে চরিত্র বা কাহিনীর এক-ধরনের সম্পূর্ণতা সাধন করতেই হয়।[১৮] সেজন্যেই উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদ অতি গুরুত্বপূর্ণ। সেখানেই বৃত্তধর্মী না-হয়েও চরিত্র ও কাহিনীর এক-ধরনের সম্পূর্ণতা সাধন ঔপন্যাসিককে করতে হয়, আর তার ভিতর থেকেই বেরিয়ে আসে লেখকের দৃষ্টিকোণ বা বক্তব্য। এজন্যেই অনেক সময় শেষ পরিচ্ছেদটি স্ফীত হয়ে ওঠে। যেমন, *পদ্মানদীর মাঝির* কাহিনী শেষ পরিচ্ছেদে যেন মোহানায় এসে পড়েছে। প্রথম ছয়টি পরিচ্ছেদের মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭৬; আর একমাত্র সপ্তম বা শেষ পরিচ্ছেদেরই পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫৫।

বৃহৎ এই পরিচ্ছেদটিকে অন্তত ৮টি অংশে সহজেই অন্তর্বিভক্ত করা যায়। এই পরিচ্ছেদের সূচনায় 'মাঝিগিরিই সে করিবে সন্দেহ নাই, তবু গম্ভীর চিন্তিত মুখে অন্য কিছু করা যায় কিনা ভাবিতে কুবের চিরদিন বড় ভালবাসে।' (পৃ. ৭৯, 'পদ্মানদীর মাঝি', *মা. গ্র.* ১) আসলে অন্তিমে 'অন্য কিছু' (মাঝির কৃষকে পরিণতি) করারই ইঙ্গিতে শেষ হয়। জীবিকা পরিবর্তনের এই ইতিহাস মানিকের অনেক উপন্যাসেই আছে। *পুতুলনাচের ইতিকথার*ও (১৯৩৬) ত্রয়োদশ বা শেষ পরিচ্ছেদটির পৃষ্ঠাসংখ্যা (৩১) অন্য পরিচ্ছেদগুলির চেয়ে বেশি—কেননা কাহিনী এখানে স্ফারিত এবং একটি সমগ্র-পরিণতির দিকনির্দেশ করেছে।

ঞ) উপকাহিনী : মানিকের কোনো-কোনো উপন্যাসে কেন্দ্রীয় কাহিনীর পাশে উপকাহিনী জায়গা করে নিয়েছে। বৃহৎ উপন্যাসে অনেক সময় মূল কাহিনীর পাশে শাখাকাহিনী-উপকাহিনী মিলে একটি জনপদ বা জনজীবনকে প্রকাশ করা হয়।[১৯] মানিকের উপান্ত্য-পর্যায়ী উপন্যাসে যে-অসংখ্য চরিত্রকেন্দ্রিক কাহিনীর রেখাভাস আছে, সে-ধরনের উপন্যাসের কথা বলা হচ্ছে না। আমাদের লক্ষ্য *পুতুলনাচের ইতিকথার* (১৯৩৬) মতো উপন্যাস, যেখানে কেন্দ্রীয় কাহিনীর পাশে অন্তত পাঁচটি যুগ্ম জীবনের ধারা রয়েছে : ক) মতি-কুমুদ; খ) যাদব-পাগলাদিদি; গ) যামিনী কবিরাজ-সেনদিদি; ঘ)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিন্দু-নন্দলাল; ঙ) জয়া-বনবিহারী। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই উপন্যাসের দুটি পরিচ্ছেদ (১০ ও ১১) সম্পূর্ণতই মতি-কুমুদের কাহিনী বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়েছে।

ট) পরিচ্ছেদহীন কাহিনীস্রোত: মানিক সাধারণত পরিচ্ছেদ-বিভক্ত কাহিনী রচনা করেন। কিন্তু *চতুষ্কোণ* (১৯৪৮) উপন্যাসে পরিচ্ছেদ বিভাজন বর্জন করে মানিক পরিচ্ছেদহীনভাবে কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এর একটি কারণ, এই উপন্যাসে মানিকের লক্ষ্য ছিল রাজকুমারের মনোলোকের একটি বিশেষ অবস্থা ও মেজাজের উন্মোচন।

ভূমিকায় মানিক নিজেই লিখেছেন :

> রাজকুমার একটু বেলুনের মত ফুলে ফেঁপে উঠেছে, কিন্তু তাতে আসবে যাবে কি? আমার উদ্দেশ্যও তাই ছিল।

['ভূমিকা', 'চতুষ্কোণ', *মা. গ্র.* ৬]

বেলুনের মতো ফুলে-ফেঁপে ওঠা মানে রাজকুমারের জীবনযাপন ও ভাবনা-বেদনার আর-সমস্ত বাদ দিয়ে শরীরের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ নির্ণয়ের একটি পরীক্ষাতেই উপন্যাসটি নিবিষ্ট হয়েছে। যেন রাজকুমারের আর-সমস্ত বাদ দিয়ে ঐ মানস-অবস্থাটিকে আকার-বর্ধক কাচের নিচে রেখে দেখানো হয়েছে। বিষয় ও বিন্যাসের অবিচ্ছেদের কারণেই এই উপন্যাসে প্রচলিত পরিচ্ছেদ-বিভাজন বর্জিত হয়েছে। পরিচ্ছেদহীন প্রবহমানতায় রাজকুমারের মানস-অবস্থা বিবৃত হয়েছে।

AMARBOI.COM

ঠ) সমান্তরাল বা প্যারালাল কাহিনী: *হলুদ নদী সবুজ বন* (১৯৫৬) উপন্যাসের ১৪-সংখ্যক পরিচ্ছেদটি সম্পূর্ণই উদ্ধারযোগ্য :

> একবার লিখছি ঈশ্বর, গৌরী, আজিজ, শান সায়েব, ফুলজান, মন্টা, সাধুদের কাহিনী আবার আসছি প্রভাস, বনানী, ইভা, রবার্টসনদের কথায়। / ঈশ্বরের কাঁচা ঘর, লক্ষ্মণের খেয়াঘাট, উড়িয়া মালী আর অহল্যায় মিলে মিশে প্রভাসের বাগানটিকে এমন করার প্রাণপণ সাধনা যে কোনো সায়েবের বাগান তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না, ক্লাবে সন্ধ্যার দিকে নাচ, গান, হাসি, আনন্দ, তাস, বিলিয়ার্ড খেলা—বেশি রাত্রে হৈ-হুল্লোড়। / একেই কি বলে প্যারালাল মানে সমান্তরাল কাহিনী? বুদ্ধি খাটিয়ে চালাকি করে উচ্চ, মধ্য এবং নিম্ন অর্থাৎ চাষী মজুরদের হাজির করে ছক কাটা গল্প রচনা করা? / এতকাল সাহিত্যচর্চা করে আমার কাণ্ডজ্ঞান তাহলে নিশ্চয় লোপ পেয়েছে বলতে হবে! / শ্রেণীবিভক্ত জীবন কোনো দেশে কস্মিনকালে প্যারালাল বা সমান্তরাল ছিল না, এখনও নেই, সোনার পাথরের বাটির মতোই সেটা অসম্ভব ব্যাপার। / কথাটা ভুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> বোঝা সম্ভব—আরও স্পষ্ট করার চেষ্টা করি। আমি বলছি জীবনের কথা। শ্রেণীতে শ্রেণীতে ভাগ হয়ে হয়েও একত্র সংগঠিত সমগ্র সমাজের কথা। সমান্তরাল কাহিনী খুবই সম্ভব, একটু কায়দা করে বানিয়ে লিখলেই হলো—কিন্তু সম্পর্কহীন সমান্তরাল জীবন? / ঈশ্বর, আজিজরা থাকে এক স্তরে, প্রভাস, রবার্টসনরা আরেক স্তরে। তাই বলে জীবন কি তাদের সম্পর্কহীন? / পরস্পরকে বাদ দিয়ে তাদের কারো জীবনযাত্রা সম্ভব? / সম্পর্ক কি শুধু প্রেমে হয়! সংঘাত সম্পর্ক নয়?
>
> [পৃ. ১২১, 'হলুদ নদী সবুজ বন', *মা. গ্র.* ১১]

হলুদ নদী সবুজ বন উপন্যাসের মোট ১৭টি পরিচ্ছেদের মধ্যে এই ১৪-সংখ্যক পরিচ্ছেদটি পুরোটাই লেখকের উপন্যাস-বিশ্লেষণ। মানিক নিজেই এখানে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, এই উপন্যাস পাশাপাশি দুই শ্রেণীর—উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের—কাহিনী। এবং এদের সম্পর্ক প্রেমে নয়—সংঘাতে।

ড) পূর্বাভাসদ্যোতক অসংযুক্ত কাহিনী : *জীবনের জটিলতা* (১৯৩৬) উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদটি মূল কাহিনীর সঙ্গে অযুক্ত : উপন্যাসের প্রধান দুই চরিত্র, দুই ভাই-বোন, বিমল ও প্রমীলার বাল্যকালের একটি চিত্র। কেন এটি যুক্ত করেছেন মানিক? মূল উপন্যাসে বিমল ও প্রমীলার যৌবনের কাহিনীই স্থান পেয়েছে। মানিক ঐ প্রথম পর্যায়ে ফ্রয়েডীয় ভাবনায় আচ্ছন্ন। আমাদের জীবনের সমস্ত জট শৈশবে-কৈশোরেই প্রোথিত—এই ফ্রয়েডীয় ভাবনাই এখানে কাজ করেছে। সেদিক থেকে ঐ প্রথম পরিচ্ছেদটি পুরো উপন্যাসের ছোটো একটি দর্পণের মতো।

ঢ) লেখকের মন্তব্য : *অহিংসা* (১৯৪১) উপন্যাসে ৬ জায়গায় 'লেখকের মন্তব্য' প্রযুক্ত হয়েছে। উপন্যাসের ভিতরে-ভিতরে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে লেখক এই মন্তব্যগুলি যোজনা করেছেন। প্রাবন্ধিক বা সমালোচনাত্মক এই মন্তব্য বা বক্তব্যগুলিতে লেখকের বিশ্লেষণ ও দার্শনিকতা ফুটে উঠেছে।[২০] মূলত এখানে লেখকের লক্ষ্য ছিল সংক্ষিপ্তি :

> ১. ভাবিয়া দেখিলাম, গল্পের মধ্যে ইঙ্গিতে পরিস্ফুট করিয়া তোলার পরিবর্তে মাধবীলতা সম্বন্ধে সদানন্দের আবিষ্কার ও মনোভাব পরিবর্ত্তনের কথাটা আমার বলিয়া দেওয়াই ভাল। সংক্ষেপে বলাও হইবে, নীরস অশ্লীলতার ঝাঁঝও এড়ানো চলিবে। সদানন্দের ধারণা হইয়াছিল, মেয়েটি ভাল নয়। মাধবীলতার প্রতিবাদহীন আত্মদান এই ধারণাকে সমর্থনও করিত। কিন্তু সদানন্দ জানিতে পরিল, মাধবীলতা কুমারী।
>
> [পৃ. ৩০, 'অহিংসা', *মা. গ্র.* ৪]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. মহেশ চৌধুরীর এই অস্পষ্ট আর অসমাপ্ত চিন্তাকে মহেশ চৌধুরীর চিন্তার শক্তি ও ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া স্পষ্টতর করিয়া তুলিতে গেলে অনেক বাজে বকিতে হইবে, সময়ও নষ্ট হইবে অনেক। আলপিন ফুটাইয়া খাঁড়ার পরিচয় দেওয়ার চেয়ে মন্তব্যের এই ভোঁতা ছুরি বেশি কাজে লাগিবে মনে হয়।

[পৃ. ২০১, ঐ]

মানিক যে অশিক্ষিতপটু ছিলেন না, তীব্রভাবেই আত্মসচেতন ছিলেন, এবং তাঁর দৃষ্টি ভবিষ্যতেও প্রসারিত ছিল, তার একটি সাক্ষ্য রয়েছে *অহিংসা* উপন্যাসে :

> কে জানে এমন একদিন আসিবে কি না, যে দিন কেহ আমার এই উপন্যাসটি পড়িতে বসিয়া প্রথম লাইনটি পড়িয়া ভাবিতে আরম্ভ করিবে, লাইনটির যে অর্থ মনে আসিয়াছে তাই কি ঠিক, অথবা প্রত্যেকটি শব্দের আর প্রত্যেকটি অক্ষরের অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া, ব্যাকরণের নিয়মকানুনগুলি ভাল করিয়া ঘাঁটিয়া, শব্দতত্ত্ব আর ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করিয়া লাইনটির মানে যাচাই করা উচিত?

[পৃ. ১৮৪, ঐ]

ণ) সর্বজ্ঞ ভূমিকায়-একক ভূমিকায় : মানিক তাঁর উপন্যাসে সাধারণত লেখকের সর্বজ্ঞ ভূমিকায় অবতীর্ণ। *ছন্দপতন* (১৯৫১) উপন্যাসেই কেবল তিনি উত্তম পুরুষে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। তাহলেও, দেখা যাচ্ছে, কাহিনী কথনের এই দুই রীতিই তিনি ব্যবহার করেছেন : ক) সর্বজ্ঞ লেখকের ভূমিকায় এবং খ) একক ভূমিকায়।

AMARBOI.COM

ত) গল্প থেকে উপন্যাস : ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হয় মানিকের তৃতীয় গল্প 'ব্যথার পূজা' (*বিচিত্রা*, ভাদ্র ১৩৩৬)। মানিকের প্রথম পর্যায়ের গল্পের[২১] রোমান্সরক্তিমা ছিল এই গল্পেও। *তেইশ বছর আগে পরে* (১৯৫৩) উপন্যাসে মানিক এক অভিনব রূপবন্ধন রচনা করেন।[২২] 'ব্যথার পূজা' গল্পটি উপন্যাসের প্রথমে স্থাপন করে, উপন্যাসের পরবর্তী অংশে মানিক ব্যবহার করেন বিশুদ্ধ বাস্তব—রোমান্স-ভাঙা বাস্তব।

থ) উপন্যাস থেকে গল্প : ১৯৫২ সাল নাগাদ মানিক আবিষ্কার করেন উপন্যাস থেকে ছোটোগল্প তৈরি করবার একটি কুশলতা। 'সাহিত্যের কানমলা' (*মাসিক বসুমতী*, শারদীয়া ১৯৫৩) প্রবন্ধে এই বিষয়টির বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন। ঐ রচনা থেকে একটি অনুচ্ছেদ :

> গত বছরের কথা। "আরোগ্য" উপন্যাসটি লিখছিলাম। পূজা আসছে। বইটা লিখতে লিখতে খেয়াল হলো, এই উপন্যাসটিতেই তো সুন্দর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েকটি গল্প রয়েছে। প্রায় একেবারে তৈরি গল্প—একটু অদল-বদল ঘষা-মাজা করলেই সত্যিকারের গল্প হয়ে যাবে। প্রায় তৈরি দু-তিনটি গল্প ছাড়াও গল্প আছে, তবে একটাকে নতুন করে ঢেলে সেজে নিতে হবে—নইলে উপন্যাসের গন্ধ ছড়াবে গা থেকে।

['সাহিত্যের কানমলা', *মা. গ্র.* ১২]

ঐ প্রবন্ধেও তিনি তাঁর স্বভাবশোভনভাবে যুক্তিশীল, আবেগের উন্মাদনায় ভেসে যান না। তাই তাঁর এরকম বিশ্লেষণী কাণ্ডজ্ঞান : 'কোন উপন্যাসে ছোট গল্প থাকে কোন উপন্যাসে থাকে না।' ১৯৫২-৫৬ : এই পাঁচ বছরে মানিক উপন্যাস থেকে বের করে এনে অনেকগুলি গল্প প্রণয়ন করেন। যুগান্তর চক্রবর্তী উপন্যাস থেকে প্রণীত গল্পের যে-তালিকা তৈরি করেছেন, তার সারাৎসার[২৩] এখানে মুদ্রিত হলো :

গল্প	উপন্যাস
১. মীমাংসা	পাশাপাশি
২. বাহিরে ঘরে	সার্বজনীন
৩. শিল্পী	আরোগ্য
৪. লেভেল ক্রসিং	আরোগ্য
৫. চিকিৎসা	আরোগ্য[২৪]
৬. বড়দিন	হলুদ নদী সবুজ বন
৭. সশস্ত্র প্রহরী	হলুদ নদী সবুজ বন
৮. প্রাক-শারদীয় কাহিনী	হলুদ নদী সবুজ বন
৯. মানুষ হতবাক নয়	মাশুল
১০. হাসপাতালে	প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান
১১. বিচার	শান্তিলতা
১২. শান্তিলতার কথা	শান্তিলতা
১৩. দুর্ঘটনা	শান্তিলতা
১৪. ঘাসে কত পুষ্টি	আশালতা[২৫]

'ঘটনা-প্রধান' আর 'চরিত্র-প্রধান' উপন্যাসের তফাত নির্ণয় করেছিলেন মানিক। উপন্যাস থেকে গল্প প্রণয়নের কৌশলও এই দুই ধরনের উপন্যাসের ভিতরে আছে বলে মানিক ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

মানিকের উপন্যাসের রূপবন্ধনের এই আলোচনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি, ঔপন্যাসিক মানিক তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তুর মধ্যে যেমন বিপুল বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনি উপন্যাসের রূপবন্ধনও তাঁর বিপুল

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিচিত্র। মানিকের উপন্যাসের আলোচনা প্রায় সব সময় বিষয়কেন্দ্রিক বলেই তাঁর রূপবন্ধনের ঐ বিপুল বিচিত্রতা অনেক সময় সমালোচকের চোখ এড়িয়ে গেছে। আর তাঁর রূপবন্ধনের প্রসঙ্গে এই তথ্যটি সতত স্মরণীয় যে মানিক যেমন জানতেন যে 'উপন্যাসের রকমভেদ' হয় তেমনি তাঁর জানা ছিল যে উপন্যাসের 'রকমভেদের জন্য আঙ্গিকভেদ হয়' (উদ্ধৃতি বাক্যাংশগুলি 'সাহিত্যের কানমলা' প্রবন্ধ থেকে)। অর্থাৎ উপন্যাসের রূপবন্ধন স্বতন্ত্র কোনো উপন্যাসের উপকরণ নয়, তা সদাসর্বদা বিষয়ের সঙ্গেই একাত্ম।

তথ্যনির্দেশ

১. পৃ. ৪, *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড) : ক্ষেত্র গুপ্ত।
২. পৃ. ১১, *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড) : ক্ষেত্র গুপ্ত।
৩. 'উপন্যাসের ভাষা' : অমিয়ভূষণ মজুমদার, *বাংলা গদ্যজিজ্ঞাসা*।
৪. 'মানিক জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সাধু ভাষাকে আঁকড়ে ছিলেন, কথ্য বা চলিত রীতিতে লিখেছেন কদাচিৎ।' ('বাংলা উপন্যাসের ভাষাশিল্প', *চতুরঙ্গ*, নারায়ণ চৌধুরী)
৫. 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। *পরিচয়*, কার্তিক ১৩৪৭।
৬. 'মানিক-প্রতিভা', গোপাল হালদার। *পরিচয়*, পৌষ ১৩৬৩।
৭. 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গদ্যরীতি', চিত্রা দেব।
৮. 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', বুদ্ধদেব বসু। প্রথম প্রকাশ: *কবিতা*, পৌষ ১৩৬৩। পরবর্তীকালে লেখকের *স্বদেশ ও সংস্কৃতি* গ্রন্থে গৃহীত।
৯. পৃ. ৬০, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*: সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১০. শরৎচন্দ্রের উক্তি: 'আমি ঘন ঘন ইয়া ব্যবহার এড়াইতে চাই। কিন্তু অনেক স্থলে নিরুপায় হয়ে ব্যবহার করি—অনেক স্থলে অনবধানতাও যে নেই তা নয়—বাক্যগুলি ভেঙে ছোট করে নিলেই চলে।'
১১. বিরোধাভাস বা oxymoron-এর ব্যবহার মানিকের সমকালীন কবি জীবনানন্দ দাশেও আছে। যেমন, 'ক্লান্ত ক্লান্তিহীন', 'অসম্ভব বেদনার সঙ্গে মিশে রয়ে গেছে অমোঘ অমোঘ।'
১২. '...শরৎচন্দ্রের স্ত্রী-চরিত্র-প্রাধান্য এবং কল্লোল-পন্থীদের নেতিভিত্তিক উন্মূল যুবকদের প্রসঙ্গ পরিহার করে তিরিশের উপন্যাস আবার বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ধারা বহন করে পুরুষ-চরিত্র-প্রধান হয়ে উঠেছে।' [পৃ. ২৮৪, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়]
১৩. *চিন্তামণি* উপন্যাসেরও প্রথম নাম ছিল *রাঙামাটির চাষী*। ঐ দিক থেকে লেখকের প্রধান লক্ষ্য গৌরই ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৪. স্পষ্টতই এটি লেখকের স্মৃতিবিভ্রম।

১৫. বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে বর্তমান পরিচ্ছেদের 'গদ্য' চিহ্নিত অংশে। রূপবন্ধনের বিবেচনায় ভাষা তথা গদ্য প্রসঙ্গও এসে পড়ে। উপর্যুক্ত অংশে তার আলোচনা হয়েছে বলে এখানে বর্জিত হলো। কেবল তার সঙ্গে এটুকু যোগ করি: স্বগতকথন (interior monologue)ও মানিক প্রয়োগ করেছিলেন:

কুসুম নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটবাবু?

শরীর! শরীর!

তোমার মন নাই কুসুম?

[পৃ. ৯৩, 'পুতুলনাচের ইতিকথা', *মা. গ্র.* ৩]

১৬. 'দিবারাত্রির কাব্য' পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১৭. ছোটো উপন্যাস বা নভেলার আয়তন ছোটোগল্প ও উপন্যাসের মাঝামাঝি। ছোটোগল্পে সাধারণত একটি চরিত্র এবং সেই চরিত্রের আকস্মিক উন্মীলন (জেমস জয়েস-কথিত 'epiphany') দেখানো হয়; ছোটো উপন্যাসে লেখকের লক্ষ্য থাকে চরিত্রের বিকাশ। উপন্যাসে থাকে বৃহৎ পটভূমি, অনেক চরিত্র, বিস্তারিত একটি সময়পরিসর; ছোটো উপন্যাস তুলনামূলকভাবে অপেক্ষাকৃত অল্পপরিসর, অল্প কয়েকটি চরিত্র এবং দ্রুতধাবমান পরস্পরসংযুক্ত ঘটনাবলি। সুতরাং ছোটো উপন্যাসের শিল্পকুশলতায় ছোটোগল্পের সংক্ষিপ্তির সঙ্গে উপন্যাসের চরিত্রবিকাশের একটি সহাবস্থান ঘটাতে হয়। ছোটো উপন্যাসে 'কাহিনীর শাখায়িত বিস্তার থাকে না বটে কিন্তু সমস্যার ক্রমিক বিকাশ ও পরিণতির মুখ্য স্তরগুলি অব্যাহত রাখা হয়, প্রধান চরিত্রের লক্ষ্যকেন্দ্রগুলি বিশ্লেষিত হয়।' (পৃ. ২৫, *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড: ক্ষেত্র গুপ্ত) খ্যাতিমান ছোটো উপন্যাস-রচয়িতাদের মধ্যে আছেন টমাস মান (১৮৭৫-১৯৫৫), লিও টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০), হেনরি জেমস (১৮৪৩-১৯১৬), ফ্রানৎস কাফকা (১৮৮৩-১৯২৪), হেরমান মেলভিল (১৮১৯-৯১), আঁদ্রে জিদ (১৮৬৯-১৯৫১), আলবেয়ার কাম্যু (১৯১৩-৬০), ডি. এইচ. লরেন্স (১৮৮৫-১৯৩০) প্রমুখ। দস্তয়েভস্কির *নোটস ফ্রম দি আন্ডারগ্রাউন্ড*, হেমিংওয়ের *দি ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি*, টমাস মানের *ডেথ ইন ভেনিস*, ডি. এইচ. লরেন্সের *দি ওম্যান রোড অ্যাওয়ে*, ভার্জিনিয়া উলফের *বিটউইন দি অ্যাকটস*, কাফকার *মেটামরফসিস* বিখ্যাত ছোটো উপন্যাস।

১৮. *ওভাওভ* উপন্যাসের ভূমিকায় চরিত্রের গতি-পরিণতির মধ্যে যে একটি নিরুদ্দেশী ভাব সৃষ্টির কথা বলেছিলেন মানিক, তা এই উক্তির বিরোধী বলে মনে হতে পারে। কিন্তু একথাও মানতে হয়, এমনকি তাঁর উদাহৃত মতি-কুমুদের আখ্যানে তাদের পরিণতির একটি ইঙ্গিত আভাসে হলেও মানিক দিয়েছেন: 'হয়তো একদিন ওদের প্রেম নীড়ের আশ্রয় খুঁজিবে, হয়তো একদিন ওদের শিশুর প্রয়োজনে নীড় না বাঁধিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওদের চলিবে না—জীবন-যাপনের প্রচলিত নিয়ম-কানুন ওদের পক্ষেও অপরিহার্য হইয়া উঠিবে।' [পৃ. ১৭৬, 'পুতুলনাচের ইতিকথা', *মা. গ্র.* ৩]

১৯. মানিকের সমকালীন ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসসমূহে উপকাহিনীর প্রবলপ্রচুর ব্যবহার করেছেন।

২০. আধুনিক উপন্যাসে মনন, তত্ত্ব বা চিন্তার সংক্রাম বিপুল। আধুনিক বাংলা কথাশিল্পের প্রধান এক পূর্বসূরি জগদীশ গুপ্ত তাঁর *দুলালের দোলা* (১৯৩১) উপন্যাসের ভূমিকায় লিখেছিলেন, 'উপন্যাস বা গল্পের সংজ্ঞার অধীনে আনিয়া ইহাদের বিচার না করিয়া প্রবন্ধ হিসাবেই যদি কেহ ইহাদের বিচার করেন তবে আমি বিস্মিত হইব না।'

২১. সমকালীন অন্যান্য গল্প : 'অতসী মামী' (*বিচিত্রা*, পৌষ ১৩৩৫), 'নেকী' (*বিচিত্রা*, আষাঢ় ১৩৩৬)।

২২. গল্পেও অনুরূপ পুনর্লেখন বা নবায়নের কাজ করেছেন মানিক—অবশ্য অন্যের : 'আর না কান্না' (*ফেরিওলা*)।

২৩. বিস্তারিতভাবে আছে যুগান্তর চক্রবর্তী-সম্পাদিত *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প* (১৯৭১) গ্রন্থের পরিশিষ্ট ৫-এ।

২৪. 'আরোগ্য'-পরিচ্ছেদে উপন্যাসের সঙ্গে গল্পগুলির সম্বন্ধ বিবেচিত হয়েছে।

২৫. *আশালতা* মানিকের পরিকল্পিত অসম্পূর্ণ একটি উপন্যাস।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় পর্ব

উপন্যাস

দিবারাত্রির কাব্য

> মানুষের মৃত্যু-কবলিত জীবন যেমন সার্থক, তেমনি সার্থকতা ক্ষণজীবী হৃদয়েরও হয়তো আছে। [পৃ. ২২৫, 'দিবারাত্রির কাব্য', *মা. গ্র.* ১]

AMARBOI.COM

১. মুখবন্ধ

দিবারাত্রির কাব্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম লেখা উপন্যাস, প্রকাশক্রমের দিক থেকে দ্বিতীয়। এর প্রথমাংশ ('দিনের কবিতা') গল্পাকারে ('একটি দিন') প্রথম মুদ্রিত হলেও এর ঔপন্যাসিক সম্ভাবনা টের পান সম্পাদক সজনীকান্ত দাস এবং তাঁর অনুরোধে ঐ বীজময় ছোটোগল্পটি একটি দীর্ঘ উপন্যাসে রূপান্তরিত হয়।[১] বীজ-আকারে যা-ই থাক, *দিবারাত্রির কাব্য*কে একটি সম্পূর্ণ ও অখণ্ড উপন্যাস হিশেবে গ্রহণ করতে আজ আমরা দ্বিধাহীন।

কিন্তু *দিবারাত্রির কাব্য* আলোচনায় নেমে প্রথমেই আমরা দুটি বিষয় বর্জন, বা অন্তত অংশত বর্জন, করতে চাই : অ) উপন্যাসের যে-তিনটি অংশ (প্রথম ভাগ : দিনের কবিতা : দ্বিতীয় ভাগ : রাতের কবিতা; তৃতীয় ভাগ : দিবারাত্রির কাব্য), সেই বিভাজন ঠিকই আছে, কেননা 'দিনের কবিতা' ও 'রাতের কবিতা' ছোটো দুটি নদী বিশাল এক মোহনায় মিশেছে *দিবারাত্রির কাব্য* অংশে[২]; কিন্তু এই তিনটি অংশের সঙ্গে যে-তিনটি কবিতা যুক্ত হয়েছে, সে-তিনটি কবিতা আমরা আলোচনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে বাদ দিতে চাই; এবং আ) 'লেখকের ভূমিকা'টিকেও আমরা মূল আলোচনা থেকে সরিয়ে রাখতে চাই। কেননা, আমাদের বিশ্বাস, মূল উপন্যাসের সঙ্গে ঐ কবিতাত্রয় ও ভূমিকার সম্পর্ক ক্ষীণ। তার কারণ, এই দুটি উপন্যাসের প্রথম রচনাকালে নয়, পরবর্তীকালে রচিত ও যোজিত। যে-বিশেষ ম্যুড বা ভাবমুহূর্ত বা মর্জি থেকে এক-একটি সৃষ্টিকাজ সম্পন্ন হয়, আর-কখনোই তা ফিরে আসে না। সেদিক থেকে রচনার পর একটি সৃষ্টিকাজের ভোক্তা এবং রচয়িতা খুব দূরবর্তী নন—বরং তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন একই সমতলে। সেদিক থেকে রচয়িতা মানিক এবং ব্যাখ্যাতা মানিক সর্বমুহূর্তে অনন্য নন—বরং অনেক সময়ই দূরবর্তী।[৩] সুতরাং মানিকের উক্তি বা ব্যাখ্যাকে সব সময় আমরা গ্রাহ্য মনে করব না। তবে ঐ বর্জনীয় ব্যাখ্যা থেকেও অনেক সময় মানিক-মানসের কোনো-কোনো সত্যের বিদ্যুৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে, বিশেষ করে তাঁর উপর্যুপরি পরিবর্তমান মানসের (কেননা তাঁর রচিত অসংখ্য চরিত্রের মতো মানিক নিজেও ছিলেন সতত-পরিবর্তমান এবং সতত-চলিষ্ণু)—সেই চকিত সত্যটিকে গ্রহণ করতে না-পারলে আবার অতিসরলীকরণের আশঙ্কা থেকে যায়;—মানিক সম্পর্কে যে-অতিসরলীকরণ অনেক সময়ই বিভ্রান্তি ডেকে এনেছে। উপরন্তু, *দিবারাত্রির কাব্য*-এর ঐ কবিতাত্রয় ও ভূমিকাকে আমরা অনেকাংশে বাদ দিতে চাই এজন্যে যে ঐ উপন্যাস মানিকের সমগ্র সৃষ্টিতে একক; ঐ উপন্যাস নিজেই একটি অখণ্ড মণ্ডল সৃষ্টি করেছে; মানিকের পরবর্তী রচনায় এর অন্তঃসার কোথাও-কোথাও পরোক্ষে বাহিত হয়ে গেছে—কিন্তু এই উপন্যাসের সঙ্গে তুলনীয় আর-কোনো উপন্যাস তিনি উত্তরকালে লেখেননি। ইতিমধ্যে মানিকের বয়স ও মন দুই-ই বদলে গিয়েছিল। কাজেই সেই পরিবর্তিত মন নিয়ে মানিক নিজেও তাঁর উপন্যাসের প্রতি সুবিচার করতে পারেন না। কাজেই ১৯২৯ সালে লেখা উপন্যাস সম্পর্কে ১৯৩৫ সালে এরকম অবিচার ঘোষিত হয় লেখকের মুখে : '...এটি গল্পও নয়, উপন্যাসও নয়, রূপক কাহিনী। রূপকের এ একটা নূতন রূপ।' কথাটিকে বদলে আমরা এভাবে দাঁড় করাতে চাই : 'এটি গল্পও নয়, রূপক কাহিনীও নয়, উপন্যাস। উপন্যাসের এ একটা নূতন রূপ।'

২. জীবনের কবিতা

উপন্যাসের অন্বিষ্ট সামগ্র্য বা totality-কে ধারণ। এই সামগ্র্য বা সমগ্রতা হচ্ছে জীবনের সমগ্রতা—জীবনের বাস্তব ও স্বপ্ন-কল্পনা, জীবনের বহির্লোক ও অন্তর্লোক, জীবনের কবিতা ও গদ্য দুই মিলিয়েই জীবনের সমগ্রতা। সব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিতর্কের ঊর্ধ্বে যে-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি তাঁর সমগ্র কথাশিল্পে এই সমগ্র জীবনেরই রূপকার। এবং বিচ্ছিন্ন এক-একটি উপন্যাসেও মানিক অনেক সময়ই এই সামগ্র্যকে ধরেছেন—এই সামগ্র্যের প্রকৃতি ও পদ্ধতি এক-একটি উপন্যাসে অবশ্য এক-এক রকম। *দিবারাত্রির কাব্য*-ও এরকমই একটি উপন্যাস, যেখানে জীবনের কবিতা ও জীবনের গদ্যকে ধারণ করা হয়েছে একটি আধারে, শুধু এই জীবনের কবিতা ও জীবনের গদ্যকে ধারণ করার প্রকৃতি ও পদ্ধতি এই উপন্যাসে একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট রূপ পেয়েছে।

এই উপন্যাসে জীবনের কবিতা-কে ধরার আয়োজনের প্রকৃতি ও পদ্ধতি প্রথমে বিচার করে নিতে চাই।

না-মেনে উপায় নেই, *দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাসে কবিতার শারীরিক ও আত্মিক অনেক কুশলতা প্রযুক্ত হয়েছে। শরীর থেকে ক্রমশ আত্মার দিকে যাব আমরা।—কবিতার শারীরিক কুশলতা, যেমন উপমা, উৎপ্রেক্ষা, প্রতীক ইত্যাদি সুপ্রচুর ব্যবহৃত হয়েছে। একগুচ্ছ উপমা-উৎপ্রেক্ষা :

১. গ্রামটির ঠিক উপরে আকাশে এখন রূপার ছড়াছড়ি। তবে সেগুলি আসল রূপা নয়, মেঘ। [পৃ. ১৩৯]
২. ...সুপ্রিয়ার যেন একটি দার্জিলিঙের আবহাওয়ার আবেষ্টনী আছে। এত গরমেও তার কথার মাধুর্যের এক কণা বাষ্প হয়ে উড়ে যায়নি, তার কণ্ঠে শ্রান্তির আভাস দেখা দেয়নি। তার ইঁদারার জলের মতোই সেও যেন জুড়িয়ে আছে। [পৃ. ১৪০]
৩. তাকে [সুপ্রিয়াকে] ও [হেরম্ব] শাসন করবে, সংকীর্ণ ও সংক্ষিপ্ত বাগানে তার মূল বিস্তার করা দরকার বলে তার সব বাহুল্য ডালপালা ছেঁটে ফেলবে, এমন একটি শাখা রেখে যাবে না, যেখানে সে দুটি অনাবশ্যক ফুল ফোটাতে পারে। [পৃ. ১৪৮]
৪. দুজনের মাঝে উঠানের ব্যবধান ভরে ঝাঁজালো কড়া রোদটা সুপ্রিয়ার কাছে রূপকের মত ঠেকল। [পৃ. ১৪৯]
৫. টবের নিস্তেজ অসুস্থ চারাগাছ হয়ে থাকার বদলে মালতীর সাহায্যেই হয়তো সে [আনন্দ] পৃথিবীর মাটিতে আশ্রয় নেবার সুযোগ পেয়েছে, রোদ বৃষ্টি গায়ে লাগিয়ে আগাছার সঙ্গে লড়াই করে ও মাটির রস আকর্ষণ করে বেড়ে ওঠা তরুর মত সতেজ, সজীব জীবন আহরণ করতে পেরেছে। [পৃ. ১৮০]

এই বইয়ে কাব্যিক যে-কুশলতাটি সবচেয়ে তাৎপর্যময়, তা হচ্ছে প্রতীক। ভূমিকায় মানিক ঈষৎ অসতর্কভাবে বিষয়টিকে চিহ্নিত করেছেন রূপক বলে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু বিষয়টিকে তিনি অভ্রান্তভাবে চিহ্নিত করেছেন (নামকরণ অযথার্থ হলেও) রূপকের খোলা ছাড়ালে শাঁস বেরিয়ে আসে, বাচ্যার্থ থেকে নিহিতার্থের দিকে চলে যায় রূপক। রূপকের এই দুটি দিক—খোলা ও শাঁস, বাচ্যার্থ ও নিহিতার্থ; এর কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু প্রতীকের বাচ্যার্থ যা-ই হোক—নিহিতার্থ অনিঃশেষ।[৪] প্রতীক জানা ও অজানার মধ্যবর্তী সাঁকো, সীমা ও অসীমের মধ্যবর্তী অলিন্দ, দুই মেরুর মধ্যবর্তী সংযোগসাধক এক আশ্চর্য রাস্তা। এমনিতে ভাষা ও ভাবনার ভিতরেই প্রতীক তার কাজ করে যায়। *দিবারাত্রির কাব্য*-এর দ্বিতীয়াংশ থেকে একটি অনুচ্ছেদ পরীক্ষা করে দেখা যাক :

> আনন্দের ফিরে আসতে দেরি হয়। হেরম্বের ব্যাকুল অন্বেষণ তার দেহকে অস্থির করে দেয়। বিছানা থেকে নেমে সে ঘরের মধ্যে পায়চারী আরম্ভ করে। এদিকের দেওয়াল থেকে ওদিকের দেওয়াল পর্যন্ত হেঁটে যায়, থমকে দাঁড়ায় এবং প্রত্যাবর্তন করে। তিনটি খোলা জানালা প্রত্যেকবার তার চোখের সামনে জ্যোৎস্না-প্লাবিত পৃথিবীকে মেলে ধরে। কিন্তু হেরম্বের এখন উপেক্ষা অসীম। সম্মুখের সুদূর সাদা দেয়ালটির আধ হাতের মধ্যে এসে গতিবেগ সংযত করে, আর কিছুই দেখতে পায় না। মেঝেতে আনন্দের পরিত্যক্ত একটি ফুল তার পায়ের চাপে পিষে যায়।[৫] [পৃ. ২০৭]

একটি সাধারণ বর্ণনা থেকে এই অনুচ্ছেদটি ক্রমশ প্রতীকে প্রবেশ করেছে। হেরম্বের মানসিক অস্থিরতার প্রকাশ এই পায়চারি (প্রথম অংশের শেষেও রাতে শুকনো মাঠে হেরম্বের পায়চারি স্মরণীয়)। 'তিনটি খোলা জানালা' যে-জ্যোৎস্না-প্লাবিত বহিঃপৃথিবীর সৌন্দর্য মেলে ধরে, হেরম্ব তার সম্বন্ধে উদাসীন। মানিক জানেন, বহিঃপৃথিবীর চেয়ে আমাদের মন অনেক শক্তিমান। ঐ 'তিনটি খোলা জানালা'র বিপরীতে সামনের 'সুদূর সাদা দেয়াল'। সাদা দেয়ালের প্রতীকে তার অন্বেষণের নিরুত্তরতা পরিব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু 'সুদূর'? আমরা তো জানি, ঘরের কোনো দেয়ালই সুদূর হতে পারে না। ঐ 'সুদূর' শব্দের মধ্যে হেরম্বের তৎকালীন মানসিক সুদূরতা থেকে ভবিষ্যতের শূন্যতার মধ্যে এসে-পড়ার অনেক ইশারাই অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। অনুচ্ছেদের শেষ বাক্য : হেরম্বের পায়ের নিচে আনন্দের পরিত্যক্ত ফুল পিষে যাওয়া উপন্যাসের পরিণামের প্রতীকী ইঙ্গিত। এই অনুচ্ছেদের 'দেয়াল' ও 'ফুল' হেরম্বের মনোজগতের প্রতিফলক দুটি প্রতীক।

উপন্যাসের যে-তিনটি অংশ, তার প্রত্যেকটিই শেষ হয়েছে এক-একটি প্রতীকে—ঘটনার সাধারণত্ব তথা গদ্য এইভাবে কবিতায় উত্তীর্ণ হয়েছে :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. আকাশ মেঘে ঢাকা। ওদিকে বিদ্যুৎ চমকায়। শুকনো ঘাসে-ঢাকা মাঠে হেরম্ব আস্তে আস্তে পায়চারী করে। আজ রাত্রে যদি বৃষ্টি হয় কাল হয়তো মাঠের বিবর্ণ বিশীর্ণ তৃণ প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। [পৃ. ১৬৪]

২. আনন্দের মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, দু'হাতের তালুতে পৃথিবীর সবুজ নমনীয় প্রাণবান তৃণের স্পর্শ অনুভব করে হেরম্ব খুসী হয়ে উঠল। প্রশান্ত চিত্তে সে ভাবল, পূর্ণিমার নাচ শেষ করে অমাবস্যায় ফিরে না গিয়ে আনন্দ ভালই করেছে। [পৃ. ২১৪]

৩. প্রথমে আনন্দের দুটি হাত দেহের সঙ্গে মিশে ছিল, হাত দুটি যখন আগুনের কম্পিত আলোয় তরঙ্গ তুলে তুলে দুই দিগন্তের দিকে প্রসারিত হয়ে গেল, তখন আনন্দের পরিক্রমা অত্যন্ত দ্রুত হয়ে উঠেছে। এখন যে তার নৃত্যের পরিপূর্ণ বিকাশ, এই নৃত্যকে যে না চেনে তারও তো বোঝা কঠিন নয়। হেরম্ব বড় আরাম বোধ করল। তার অশান্তি ও উদ্বেগ, শ্রান্তি ও জড়তা মিলিয়ে গিয়ে পরিতৃপ্তিতে সে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। আনন্দের প্রথম নৃত্যের শেষে মন্দিরের সামনে সে প্রথম যে অলৌকিক অনুভূতির স্বাদ পেয়েছিল, আবার তার আবির্ভাবের সম্ভাবনায় হেরম্বের দেহ হালকা, মন প্রশান্ত হয়ে গেল। [পৃ. ২৭০]

১-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে প্রাক্তন প্রেমিকা সুপ্রিয়ার আত্মনিবেদন প্রত্যাখ্যানের পরে নিদ্রাহীন হেরম্ব বাড়ির বাইরে এসে শুকনো মাঠে পায়চারি করছিল। তার মনের জটিল মেঘাচ্ছন্নতার সঙ্গে সাযুজ্যবহ বহিঃপ্রকৃতিতে অন্ধকার, অন্ধকারে বিদ্যুচ্চমক। আর ঐ 'বিবর্ণ বিশীর্ণ তৃণ' কি তার জীবনের বৃষ্টিহীন মমতাহীন নির্জীবতার সাক্ষ্য? যে-সম্ভাবনার ইশারায় উপন্যাসের প্রথম ভাগ শেষ হলো, দ্বিতীয় ভাগের শেষাংশে আমরা দেখলাম তারই পূর্ণতা : আবার সেই তৃণ-প্রসঙ্গ, কিন্তু ২-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে সে-তৃণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে 'সবুজ নমনীয় প্রাণবান তৃণে'। আমরা অবশ্য নিশ্চিত হতে পারি না যে এই তৃণ মাঠের তৃণ নাকি আনন্দের শরীরের স্পর্শের বর্ণনা (কেননা একটু আগেই বলা হয়েছে : 'প্রেমকে হেরম্ব অনুভব করছে না, উপলব্ধি করছে না, চিন্তা করছে না—সে প্রেম করছে')। কিন্তু একথা সত্যি যে হেরম্ব স্বয়ং বিবর্ণ বিশীর্ণ তৃণের জগৎ থেকে চলে এসেছে সবুজ নমনীয় প্রাণবান তৃণের জগতে। হেরম্বের মনোজগতের এই পরিবর্তন স্থায়ী নয়, কিন্তু স্থায়ী নয় বলেই এ মূল্যহীন নয়—বরং স্থায়ী নয় বলেই এ এত দুর্মূল্য, জীবনের দুর্মূল্য ধন (লেখক আমাদের জানিয়ে রেখেছেন : 'মানুষের মৃত্যু-কবলিত জীবন যেমন সার্থক, তেমনি সার্থকতা ক্ষণজীবী হৃদয়েরও হয়তো আছে।') ৩-সংখ্যক উদাহরণের ঐ ক্ষণিক কিন্তু পরিপূর্ণ প্রেমের চূড়া স্পর্শ করেছে। স্তরে-স্তরে যে-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেম উদ্‌গীত হয়েছিল, প্রেমহীনতা ও চূড়ান্ত হৃদয়হীনতা থেকে ক্রমে ক্ষণিক-রঙিন প্রেম, যা নয় তত্ত্বগত ও বিশ্লেষণশীল, যা প্রেম, বিশুদ্ধ প্রেম, তা পরিপূর্ণ হয়েই শেষ হলো। আনন্দের পরীনৃত্যে এই প্রতীকই আভাসিত হয়েছে যে, প্রেম রঙিন এবং ক্ষণিক, এবং ঐ ক্ষণিক-রঙিন প্রেমই পরিপূর্ণ প্রেম, একমাত্র তাতেই আছে অলৌকিক অনুভূতির স্বাদ। তিনটি নারীর সঙ্গে হেরম্বের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে এবং অনাথের মধ্য দিয়েও এই সত্যই স্পষ্ট হয়েছে। আমরা জানি : 'In a symbol there is both concealment and revelation.' (টমাস কার্লাইল) প্রতীকের এই সংগোপন ও প্রকাশ্যের মিলিত চারিত্রের জন্যে এই আশ্চর্য পরীনৃত্যের প্রকৃত ভাষ্য আমরা নির্ধারণ করতে পারি না। হয়তো এর অনিঃশেষ নিহিতার্থ থেকে অন্য একটি বা আরো অনেক অর্থ ও ভাষ্য নিষ্কাশন করে নেওয়া যেতে পারে। তবে আমাদের বিবেচিত অর্থটি এই। 'প্রতীকায়ন একই সঙ্গে গন্তব্য ও পথ' ('Symbolization is both an end and an instrument')—সুসান কে. ল্যাঙ্গারের এই উক্তিটিও এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। আনন্দের প্রেমের পরিপূর্ণতার সঙ্গে আনন্দের মৃত্যু, যে-আশ্চর্য পরীনৃত্য দেখে 'দেহ হালকা, মন প্রশান্ত' হয়ে যায়, সেই আশ্চর্য প্রতীকে উপন্যাস সমাপ্ত হলো। বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার অন্যতম প্রধান প্রবর্তক বলেও যাঁকে সমালোচকেরা সম্মান জানিয়েছেন, যিনি নিজেও বাস্তবতার দাবি খানিকটা মেটাতে পেরেছেন বলে তৃপ্ত, তাঁর হাত দিয়েই রচিত হলো বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ প্রতীকপরিণামী উপন্যাস। আমাদের বিবেচনায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মহৎ শিল্পী শুধু এজন্যে নয় যে তিনি বহির্লোক-অন্তর্লোকচারী বাস্তবতাকে রূপ দিয়েছেন—এজন্যে যে জীবনের বাস্তবতাভেদী রহস্য বিষয়েও তাঁর তীক্ষ্ণ বোধ ও সংবেদন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসগুচ্ছে এই রহস্যের বোধ ও আবহ আনুপূর্ব মিশে আছে।

দিবারাত্রির কাব্য উপন্যাসের আর-এক লক্ষণীয় বিশিষ্টতা এর প্রতীকী ভূদৃশ্য (symbolic landscape)। মানবহৃদয়ের যে-বিজন, দুর্গম এবং অসেতুসম্ভব সম্পর্কের টানাপোড়েন এই উপন্যাসের উপজীব্য, তার জন্যে লেখক নির্বাচন করে নিয়েছেন জনবসতি থেকে দূর এলাকা। উপন্যাসের ঘটনাবলির দুটি স্থানই এরকম। রূপাইকুড়া থানা এমন-একটি জায়গায়, যেখানে যেতে মোটরগাড়ির পরে প্রায় সারা রাত গোরুর গাড়িতে চড়তে হয়। রূপাইকুড়া থানার সামনে গোরুর গাড়ি থেকে হেরম্বের নামার পরে লেখকের বর্ণনা থেকেই স্পষ্ট হয় স্থানটির নির্জনতা :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূব আর পশ্চিমে কেবল প্রান্তর আর দিগন্ত। মাঝে-মাঝে দুএকটি গ্রামের সবুজ চাপড়া বসানো আছে, বৈচিত্র্য শুধু এই। উত্তরে কেবল পাহাড়। একটি দুটি নয়, ধোঁয়ার নৈবেদ্যের মত অজস্র পাহাড় গায়ে গায়ে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে—অতিক্রম করে যাওয়ার সাধ্য চোখের নেই, আকাশের সঙ্গে এমনি নিবিড় মিতালি। দক্ষিণে প্রায় আধ মাইল তফাতে একটি গ্রামের ঘনসন্নিবিষ্ট গাছপালা ও কতকগুলি মাটির ঘর চোখে পড়ে। অনুমান হয় যে, ওটিই রূপাইকুড়া গ্রাম। [পৃ. ১৩৯]

হেরম্বের সঙ্গে আলাপে সুপ্রিয়ার অভিযোগটিও এখানে মনে করা যেতে পারে: 'পাঁচ বছর এই বুনো দেশে পড়ে থাকা সহ্য হচ্ছে...।' কিংবা 'বিশ মাইলের মধ্যে চা'টি পর্যন্ত কিনতে পাওয়া যায় না এমন বুনো দেশ।' উপন্যাসের দ্বিতীয় যে-পটভূমি, সেটি হলো পুরীর সমুদ্রতীর। সেখানে 'জগন্নাথের বিস্তীর্ণ মন্দির-চত্বরে, সাগর-সৈকতের বিপুল উন্মুক্ততায়, আপনার হৃদয়ের খেলা নিয়ে সে [হেরম্ব] মেতে থাকে। (পৃ. ২১৭) সেখানে সমুদ্র আর মন্দির ছাড়া কিছু নেই। সেখানে 'জলের সমুদ্র নয়, আরও উন্মাদ হৃদয়-সমুদ্রের কলরবে মাঝরাত্রি পার না হলে হেরম্বের ঘুম আসে না।' (পৃ. ২১৭) এখানেই মনে করা যেতে পারে উপন্যাসের একেবারে শেষে হেরম্ব-আনন্দের একটুখানি কথোপকথন: আগুন জ্বালিয়ে নৃত্যের আয়োজন করলে হেরম্ব বলেছিল, 'বাড়িতে আগুন লেগেছে ভেবে লোক হয়তো ছুটে আসবে।' আনন্দ তখন জবাব দিয়েছিল, 'এদিকে লোক কোথায়?...' রূপাইকুড়ায় ও পুরীতে, জনবসতি থেকে দূরে এই কটি অস্বভাবী, যোগাযোগকামী, অসুখী মানুষের আকর্ষণ-বিকর্ষণের পালা রচিত হয়েছে।[৬]

দিবারাত্রির কাব্য উপন্যাসের শুধু শরীরে নেই কবিতার সংক্রাম, এর আত্মাও কবিতার। চরিত্র, ঘটনা, পরিবেশ—যা-কিছু উপন্যাসের অস্ত্র, সবই আক্রান্ত কবিতায়। পুরো উপন্যাসটিই দাঁড়িয়ে আছে হৃদয়-সমস্যার উপর: 'শুধু প্রেমকে ভিত্তি করে'। বিষয়ের কারণেই এবং বিষয়ানুযায়ী বিন্যাসের কারণে *দিবারাত্রির কাব্য* হয়ে উঠেছে 'কাব্যধর্মী উপন্যাস'। ঐ কাব্যধর্মিতার প্রসঙ্গে চলে আসে ঐ সময় ও পারিপার্শ্বিকতার প্রসঙ্গ: রবীন্দ্রনাথের *শেষের কবিতা* ঐ সময়েরই (১৯৩০) ফসল এবং কল্লোল যুগের—অর্থাৎ মানিকের প্রায়-সমকালীন—দুজন ঔপন্যাসিক, বুদ্ধদেব বসু ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে, একজন প্রাজ্ঞ উপন্যাসের ইতিহাস-রচয়িতা ও সমালোচক[৭] 'কাব্যধর্মী' ঔপন্যাসিক হিশেবে চিহ্নিত করেছিলেন।

দিবারাত্রির কাব্য একটি কাব্যধর্মী উপন্যাস। মানিক বিভিন্ন সময়ে আধুনিক কবি ও কবিতাকে ব্যঙ্গ করলেও[৮] এ উপন্যাসে তিনি সম্পূর্ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিরিয়াস। মানিক যেমন, তেমনি তাঁর নায়কও এ উপন্যাসে কবিতাকে অতিক্রম করে যেতে পারেনি :

> হেরম্বের ধারণা ছিল কাব্যকে, বিশেষ করে চাঁদের আলোর কাব্যকে সে বহুকাল পূর্বেই কাটিয়ে উঠেছে। জ্যোৎস্নার একটিমাত্র গুণের মর্যাদাই তার কাছে আছে, যে এ আলো নিষ্প্রভ, এ আলোতে চোখ জ্বলে না। অথচ, আজ শুধু আনন্দের মুখে এসে পড়েছে বলেই তার মত সিনিকের কাছেও চাঁদের আলো জগতের আর সব আলোর মধ্যে বিশিষ্ট হয়ে উঠল। [পৃ. ১৯৬]

আনন্দও আবেগ-আকুল মুহূর্তে হেরম্বকে একবার বলেছিল, 'তুমি আমার কবি।'

এখানে সবিনয়ে আমি একটি প্রশ্ন তুলতে চাই। কাব্যধর্মী এই উপন্যাসে মানিকের সাফল্য কতখানি? *শেষের কবিতা*র রবীন্দ্রনাথ, কল্লোলেরই দুজন কাব্যধর্মী ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেব বসু এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, এঁদের সঙ্গে *দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাসের তুলনা অপ্রতিরোধ্যভাবে এসে পড়ে।[৯] তখন আমরা লক্ষ না-করে পারি না যে, *শেষের কবিতা* এবং উক্ত ঔপন্যাসিকদ্বয়ের উপন্যাসাবলি (যার অনেকগুলি *শেষের কবিতা* থেকেই জন্ম নিয়েছে) বর্ণনায়, ঘটনায়, পরিবেশচিত্রণে কাব্যধর্মী ঠিকই; কিন্তু *দিবারাত্রির কাব্য*র মতো গভীর ও বহুতল হয়ে ওঠেনি। অন্যরা ঠিকই 'কাব্যধর্মী' উপন্যাস লিখেছেন, কিন্তু *দিবারাত্রির কাব্য* কাব্যধর্মী হয়েও আবার একই সঙ্গে গদ্যধর্মী, অর্থাৎ কবিতা ও গদ্য মিলে সত্যধর্মী। এভাবেই *দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাস হিশেবে অধিকতর গ্রাহ্য ও গভীর হয়ে ওঠে। এবং তাই যদি হয়, তাহলে মানিকের সাফল্যের ক্ষেত্রও বহুগুণে প্রসারিত হয়। একটিমাত্র কাব্যধর্মী উপন্যাস লিখেই প্রমাণ করেন মানিক—বাংলা উপন্যাসে তিনি কেবল রিয়ালিজমের প্রবক্তা ও ধারক নন, একেবারে ভিন্ন মেরুর যে-উপন্যাস তারও উচ্চতম শীর্ষে আরোহণ করেছেন তিনি। এমনিভাবে প্রমাণ করেন, আটচল্লিশ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনেই তিনি জীবনের পুরো বলয়ের পরিক্রমা সম্পন্ন ও পরিপূর্ণ করেছিলেন। এমনিভাবে মহৎ শিল্পীর অভিধাটি তাঁর জন্য নিশ্চিত ও অবধারিত হয়ে ওঠে।

৩. জীবনের গদ্য

*দিবারাত্রির কাব্য*র চরিত্রগুলির জীবনের কবিতা জীবনের গদ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই তারা কাব্যধর্মী উপন্যাসে অধিকাংশ সময়ে যেমন হয় তেমন ছক-বাঁধা, ছাঁচে-গাঁথা বা নির্বস্তুক নয়—তারা জীবন্ত মানুষের মতোই সজীব ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলিষ্ণু। (ই. এম. ফর্স্টর উপন্যাসের চরিত্রের যে-দুটি ভাগ করেছিলেন, 'round' এবং 'flat',—এখানে সেই 'round character' অর্থেই 'চলিষ্ণু চরিত্র' ব্যবহার করছি, 'flat character'-কে বলা যেতে পারে 'একায়তনিক চরিত্র'।) কাব্যধর্মী উপন্যাসে অনেক সময় লেখকের সবখানি জোর ও নজর পড়ে বর্ণনার কবিত্বে, চরিত্রদের আচরণে বা কথোপকথনে; কিন্তু চরিত্রদের চলাফেরা ও কথাবার্তার পিছনে যে-বস্তুসত্য ও মনস্তত্ত্ব কাজ করে তার কোনো পরিচয় থাকে না;—*দিবারাত্রির কাব্য* তেমন উপন্যাস নয়। সন্দেহ নেই, এ উপন্যাসেও বর্ণনায় কবিত্ব কম নেই, কথোপকথনে শব্দ ও বাক্যের জাদু ও মারপ্যাঁচ কম নেই, রোমান্টিক আবহ প্রায় সর্বব্যাপী; কিন্তু আরো যা আছে, যা চরিত্রগুলির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে, তা হলো তাদের চির-চলিষ্ণুতা ও চির-উদ্ভিন্নমানতা—চরিত্রের যে-চলিষ্ণুতা ও উদ্ভিন্নমানতা মানিকের উপন্যাসের অসংখ্য কুশীলবকে মানুষ করেছে। চরিত্রের এই চলিষ্ণুতা-গুণ আছে *দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাসের হেরম্ব, সুপ্রিয়া, অশোক, অনাথ, মালতী প্রমুখের মধ্যে। এই চলিষ্ণুতা-গুণ মানবস্বভাবেরই একটি বৈশিষ্ট্য—মানুষ কখনো এক-জায়গায় স্থির থাকে না, তার মানবিক চলমানতার কোনো বিরাম নেই, চলতে-চলতে সে হয়তো একেবারে বিপরীত বিন্দুতে এসে দাঁড়ায়—যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল তার বিপরীত বিন্দুতে। মানিক মানবস্বভাবের এই মৌলিক লক্ষণটিকে যথার্থই আবিষ্কার করেছিলেন, সেজন্যে তাঁর এই প্রথমতম উপন্যাসের মানুষগুলিও ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছে, কোথাও স্থির থাকেনি। এই উপন্যাসের চরিত্রদের চলিষ্ণুতা-গুণ পরীক্ষা করার আগে ই. এম. ফর্স্টরের একটি সতর্কবাণী আমরা স্মরণ করব :

> The test of a round character is whether it is capable of surprising in a convincing way. If it never surprises, it is flat. If it does not convince, it is pretending to be round.
>
> [পৃ. 85, *Aspects of the Novel*: E. M. Forster]

হেরম্ব : হেরম্ব তার জীবনে তিনটি নারীর সংস্পর্শে এসেছে : উমা, সুপ্রিয়া ও আনন্দ।

ক) উমা, হেরম্বের স্ত্রী, একটি শিশুকন্যা রেখে আত্মহত্যা করেছে। ঔপন্যাসিক কোথাও উমার আত্মহত্যার কারণ পরিষ্কার বলেননি। সুপ্রিয়ার ধারণা ছিল, হেরম্ব তাকে ভালোবাসে বলেই উমা আত্মহত্যা করেছে;—কিন্তু হেরম্ব তাকে জানিয়ে দেয় যে, এই ধারণা সত্য নয়। আনন্দও উমার প্রসঙ্গ তুলেছে, কিন্তু হেরম্ব নিজে এ-বিষয়েও কিছু বলেনি। স্ত্রীর বিষয়ে হেরম্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশ্চর্যজনকভাবে নীরব ও উদাসীন (তার শিশুকন্যাটি সম্পর্কেও)। সুপ্রিয়া মাঠে বেড়াতে গিয়ে যখন তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'বৌয়ের কথা বলতে আপনার কি কষ্ট হয়?' হেরম্ব তখন 'পাশবিক নিষ্ঠুরতার সঙ্গে' জবাব দিয়েছিল, 'না।' 'পাশবিক নিষ্ঠুরতার সঙ্গে' শব্দগুচ্ছ লেখকের বর্ণনার অংশ। (পৃ. ১৫৫) একইভাবে পাশবিক নিষ্ঠুরতায় আনন্দকে সে জানিয়েছিল, 'আমার স্ত্রীর কথা ভেবে বললেও দোষ হত না আনন্দ। সংসারে কত পরিচিত কত আত্মীয় থাকে, যারা হঠাৎ আমাদের ছেড়ে চলে যায়। বেঁচে থাকবার সময় আমাদের কাছে তাদের কতটুকু দাম ছিল, মরে যাবার পর কেবল কাছে নেই বলেই তাদের সে দাম বাড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়...' (পৃ. ১৮৭)। অর্থাৎ স্ত্রী তার পরিচিত আত্মীয়ের বেশি কিছু নয়। স্ত্রীর সঙ্গে কোনো মানসসেতু সংরচিত হয়নি তার; এবং হয়নি যে, তার জন্যে তার মনে কোনো অনুতাপ নেই। উমার কথা একবার তার মনে হয়েছে—কোনো প্রেমোজ্জ্বল মুহূর্তে নয়—একবার উমা ভীষণ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল, সেই ভয় হেরম্বের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। উমার আত্মহত্যার কোনো পরিষ্কার কারণ লেখক না-বললেও দু-একটি ইঙ্গিত বিকীর্ণ করে দিয়েছেন, যা থেকে একটি সিদ্ধান্ত আমাদের তৈরি করে নিতে হয়। প্রেম-প্রত্যাখ্যাতা সুপ্রিয়ার তীব্র অভিযোগ আমাদের মনে পড়ে যায় : 'আজ টের পেলাম বৌ কেন গলায় দড়ি দিয়েছিল। আপনি মেয়েমানুষের সর্বনাশ করেন কিন্তু তাদের ভার ঘাড়ে নেবার সময় হলেই যান এড়িয়ে...।' (পৃ. ১৬৩) আত্মবিশ্লেষণের এক মুহূর্তে হেরম্বের উচ্চারণ এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে :

> সমারোহের সঙ্গে দিনের পর দিন নিজের এই অস্তিত্বহীন অস্তিত্বকে সে বয়ে বেড়িয়েছে। চকমকির মত নিজের সঙ্গে নিজেকে ঠুকে চারিদিকে বয়ে বেড়িয়েছে আগুন। কড়িকাঠের সঙ্গে দড়ি বেঁধে গলায় ফাঁস লাগিয়ে সে-ই উমাকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। সে খুনী! [পৃ. ১৯৭]

না, আক্ষরিক অর্থে খুনি সে নয়—কিন্তু এক-হিশেবে সে-ই হত্যা করেছে উমাকে—সে—তার নিস্পৃহতা ও শীতলতা। হেরম্ব জড়ায়—কিন্তু সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না; এই সর্বনাশী যোগাযোগহীনতাই তার ট্র্যাজেডির কারণ। 'অস্তিত্বহীন অস্তিত্ব' এই কূটাভাসিক (paradoxical) শব্দবন্ধটি হেরম্বের চরিত্র চমৎকারভাবে উদ্ঘাটন করে দেয় : সে সরাসরি জীবনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না; জীবনকে ও মানুষকে ও সম্পর্ককে সে কেবলই বিশ্লেষণ করে যায়। এই মৃতা নারী, উমা, উপন্যাসে কোথাও শারীরিকভাবে উপস্থিত না-হয়েও, পরোক্ষে থেকেই হেরম্বের চরিত্রকে স্পষ্ট করে তোলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ) সুপ্রিয়া হেরম্বের প্রাক্তন 'প্রেমিকা'। একদিন ছিল সে প্রেমিকা, এখন আর নয়। 'ও [হেরম্ব] আর না চায় সুপ্রিয়ার দেহ, না চায় সুপ্রিয়ার মন। সংসারের টানে সুপ্রিয়া ওর কাছ থেকে ভেসে গিয়েছে। ওর আর ইচ্ছে নয় সাঁতরে সে ফিরে আসে।' (পৃ. ১৫৪) অর্থাৎ একদিন হেরম্ব সুপ্রিয়ার দেহ-মন পেয়েছিল, বা অন্তত কামনা করেছিল। কিন্তু পাঁচ বছর পরে হেরম্ব যখন রূপাইকুড়ায় এল, তখন সুপ্রিয়ার প্রতি তার প্রেম এককণা বেঁচে নেই আর। সুপ্রিয়া হেরম্বকে তার হৃদয়ের প্রথম উন্মেষে যেমন বরণ করে নিয়েছিল, আজও তেমনি ভালোবাসে; কেবল তফাত এই, যৌবনের প্রথম উন্মেষকালে সে ছিল লাজুক ও আচ্ছাদিত, আর অসুখী বিবাহিত জীবনে, পাঁচ বছর একটা 'বুনো দেশে' কাটিয়ে সে হয়ে উঠেছে মরিয়া, হয়ে উঠেছে (হেরম্বের ভাষায়) 'অবাধ্য' ও 'দুরন্ত', ভিতরে-ভিতরে তার এই আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। তাই সে, অশোকের সংসারে থেকেও, রূপাইকুড়ায় গভীর রাতে হেরম্বের কাছে প্রেম নিবেদন করেছে, যে-প্রেমনিবেদন হেরম্ব প্রত্যাখ্যান করেছে তাকে বুঝিয়ে।[১০] হেরম্ব-যে সুপ্রিয়ার ক্রমাগত প্রেমনিবেদন প্রত্যাখ্যান করে, তার কারণ তার নৈতিকতা নয়, পাপ-অপাপের বোধ নয়—তার কারণ, তার সুপ্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধহীনতা। তবে কেন সে এসেছিল রূপাইকুড়ায়—অনিবার্য এই প্রশ্নটি ওঠে। স্ত্রীর মৃত্যুতে বৈরাগী হয়ে নয়—তা সে মালতীর কাছে স্বীকার করেছে। (এবং সে যে সৎ ও সত্যভাষী, উপন্যাসে তার একাধিক প্রমাণ আছে।) তাহলে কি দায়িত্ববোধ থেকে—যে-বিমুগ্ধা মেয়েকে সে একদিন বিয়ে দিয়েছিল তাকে তার ঘরসংসারে স্থিত করার জন্যে? তাহলে সে অনুরূপ দায়িত্ব উমা বা আনন্দের বেলায় বোধ করেনি কেন (উমার বেলায় না-হয় তার সম্পর্ক ছিল প্রেমহীন, কিন্তু আনন্দের বেলায় তো তা নয়?), রূপাইকুড়ায় তার আসার একটিই ব্যাখ্যা : সে এসেছিল নিজেরই তাগিদে, তার স্বভাবসুলভ আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মসন্ধানের তাগিদে।[১১] হয়তো সে এসেছিল রূপাইকুড়ায় এই যাচাই করতে যে সুপ্রিয়ার প্রতি তার একদা-প্রেমমুগ্ধতা পাঁচ বছর পরেও বেঁচে আছে কি না। এই সন্দেহ সত্যি মনে হয় এজন্যে যে আনন্দকে সে কিছুকাল পরেই ক্ষণজীবী প্রেমের মাহাত্ম্য বিষয়ে একটি দীর্ঘ নিজস্ব থিওরি শুনিয়ে দিয়েছে। সুপ্রিয়া তার তীক্ষ্ণ নারীস্বজ্ঞাবলে ঠিকই বুঝে নিয়েছিল হেরম্বের চরিত্র : 'আপনি মেয়েমানুষের সর্বনাশ করেন কিন্তু তাদের ভার ঘাড়ে নেবার সময় হ'লেই যান এড়িয়ে।' (পৃ. ১৬৩) তার কারণ এই নয় যে হেরম্ব লম্পট ও বদমাশ; তার অপরূপ নিরাসক্তিতে হেরম্ব নারীকে আকর্ষণ করে ঠিকই, কিন্তু নারী বা প্রেম তার আত্মবিশ্লেষণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপকরণ, এজন্যেই তার ভার বহন করতে সে রাজি হয় না। সুপ্রিয়া তার নারীস্বজ্ঞাবলে হেরম্বকে যথার্থভাবে চিনেছিল বলেই এমন উক্তি করেছিল একবার, 'বিশ্লেষণ করবেন না, আপনার পায়ে পড়ি।' আর তারপরই হেরম্বের চিন্তা এই খাতে বয় :

> এরা কেউ বিশ্লেষণ ভালবাসে না, সুপ্রিয়াও নয়, আনন্দও নয়, তার একি অভিশাপ যে, এরা কেন বিশ্লেষণ ভালবাসে না বসে বসে তাও বিশ্লেষণ করতে ইচ্ছা হয়? একি জ্ঞানের জন্য? নারীকে জেনে সে কি জীবনের নাড়ীজ্ঞান আয়ত্ত করতে চায়? তার লাভ কি হবে? বরং আজ পর্যন্ত তার যা ক্ষতি হয়েছে তার তুলনা নেই। জীবনের সমস্ত সহজ উপভোগ তার বিষাক্ত বিস্বাদ হয়ে যায়।[১২] [পৃ. ২৪২]

সুপ্রিয়া তার দুরন্ত ও অবাধ্য প্রেমের টানে পুরীতেও ছুটে গিয়েছিল হেরম্বের কাছে। এবং তার শেষ-মুহূর্তের প্রস্তাবও হেরম্ব প্রত্যাখ্যান করে সৎ শান্ত নিরুত্তেজ নিস্পৃহতায়।

গ) বাকি থাকে আনন্দ। এই একটি জায়গায় এসে হেরম্বের সমস্ত আত্মবিশ্লেষণ-প্রবণতা মুহূর্তে থমকে গেছে। আনন্দকে প্রথম দেখেই হেরম্ব 'হঠাৎ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল।' প্রথম দর্শনে প্রেম বিষয়টি এখানে আছে—কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিতে এ অত্যন্ত স্বাভাবিক—আকস্মিকও নয়, রোমান্টিক কপোলকল্পনাও এর পিছনে নেই। একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করলে হেরম্বের মন পরিষ্কার বোঝা যাবে :

> সুপ্রিয়াকে ত্যাগ করে এসে হেরম্বের যা হয়নি, এখন তাই হল। নিজের কাছে নিজের মূল্য তার অসম্ভব বেড়ে গেল। সে জটিল জীবনযাপনে অভ্যস্ত। সাধারণ সুস্থ মানুষ সে নয়। তার মন সর্বদা অপরাধী, অহরহ তাকে আত্মসমর্থন করে চলতে হয়। জীবনে সে এত বেশি পাক খেয়েছে যে মাথা তার সর্বদাই ঘোরে। আনন্দ, পুলক ও উল্লাস সংগ্রহ করা আজ তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু আনন্দ আজ তাকে আর তার দৃষ্টিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে, বিচলিত হয়ে তাকে ছেলেমানুষের মত উল্লসিত করে দিয়েছে। তার দেহ-মন হঠাৎ হাল্কা হয়ে গিয়েছে। তার মনে ভাষার মত স্পষ্ট হয়ে এই প্রার্থনা জেগে উঠেছে, আনন্দ যেন চলে যাবার আগে আর একবার তার দিকে এমনিভাবে তাকিয়ে যায়। [পৃ. ১৭৩]

আনন্দের সঙ্গে পরিচয়ের পরও হেরম্বের অবাধ্য বিশ্লেষণপ্রিয় মন যথারীতি তার কাজ করে যায়। কিন্তু নিছক প্রেম, বিশুদ্ধ প্রেম, বিশ্লেষণহীন প্রেম যাকে বলে, তার স্বাদও জীবনে সে এই প্রথম পায়। তাই চিরকাল প্রেমিকের যেমন মনে হয় হেরম্বেরও তেমনি আকুল জিজ্ঞাসা, 'তোমার কাছে বসে আমার মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছে, এতকাল তোমার সঙ্গে আমার কেন পরিচয় ছিল না?...'[১৩] আনন্দকে পেয়ে হেরম্বের প্রকৃত প্রেমের অনুভব ও প্রকাশ কতভাবেই না হয়েছে :

১. তাদের কথা বলা অর্থহীন, তাদের চুপ করে থাকা ভয়ংকর। [পৃ. ২৬৮]
২. পরস্পরের কত অনুচ্চারিত চিন্তাকে তারা শুনতে পাচ্ছে। তাদের কত প্রশ্ন ভাষায় রূপ না নিয়েও নিঃশব্দ জবাব পাচ্ছে। [পৃ. ২৬৯]
৩. এই কক্ষের বাইরে জ্ঞান নেই, সমস্যা নেই, প্রয়োজনীয় কিছু নেই—মানুষ পর্যন্ত নেই। [পৃ. ২৬৮]

'এতকাল হেরম্ব এক মুহূর্ত বিশ্লেষণ ছাড়া থাকতে পারেনি।' আনন্দের সংস্পর্শে এসে সে জীবনের বিশ্লেষণ না-করে সরাসরি জীবনের মধ্যেই প্রবেশ করেছে। সব বুদ্ধি বা মননের শেষ এই গন্তব্য—বুদ্ধি বা মননকে বাদ দিয়ে হৃদয় বা জীবনের সরাসরি স্বাদ গ্রহণ। এটাই হচ্ছে হেরম্বের চূড়ান্ত পরিবর্তন : সে যা ছিল (আক্ষরিক অর্থে বুদ্ধিজীবী) সে তার বিপরীত বিন্দুতে এসে দাঁড়িয়েছে (হৃদয়বান)। হেরম্বের এই আমূল পরিবর্তনকে লেখক নির্দেশ করছেন এভাবে :

> প্রেমকে হেরম্ব অনুভব করছে না, উপলব্ধি করছে না, চিন্তা করছে না—সে প্রেম করছে। এ তার নব ইন্দ্রিয়ের নবলব্ধ ধর্ম। [পৃ. ২১৪]

'নব' শব্দের এই দুইবার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সূচিত হয়েছে তার ঐ পরিবর্তন।—তবে হেরম্বের এই চলিষ্ণুতা এখানেই থেমে থাকেনি—উপন্যাসের দ্বিতীয় ভাগে তার এই পরিবর্তনের পর সে ক্রমশ আবার ফেরে তার বুদ্ধিবাদিতায়, তার শীতল কঠিন নিস্পৃহ জগতে। প্রেমকে নিয়ে সে তৈরি করেছে থিয়োরি :

> নারীকে নিয়ে এক দিনের জন্য যে খেয়ালের খেলা খেলেছে, তুচ্ছ সাময়িক খেলা, প্রেমের উপযুক্ততা তার ক্ষুণ্ন হয়ে গেছে। মানুষের জীবনে তাই প্রেম আসে একবার, আর আসে না, কারণ একটি প্রেমই মানুষের যৌবনকে ব্যবহার করে জীর্ণ করে দিয়ে যায়। হৃদয় বলে মানুষের কাব্যে উল্লিখিত একটি যে শতদল আছে, তার বিকাশ স্বাভাবিক নিয়মে একবারই হয়, তারপরই শুরু হয় ঝরে যাবার আয়োজন। সাধারণ হৃদয়, প্রতিভাবানের হৃদয়, সমস্ত হৃদয় এই অখণ্ডনীয় নিয়মের অধীন, কারো বেলা এর অন্যথা নেই। [পৃ. ২৩৮]

আর এর জন্যেই হেরম্বের হৃদয়ের ও জীবনের যে-জাগরণ তা ক্ষণিকের, তারপরই আবার সে ফিরে যায় তার গহ্বরে। উপন্যাসের দ্বিতীয় ভাগের শেষে যে-হেরম্ব প্রেমানুভবের চূড়ায় উঠেছিল সে আবার নেমে যায়; তার যে-অসংযত স্পন্দন শুরু হয়েছিল, আবার তা কেবল প্রাত্যহিক প্রয়োজনেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্পন্দিত হতে থাকে। উপন্যাসের শেষে আছে ঐ ক্ষণিকতার সাক্ষ্য :

> হেরম্বের বুক হিম হয়ে আসে—কোথায় সেই প্রেম? পূর্ণিমা তিথির এক সন্ধ্যায় সে যা সৃষ্টি করেছিল? আজ রাত্রিটুকুর জন্য সেই অপার্থিব চেতনা যদি সে ফিরে পেত! [পৃ. ২৬৭]

—এইভাবে হেরম্ব যেখান থেকে শুরু করেছিল আবার ফিরে গেছে সেখানে। আবার সে হয়ে উঠেছে কেবল বিশ্লেষক, কেবল দর্শক, উপনিষদের দ্বিতীয় পাখি—যে কেবল দেখে, কিছু করে না। এজন্যেই সে পরীনৃত্যরত আনন্দকে আগুনে পুড়ে যেতে দেয় তার সামনেই বসে থেকে, কেননা ইতিমধ্যেই আনন্দের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিঁড়ে গেছে, আনন্দ এখন কেবল তার প্রাক্তন প্রেমিকা। এভাবেই একটি নারীর (উমা) আত্মহত্যার কারণ সে হয়েছিল একদিন, আবার আর-একদিন আর-একটি নারীও (আনন্দ) তার জন্যে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করে নেয়। যে-উপন্যাসের শুরুতে আমরা জেনেছিলাম একটি আত্মহত্যার সংবাদ, তার শেষ হলো আর-একটি আত্মহত্যায়। তফাত অবশ্য বিপুল এই দুই আত্মহত্যায়—উমার সঙ্গে হেরম্বের কোনো দিনই কোনোরকম হৃদয়-সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল বলে মনে হয় না; আর আনন্দের সঙ্গে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ আত্মবিজয়ী সম্বন্ধ তৈরি হয়েছে। কিন্তু ফলাফল তো একই!

যে-তিনজন নারীর সম্পর্কে এসেছিল হেরম্ব—উমা, সুপ্রিয়া ও আনন্দ—এক-হিশেবে তাদের তিনজনের জীবনই ব্যর্থ করে দিয়েছে সে। এই তিনজনের দুজন করেছে আত্মহত্যা, আর-একজন অসুখী নারী বারবার আত্মসমর্পণ করেও হেরম্বের মন জয় করতে পারেনি। কিন্তু আবার এক-হিশেবে এদের প্রত্যেকের পরিণাম পৃথক : উমার জীবনচরিত অনেকখানি অস্পষ্টই থেকেছে, আমাদের কল্পনা করে নিতে হয়; সুপ্রিয়া সত্যই অসুখী, ব্যর্থ প্রেমিকা; কেবল আনন্দের আত্মাহুতি আত্মাহুতি নয়—আত্মবিজয়, প্রেমের পরিপূর্ণতার মুহূর্তে সে আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে, প্রেমহীন জীবন সে আকাঙ্ক্ষা করে না। তিনটি নারীর জীবন যে ব্যর্থ করে দিয়েছে, সেই হেরম্ব কি নিষ্ঠুর ও পাশবিক? স্ত্রী ও প্রেমিকাদের প্রতি তার নিস্পৃহ শীতলতা থেকে ওরকম একটি ধারণা করা যেতে পারত; কিন্তু তা অসম্ভব, কেননা হেরম্ব আশ্চর্য সৎ : সে অনাথকে বলেছিল, তার মধ্যে 'বাহুল্য' নেই; মালতী একবার পরিষ্কার বলেছিল আনন্দকে, 'হেরম্ব লুকোচুরি ভালবাসে না।' আসলে হেরম্ব আত্মবিশ্লেষক ও সন্ধানশীল, তার নির্মোহতা বৈজ্ঞানিকের নির্মোহতা।

আমাদের মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। হেরম্বের শুরু হয়েছিল বুদ্ধিবাদী বিশ্লেষণমূলকতায়; আনন্দের সংস্পর্শে সে যে এতখানি উজ্জীবিত হবে, তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিস্ময়কর—কিন্তু বিশ্বাস্যভাবে বিস্ময়কর। এতখানি বুদ্ধিবাদী বলেই সে হয়তো আনন্দের অপাপ সান্নিধ্যে এতখানি বদলে গিয়েছিল। তার বুদ্ধিবাদিতায় প্রত্যাবর্তনও স্বাভাবিক আবার। হেরম্ব-যে চলিষ্ণু চরিত্র, সারা উপন্যাসের আন্তর-ও-বহির্ঘটনাবলিতেই আছে তার সাক্ষ্য।

সুপ্রিয়া : সুপ্রিয়ার চলিষ্ণুতার চিহ্ন উপন্যাসে আছে পরোক্ষভাবে। এমনিতে উপন্যাসের প্রথম ও তৃতীয় ভাগে যে-সুপ্রিয়াকে দেখা যায় সে হেরম্বের জন্যে পাগল, হেরম্বের প্রেমে মরিয়া, তার সর্বস্ব সমর্পণে উৎসুক। স্বামী অশোকের বাড়িতে থেকেই সে রাতে চলে যায় হেরম্বের কাছে, স্বেচ্ছায় নিজেকে দান করার জন্যে অস্থির-অধীর হয়ে যায়। হেরম্ব পুরীতে চলে গেলে সেখানেও সে ছোটে অশোককে নিয়ে—এবং আবার আত্মসমর্পণ করে হেরম্বের কাছে। হেরম্বের কঠিন প্রত্যাখ্যানেও সে কিছুতেই নিজেকে শান্ত করতে পারে না। উপন্যাসে তার চরিত্রের এই একটি রেখাই প্রকাশিত হয়েছে।

কিন্তু চিরদিন কি সুপ্রিয়া এমনি ছিল? ছিল না; প্রথম ভাগে সেই অতীত সুপ্রিয়ার পরিচয় আছে। বরাবরই সে জেদি ও একরোখা; কিন্তু প্রথম জীবনে সে তো হেরম্বের অনুরোধে ও বোঝানোতেই বিয়ে করেছিল অশোককে। হেরম্বকে ঘিরে তার 'কিশোর বয়সের কল্পনা' হেরম্বের অনুরোধেই সে চাপা দিয়েছিল। কিন্তু পাঁচ বছর 'বুনো দেশে' কাটিয়ে সুপ্রিয়ার মনে হয়, 'আমি এখন বড় হয়েছি। পাঁচ বছর ধরে ভেবে ভেবে আমি বুঝতে পেরেছি পৃথিবীতে একটা ব্যাপার হয় না। বেশ মোটা করে ভালবাসা বুঝিয়ে না দিলে—' উপন্যাসে আমরা এই পরিবর্তিত সুপ্রিয়াকেই দেখি। যে-সুপ্রিয়ার 'প্রকৃতির কল্পনাতীত সহিষ্ণুতা' হেরম্বের অজানা ছিল না, আজ তাকেই অবাক হয়ে বলতে হয়, 'তুই তো চিরদিন লক্ষ্মী মেয়ে ছিলি সুপ্রিয়া। এত অবাধ্য এত দুরন্ত কবে থেকে হলি?' [পৃ. ১৬৩]

মালতী ও অনাথ : মালতী ও অনাথ কুড়ি বছর আগে প্রেম করে গৃহত্যাগ করেছিল; এমনই তীব্র ছিল তাদের প্রেম যে পরিচিত সমাজ-সংসার ছেড়ে তারা চলে এসেছিল অজানা-অচেনা জায়গায়। কিন্তু আজ, কুড়ি বছর পরে তাদের সে-সম্পর্ক নেই আর। আজ কেবল টিকে আছে 'অনাথের অসংগত অবহেলার জবাবে মালতীর স্বেচ্ছাচারিতা...।' (পৃ. ২২০) তার উগ্র স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে হেরম্ব অবশ্য দেখতে পায় ভিখারির দীনতা—ক্রমাগত আত্মনিবেদন। কিন্তু ধ্যাননিবিষ্ট অনাথ একটা গাছ বা পাথরের মতোই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মালতীর আবেদনে উদাসীন থাকে। তাদের অন্তর্গত ভাঙন চূড়ান্ত রূপ পায় মালতীর জন্মদিনে, যে একটি দিনে অনাথ মালতীকে প্রত্যাখ্যান করে না, ঠিক সেই জন্মদিনেই অনাথ চলে যায় নিরুদ্দেশে। মালতীও মাঝরাতে তার খোঁজে বেরিয়ে যায়।

দিবারাত্রির কাব্য উপন্যাসে চরিত্রদের অনেকখানি প্রতিষ্ঠা দিয়েছে এদের মনস্তত্ত্ব। তাদের জীবনের গদ্যমুহূর্ত তথা বাস্তবতা এভাবেই প্রমাণিত হয়। এর ফলেই চরিত্রগুলি একরেখ হয়নি, হয়েছে জীবনের মতো বহুভঙ্গিম, এমনকি বৈপরীত্যময়। যে-হেরম্ব অনবরত সুপ্রিয়ার প্রেমনিবেদন প্রত্যাখ্যান করে গেছে, সে-ও দুর্বল হয়ে পড়েছে মাঝে-মাঝে : পুরীতে তার একবার মনে হয় : 'ক্রমাগত সুপ্রিয়ার চিত্তকে ভিন্নাভিমুখী করার চেষ্টায় মাঝে মাঝে তার ভ্রান্তি জন্মে যায়, সুপ্রিয়ার প্রেমকে হত্যা করার বদলে সে বুঝি প্রশ্রয় দিয়েই চলেছে।' (পৃ. ২৪৭) তার ঐ দ্বিধাদুর্বল আর-এক রকম সাক্ষ্য : 'আসন্ন সন্ধ্যায় সুপ্রিয়া স্খলিত পদে তার পরিত্যক্ত গৃহে প্রবেশ করার পর অন্ধকার পথে দাঁড়িয়ে তার অন্তরের পিপাসাকে ছাপিয়ে যে কোটি ক্ষুধিত কামনার হাহাকার উঠেছিল মাটির মানুষ হেরম্বকে তা এখনো আচ্ছন্ন করে রেখেছে।' (পৃ. ২৫৭) আবার, আনন্দকে প্রথম দেখেই হেরম্বের চিত্তের যে-জাগরণ তার সঙ্গে বাংলা উপন্যাসে বহুল-আচরিত 'প্রথম দৃষ্টিতে প্রেম'-এর কোনো সম্বন্ধ নেই : কেননা এই জাগরণের পিছনেও আছে মনস্তাত্ত্বিক নির্ভরতা :

> আনন্দকে দেখে তার [হেরম্বের] মনে হল সেই মালতীই যেন বিশ্ব-শিল্পীর কারখানা থেকে সংস্কৃত ও রূপান্তরিত হয়ে, গত বিশ বছর ধরে প্রকৃতির মধ্যে, নারীর মধ্যে, বোবা পশুপাখীর মধ্যে, ভোরের শিশির আর সন্ধ্যাতারার মধ্যে রূপ, রেখা ও আলোর অভিজ্ঞতা সঞ্চার করে, তাকে তৃপ্ত করার যোগ্যতা অর্জন করে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। / ...বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে সে [হেরম্ব] আনন্দকে দেখতে লাগল। তার মনের উপর দিয়ে কুড়ি বছর ধরে যে সময়ের স্রোত বয়ে গেছে, তাই যেন কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে ঘনীভূত হয়ে এসেছে। [পৃ. ১৭২]

চরিত্রের চলমানতার আরো উদাহরণ : যে-অশোক হেরম্বকে বলেছিল সুপ্রিয়া প্রসঙ্গে, 'রাগের মাথায় মত বদলে "কাকার কাছে চললাম, তোমার কাছে আর আসব না" বলে বিদায় নিলে তো বিপদেই পড়ে যাব।' সে-ই পুরীতে বৃষ্টির ভিতরে বাড়ির ছাদ থেকে সুপ্রিয়াকে ফেলে দিতে গিয়েছিল।

এ উপন্যাসে অনেক নাটকীয় ও ভয়ংকর ঘটনা ঘটেছে : আনন্দের আত্মহত্যা, সুপ্রিয়াকে ছাদ থেকে অশোকের ফেলে দেওয়ার চেষ্টা, অনাথ ও পরে মালতীর নিরুদ্দেশ যাত্রা। কিন্তু সবার পিছনে আছে মনস্তত্ত্বের গভীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমর্থন। এবং যৌনতাও, যে-যৌনতা মনস্তত্ত্বেরই অংশ। হেরম্ব সুপ্রিয়াকে মানসিকভাবে বারবার গ্রহণ করতে না-পারলেও অন্তত একবার তীব্র কামনায় আক্রান্ত হয়েছে; আনন্দের সঙ্গে তার প্রেমের সম্বন্ধেও আছে শরীরের সম্বন্ধ। মালতী হেরম্বকে অনাথের কথা তুলে বলেছিল, 'দেড় যুগ আঙুল দিয়ে ছোঁয় না...।' তার অসুখের প্রধান কারণ এই শারীরিক, মানসিক তো বটেই, অবহেলা। আনন্দ নৃত্যের ভিতর দিয়েই পায় তার বিবাহিত জীবনের স্বাদ ও অবসাদ। সুপ্রিয়া-যে বলে, 'কাব্য নিয়ে থাকলে আমার চলবে কেন? আমি যে একটা দিনের জন্য সুখ পেলাম না, সারাদিন আমার যে কিছু ভাল লাগে না। কিছুই ভাল লাগে না—' তার পিছনে হয়তো আছে জীবনের গদ্য—এক ক্ষুধিত যৌনতা। হেরম্ব পুরীতে মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে যা ভেবেছিল, হয়তো তা এই উপন্যাসের তীব্র ও চাপা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যৌনতার একটি প্রতীকী রূপ :

> এখানে আছে ভোরের পাখীর ডাক আর অসংখ্য কীটপতঙ্গের প্রণয়। পচা ডোবার জলে হয়ত আমিবা আত্মপ্রণয়ে নিজেকে বিভক্ত করে ফেলছে, তরু-বন্কলের আড়ালে পিপীলিকার চলেছে শুঁড়ে শুঁড়ে প্রণয়ভাষণ, হেরম্বের পায়ের কাছ দিয়ে এক হয়ে এগিয়ে চলেছে কর্ণজলৌকা দম্পতি, গাছের ডালে ডালে একজোড়া অচেনা পাখীর লীলাচাঞ্চল্য। [পৃ. ২২৯]

এই উপন্যাসের সমস্ত চরিত্রই—হেরম্ব, সুপ্রিয়া, অশোক, অনাথ, মালতী, আনন্দ—সবাই অসুখী। হেরম্ব ও উমা, সুপ্রিয়া ও অশোক, মালতী ও অনাথ—কোনো দম্পতিই সুখী নয়। এই কটি পরিবার পরস্পরের সম্পর্কে এসে আরো শুধু জ্বলেছে। সেই-যে আনন্দ হেরম্বের লোকালয়ের বাইরে ঘর-বাঁধার প্রস্তাবে বলেছিল, 'বিরক্ত আমরা নিজেদের নিজেরাই করব। আমরা মানুষ যে!' এই উপন্যাসে তা অক্ষরে-অক্ষরে ফলেছে।[১৪] এই উপন্যাসের নরনারীরা কেউ কারো সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে পারে না; কারো-কারো মধ্যে সম্পর্ক হয়তো একদিন তৈরি হয়েছিল, এখন ভেঙে গেছে; অশোক সুপ্রিয়ার সঙ্গে (ক্ষণিক), সুপ্রিয়া হেরম্বের সঙ্গে, মালতী অনাথের সঙ্গে, হেরম্ব আনন্দের সঙ্গে (ক্ষণিক) সম্পর্ক নির্মাণের জন্যে উৎসুক, কাতর ও দীন—কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়ে ওঠে না। সম্পর্ক শেষ হয় আত্মহত্যার ভিতর দিয়ে (আনন্দ), কঠিন শীতল নিস্পৃহতায়—যে-নিস্পৃহতা প্রেমিকাকে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেও ভাঙে না (হেরম্ব), বিশ্বাসভঙ্গে (সুপ্রিয়া—অশোকের প্রতি), ছাদ থেকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা (অশোক), নিরুদ্দেশ যাত্রায় (অনাথ ও মালতী)। শুধু এর মধ্যে একবারই সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল (হেরম্ব ও আনন্দের প্রেমে); কিন্তু তা যেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তীব্র তেমনি ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু 'মানুষের মৃত্যু-কবলিত জীবন যেমন সার্থক, তেমনি সার্থকতা ক্ষণজীবী হৃদয়েরও হয়তো আছে।'

তথ্যনির্দেশ

১. পৃ. ৪২৩, *আত্মস্মৃতি*: সজনীকান্ত দাস।

২. এই আলোচনায় *দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাস হিশেবে উল্লেখের সময় ব্যবহৃত হয়েছে দুটি উর্ধ্বকমা এবং উপন্যাসের তৃতীয়াংশ 'দিবারাত্রির কাব্য' উল্লেখের সময় একটি উর্ধ্বকমা।

৩. এই দূরবর্তিতার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত *পুতুলনাচের ইতিকথা* উপন্যাস ও মানিক-কৃত তার বিশ্লেষণ। ['পুতুলনাচের ইতিকথা: আত্মসমালোচনা', ছিন্ন লেখা, *এক্ষণ*, শারদীয়া ১৩৮৪]

৪. উপন্যাস ও কবিতা থেকে এর দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। আমরা বুঝে উঠতে পারি না হেরমান মেলভিলের *মবিডিক* উপন্যাসের তিমি মাছ প্রকৃতি না ভাগ্য কিংবা যৌনতা নাকি স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতীক। বিষ্ণু দের 'ঘোড়সওয়ার' কবিতার (*চোরাবালি*) ঘোড়সওয়ার ও চোরাবালি প্রকৃতি-পুরুষ, ভক্ত-ভগবান, পিষ্ট জনতা ও তার মুক্তি ইত্যাদি নানা অর্থেই উদ্ঘাটিত হতে পারে। (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-ও এই কবিতার অনেকরকম অর্থের অনুমান করেছেন। (*কুলায় ও কালপুরুষ*)।

৫. *পুতুলনাচের ইতিকথা* উপন্যাসেও এই অনন্যপরিণাম প্রতীকী ইঙ্গিত প্রযুক্ত:

> শশী ঘুরিয়া বাগানে গিয়া দ্যাখে জানালার নীচে তাহার অত সাধের গোলাপ-চারাটি কুসুম দুই পায়ে মাড়াইয়া মাটিতে পুঁতিয়া দিয়াছে। [পৃ. ৬১, *মা. গ্র.* ৩]

কিংবা *দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাসেই অনন্যপরিণাম আর একটি প্রতীকের প্রয়োগ:

> একটি নিরীহ ছোট কালো পিঁপড়ে, যারা কখনো কামড়ায় না কিন্তু একটু ঘষা পেলেই নিশ্চিহ্ন হয়ে প্রাণ দেয়, সেই জাতের একটি অতি ছোট পিঁপড়ে আনন্দের আঙুলে উঠে হেরম্বের চেতনায় নিজের ক্ষীণতম অস্তিত্বকে ঘোষণা করে দেয়। হেরম্ব তাকে স্থানচ্যুত করতে গিয়ে হত্যা করে ফেলে। [পৃ. ১৮৪, *মা. গ্র.* ১]

৬. *পুতুলনাচের ইতিকথা* উপন্যাসেও একটি symbolic landscape বা প্রতীকী ভূদৃশ্য ব্যবহৃত হয়েছে:

> সেই মাটির টিলাটি, যেখানে উঠে শশীর সর্বাঙ্গ শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, কয়েক মিনিটের ভবিষ্যৎও তাহার আর অবশিষ্ট নাই, সে এমনি অসহায়, এমনি ভঙ্গুর। পৃথিবীর বহু উর্দ্ধে, স্তরে স্তরে সাজানো ভয়ের তলে প্রোথিত পৃথিবীর উর্দ্ধে, একটা জঙ্গলাকীর্ণ মাটির টিলার শীর্ষে শশী হঠাৎ হারাইয়া গিয়াছে। সামনে রূপ-ধরা অনন্ত। সীমাহীন ধারণাতীত কী যে তাহার চারিদিকে ঘনীভূত হইয়া সীমাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছে শশী জানে না। কিন্তু আর কখনো নিঃশ্বাস সে লইতে পারিবে না। [পৃ. ৭৩, *মা. গ্র.* ৩]

এই মাটির টিলাটি গ্রামের সংকীর্ণ ও জটিল জীবনের উর্ধ্বে উঠে যাওয়ার এক প্রতীক—শশীর কাছে। ঐ উপন্যাসে একেবারে শেষ বাক্যে ফিরে এসেছিল ঐ প্রতীক প্রসঙ্গ:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাটির টিলাটির উপর উঠিয়া সূর্যাস্ত দেখিবার শখ এ জীবনে আর একবারও শশীর আসিবে না। [পৃ. ২১৭, *মা. গ্র.* ৩]

৭. *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৮. তাঁর নিজের কবিতায় মানিক কবিদের বলেছেন 'শব্দ-মদ বেচা শুঁড়ি' (*মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা*, যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত)।

৯. ত্রিশের দশকে লেখা কয়েকটি কাব্যধর্মী উপন্যাস: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *শেষের কবিতা* (১৯৩০), বুদ্ধদেব বসুর *সাড়া* (১৯৩০), *যেদিন ফুটল কমল* (১৯৩৩), *হে বিজয়ী বীর* (১৯৩৩), *ধূসর গোধূলি* (১৯৩৩), *লাল মেঘ* (১৯৩৪), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের *বেদে* (১৯২৮), *বিবাহের চেয়ে বড়ো* (১৯৩১), *প্রাচীর ও প্রান্তর* (১৯৩৩), *প্রচ্ছদপট* (১৯৩৪), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *দিবারাত্রির কাব্য* (১৯৩৫)।

১০. লেখকের উত্তরকালে রচিত উপন্যাস *পুতুলনাচের ইতিকথায়* শশীও একদিন ঠিক এভাবেই কুসুমের প্রেমনিবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিল তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে।

১১. এখানেই হেরম্বের সঙ্গে শশী-চরিত্রের মৌলিক একটি পার্থক্য ঘটে যায়।

১২. অনেক বছর পরে লেখা *চতুষ্কোণ*-এর (*দিবারাত্রির কাব্যর* আদি রচনার সূত্রপাত ১৯২৯ সালে, *চতুষ্কোণ* ১৯৪১ সালে) নায়কও এ রকম আত্মবিশ্লেষণশীল; কিন্তু হেরম্ব ও রাজকুমারের প্রকৃতির মধ্যে মিল থাকলেও পরিণাম সম্পূর্ণ ভিন্ন।

১৩. মানিকের সমকালীন একজন কবি, জীবনানন্দ দাশের কাব্যনায়িকা বনলতা সেন-ও তার প্রেমিককে একদিন এরকম জিজ্ঞাসাই করেছিল, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?' ['বনলতা সেন', *বনলতা সেন*]

১৪. এই উপন্যাসের বিবাহিত নরনারীদের এই অসুখের গাথা পড়তে-পড়তে অপ্রতিরোধ্যভাবে আমাদের মনে পড়ে যায় মানিকেরই সমকালীন কবি জীবনানন্দ দাশের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার আত্মহন্তারক বিবাহিত পুরুষটির কথা। এই কবিতায় কথিত 'বিপন্ন বিস্ময়ে'ই যেন আন্দোলিত হয়েছে *দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাসের নরনারীরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পদ্মানদীর মাঝি

> আজ রাত্রেই হয়তো কুবের মালাকে বুকে জড়াইয়া মিঠা মিঠা কথা বলিবে, পদ্মার ঠাণ্ডা বাতাসে জুড়াইয়া জুড়াইয়া কি যে মধুর হইয়া উঠিবে কুবেরের ব্যবহার! কাল হয়তো আবার সে কাঁদাইবে মালাকে মেজবাবুর কথা বলিয়া। এমনি প্রকৃতি পদ্মানদীর মাঝির, ভদ্রলোকের মত একটানা সংকীর্ণতা নয়, বিরাট বিস্তারিত সংমিশ্রণ।
>
> [পৃ. ১২৭, 'পদ্মানদীর মাঝি', *মা. গ্র.* ১]

AMARBOI.COM

১. ভূমিকা

বলা হয়ে থাকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের দুটি পর্যায় : ১. ফ্রয়েড-উদ্বুদ্ধ : *জননী* (১৯৩৫) থেকে *প্রতিবিম্ব* (১৯৪৩)—মোট দশটি উপন্যাস; এবং ২. মার্ক্স-উদ্বুদ্ধ : *দর্পণ* (১৯৪৫) থেকে তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ উপন্যাস *মাশুল* (১৯৫৬) এবং মৃত্যুর পরে প্রকাশিত আরো কয়েকটি উপন্যাস—মোট উনতিরিশটি উপন্যাস।[১]

কিন্তু মানুষের মনকে কি এ রকম কোনো জল-অচল-ভাগে (water-tight compartment) বিভক্ত করা যায়? উপরন্তু যে-লেখকের জীবনকাল মাত্র ৪৮ বছর, যাঁর সৃষ্টিকাল মাত্র ২৮ বছর, তার মধ্যে প্রথম পর্যায় মোটামুটি ১৬ বছর, উত্তর-পর্যায় মোটামুটি ১২ বছর—তাঁকে ততখানি পরিষ্কারভাবে দ্বিধাবিভক্ত করা যায় না। এই সূত্রে স্মরণীয় ১৯৪৪ সালে কম্যুনিজম গ্রহণের বছরে মানিকের বয়স ৩৬। ৩৬ বছর বয়সে একজনের মানসতার যে-প্যাটার্ন তৈরি হয়ে যায় তা উত্তরকালে একেবারে বর্জন করা অসম্ভব, মানিকও পারেননি বা করেননি। চরিত্রের অন্তর্লোক নির্মাণের অভ্যাস তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখনোই সম্পূর্ণ বর্জন করেননি, বহির্বাস্তবতা রূপায়ণের অঙ্গীকার যত দৃঢ়ই হোক অন্তর্বাস্তবতা অঙ্কনের অভ্যাস ছাড়তে পারেননি তিনি কখনো। আর কি অন্তর্বাস্তবতা কি বহির্বাস্তবতা—দুয়েরই প্রয়োগের কেন্দ্রে কাজ করে যাচ্ছিল তাঁর নিজের মন, তাঁর অবিরল জিজ্ঞাসা, পরীক্ষা ও সন্ধান। এজন্যেই আমাদের বিশ্বাস মানিক কেবল তাঁর জীবনজিজ্ঞাসায় স্তরের পর স্তর উন্মোচন করে যাচ্ছিলেন, সে-সন্ধানে ছিল অস্থিরতা, অবিরলতা ও ছেদহীনতা, কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে তিনি পৌছোননি। মৃত্যু, যে-পর্যায়ে যতি টেনে দিয়েছিল সেটাই অবশ্য আপাতভাবে চূড়ান্ত, কিন্তু আপাতভাবেই, কেননা প্রকাশ্যে কম্যুনিজমে তীব্রভাবে আস্থাবান হয়েও জেগে উঠেছিল তাঁর আধ্যাত্মিক এষণা : গোপনে নিয়েছিলেন কালীমাতার শরণ।[২] এই দিক থেকে মানিকের ৪৮ বছর বয়সে মৃত্যু প্রকৃতই অকালমৃত্যু, শেষ পর্যন্ত তাঁর রচনায় ছিল না কোনো প্রৌঢ়িক প্রশান্তি, শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবন ছিল আত্ম-বৈপরীত্যে ও স্ববিরোধিতায় বিশৃঙ্খল, রচনায় ও জীবনে কোনো সুশান্ত ও স্বস্তিদায়ী সমীকরণে তিনি পৌছোননি। তাই তাঁর সাহিত্যিক আচরণ লিও টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০) বা পাবলো নেরুদার (১৯০৪-৭৩) মতো হয়নি। টলস্টয় তাঁর প্রথম জীবনে রচিত প্রধান দুটি উপন্যাসে *ওয়ার অ্যান্ড পিস* (১৮৬২-৬৯) এবং *আনা কারেনিনা*কে (১৮৭৫-৭৭) উত্তরকালে তাঁর বিখ্যাত রূপান্তরের (১৮৭৯ নাগাদ) পরে নাকচ করে দিয়েছিলেন। আর নেরুদা তাঁর প্রথম যৌবনে রচিত প্রেমকামময় অতিরোমান্টিক কবিতার পুনঃপ্রকাশ উত্তরকালে বন্ধ রেখেছিলেন। কিন্তু মানিক কম্যুনিজমে দীক্ষিত হওয়ার (১৯৪৪) পরে *পুতুলনাচের ইতিকথার* যে আত্মভাষ্য[৩] রচনা করেছিলেন, তার সঙ্গে একমত হতে পারেন না সমাজতান্ত্রিক সমালোচকও।[৪] টলস্টয় বা নেরুদার দীর্ঘ জীবন পাননি মানিক; তাঁদের আর্থিক, সামাজিক ও পারিবেশিক আনুকূল্যও তাঁর ভাগ্যে জোটেনি; তাঁর প্রথম জীবনের কোনো-কোনো উপন্যাসের নায়কের মতোই মানিক ছিলেন আত্মসন্ধানী, বিশ্লেষণশীল[৫] ও অকরুণ ভাগ্যের হাতের ক্রীড়নক। মানিক-মানসের ক্ষিপ্রতা ও দ্রুততার কথা মনে রেখেও আমরা ভুলতে পারি না *দিবারাত্রির কাব্যর* ভূমিকায় তিনি এটুকু মাত্র লিখেছিলেন, 'দিবারাত্রির কাব্য আমার একুশ বছর বয়সের রচনা। শুধু প্রেমকে ভিত্তি করে বই লেখার সাহস ওই বয়সেই থাকে।' এই ভূমিকা লিখেই ক্ষান্তি মেনেছিলেন, পুরো উপন্যাসটিকে খারিজ করে দেননি। মানিকের সততা ও অঙ্গীকারের দার্ঢ্য আমরা জানি। অনেক অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ প্রমাণ থেকে এটাই বরং মনে হয়, মানিকের রচনায় ঐ দুটি ধারা ছিল : অন্তর্মুখীন ও বহির্মুখীন।[৬]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐ দুই ধারারই উদ্‌গতি হয়েছিল মানিকের প্রথম পর্যায়েই। শুধু প্রথম পর্যায়ে ছিল অন্তর্মুখিনতার প্রাধান্য, পরবর্তী পর্যায়ে বহির্মুখিনতার প্রাধান্য। সরাসরি দুটি ভাগ করে ফেললে প্রথম পর্যায়ে *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬), *সহরতলী* (দুই পর্ব, ১৯৪০-৪১) ও *প্রতিবিম্ব*র (১৯৪৩) মতো উপন্যাস কীভাবে লিখিত-প্রকাশিত হলো তার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না। মানিক স্বয়ং লিখেছেন :

> লিখতে আরম্ভ করার পর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আগেও ঘটেছে, মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয় হবার পর আরও ব্যাপক ও গভীরভাবে সে পরিবর্তন ঘটাবার প্রয়োজন অনুভব করি।

আত্মচেতন মানিক অনিবার্য ঐ জিজ্ঞাসার পাশ কাটিয়ে না-গিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলেছিলেন :

> প্রকৃতপক্ষে মার্কসবাদ ঘাঁটতে ঘাঁটতে যখন আমার এত দিনের লেখার ত্রুটিদুর্বলতাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, আমার সাহিত্য সৃষ্টি মানুষকে এগিয়ে যেতে এতটুকু সাহায্য করার বদলে আরও বিভ্রান্ত করছে কিনা সন্দেহ জেগেছিল এবং সোজাসুজি নিজেকে প্রশ্ন করতে হয়েছিল যে, আমার অর্ধেক জীবনের সাধনা কি বাতিল বলে গণ্য করতে হবে?

না, মানিক তা করেননি—আমরা সকলেই তা জানি। নিজের প্রাক্তন রচনার শত স্খলন-পতন-ত্রুটি তখন (অর্থাৎ পরবর্তী পর্যায়ে) আবিষ্কার করলেও তখনো তিনি জানতেন নিজের অতীত রচনায় সত্যসন্ধানের সিঁড়িগুলি গভীরভাবে স্থাপিত হয়ে আছে এবং তা 'মানুষকে এগিয়ে যেতে' সাহায্যই করবে। মোহহীন মানিক-চারিত্র আমাদের জ্ঞাত বলেই আমরা বিশ্বাস করতে পারি, তাঁর 'অর্ধেক জীবনের সাধনা'কে সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্য বলে মনে হলে তাকে বাতিল করতে মানিক এতটুকু ইতস্তত করতেন না।

আমাদের মোট কথা এই।—মানিকের জীবনের ও রচনার সন্ধানের (মানিকের নিজের ভাষায় লেখকের জন্যে প্রয়োজন 'জীবনকে দেখার বিরতিহীন শ্রম')—ঐ বিরতিহীন শ্রমের ও সন্ধানের কোনো সমীকরণ শেষ পর্যন্ত সাধিত হয়নি। কাজেই কম্যুনিজম গ্রহণের আগে-পরে মানিক-সাহিত্যের যে-বিভাজন করা হয়ে থাকে তা সাধারণভাবে সত্য হলেও গভীর অর্থে সত্য নয়। শেষ পর্যন্ত মানিক কোনো সমাধানে পৌছোননি : তাঁর প্রথম পর্যায়ে ফ্রয়েডবাদ গ্রহণ, পরবর্তীকালে মার্ক্সবাদে দীক্ষা, একেবারে শেষদিকে কালীমাতার আশ্রয় ভিক্ষা : এই পরিবর্তমান ক্রমচলিষ্ণুতার মধ্যেই মানিক চাচ্ছিলেন তাঁর শরীর ও মনের, ব্যক্তি ও সমাজের, অভিজ্ঞতা ও অঙ্গীকারের (commitment), অস্তিত্ব ও চৈতন্যের, জীবন ও রচনার একটি সামঞ্জস্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধন। তাঁর উপন্যাসও (বা সমগ্র রচনাবলিই) এক-হিশেবে ছিল ঐ আত্মপ্রকাশের অস্ত্র বা মাধ্যম। তাঁর শেষ একাধিক উপন্যাসের মতোই তাঁর ঐ আত্মসন্ধানও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে—যত দুঃখজনকই হোক, এ তথ্য আমাদের স্বীকার না-করে উপায় নেই। মানিক বিশ্বাস করতেন রচনার সম্পূর্ণতায়, অন্তর্গত সম্পূর্ণতায়, তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসে (এবং অন্যান্য রচনায়) আছে ঐ শৈল্পিক সম্পূর্ণতা; কিন্তু সমগ্রভাগে তাঁর জীবনের ও রচনার সম্পূর্ণতা সাধিত হয়নি। আজ অবশ্য তাঁর রচনাবলি থেকেই আমাদের মানিক-মানস বুঝে নিতে হবে;—কিন্তু ঐ অসম্পূর্ণতার কথা ভুলে গিয়ে নয়। কোনো লেখকই তাঁর কাজ শেষ করে যেতে পারেন না, সেই হিশেবে সব লেখকই অসম্পূর্ণ, আশি বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথও তাঁর কাজ হয়তো সম্পূর্ণ করতে পারেননি; কিন্তু ক্রমাগত জিজ্ঞাসার অত্যাচারে অস্থির, অবিরল আত্মসন্ধানে জর্জরিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে ঐ উক্তি (সন্ধানের অসম্পূর্ণতা) আরো সত্যি।

পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬) এমন-একটি উপন্যাস, যেখানে চিত্রিত হয়েছে নিম্নবিত্তের জীবন, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের সংকীর্ণতাকে আক্রমণও করা হয়েছে। তখনো মানিক মার্ক্সবাদে দীক্ষা নেননি। *পদ্মানদীর মাঝি* বহির্জীবনের গাথা—কিন্তু অন্তর্জীবনেরও। কম্যুনিজম গ্রহণের অনেক আগে রচিত এই উপন্যাস প্রমাণ করে, মানিকের মনোজীবন দ্বিধাবিভক্ত ছিল না; সাধারণ মানুষের প্রতি প্রথম থেকেই তাঁর ছিল ঐকান্তিক ভালোবাসা, আগ্রহ ও সহানুভূতি।

AMARBOI.COM

২. 'বিরাট বিস্তারিত সংমিশ্রণ'

পদ্মানদীর মাঝি মানিকের বহির্মুখী ধারার প্রথম উপন্যাস। মধ্যবিত্তের বাইরে, একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীকে তিনি বৃহৎ সামাজিক পটভূমির উপর দাঁড় করাতে চেয়েছেন। কিন্তু এ নিছক বহির্বাস্তবতার উপন্যাস নয়;—বহির্বাস্তব উপন্যাসের লক্ষণসমূহের (বস্তুবাদিতা, আঞ্চলিকতা, লোকজীবনের রূপায়ণ, দেশজ সংলাপ ইত্যাদি) সঙ্গে এখানে কাজ করেছে প্রথম পর্যায়ের অন্তর্মুখ উপন্যাসগুচ্ছের সাধারণ লক্ষণসমূহ (কবিত্ব, মনস্তত্ত্ব, রহস্যবোধ, নিয়তি, প্রতীক ইত্যাদি)।

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের মহৎ সাফল্য এখানে যে ঐ বহির্মুখ ও অন্তর্মুখ ধারার 'বিরাট বিস্তারিত সংমিশ্রণ' এখানে ঘটেছে। ঐ সংমিশ্রণ বিশেষভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লক্ষ করেছেন মানিক নিম্ন সমাজের মানুষদের মধ্যে। ঐ সংমিশ্রণের ফলেই পদ্মা নদীর তীরবর্তী মানুষেরা নেহাত আঞ্চলিক চরিত্র হয়ে থাকেনি, হয়ে উঠেছে ব্যক্তিত্বচিহ্নিত মানুষ।

তথ্যনির্দেশ

১. মানিকের উপন্যাসের সংখ্যার নানা রকম হিসাব দেখা যায় এজন্যে যে, দুটি উপন্যাস *সহরতলী* ও *সোনার চেয়ে দামী*—দুখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা এ দুটিকে এক-একটি উপন্যাস হিশেবে বিবেচনা করেছি: মৃত্যুর পরে প্রকাশিত অসম্পূর্ণ ও কিশোর উপন্যাসও এই তালিকায় ধরেছি।

২. সাক্ষ্য *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* গ্রন্থভূর্ত মানিকের ডায়েরির ১৯৫৪-৫৬-র অতিলৌকিক উল্লেখগুলি।

৩. 'ছিন্ন লেখা' : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। *এক্ষণ*, শারদীয়া ১৩৮৪।

৪. নারায়ণ চৌধুরী লিখেছেন :

> মানুষের জীবন ভাগ্যের হাতে ক্রীড়নকস্বরূপ, অদৃশ্য সুতোর টানে সংসার রঙ্গমঞ্চে পুতুলের মতো নাচা ছাড়া মানুষের অন্য কোনো ভূমিকা নেই—ভারতীয় অদৃষ্টবাদের এই বক্তব্য *পুতুলনাচের ইতিকথার*ও বক্তব্য।
>
> [পৃ. ১২৮, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', *চতুরঙ্গ*]

৫. রবীন্দ্রনাথ ১৩ জুলাই ১৯৩৫ সালে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'হয়তো আমিও আমার গল্পে নিজেকে প্রকাশ ক'রে থাকি।...আমার পাত্ররা আমারই মতো কল্পনাশীল, তোমার পাত্ররা তোমারই মতো চিন্তাশীল।' (*দেশ*, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮০)। উপন্যাসে আত্মপ্রক্ষেপের এই অর্থেই মানিককে বলেছি বিশ্লেষণশীল।

৬. *পরিচয়* পত্রিকায় (কার্তিক ১৩৬৪) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রথম স্মৃতিবর্ষ' উদ্‌যাপন করতে গিয়ে যথার্থই বলা হয়েছিল :

> শিল্পকর্ম ও দৃষ্টিভঙ্গির অভিনব স্বাতন্ত্র্যে মৌলিকতায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে এ দেশের সব-সেরা লিখিয়েদের একজন। বাংলা সাহিত্যে বস্তুবাদী অথচ অন্তর্মুখিন রচনারীতির প্রধান রূপকার তিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুতুলনাচের ইতিকথা

জানিবার এত বিষয়, উপভোগ করিবার এত উপায়, বিজ্ঞান ও কাব্য মিশিয়া এমন জটিল, এমন রসালো মানুষের জীবন?

[পৃ. ১৩, 'পুতুলনাচের ইতিকথা', *মা. গ্র.* ৩]

১. পটভূমি

AMARBOI.COM

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদি উপন্যাস হিশেবে আমরা ধরতে পারি তাঁর প্রথম পর্যায়ের ছ'টি উপন্যাস : ১. *জননী* (১৯৩৫), ২. *দিবারাত্রির কাব্য* (১৯৩৫), ৩. *পুতুলনাচের ইতিকথা* (১৯৩৬), ৪. *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬), ৫. *জীবনের জটিলতা* (১৯৩৬); এবং ৬. *অমৃতস্য পুত্রাঃ* (১৯৩৮)।

মানিকের জন্ম ১৯০৮ সালে। বিশ বছর বয়সে, ১৯২৮ সালে তাঁর প্রথম গল্প 'অতসী মামী' প্রকাশিত হয়। ১৯২৯ সালে, একুশ বছর বয়সে, মানিক তাঁর প্রথম উপন্যাস *দিবারাত্রির কাব্য* রচনা শুরু করেন। ১৯৩৪ সালে *বঙ্গশ্রী* পত্রিকায় *দিবারাত্রির কাব্য* প্রকাশিত হয় ধারাবাহিকভাবে। *পদ্মানদীর মাঝি*-ও ঐ বছর *পূর্ব্বাশা* পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৩৫ সালে *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় *পুতুলনাচের ইতিকথা* ধারাবাহিক বেরোতে থাকে। ১৯৩৮ সাল অব্দি ঐ ছ'টি উপন্যাস প্রকাশিত হয়।

১৯৩৮ সাল পর্যন্ত মানিকের উপন্যাসের একটি পর্যায় ধরবার কারণ আছে। চার-পাঁচ বছরের বিরামহীন সাহিত্যিক শ্রমের ফলে মানিক মৃগী রোগে আক্রান্ত হন। এটা প্রথম ঘটেছিল ১৯৩৫ সালে—*পুতুলনাচের ইতিকথা* লিখছেন তখন মানিক। চিকিৎসার অতীত এই রোগ মানিকের আমৃত্যু সহচর ছিল। বালক বয়সেই তাঁর মা মারা গিয়েছিলেন, এবং তাঁর দেখাশোনার জন্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ ছিল না। এর মধ্যে বি.এস-সি. পরীক্ষা দিয়েছিলেন তিনি একাধিকবার, পাশ করতে পারেননি। এবং তাঁর সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিয়েছিল সাহিত্য। মানিকের পত্রাবলি থেকে দুটি সাক্ষ্য :

১. অঙ্কশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি.এস-সি. পড়বার সময় আমি সাহিত্য করতে নামি—বাড়ীর লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে। কারণ, তখন আমি অনুভব করছিলাম যে সাহিত্যজগতে একটা বড়রকম পরিবর্তন ঘটতে চলেছে, এরকম সন্ধিক্ষণে সাহিত্য সৃষ্টি করার বদলে অন্য কাজে সময় নষ্ট করা যায় না।

[পত্রসংখ্যা ২৩, *অ. মা. র.*]

২. প্রথমদিকে "পুতুলনাচের ইতিকথা" প্রভৃতি কয়েকখানা বই লিখতে মেতে গিয়ে যখন আমি নিজেও ভুলে গিয়েছিলাম যে আমার একটা শরীর আছে এবং পরিবারের মানুষেরাও নিষ্ঠুরভাবে উদাসীন হয়ে গিয়েছিল তখন একদিন হঠাৎ আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। এক মাস থেকে দু তিন মাস অন্তর এটা ঘটতে থাকে। তখন আমার বয়স ২৮/২৯—৪/৫ বছরের প্রাণান্তকর সাহিত্য সাধনা হয়ে গেছে।

[পত্রসংখ্যা ২৪, *অ. মা. র.*]

AMARBOI.COM

পারিবারিক বিরোধ, দারিদ্র্য ইত্যাদি কারণে মানিককে জীবিকার সন্ধান করতে হয় অতঃপর। ১৯৩৭ সালে মানিককে ঐ প্রত্যক্ষ বাস্তবের মোকাবিলা করতে হয়। ঐ ১৯৩৭ সালেই তিনি সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য সম্পাদিত মাসিক ও সাপ্তাহিক *বঙ্গশ্রী* পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিশেবে যোগ দেন। ১৯৩৭ সালে ভারতবর্ষ-ব্যাপী শ্রমিক অসন্তোষ শুরু হয়। মানিক ছিলেন তার দর্শক। সেই অভিজ্ঞতা তিনি পরবর্তীকালে কাজে লাগিয়েছিলেন। মোটামুটিভাবে *বঙ্গশ্রী* পত্রিকায় কাজ করার দুটি বছর বড়ো কোনো সাহিত্যকাজে হাত দিতে পারেননি তিনি—দ্বিতীয় বছরে *অমৃতস্য পুত্রাঃ* উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে বেরিয়েছিল কেবল। এই ১৯৩৮ সালে মানিকের বয়স ৩০, এ বছর তিনি বিয়েও করেন। তাঁর পরবর্তী উপন্যাস *সহরতলী* বের হয় ১৯৪০ সালে—তত দিনে মানিকের জীবনদৃষ্টি অনেকখানি পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সেজন্যে ঐ ১৯৩৮ সালটিকে তাঁর উপন্যাসচর্চার আদি পর্যায়ের শেষ হিশেবে চিহ্নিত করেছি।

২. বাস্তবতা—অন্তর্বাস্তবতা, বহির্বাস্তবতা

তাঁর আদি পর্যায়ের তৃতীয় উপন্যাস *পুতুলনাচের ইতিকথায়* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাস্তবতার সমগ্রতাকে'ই[১] ধারণ করতে চেয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাসে যে-গ্রামজীবনকে রূপায়িত করেছেন মানিক, বাংলা উপন্যাসে আর-কখনো তা দেখা যায়নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *গল্পগুচ্ছ*-এ পল্লীজীবনকে টুকরো-টুকরোভাবে উপস্থিত করলেও উপন্যাসের বৃহৎ পরিসরে গ্রামকে নিয়ে আসেননি কখনো। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের (১৮৭৩-১৯৩২) উপন্যাসের সুশান্ত গ্রামজীবন-যে ক্লিন্ন হয়ে উঠেছিল কতখানি, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) *পল্লীসমাজ* (১৯১৬) উপন্যাসে আছে তার সাক্ষ্য। কিন্তু *পল্লীসমাজ*-এ বর্ণিত গ্রামজীবন বহির্বাস্তবতার ছবিই ধরেছে অনেকখানি, গ্রামের মানুষের অন্তর্গত জীবনকে ধরতে পারেনি—অন্তত *পুতুলনাচের ইতিকথার* সঙ্গে তার তুলনায় তা স্পষ্ট হয়: শরৎচন্দ্রের *পল্লীসমাজ*-এর মানুষগুলি শেষ-অব্দি গ্রামসীমারই বাসিন্দা, *পুতুলনাচের ইতিকথার* নরনারী সর্বতোভাবে গ্রামনিবাসী হলেও শেষ পর্যন্ত গ্রামোত্তর। এর কারণ শরৎচন্দ্র কেবল বাস্তবতার উপরিভাগ নিয়ে কাজ করেছেন কিংবা বড়োজোর মানিক-কথিত 'কাঁচা মনের অস্থায়ী আবেগ' নিয়ে এবং মানিক চেয়েছেন তাঁর কথিত 'বাস্তবতার সমগ্রতাকে' একটি আধারে ধারণ করতে। উপন্যাসের নায়ক শশীর উক্তি ও উপলব্ধি :

> জীবনকে দেখিতে শিখিয়া, অন্তত অসম্পূর্ণ ভাসা-ভাসা ভাবে জীবনকে দেখিতে শিখিয়া, সে অবাক হইয়া দেখিয়াছে যে, এইখানে, এই ডোবা আর মশা-ভরা গ্রামে জীবন কম গভীর নয়, কম জটিল নয়। [পৃ. ৫৭]

পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাসে মানিক সব সময় 'বৈজ্ঞানিক বিচারবোধ'[২] দ্বারাই পরিবেশ, ঘটনা ও চরিত্র নির্মাণ করেছেন। এবং তাঁর ভাষাব্যবহারেও কাজ করেছে ঐ বৈজ্ঞানিক পরিমাণজ্ঞান। অলৌকিকতার ষোলো-আনা সুযোগ থাকলেও এক-মুহূর্তও তিনি তাকে প্রশ্রয় দেননি—বরং তাঁর দৃষ্টি সব সময় বিজ্ঞানস্বচ্ছ, বাক্য যুক্তিজালশৃঙ্খলিত। পরিবেশ বর্ণনায় তাই এরকম দৃষ্টিপাত :

> গ্রামের লোক ভয় করিতে ভালবাসে। গ্রামের বাহিরে খালের এপারের ঘন জঙ্গল ও গভীর নির্জনতাকে তাহারা ঐ কাজে লাগাইয়াছে। ভূত-প্রেতের অস্তিত্ব হয়তো গ্রাম-বাসীরই ভীরু কল্পনায়, কিন্তু স্থানটি যে সাপের রাজ্য তাতে সন্দেহ নাই। [পৃ. ১]

ঘটনা—যে-ঘটনা নিয়ে উচ্ছ্বাস ও অলৌকিকতার পূর্ণ সুযোগ ছিল, সেই যাদব ও পাগলদিদির স্বেচ্ছামৃত্যুর পরে শশীর অনুভবে যেমন বিজ্ঞানসম্মত বাস্তবতা তেমনি হৃদয়ও অনুপস্থিত নয় :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কত সংকীর্ণ দুর্বল চিত্তে যে যাদব বৃহতের জন্য, মৃদু হোক, প্রবল হোক, ব্যাকুলতা জাগাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন, শশী তাই ভাবে। যখন ভাবে, তখন আপিমের ক্রিয়ায় যাদবের চামড়া ঢাকিয়া চটচটে ঘাম, বিন্দুর মতো ছোট হইয়া আসা চোখের তারকা আর মুখে ফেনা উঠিবার কথা সে ভুলিয়া যায়। [পৃ. ১২৪]

আর চরিত্রচিত্রণে এই নিরাসক্ত বিজ্ঞানধর্মী বাস্তবতা যে কত বেশি, এই উপন্যাসের প্রায় সব চরিত্রেই রয়েছে তার স্বাক্ষর। নায়ক শশীকেও মানিক সাধারণ মানুষ করেই এঁকেছেন, কোনো আরোপিত মহত্ত্বের আসনে বসাননি :

শশীর চরিত্রে দুটি সুস্পষ্ট ভাগ আছে। একদিকে তাহার মধ্যে যেমন কল্পনা, ভাবাবেগ ও রসবোধের অভাব নাই, অন্যদিকে তেমনি সাধারণ সাংসারিক বুদ্ধি ও ধনসম্পত্তির প্রতি মমতাও তাহার যথেষ্ট। [পৃ. ১০]

একদিকে তার হারু ঘোষের বাড়ির অদূরে তালবনের ধারে মাটির টিলার উপরে উঠে সূর্যাস্ত দেখার 'ছেলেমানুষী শখ' (পৃ. ৭৩), আর-একদিকে বাসুদেব বাঁড়ুজ্জে সপরিবারে যখন গ্রামত্যাগের আয়োজন করেন তখন শশী তাঁর বাড়ি গিয়ে ঝগড়া করে তাঁর সমস্ত ভিজিট আর ওষুধের বাকি টাকা আদায় করে। এবং এই আদায় করতে গিয়ে 'কোন পক্ষেরই মান অপমানের পার্থক্য রহিল না।' (পৃ. ৭৫) আর শশী চরিত্রের বাস্তবতা নির্মিত হয়েছে পর-পর এরকম বিপরীত সব ঘটনায়। আর এই বাস্তবতার প্রয়োগ আছে ভাষার ব্যবহারেও—বহির্বাস্তবতা আর মনোবস্তবতা দুইকেই স্পর্শ করে এমন ভাষা। কখনো তাঁর ভাষা ভেসে যায় না আবেগের তোড়ে, যাকে তিনি বলেছেন 'ভাবপ্রবণতা', 'কাঁচা মনের অস্থায়ী আবেগ'। তাঁর ভাষা চাঁচাছোলা বক্তব্যকেই উপস্থিত করে—কিন্তু সে-ভাষা মনোলোক ও বহির্লোক দুই-এরই উপযোগী। সে-ভাষা একদিকে নিছক সংবাদবহ :

শেষ রাত্রে একটি ছেলে হইল সেনদিদির, ভোরবেলা সেনদিদি মরিয়া গেল। [পৃ. ১৯৯]

অন্যদিকে প্রয়োজনে মনোলোকের গভীর স্তর-স্পর্শী :

শশীর সর্বাঙ্গ শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, কয়েক মিনিটের ভবিষ্যৎও তাহার আর অবশিষ্ট নাই, সে এমনি অসহায়, এমনি ভঙ্গুর। পৃথিবীর বহু উর্দ্ধে, স্তরে স্তরে সাজানো ভয়ের তলে প্রোথিত পৃথিবীর উর্দ্ধে, একটা জঙ্গলাকীর্ণ মাটির টিলার শীর্ষে শশী হঠাৎ হারাইয়া গিয়াছে। সামনে রূপ-ধরা অনন্ত। সীমাহীন ধারণাতীত কী যে তাহার চারিদিকে ঘনীভূত হইয়া সীমাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছে শশী জানে না; কিন্তু আর কখনো নিঃশ্বাস সে লইতে পারিবে না। [পৃ. ৭৩]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানিক প্রকৃতিবাদী শিল্পী নন; নেহাত-বস্তুবাদী শিল্পীও নন; অন্তর্বাস্তবতার শিল্পী বরং—সব সময় তাঁর লক্ষ্য inner man, বস্তুকে ব্যবহার করে বস্তুর ভিতরে চলে যান তিনি। একটি উদাহরণ :

> রোদ উঠিলে মতি বাড়ি গেল। শশী ভাবিল, এমন গেঁয়ো স্বভাব, দেখতে তো গেঁয়ো নয়? আর মতি ভাবিল, শেষের দিকে ছোটবাবু আমাকে কি করে দেখছিল? আমাকে দেখতে দেখতে কি ভাবছিল ছোটবাবু? [পৃ. ৩৪]

এরকম অজস্র উদাহরণ আহরণ করা যায়। প্রায় সব চরিত্রেরই গোপন প্রদেশটিতে আলো ফেলে-ফেলে এগিয়ে যান মানিক।

৩. রহস্যময়তা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নেহাত-বস্তুবাদী শিল্পী নন—অনেকখানি অন্তর্বাস্তবতার শিল্পী। এর সাক্ষ্য তাঁর চরিত্রের মনোবাস্তবতায় যেমন প্রাপ্তব্য তেমনি পাওয়া যাবে তাঁর রহস্যময়তার ব্যবহারে। মানিক প্রকৃতিপন্থী ঔপন্যাসিক তো ননই, পুরোপুরি বস্তুবদ্ধ বা বস্তুনিমজ্জিত নন—শেষ পর্যন্ত, এবং প্রায়ই, বস্তু-অতিক্রমী; তাঁর চরিত্র ও ঘটনা চিত্রণের রহস্য, তাঁর রচিত প্রেম ও কাম—এক কথায় জীবনের অপার অতল নামহীন ব্যাখ্যাহীন দুর্জ্ঞেয় সব রহস্য যেন কিছুতেই ফুরোয় না।

শুধু রহস্যানুভূতির উল্লেখেই রহস্য সৃজিত হয় না, কিন্তু উল্লেখে স্বচ্ছ হয়ে আসে লেখকের মনোভঙ্গি। শত যন্ত্রণার মধ্যেও ('শশীর বিষণ্নতা ঘুচিবার নয়।'—পৃ. ৯) *পুতুলনাচের ইতিকথার* নায়ক শশী যেমন অনুভব করে : 'জানিবার এত বিষয়, উপভোগ করিবার এত উপায়, বিজ্ঞান ও কাব্য মিশিয়া এমন জটিল, এমন রসালো মানুষের জীবন?' (পৃ. ১৩), মানিকও তেমনি সহস্র কুশাঙ্কুরে বিদ্ধ হয়েও জীবনকে যে ভোগ করেন তা শেষ পর্যন্ত লুকোনো থাকে না। অনেক মানসকূটের লিপিকার হওয়া সত্ত্বেও এই জীবনভোগ ও জীবনলিপ্সা মানিককে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করেছে—মানুষ হিশেবে এবং শিল্পী হিশেবে। মর্বিড হয়ে যাননি তিনি, হননি কেবল রুগ্‌ণ মনের ভাষ্যকার, হয়ে পড়েননি বস্তু-আবদ্ধ বস্তুবাদী। জীবনের এক তলকূলহীন রহস্যের বোধ তাঁকে ঐ বস্তুবলয়ের মধ্যে চংক্রমণ থেকে রক্ষা করেছে।

মানিকের মনোভঙ্গি বুঝবার জন্যে প্রথমে ঐ রহস্যোল্লেখের একটি অসম্পূর্ণ পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করব :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. জীবনের অজ্ঞাত রহস্য গাওদিয়ার বিন্দুকে গ্রাস করিয়াছে, কলিকাতার অনামী রহস্য। [পৃ. ৬৫]
২. বিন্দু আজ তাদের কাছে আকাশের পরীর চেয়েও রহস্যময়ী...আবার সে ফিরিয়া যাইতেছে তাহার অজ্ঞাত রহস্যময় প্রবাসে, তাদের গাঁয়ের মেয়ে বিন্দু। [পৃ. ১০২]
৩. ভাবিতে ভাবিতে রীতিমতো বিহ্বল হইয়া যায় বইকি শশী। সে রোগ সারায়, অসুস্থকে সুস্থ করে। অথচ একেবারে চরম হিসাব ধরিলে শুধু এই সত্যটা পাওয়া যায় : রোগে ভোগা, সুস্থ হওয়া, রোগ সারানো, রোগ না-সারানো সমান—রোগীর পক্ষেও শশীর পক্ষেও। এসব ভাবিতে ভাবিতে কত অতীন্দ্রিয় অনুভূতি যে শশীর জাগে। রহস্যানুভূতির এ প্রক্রিয়া শশীর মেওলিক নয়; সব মানুষের মধ্যে একটি খোকা থাকে যে মনের কবিত্ব, মনের কল্পনা, মনের সৃষ্টিছাড়া অবাস্তবতা, মনের পাগলামিকে লইয়া সময়ে-অসময়ে এমনিভাবে খেলা করিতে ভালবাসে। [পৃ. ৭২]

এই রহস্যের পরিচয় আছে প্রেমে, কামে, সার্বিক জীবনে।

প্রেম : কুমুদের মুখে তার প্রতি মতির প্রেমের আখ্যান শুনে—'শশীর বিস্ময়ের সীমা থাকে না। মতি?...ওই একরত্তি নোংরা মেয়েটা গোপনে গোপনে এত ভালবাসিয়াছে কুমুদকে? শশীর মনে হয় সব কুমুদের বানানো,—দিবাস্বপ্ন, কল্পনা।' (পৃ. ৯০) কিংবা 'দীর্ঘ দিন জেগে-জেগে থেকে কুসুমের মন ম'রে যাওয়ার' সেই আশ্চর্য ঘটনা, কুসুমের নিজেরই ভাষায় 'কুসুম কি বেঁচে আছে? সে মরে গেছে।' [পৃ. ১৯২]

কাম : বিকৃত জীবনে বিন্দু এমনই অভ্যস্ত হয়ে যায় যে সে তার বিকৃত জীবনের দীক্ষাদাতা নন্দলালের আহ্বানেও স্বাভাবিক জীবনে চলে আসতে পারে না আর।

পুতুলনাচের ইতিকথার বহু চরিত্রের আমূল পরিবর্তনেই রয়েছে ঐ রহস্যের বোধ ও আবহ। প্রেম হোক, কাম হোক, কিংবা জীবনের অন্য যে-কোনো বিষয়েরই হোক, এই-যে রহস্য এ কোনো বহিরারোপিত রহস্য নয়। এ রহস্য জীবনেরই রহস্য, এ বিস্ময় জীবনেরই বিস্ময়।

৪. চরিত্রের চলিষ্ণুতা

পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাসের একটি বিশিষ্টতা এই যে, এর চরিত্রেরা প্রায়-কেউই ফর্স্টর-বিভাজিত 'flat' নয় 'round'।[৩] চরিত্রগুলি আলোছায়ায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্মিত: চরিত্রগুলি কেউ কোথাও স্থির দাঁড়িয়ে নেই; এমনকি কোনো-কোনো চরিত্র এসে দাঁড়িয়েছে শেষ পর্যন্ত অপ্রত্যাশিত অভাবিত এক জায়গায়। এই পরিবর্তন, আমূল হলেও, আকস্মিক মনে হয় না; এক-একটি চরিত্রের মনোলোক এমনই স্বৈরথে বিপর্যস্ত হয়, কিংবা অন্য চরিত্রের সঙ্গে সতত সংঘর্ষেই বদল হয় তাদের যে, ঐ পরিবর্তিত পরিণামকে স্বাভাবিকই মনে হয়।

শশী-কেন্দ্রিক মূল কাহিনীর সঙ্গে *পুতুলনাচের ইতিকথায়* অন্য দুটি শাখাকাহিনী আছে: একটি মতি-কুমুদের; আর-একটি বিন্দু-নন্দলালের। সহোদরা বিন্দু আর প্রতিবেশিনী মতির বিপুল পরিবর্তন ঐসব চরিত্রের চলমানতারই সাক্ষ্য দেয়।

মতি ও কুমুদ: যাযাবর কুমুদ নীড় বেঁধেছিল কচি মেয়ে মতির সঙ্গে—সে এক বিস্ময়। কুমুদের মেয়ে-বন্ধু জয়ার উক্তি স্মরণীয়: 'তুই অবাক করেছিস মতি। রূপ গুণ বিদ্যাবুদ্ধি নাচ গান দিয়ে কেউ যাকে বাঁধতে পারেনি তাকে তুই কাবু করলি, এক ফোঁটা মেয়ে? কম তো নোস তুই।' আর মতি? কুমুদের প্রেমে পড়ে রাতারাতি যেন বয়স্ক ও গভীর হয়ে উঠেছে। তা না-হলে কেন শশীর এমন অনুভব?—

> শশী বারবার বিস্মিত চোখে তাহার বিষণ্ণ মুখ, ছলছল চোখের দিকে চাহিতেছিল। এক অপূর্ব ভাবাবেশে সেও উতলা হইয়া উঠিতেছিল। সংসারে হয়তো এমন অনেক আছে, মতির মতো এমন করিয়া ভাল হয়তো অনেকেই বাসে, কিন্তু মতি ইহা শিখিল কোথায়? অনুভূতির এমন গভীরতা তাহার আসিল কোথা হইতে? / এ যে ভাবপ্রবণতা নয়, কাঁচা মনের অস্থায়ী আবেগ নয়, বালিকা মতির বিরহ-কাতরতায় এক অপূর্ব ধৈর্যের সমাবেশ দেখিয়া শশী তা বুঝিতে পারিয়াছিল। [পৃ. ১৭১]

শেষ-অব্দি ছলনা করে কুমুদের সঙ্গে যাবার জন্যে ট্রেনে চড়ে বসে মতি। মতির এই বিপুল পরিবর্তনে লেখকও তাঁর বিস্ময় গোপন করেননি: 'গৃহবিমুখ যাযাবর স্বামীর সঙ্গে মতিও আজ এলোমেলো পথের জীবনকে বরণ করিল—আমাদের গেঁয়ো মেয়ে মতি।'

বিন্দু ও নন্দলাল: বিন্দুর সঙ্গে কৌশল করে বিয়ে দেওয়ায় নন্দলাল তাকে প্রকৃত স্ত্রীর মর্যাদা দেয়নি। তাকে সে রাখত রক্ষিতার মতো, নষ্টপাড়াতেই, তাকে সে মদে অভ্যস্ত করে তোলে। যে-ঘরে বিন্দু থাকত, তা 'শশীর দেখিবার সাধ ছিল না, হাতে ধরিয়া বিন্দু তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল। ওদিকের বড় একখানা ঘরের তালা খুলিয়া সুইচ টিপিয়া বিন্দু আলো জ্বালিল।/

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী সে তীব্র আলো! গোটা তিনেক বাল্‌ব ঘিরিয়া কাঁচের ঝাড় ঝলমল করে—শশীর চোখ যেন ঝলসিয়া গেল। দেওয়ালে আট-দশটা অশ্লীল ছবি। মেঝে জুড়িয়া ফরাশ পাতা। তাতে কয়েকটা বড় বড় তাকিয়া।' এই বিন্দুকে শশী গাওদিয়া গ্রামে আনার পরে দেখা গেল মদে অভ্যস্ত নারী যে-কোনো উপায়ে মদ খুঁজে নেয়। অনুতপ্ত নন্দলাল তাকে ফেরত নেবার পরে, চরিত্রহীন নন্দলাল বদলে যায়, সে তাকে নিয়ে যেতে চায় পারিবারিক জীবনের স্বাভাবিক মণ্ডলে; কিন্তু বিন্দু সাত বছরের জীবনে এমন বিপুলভাবে পরিবর্তিত-যে সে-ই সুস্থ জীবনে ফিরে যেতে চায় না আর, তার পক্ষে সম্ভবও নয়।

কেন্দ্রচরিত্র শশী ও কুসুমও অনেক বদলেছে।

কুসুম: যে-কুসুম কতভাবে আত্মনিবেদন করেছিল শশীর কাছে, 'পরানের বৌ' বললে যার রাগ হয়, যে শশীকে শুনিয়ে যাত্রার দলের গান করে, যে মতির হালকা অপরিণত দেহটিকে হিংসা করে, 'মনে হয়, তাহার নিজের স্বাস্থ্য এতখানি ভাল না হইলেই যেন সে খুশী হইত', যে পেটব্যথায় শশীর পাঠিয়ে দেওয়া ওষুধ পেয়ে রেগে যায় এবং ব্যঙ্গ করে বলে, 'হ্যাঁগো ছোটবাবু, আছেই তো। তা যাই বলেন, এক ঘণ্টা ধরে বুক পরীক্ষা, ম্যালেরিয়া জ্বর হলে আমি করি না।' যে বারবার শশীর বাগানের গোলাপের চারা মাড়িয়ে দেয়, যে ইশারায় পরিষ্কার বলে, 'সইতে পারি না ছোটবাবু' কিংবা শশীর 'তুমিও রইলে আমিও রইলাম'-এর উত্তরে, 'সে তো ন বচ্ছর ধরেই আছি। এক আধ দিন নয়।' কিংবা 'এমনি চাঁদনি রাতে আপনার সঙ্গে কোথাও চ'লে যেতে সাধ হয় ছোটবাবু।' সেই কুসুমই একসময় পরিষ্কার শশীকে বলে দেয়, 'মানুষ কি লোহায় গড়া যে চিরকাল সে এক রকম থাকবে, বদলাবে না? বলতে বসেছি যখন কড়া করেই বলি, আজ হাত ধরে টানলেও আমি যাব না।'

শশী: আর শশী? ঝোঁকের মাথায় কাজ করার অভ্যাস যে-শশীর কোনো দিন ছিল না, যে 'মনের হঠাৎ-জাগা ইচ্ছাগুলিকে চিরদিন সামলাইয়া চলিবার চেষ্টা করে', যে কুসুমকে অনেকক্ষণ ধরে বুঝিয়েছিল একদিন, 'আমরা ছেলেমানুষ নই, ইচ্ছে হলেই একটা কাজ কি আমরা করতে পারি? বুঝে-সুজে কাজ করা দরকার। এক তো দ্যাখো পরান আমার বন্ধু, উপকার করতে গিয়ে চিরকাল শুধু অপকারই করেছি। তবুও তাও আমি গ্রাহ্য করতাম না বৌ। এই বৃষ্টিতে তুমি এলে, তোমার কাছে সরে বসতে না পেরে আমার যা কষ্ট হচ্ছে, কারো মুখ চেয়ে আমি তা সইতাম না। কিন্তু আমি গাঁয়েই থাকব না বৌ। আজ বাদে কাল চলে যাব বিদেশে, আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখনো ফিরব না। এরকম অবস্থায় একটু মনের জোর করে—' সেই শশীই আর-একদিন সমস্ত ভারসাম্য ভাসিয়ে কাতর আর্তনাদ করে ওঠে, 'আমার সঙ্গে চ'লে যাবে বৌ?' অসীম হাহাকারে বলে ওঠে, 'যেখানে হোক। যেখানে হোক চলে যাই চল আজ রাত্রে।'

চরিত্রের চলিষ্ণুতার উদাহরণ হিশেবে দুটি পার্শ্ব কিন্তু অত্যুজ্জ্বল চরিত্র অন্তত উল্লেখ করতেই হয়।

যাদব : *পুতুলনাচের ইতিকথা* উপন্যাসে যাদব প্রবেশ করেন লাঠি ঠুকতে-ঠুকতে, 'শশী জানে এত জোরে লাঠির শব্দ করা সাপের জন্য।' যে-যাদব অন্ধকারে লাঠি ঠুকে পথ চলেন শুধু সাপ তাড়ানোর জন্যে, সেই যাদবই হঠাৎ একটা কথা বলে ফেলে সেই কথা রক্ষা করবার জন্যে সস্ত্রীক আত্মহত্যা করেন ব্যঙ্গময় হাস্যমুখে।

গোপাল : গোপাল, শশীর পিতা, যার দালালি ও মহাজনি কারবারকে লোকে বলে গলায় ছুরি দেওয়া, সেই অতি-বিষয়ী গোপাল, 'সংসারী গৃহস্থ মানুষ' গোপাল, সমস্ত জীবন ধরে যে ক্রমাগত অর্জন করেছে 'ফলপুষ্পশস্যদাত্রী ভূমিখণ্ড' আর 'সিন্দুক-ভরা সোনারূপা', সমস্ত ফেলেই সে একদিন চিরকালের মতো গাওদিয়া গ্রাম ছেড়ে চলে যায়।

শশী, গোপাল, কুসুম, সেনদিদি, যাদব, নন্দলাল, বিন্দু, কুমুদ, মতি, জয়া—*পুতুলনাচের ইতিকথায়* এরকম প্রায় সব চরিত্রই পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে এবং নিজেদের মানস-সংঘর্ষে ক্রমাগত বাসা-বদল করে চলেছে। অধিকাংশ উপন্যাসে, অধিকাংশ বাংলা উপন্যাসে প্রধান পাত্র-পাত্রীই থাকে চলিষ্ণু ও পরিবর্তমান, বাকি চরিত্রেরা স্থির, কিন্তু অন্তত এই একটি উপন্যাসে ঐ অতগুলি চরিত্র ক্রমাগত তাদের বাসা-বদল করে চলেছে। এতগুলি চরিত্রের এই চলিষ্ণুতাই উপন্যাসটিকে এত জীবন্ত ও গতিশীল করে তুলেছে।

৫. মৃত্যুচেতন জীবনময়তা

জীবন্ত, এবং জীবনের মতোই মৃত্যুময় *পুতুলনাচের ইতিকথা* উপন্যাসটি। কিংবা, ঘুরিয়ে বলা যায়, *পুতুলনাচের ইতিকথা* মৃত্যুচেতন জীবনময়তার উপন্যাস। আর-কোনো বাংলা উপন্যাসে মৃত্যু এইভাবে আসেনি—এত উপর্যুপরি এবং ভিতর-পর্যন্ত-ঢুকে-যাওয়া।[৪]

উপন্যাসের শুরুই হয়েছে একটি মৃত্যুর ঘটনায় : 'খালের ধারে প্রকাণ্ড বটগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া হারু ঘোষ দাঁড়াইয়া ছিল। আকাশের দেবতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেইখানে তাহার দিকে চাহিয়া কটাক্ষ করিলেন।' (পৃ. ১) পুরো প্রথম পরিচ্ছেদটি ব্যয়িত হয়েছে এই মৃত্যুর বর্ণনায় ও তার প্রতিক্রিয়ায়। উপন্যাসটিকে আমি বলেছি মৃত্যুচেতন কিন্তু জীবনময়তার উপন্যাস। মানিকের সমকালীন একজন কবি যখন মৃত্যুর আগে সমস্ত ইন্দ্রিয় জাগ্রত রেখে জীবনের রূপ-রস আস্বাদ-আঘ্রাণ করতে চেয়েছিলেন, মানিকের এই উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার জীবনও তেমনি মৃত্যুচিন্তিত ও মৃত্যুচেতন বলেই মূল্যবান।[৫] লক্ষণীয়, হারুর মৃত্যু শশীর ভিতরে বৈরাগ্য সঞ্চার না-করে জিজীবিষাই জাগিয়ে দিয়ে যায়:

> হারুর মরণের সংশ্রবে অকস্মাৎ আসিয়া পড়িয়া শশীর কম দুঃখ হয় নাই। কিন্তু তার চেয়েও গভীরভাবে নাড়া খাইয়াছিল জীবনের প্রতি তার মমতা।...মৃত্যু পর্যন্ত অন্যমনস্ক বাঁচিয়া থাকার মধ্যে জীবনের অনেক কিছুই যেন তাহার অপচয়িত হইয়া যাইবে। শুধু তাহার নয়, সকলের। জীবনের এই ক্ষতি প্রতিকারহীন।

উপন্যাসের এই প্রথম মৃত্যু অপঘাত-মৃত্যু। বস্তুতপক্ষে এই উপন্যাসের সবগুলি মৃত্যুর ভিতরে আপাত-পার্থক্য যা-ই থাক, সবগুলিই তাই। স্বাভাবিক মৃত্যু এই উপন্যাসে নেই। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই দ্বিতীয় মৃত্যু—ভূতোর, গাছের মগডাল থেকে পড়ে সে মরেছে। ডাক্তারের কাছে তুচ্ছ হলেও অতিসংবেদনশীল শশী এই মৃত্যুর কথা ভুলতে পারেনি।

আর-একটি মৃত্যু সেনদিদির। একসময়কার রূপসী কলঙ্কবতী সেনদিদি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রথমে রূপ হারায় ও চোখ হারায়। তারপর কোনো-এক 'শেষ রাত্রে একটি ছেলে হইল সেনদিদির, ভোরবেলা সেনদিদি মরিয়া গেল।' এই সেনদিদির রেখে-যাওয়া শিশুপুত্রটি শশী আর তার পিতা গোপালের মধ্যেকার দীর্ঘ টানাপোড়েনের ভিতর দিয়ে একটি দীর্ঘ ও স্থায়ী ফাটল তৈরি করে, এবং পরিণামে ঐ শিশুপুত্র নিয়ে গোপাল চিরকালের জন্যে গাওদিয়া গ্রাম ছেড়ে চলে যায়।

বাংলা সাহিত্যে কারণহীন মৃত্যুর উদ্‌গাতাও মানিক।[৬] 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় জীবনানন্দ এক আত্মহন্তারকের বর্ণনা দিয়েছিলেন, যাকে শিশু-বধূ-অর্থ-কীর্তি কিছুই বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি, তাকে হত্যা করেছিল 'আরো এক বিপন্ন বিস্ময়', যে-অন্তর্গত বিস্ময় আমাদের রক্তের ভিতরে খেলা করে। এই বিপন্ন বিস্ময় আর কিছু নয়, অস্তিত্বের সংশয়, এক সর্বগ্রাসী শূন্য। মানিকও আর-একরকম কারণহীন (কিংবা এক আশ্চর্য প্রায়-পাগল কারণ-সম্পন্ন) মৃত্যুর বর্ণনা দিয়েছেন এই উপন্যাসে—যাদব আর পাগলদিদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভবিষ্যতে যিনি স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করবেন, উপন্যাসে তিনি প্রবেশ করেন সাপের ভয়ে লাঠি ঠুকে-ঠুকে : 'লাঠি ঠুকিয়া যাদব পথ চলেন। শশী জানে এত জোরে লাঠির শব্দ করা সাপের জন্য। মরিতে যাদব কি ভয় পান,—জীবন-মৃত্যু যাঁর কাছে সমান হইয়া গিয়াছে?' সেই যাদবই মৃত্যুকালে জীবিতের প্রতি যেন ব্যঙ্গহাসি হেসে যান : 'আরও খানিকক্ষণ পরে শশীর দিকে ঢুলুঢুলু চোখ মেলিয়া একবার মাত্র চাহিয়া যাদব এক অদ্ভুত হাসি হাসিয়াছিলেন... ।' আর যাদবের স্ত্রী পাগলদিদি সম্পর্কে সেই অসম্ভব তাৎপর্যশীল মন্তব্য : 'ঘনানো মৃত্যুর স্বাদে পাগলদিদি কৌতুকময়।' শশীর সঙ্গে গল্প করতে-করতে হঠাৎ যাদব আত্মগরিমায় মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলেন তাঁর মৃত্যু হবে রথের দিন, একথা তিনি জানেন। তারপরই, 'কবে কোন সালের রথের দিন যাদব দেহত্যাগ করিবেন ঠিক হইয়া আছে, শশী আর সেকথা জিজ্ঞাসা করে না, কারণ কথাটা বলিয়াই যাদব হঠাৎ এমন ভীতভাবে স্তব্ধ হইয়া যান এবং পাগলদিদি এমনভাবে অস্ফুট একটা শব্দ করিয়া ওঠেন যে শশী লজ্জা বোধ করে।' (পৃ. ১১৩) তারপর শশী কথাটা চাপা দেবার জন্যে অন্য কথা পাড়ে। তারপর নেহাত গল্পচ্ছলে শশী কথাটা পরান ও কুসুমকে বললে ক্রমশ গাওদিয়া গ্রামের সবাই জানতে পায় এবং যাদব ও পাগলদিদি শেষ-অব্দি স্রেফ এই একটি হঠাৎ-বলা কথার জন্যে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করে নেন।

যাদব ও পাগলদিদির কারণহীন মৃত্যুর মতোই আর-একটি মৃত্যু এই উপন্যাসে ঘটেছে, যা বাংলা সাহিত্যে অভিনব। সফল প্রেম ও ব্যর্থ প্রেমের অনেক আখ্যান রচিত হয়েছে বাংলায়। কিন্তু কুসুম যে-কথা বলেছে, তা কি কখনো শুনেছি আমরা?—যখন সে বলছে, 'যেতাম ছোটবাবু। স্পষ্ট করে ডাকা দূরে থাক, ইশারা করে ডাকলে ছুটে যেতাম। চিরদিন কি একরকম যায়? মানুষ কি লোহায় গড়া যে চিরকাল সে একরকম থাকবে, বদলাবে না? বলতে বসেছি যখন কড়া করেই বলি, আজ হাত ধরে টানলেও আমি যাব না।' কিংবা আর-একটু পরে যখন সে শশীকে বলছে, '...সব ভোঁতা হয়ে গেছে ছোটবাবু। লোকের মুখে মন ভেঙে যাবার কথা শুনতাম, অ্যাদ্দিনে বুঝতে পেরেছি সেটা কি। কাকে ডাকছেন ছোটবাবু, কে যাবে আপনার সঙ্গে? কুসুম কি বেঁচে আছে? সে মরে গেছে।' এই মন জেগে উঠে মরে যাওয়া, 'একদিন দুদিন নয়, অনেকগুলি সুদীর্ঘ বৎসর ব্যাপিয়া তার জন্য কুসুম পাগল হইয়া ছিল, তারপর ক্রমে ক্রমে তার সে উন্মাদ ভালবাসা নির্জীব হইয়া আসিয়াছে। হয়তো মরিয়াই গিয়াছে।' এই অদ্ভুত মনের মৃত্যু, বাংলা সাহিত্য আগে কখনো দেখেনি আর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরীরের মৃত্যু, মনের মৃত্যু, আত্মনির্বাসন—এরকম অনেক মৃত্যু ঘটেছে এই উপন্যাসে, সমস্তের পরে রয়েছে এক পরাজিত-অপরাজিত 'ক্লান্ত ক্লান্তিহীন' মন্থর অভিজ্ঞতাঋদ্ধ চলিষ্ণুতা।

৬. break of communication বা মানস-সেতুভঙ্গ

অতিকায় *পুতুলনাচের ইতিকথা* উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত, এবং প্রথমাবধি, কোনো হাসি নেই। প্রত্যেকেই আত্মদুর্গে বন্দী। শশী, গোপাল, পরান, কুসুম, যামিনী কবিরাজ, সেনদিদি, যাদব, পাগলদিদি, নন্দলাল, বিন্দু, কুমুদ, মতি, বনবিহারী, জয়া—কেউ সুখী নয়, তুষ্ট নয়। পিতা ও পুত্র, স্বামী ও স্ত্রী, প্রেমিক ও প্রেমিকা, বন্ধু ও বন্ধু—প্রত্যেকের মধ্যে আকর্ষণ-বিকর্ষণের জোয়ার-ভাটা চলছে; কিন্তু প্রত্যেকেই প্রত্যেকের থেকে সুদূর—যে যার আত্মদ্বীপে নির্বাসিত। যেন এক বিপুল জলোচ্ছ্বাসে ভেসে চলেছে ওরা, অবলম্বন খসে গেছে, এখন অসহায় প্লাবিত, কারো সঙ্গে কারো যোগাযোগ ঘটছে না। এই break of communication বা মানস-সেতুভঙ্গ, এই উপন্যাসের এটি এক কুললক্ষণ।

পিতা ও পুত্র : গলায় ছুরি-দেওয়া গোপাল, যার 'গভীর ও অপরূপ এক হীনতা থাকার জন্য কঠোর কর্মঠ প্রকৃতি শুধু নিষ্ঠুরতায় গড়া' সেই গোপাল, তিনটি কন্যার প্রতিও যার খুব-একটা মমতা নেই, একমাত্র পুত্রসন্তান শশীর প্রতি সে ভালোবাসায় অন্ধ। 'আর তো ছেলে নাই গোপালের, শুধু শশী।' শশীর সঙ্গে সে কিছুতেই যেন স্বাভাবিক হতে পারে না, চলে মান-অভিমানের পালা, প্রায়ই কথা বন্ধ থাকে। 'ছেলে বড় হইলে কি কঠিন হইয়া দাঁড়ায় তার সঙ্গে মেশা। সে বন্ধু নয়, খাতক নয়, উপরওয়ালা নয়, কি যে সম্পর্ক দাঁড়ায় বয়স্ক ছেলের সঙ্গে মানুষের ভগবান জানেন।' পিতা-পুত্রের মধ্যে কিছুতেই যেন স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। শশী বাপকে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করে না; শুধু 'গোপালের খেয়ালে জীবনে যারা দুঃখ পাইয়াছে তাদের জন্য শশীর মনে একটা অতিরিক্ত মমতা আছে।' এ থেকেই আসে বাপের সঙ্গে দ্বন্দ্ব, গোপাল ছেলের উপরে কখনো ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে, কখনো তার কণ্ঠ হয় 'কৃপাপ্রার্থীর মতো'। এই দ্বন্দ্ব চূড়ান্তে ওঠে মৃতা সেনদিদির শিশুপুত্রকে নিয়ে; ঐ শিশুপুত্র নিয়ে শশী এক আশ্চর্য জটিলতায় ভোগে, আর গোপাল পায় এক আশ্চর্য মমতার আস্বাদ। শেষ পর্যন্ত শশীকে কৌশলে গ্রামে আটকে রাখার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্যে গোপালের যে-স্বার্থত্যাগ তারও কোনো তুলনা নেই, সংসারী গৃহস্থ মানুষ গোপাল 'সমস্ত জীবন ধরিয়া ফলপুষ্পশস্যদাত্রী ভূমিখণ্ড, সিন্দুক-ভরা সোনারূপা, কতকগুলি মানুষের সঙ্গে পারিবারিক ও আরও কতকগুলি মানুষের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক, দায়িত্ব, বাধ্যবাধকতা প্রভৃতি যত কিছু অর্জন করিয়াছিল সব সে দিয়া গেল শশীকে, মরিয়া গেলে যেমন সে দিত।' পিতা-পুত্রের শেষ সাক্ষাৎকারই একমাত্র তাদের মধ্যেকার ক্ষণিক স্বাভাবিক আলোকোজ্জ্বল মুহূর্ত : 'সকালবেলার স্বচ্ছ আলোয় দুজনের মুখ দেখিয়া মনে হইল না পিতা-পুত্রে কোন দিন সামান্য বিষয়েও মতান্তর ছিল, জীবনের গতি দুজনের বিপরীতগামী।'

স্বামী ও স্ত্রী : এই উপন্যাসে যে-সব দম্পতির কথা আছে, তাদের মধ্যে পরান ও কুসুমের মধ্যে মনে হয় না কোনো মানস-সেতু রচিত হয়েছে—দুজনের মানসিক প্যাটার্ন মেরু-দূর বলেই মনে হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে যে-অসেতুসম্ভব নির্দ্বন্দ্ব দ্বীপবর্তী সম্বন্ধ, অন্যদের ক্ষেত্রে তা অনেক সংঘর্ষময়। যামিনী কবিরাজ ও সেনদিদির সম্পর্ক তীব্র তিক্ত ঘৃণার—মৃত্যুকামী, এবং শেষ পর্যন্ত একজনের মৃত্যুতেই অবসান মানে। নন্দলাল ও বিন্দুর মধ্যে কিছুতেই সুস্থ স্বাভাবিক স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ রচিত হয় না। বিন্দু যখন তাকে স্বাভাবিক স্বামীত্বে বরণ করে নিয়েছিল নন্দলাল তখন তাকে ক্রমাগত চালনা করে বিকারের পথে; আবার নন্দলাল অনুতপ্ত হয়ে নিজে যখন বিন্দুকে স্বাভাবিক স্ত্রীর অধিকার দিতে চায় বিন্দু তখন তা প্রত্যাখ্যান করে, বিন্দু তখন বিকারবন্দী, অস্বাভাবিকতা ছাড়া তার আর বাঁচার উপায় নেই। আবার, কুমুদ-মতির সঙ্গে থাকতে-থাকতে বনবিহারী-জয়ার সম্পর্কে ফাটল ধরে, জয়ার নিজেকে মনে হয় অ-সুখী অ-প্রেমিক। সুখী দম্পতির ছবি যে এই উপন্যাসে নেই, তা নয়; আত্মহন্তারক যাদব ও পাগলদিদির কথা মনে হতে পারে, কিংবা ক্রমাগত কুমুদের ছাঁচে-ঢালা মতিকে।

প্রেমিক ও প্রেমিকা : এই উপন্যাসে যেমন তীব্র-মধুর প্রেমের আখ্যান আছে (মতি-কুমুদ), প্রেমভঙ্গের কাহিনী আছে (জয়া-বনবিহারী), তেমনি আছে প্রেমের ক্ষেত্রেও যোগাযোগহীনতার এক বিপুল সর্বনাশা উদাহরণ। আর তা ঘটেছে নায়ক শশীর জীবনেই। দীর্ঘ নয় বছর ধরে কুসুম নানাভাবে আত্মনিবেদন করে চলেছে শশীকে, এক বাদলঘন উতল দুপুরে নির্জনে উপস্থিত হয়েছে শশীর ঘরে, কিন্তু শশী তখন দায়িত্বশীল, বন্ধুপ্রীতি বিসর্জন দিতে নারাজ। আবার এই শশীই যখন আত্মধিক্কারে জর্জরিত হয়ে ভালোবাসার উন্মাদনায় বলে ওঠে, 'যেখানে হোক। যেখানে হোক চলে যাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চল আজ রাত্রে।' তখন সমস্ত আহ্বান বিদীর্ণ করে কুসুম জানিয়ে দেয়, 'বলতে বসেছি যখন কড়া করেই বলি, আজ হাত ধরে টানলেও আমি যাব না।' এই দুজন প্রেমিক-প্রেমিকা, যাদের মধ্যে এক মুহূর্তের বিনিময় সম্ভব হলো না, তাদের জন্যে আমাদের বুক ভেঙে যায়, কেননা ওদের প্রেমের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-আচরিত (অপসরণ-সম্ভব) সামাজিক বাধা নয়, ওদেরই ব্যক্তিগত (অপসরণ-অসম্ভব) মন।

বন্ধু ও বন্ধু: কলকাতার কলেজ-জীবনে শশীকে প্রথম মুক্তির স্বাদ দিয়েছিল কুমুদ, 'যে দুর্গের মধ্যে গোপাল তাহার মনকে পুরিয়া সিল্ করিয়া দিয়াছিল, কুমুদ তাহা একেবারে ভাঙিয়া ফেলিতে পারিল না বটে, কিন্তু অনেকগুলি জানলা-দরজা কাটিয়া বাহিরের আলো-বাতাস আনিয়া দিল...'। সেই কুমুদ অনেক দিন পরে শশীদের গাওদিয়া গ্রামে যাত্রার নায়ক হিশেবে হঠাৎ এসে পড়লে 'মনে মনে শশী ভারী খুশী হইয়াছিল। এত কাল পরে কুমুদের সঙ্গে দেখা হইয়াছে, শুধু এই জন্য নয়। কুমুদ নামিয়া আসিয়াছে বলিয়া।' শেষাবধি সেই কুমুদের সঙ্গেও চলে শশীর নানা-রকম অন্তর্গত দ্বন্দ্ব ও দ্বৈরথ।

এক-হিশেবে সমস্ত *পুতুলনাচের ইতিকথা* উপন্যাসটিই সম্পর্ক ভেঙে-যাওয়ার কথামালা।

AMARBOI.COM

৭. নিয়তিচেতনা

নিয়তি এই উপন্যাসের প্রথম থেকেই তার অনিবার্য কালো ছায়া বিস্তার করেছে। 'খালের ধারে প্রকাণ্ড বটগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া হারু ঘোষ দাঁড়াইয়া ছিল। আকাশের দেবতা সেইখানে তাহার দিকে চাহিয়া কটাক্ষ করিলেন।' বই-এর প্রথমেই শুরু হয়েছে এই ভয়াবহ নিয়তিনির্দিষ্ট মৃত্যু। বজ্রাহত হারুকে ঘিরে এক জগৎ উদ্ভাসিত হয়েছে—যা প্রায় অপ্রাকৃত ও প্রতীকী।

এই উপন্যাসে নিয়তি ও মানুষ এক বিপরীত রেখায় দাঁড়িয়ে, লড়াই করে-করে শেষ পর্যন্ত মানুষ হেরে যায়—কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে লড়াই করে তার প্রমাণ শশী। এই বৈপরীত্যের পরিচয় আছে প্রথম পরিচ্ছেদেই : 'জোর করিয়া বাড়িতে আটকাইয়া রাখিলে আর সকলকেই হয়তো সে [মতি] ক্ষমা করিবে, নিয়তিকে পর্যন্ত, কিন্তু শশীকে সে মার্জনা করিবে না।' দায়িত্বময় শশী বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই করে চলে। কিন্তু তারই মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার যে-বোধের উপার্জন, তা আঞ্চলিক বটে কিন্তু গভীর। পঞ্চম পরিচ্ছেদে, উপন্যাসের এক-তৃতীয়াংশ অগ্রসর হওয়ার পর, শশীর উপলব্ধি :

> রোগে ভুগিয়া অকারণে মরিয়া ওরা বড় আনন্দে থাকে। স্ফূর্তি নয়—আনন্দ, শান্ত স্তিমিত একটা সুখ। স্বাস্থ্যের সঙ্গে, প্রচুর জীবনীশক্তির সঙ্গে, ওদের জীবনের একান্ত অসামঞ্জস্য। ওরা প্রত্যেকে রুগ্ন অনুভূতির আড়ত, সংকীর্ণ সীমার মধ্যে ওদের মনের বিস্ময়কর ভাঙাগড়া চলে, পৃথিবীতে ওরা অস্বাস্থ্যকর জলাভূমির কবিতা: ভাপসা গন্ধ, আবছা কুয়াশা, শ্যামল শৈবাল, বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতা, কলমি ফুল। সতেজ উত্তপ্ত জীবন ওদের সহিবে না।

এই উপন্যাসে প্রায় সব চরিত্রেরই পরিণাম শূন্যতায়, অন্ধ মত্ততায় বা শান্ত স্তিমিতিতে, চরিত্রগুলি মনে হয় এক অলক্ষ্য হাতের অন্ধ হাতি-ঘোড়া-বোড়ে এইভাবে উঠছে পড়ছে চালিত হচ্ছে। উপন্যাসের নামকরণও সেই ইশারা দেয়। মানিক যদিও উত্তরকালে এই উপন্যাসের স্বকৃত একটি অসম্পূর্ণ ভাষ্যে অস্বীকার করেছেন এর নিয়তিনির্দিষ্টতা, কিন্তু প্রথম যৌবনের রচনা আর উত্তরযৌবনের ভাষ্য এক মন, মনন ও চেতনার সৃষ্টি বলে আমরা মনে করি না।[৭]

মানিক অগ্রাহ্য করতে চাইলেও নিয়তি এই উপন্যাসের এক নিয়ামকশক্তি, নিয়তি ও দায়িত্বের পরস্পর টানাপোড়েন এই উপন্যাসের মহত্ত্বেরও এক দিকচিহ্ন, একে বাদ দিলে এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় শক্তিই দুর্বল হয়ে পড়ে। কুসুমের বাবার উক্তি, 'সংসারে মানুষ চায় এক, হয় আর, চিরকাল এমনি দেখে আসছি ডাক্তারবাবু। পুতুল বই তো নই আমরা, একজন আড়ালে বসে খেলাচ্ছেন।' (পৃ. ১৮৪) কিংবা ছোটো বোন সিন্ধু এক বিরাট জটিলতার যেন সহজ সমাধান করে ফেলে :

> নীচে সিন্ধু পুতুল খেলা করে, খাটে বসিয়া শশী অস্বাভাবিক মনোযোগের সঙ্গে সে খেলা চাহিয়া দেখে।
>
> খুকী, বড় হলে তুই কি করবি?
>
> পুতুল খেলব।
>
> এই একটি জবাবে ক্ষণেকের জন্য শশীর মন যেন একেবারে হালকা হইয়া যায়। [পৃ. ৭৪]

কিংবা একেবারে শেষ পরিচ্ছেদের এই পঙ্‌ক্তিগুলি অগ্রাহ্য করা অসম্ভব :

> কাজ আর দায়িত্ব ছিল জীবনে, কাজ আর দায়িত্বের জীবনটা আবার ভরপুর হইয়া উঠিল। নদীর মতো নিজের খুশিতে গড়া পথে কি মানুষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনের স্রোত বহিতে পারে? মানুষের হাতে কাটা খালে তার গতি, এক অজানা শক্তির অনিবার্য ইঙ্গিতে। মাধ্যাকর্ষণের মতো যা চিরন্তন, অপরিবর্তনীয়। [পৃ. ২১৭]

৮. দায়িত্বের ভার

শশী তীব্রভাবে জীবনপ্রেমিক। তার এই তীব্র জীবনপ্রেমের অভিব্যক্তি ঘটেছে তার বিভিন্ন সময়ের উক্তি ও উপলব্ধিতে :

১. মৃত্যু পর্যন্ত অন্যমনস্ক বাঁচিয়া থাকার মধ্যে জীবনের অনেক কিছুই যেন তাহার অপচয়িত হইয়া যাইবে। শুধু তাহার নয়, সকলের। জীবনের এই ক্ষতি প্রতিকারহীন। [পৃ. ৪]
২. জানিবার এত বিষয়, উপভোগ করিবার এত উপায়, বিজ্ঞান ও কাব্য মিশিয়া এমন জটিল, এমন রসালো মানুষের জীবন? [পৃ. ১৩]
৩. জীবনকে দেখিতে শিখিয়া, অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ভাসা-ভাসা ভাবে জীবনকে দেখিতে শিখিয়া, সে অবাক হইয়া দেখিয়াছে যে এইখানে, এই ডোবা আর মশা-ভরা গ্রামে জীবন কম গভীর নয়, কম জটিল নয়। [পৃ. ৫৭]
৪. শশী ইহাও বুঝিয়াছে যে জীবনকে শ্রদ্ধা না করিলে জীবন আনন্দ দেয় না। শ্রদ্ধার সঙ্গে আনন্দের বিনিময়, জীবনদেবতার এই রীতি।/ শশী তাই প্রাণপণে জীবনকে শ্রদ্ধা করে। সংকীর্ণ জীবন, মলিন জীবন, দুর্বল পঙ্গু জীবন,—সমস্ত জীবনকে। নিজের জীবনকে সে শ্রদ্ধা করে সকলের চেয়ে বেশী। [পৃ. ৫৮]

'জীবন সম্বন্ধে যে অমন তীব্রভাবে সচেতন' এবং শ্রদ্ধাবান, সেই শশী স্বেচ্ছায় এক দায়িত্বভার তুলে নিয়েছে তার কাঁধে, সে-দায়িত্ব আর কিছু নয়, গ্রামের মানুষের দেখাশোনা, শুধু চিকিৎসক হিশেবে নয়—মানুষ হিশেবে।

এই দায়িত্ববোধের কারণেই গ্রামের বাইরে বজ্রাঘাতে মৃত হারু ঘোষকে সে গ্রামে নিয়ে গিয়ে সৎকারের ব্যবস্থা করে। সেনদিদির 'তিনটি যমের সঙ্গে' লড়াই করে তাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনে—তার একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেলেও। একটি শিশুর মৃত্যুর পরে শশী-যে বাড়িতে স্বাস্থ্যনীতি প্রবর্তনের চেষ্টা করে, সেও ঐ দায়িত্ববোধের ফল। শশীর এই দায়িত্বশীলতার একটি গোপন কারণ উল্লিখিত হয়েছে একবার :

> গোপালের খেয়ালে জীবনে যারা দুঃখ পাইয়াছে তাদের জন্য শশীর মনে একটা অতিরিক্ত মমতা আছে। গোপালের কীর্তিতে নিজেকেও সে কেমন অপরাধী মনে করে। মনে হয়, তারও যেন দায়িত্ব ছিল। [পৃ. ৭৮]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই দায়িত্বের একটি কলঙ্কবতী সেনদিদি, যাকে জড়িয়ে গোপালের এক-ধরনের বদনাম আছে, কয়েকটা টাকার লোভে সে প্রতিমার মতো ঐ মেয়েকে যামিনী কবিরাজের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল, শশীর যত্নে একটি চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েও দুরন্ত বসন্ত রোগ থেকে প্রাণে বেঁচে যায় সেনদিদি। এই দায়িত্বের আর-একটি বিন্দু। বিন্দুকে নন্দলালের সঙ্গে কৌশলে এবং জোর করে বিয়ে দিয়েছিল গোপাল; নন্দলাল এর শোধ তুলেছিল বিন্দুকে স্ত্রীর মর্যাদা না-দিয়ে রক্ষিতার মতো ব্যবহার করে; বিন্দুকে তার নরক থেকে বাঁচানোর জন্যে শশী তাকে গ্রামে নিয়ে আসে—শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিকার জীবনে অভ্যস্ত বিন্দু সুস্থ স্বাভাবিক জীবন সহ্য করতে পারে না, ফিরে যায় তার সেই নরকে, কিন্তু তা-ও তো বিন্দুর একটি শিক্ষা হয়, তার ভাষায়, 'লাভ হল বইকি দাদা। চলে না এলে কি করে বুঝতাম ওখানে ওমনিভাবে থাকা ছাড়া আমার গতি নেই? এবার আর কিছু না হোক মুক্তির কল্পনা করে অযথা ব্যাকুল হব না। হয়তো এবার মনও বসবে। হয়তো এবার খুব সুখেই থাকব।'

দায়িত্ববোধ সম্পর্কে শশীর কতগুলি বিচ্ছিন্ন চিন্তা তার মনোলোক উদ্‌ঘাটন করে দেয় :

১. হারু ঘোষের পরিবারে ভালমন্দের দায়িত্ব শশীকে কেহ দেয় নাই, তবু চিরদিন ওদের মঙ্গল করিতে চাহিয়াছে বলিয়া আপনা হইতে দায়িত্ব যেন তাহার জন্মিয়াছে। [পৃ. ৯৫]
২. বিন্দুকে সে-ই নন্দর কবল হইতে ছিনাইয়া আনিয়াছ,—ওর সম্বন্ধে সমস্ত দায়িত্ব তাহার। বিন্দু যে বীভৎস কীর্তি করিয়া লোক হাসাইয়াছে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে অকথ্য রটনা হইতেছে, এজন্য শশী নিজেকে অপরাধী মনে করে। তারই দোষ। যে বিষয়ে সে দায়িত্ব গ্রহণ করে তাই ভেস্তাইয়া যায়। একটা অদৃশ্য দুর্বার শক্তি যেন অহরহ তার বিরুদ্ধে কাজ করিতেছে। [পৃ. ৯৯]
৩. কলেরা, বসন্ত, কালাজ্বর, টাইফয়েড এবং আরও অনেক ছোট বড় রোগে আক্রান্ত যাদের সে ফেলিয়া আসিয়াছে, একে একে তাদের কথা মনে পড়িলে আর একটা দিনও অকারণে কলিকাতায় বসিয়া থাকিবার সংকল্পে নিজেকে তাহার খেয়ালী, বর্বর মনে হইতেছে। কে জানে ওদের কে ইতিমধ্যে গিয়াছে মরিয়া, কার অবস্থা গিয়াছে খারাপের দিকে! ফিরিয়া গিয়া আবার ওদের রোগ-শয্যাপার্শ্বে বসিতে না পারিলে মনে তো স্বস্তি পাইবে না। একি বন্ধন, একি দাসত্ব? / শশীর রাগ হয়। এ দায়িত্ব সে মানিবে না, এত কিসের নীতিজ্ঞান? [পৃ. ১০৩]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মীয় ও পর, ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে শশীর এই দায়িত্ব এই উপন্যাসের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। একটু আগেই এর দু-একটি উদাহরণ উপস্থিত করেছি। আরো—যাযাবর কুমুদের হাত থেকে মতিকে বাঁচানোর জন্যে কুসুমের কাছে শশী এমনও প্রস্তাব করে, 'আমি মতিকে বিয়ে করতে পারি।' কুসুম অবশ্য এ প্রস্তাব উড়িয়ে দেয়, এবং শশীও তার যুক্তির সারবত্তা বুঝতে পারে; কিন্তু এই প্রস্তাবই শশীর দায়িত্বশীলতা কত গভীর ও আন্তরিক তা উন্মোচন করে দেয়। আবার সেই বিখ্যাত বৃষ্টির দুপুরবেলা কুসুমের আত্মসমর্পণকে শশী যখন যুক্তির ধারায় কোমলভাবে প্রত্যাখ্যান করে তখন তার পিছনে দায়িত্বের অনুভূতিই কাজ করে যায়, কুসুমকে সে যা বোঝায় নিজেকেও কি তা-ই শোনায়নি?—'আমরা ছেলেমানুষ নই, ইচ্ছে হলেই একটা কাজ কি আমরা করতে পারি? বুঝে-সুজে কাজ করা দরকার। এক তো দ্যাখো পরান আমার বন্ধু, উপকার করতে গিয়ে চিরকাল শুধু অপকারই করেছি।...'

উপন্যাসের উপসংহারেও আছে এই দায়িত্ববোধের প্রসঙ্গ। গোপাল যখন শশীকে কৌশলে গ্রামে রেখে চিরকালের জন্যে চলে গেল, তখন 'কি আর করিবে শশী, এ ভার তো ফেলিবার নয়।' তারপর 'কাজ আর দায়িত্ব ছিল জীবনে, কাজ আর দায়িত্বের জীবনটা আবার ভরপুর হইয়া উঠিল।'

এদিক থেকেই শশী বাংলা উপন্যাসের প্রথম অস্তিত্ববাদী নায়ক। দায়িত্বশীল, কিন্তু বারবার পরাজিত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবার অপরাজিত এক সত্তা, যার কেবল কর্মে অধিকার।

৯. সমগ্রতা

আমরা জানি যে ঔপন্যাসিক জীবনের সমগ্রতাকে ধারণ করেন—জীবনের ছোটো-বড়ো উঁচু-নিচু সমস্ত এলাকায় তাঁর বিহার। একটি গোটা জীবন এবং গোটা মানুষকে রূপ দিতে হয় তাঁকে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসমালায় এই সমগ্র জীবনেরই সম্মুখীন—বিষয়ে এবং বিন্যাসে। তিনি তাঁর আরাধ্য এবং অনেকের ব্যাখ্যাত নেহাত-বস্তুবাদী শিল্পী নন—তিনি বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎকে ধারণ করেন। নিছক-বস্তুবাদী শিল্পী নন তিনি—তাঁর রচনায় চরিত্র ও ঘটনার রহস্যময়তা মিশিয়ে যে-পৃথিবী নির্মাণ করেছেন তিনি, তা এক দার্শনিক লোকে উঠে যায়। বিচ্ছিন্ন করে আনলে আশ্চর্য লাগে না কি এইসব মানিকেরই উক্তি?—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. অথচ একেবারে চরম হিসাব ধরিলে শুধু এই সত্যটা পাওয়া যায়: রোগে ভোগা, সুস্থ হওয়া, রোগ সারানো, রোগ না সারানো সমান—রোগীর পক্ষেও শশীর পক্ষেও। [পৃ. ৭২]

২. এর চেয়ে বিস্ময়কর কিছু নাই যে শান্ত আর বন্য কোন মানুষই জীবনের রহস্য ভেদ করিয়া সেই চিরন্তন স্থিতির খোঁজ পায় না, যা অপরিবর্তনীয় হইলেও চলে, যেখানে অভিনবত্ব কাম্য নয় মানুষের। [পৃ. ৮৭]

তবে, সুখের বিষয়, মানিক বা তাঁর নায়ক শেষ পর্যন্ত এই দার্শনিক হতাশায় নিমজ্জিত হননি। এই অভিজ্ঞতা অর্জনে রেখেই শশী অগ্রসর হয়ে গেছে।

যে-কোনো লেখকের নায়ক তাঁর নিজের অনেকখানি প্রতিভূ। শুধু বুদ্ধদেব বসুর মতো অন্তর্বৃত লেখকের উপন্যাসের নায়কেরাই বুদ্ধদেবের প্রতিরূপ নয়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বহির্বৃত লেখকের কোনো-কোনো নায়কও তারাশঙ্করের অনুকল্প। বিজ্ঞানমন্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নায়ক শশী নিজেও বিজ্ঞানমন্য, নিরাসক্ত, নির্মম, স্বচ্ছ, তির্যক ও জটিল। এবং অস্তিত্ববাদী। পরাজিত এবং শেষ পর্যন্ত অপরাজিত সত্তা।

পুতুলনাচের ইতিকথা নিজে যেমন সমগ্র জীবনের একটি প্রতিভূ, তেমনি এই উপন্যাসের নায়কও সমগ্র জীবনের দিকে অগ্রসর। জীবন ও মৃত্যু, বস্তু ও রহস্য, বাস্তবতা ও দার্শনিকতা, ব্যক্তির আত্মদ্বন্দ্ব, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্ব, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্ব—এই উপন্যাসে পরস্পরের মধ্যে এমন চমৎকার মিশেছে যে এদের কোনোটিকেই আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না। এই সমগ্র জীবনেরই অন্বেষী শশী। সে এও বুঝেছে জীবনকে শ্রদ্ধা না করলে জীবন আনন্দ দেয় না। তাই সে প্রাণপণে জীবনকে শ্রদ্ধা করে—সংকীর্ণ, মলিন, দুর্বল, পঙ্গু—সমস্ত জীবনকে। সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করে নিজের জীবনকে।

সমগ্র জীবনের প্রতি শশীর এই শ্রদ্ধা, আসলে সমগ্র জীবনের প্রতি ঔপন্যাসিকের শ্রদ্ধার প্রকাশ। শশীকে সমগ্র করে গড়তে গিয়েছেন বলেই মানিক তাঁর চরিত্র বর্ণনার শুরুতেই তাঁর অন্তঃপৃথিবীর জল-স্থল সম্পর্কে এমন মন্তব্য করেন:

> শশীর চরিত্রের দুটি সুস্পষ্ট ভাগ আছে। একদিকে তাহার মধ্যে যেমন কল্পনা, ভাবাবেগ ও রসবোধের অভাব নাই, অন্য দিকে তেমনি সাধারণ সাংসারিক বুদ্ধি ও ধনসম্পত্তির প্রতি মমতাও তাহার যথেষ্ট। [পৃ. ১০]

শেষ-অব্দি শশীর সমগ্র চরিত্র-পরিকল্পনায় তার এই দুটি অংশই কাজ করে যায়। এবং এই দুই-ই শশীর সমগ্রতা নির্মাণ করে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেবল শশী নয়, অন্য সব চরিত্রও—যেমন গোপাল, কুসুম, যামিনী কবিরাজ, সেনদিদি, যাদব, পাগলদিদি, নন্দলাল, বিন্দু, কুমুদ, মতি, জয়া, বনবিহারী—প্রত্যেকেই জীবনের এক-পিঠ নয়, দুপিঠই দেখেছে, এবং দুই মিলে সম্পূর্ণ হয়েছে তাদের জীবনের সমগ্রতা।

উপন্যাসের শেষ হয়েছে এক শান্ততায়। নায়ক এক অভিজ্ঞতার শেষে পৌঁছেছে। সে-অভিজ্ঞতা এক অতলশায়ী উপলব্ধির অভিজ্ঞতা, সে-অভিজ্ঞতা জন্ম দিয়েছে এক স্তিমিতির, এক পরাজিত কিন্তু দায়িত্ববহ চেতনার। যে-শশী গ্রামের অনেকগুলি মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে চেয়েছিল, দিতে চেয়েছিল কিছু সুখ-শান্তি, সে উপলব্ধি করেছে—নিজের খুশিতে গড়া পথে জীবনের স্রোত বইতে পারে না। সেখানে থাকে এক অজানা শক্তির অনিবার্য ইঙ্গিত। এ অভিজ্ঞতা শশীকে স্তিমিত করেছে:

> জোরে আর আজকাল শশী হাঁটে না; মন্থর পদে হাঁটিতে হাঁটিতে গ্রামে প্রবেশ করে। [পৃ. ২১৭]

শশী কি পরাজিত? মানিক কি নাস্তি প্রচার করেছেন? না, শশীর পরাজয়ের ভিতর দিয়েও ঘোষিত হয় এক-ধরনের বিজয়—জীবনে পরাজয় আছে, সব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে না, কিন্তু দায়িত্বশীলতার মধ্য দিয়ে চলে যেতে হবে জীবনে—এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই, মাড়িয়ে যেতে হবে, আর এই মাড়িয়ে যাওয়াটাই আমাদের জীবন। জীবনের এই সশ্রদ্ধ দায়িত্বশীল অতিক্রমণ—এ-ই তো বিজয়, সে-দায়িত্ব যতবারই বিধ্বস্ত বিচূর্ণ হোক না ঐ দায়িত্ব গ্রহণেই রয়েছে বিজয়ী চৈতন্যের স্বাক্ষর। উপন্যাসের আরম্ভে সেই যে বলা হয়েছিল 'শশীর বিষণ্ণতা ঘুচিবার নয়', উপন্যাসের অন্তিম বাক্যে 'মাটির টিলাটির উপর উঠিয়া সূর্যাস্ত দেখিবার শখ এ জীবনে আর একবারও শশীর আসিবে না', যেন তা এক বলয় পূর্ণ করল। কিন্তু আমরা বুঝে নিয়েছি, শশীর এই ব্যক্তিগত বিমর্ষতা যেমন স্থায়ী, তেমনি তার 'কাজ আর দায়িত্বের' সামাজিক বোধটিও সচল থাকবে।

সমগ্র জীবনকে শ্রদ্ধা করেন ও ভালোবাসেন বলেই মানিকের এই অপূর্ব অভিজ্ঞান, যা তাঁর সমগ্র সাহিত্যেরই ধারক :

> জানিবার এত বিষয়, উপভোগ করিবার এত উপায়, বিজ্ঞান ও কাব্য মিশিয়া এমন জটিল, এমন রসালো মানুষের জীবন? [পৃ. ১৩]

বিজ্ঞান ও কাব্য, বস্তু ও রহস্য মিশে *পুতুলনাচের ইতিকথা* উপন্যাসটিও হয়ে উঠেছে অফুরানভাবে জটিল ও রসালো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুনশ্চ : প্রাসঙ্গিক তথ্য

এখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পুতুলনাচের ইতিকথা* সম্পর্কে কিছু তথ্য সংকলন করে দেওয়া হলো :

ক) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে এই উপন্যাস সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেছিলেন। একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করেছি মূল লেখায়। আরো দুটি মন্তব্য :

অ) লিখতে শুরু করেই আমার উপন্যাস লেখার দিকে ঝোঁক পড়লো। কয়েকটি গল্প লেখার পরেই গ্রাম্য এক ডাক্তারকে নিয়ে আরেকটি গল্প ফাঁদতে বসে কল্পনায় ভিড় করে এলো "পুতুলনাচের ইতিকথা" উপকরণ এবং কয়েক দিনে একটি গল্প লেখার বদলে দীর্ঘ দিন ধরে লিখলাম এই দীর্ঘ উপন্যাসটি—এ ব্যাপারের সঙ্গে সাধ করে বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়ার সম্পর্ক অনেক দিন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত থেকে যায়। মোটামুটি একটা ধারণা নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলাম যে, সাহিত্যিকেরও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন, বিশেষ করে বর্তমান যুগে, কারণ তাতে অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদের অনেক চোরা মোহের স্বরূপ চিনে সেগুলি কাটিয়ে ওঠা সহজ হয়। ['উপন্যাসের কথা', *পূর্বাশা*, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮][৮]

আ) প্রথমদিকে "পুতুলনাচের ইতিকথা" প্রভৃতি কয়েকখানা বই লিখতে মেতে গিয়ে যখন আমি নিজেও ভুলে গিয়েছিলাম যে আমার শরীর আছে এবং পরিবারের মানুষেরাও নিষ্ঠুরভাবে উদাসীন হয়ে গিয়েছিল তখন একদিন হঠাৎ আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। এক মাস থেকে দু তিন মাস অন্তর এটা ঘটতে থাকে। [অতুলচন্দ্র গুপ্তকে লেখা পত্র, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫][৯]

এই বিপুল পরিশ্রমের একটি প্রমাণ পাওয়া যাবে নিতাই বসুর *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজজিজ্ঞাসা* (১৯৭৮) গ্রন্থে। তিনি *পুতুলনাচের ইতিকথার* আদি পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার প্রতিচিত্র ছেপেছেন—যেখানে দেখা যাচ্ছে পাঠ খানিকটা ভিন্ন। তার অর্থ এই যে মানিক এই উপন্যাসটি নিয়ে যথেষ্ট খেটেছিলেন। আমরা এও জানি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আরো কিছু উপন্যাসের মতো, এই উপন্যাসটিরও দ্বিতীয় একটি খণ্ড লেখার পরিকল্পনা করেছিলেন। মতি-কুমুদের অনুকাহিনীটি তো অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে—উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড রচিত হলে হয়তো সেখানে থাকত তাদের প্রসঙ্গ। বেঙ্গল পাবলিশার্সের সঙ্গে *পুতুলনাচের ইতিকথা* উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের চুক্তিও হয়েছিল—এমনকি তার জন্যে মানিক অগ্রিম টাকাও নিয়েছিলেন।

পুতুলনাচের ইতিকথা চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয় ১৯৪৯ সালে। কে. কে. প্রোডাকশন প্রযোজিত এবং অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত *পুতুলনাচের*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিকথা মুক্তি পায় ১৯৪৯-এর ২৮ জুলাই কলকাতার তিনটি প্রেক্ষাগৃহে। মাস খানেকও চলেনি। শশী ও কুসুমের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীলিমা দাস। ১৭ জানুয়ারি ১৯৪৮ সালে মানিক তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন: "পুতুলনাচের ইতিকথার ছায়াচিত্রের চুক্তি সই করলাম: কে. কে. প্রোডাকসনের সঙ্গে। আমিই একমাত্র খ্যাতনামা লেখক যে সিনেমার কাছে আত্মবিক্রয় করেনি। এতোদিন পরে যেচে এসে 'শস্তা করা চলবে না' মেনে নিয়ে সিনেমা কোম্পানী চুক্তি করল। আশা করছি ছবিটা ভালো হবে। দেখা যাক!"[১০]

পুতুলনাচের ইতিকথা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে (পৌষ ১৩৪১—অগ্রহায়ণ ১৩৪২)। উপন্যাসটি মানিকের জনপ্রিয়তম দুটি উপন্যাসের একটি। বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশের বিবরণ:

১. প্রথম সংস্করণ। ১৯৩৬। ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা।
২. দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৯৪৭। দি বুকম্যান, কলকাতা
৩. তৃতীয় সংস্করণ। ১৯৫০। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা।
৪. চতুর্থ সংস্করণ। ১৯৫২।
৫. পঞ্চম সংস্করণ। ১৯৫৬।
৬. ষষ্ঠ সংস্করণ। ১৯৫৭।
৭. সপ্তম সংস্করণ। ১৯৫৯।
৮. একাদশ সংস্করণ। ১৯৭১। প্রকাশ ভবন, কলকাতা।
৯. দ্বাদশ সংস্করণ। ১৯৭৩।[১১]

AMARBOI.COM

পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাসের গুজরাতি ও তেলেগু ভাষায় অনুবাদ লেখকের জীবদ্দশাতেই হয়েছিল। গুজরাতি ভাষার অনুবাদক শ্রীকান্ত ত্রিবেদী (প্রকাশ: ১৯৫৩)। তেলেগু ভাষার অনুবাদক এম. সুরি। এ ছাড়া উপন্যাসটি হিন্দি, কানাড়া, চেক, সুইডিশ ও ইংরেজি ভাষায় অনূদিত। ইংরেজি ভাষার অনুবাদক শচীন্দ্রলাল ঘোষ (প্রকাশ: ১৯৬৮)।

তথ্যনির্দেশ

১. 'বাস্তবতার সমগ্রতা' কথাটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরই, 'উপন্যাসের ধারা' (*মা. গ্র.* ২) প্রবন্ধে উল্লেখিত।
২. 'বৈজ্ঞানিক বিচারবোধ' বলতে মানিক বুঝেছেন 'সরাসরি বিজ্ঞানের কিছু শিক্ষা পাওয়া নয়', বরং সাধারণ যুক্তবোধ, 'সাহিত্য উপন্যাসের নব বিধান যেন যুক্তিবাদেরই জয়গান'। ('উপন্যাসের ধারা', *মা. গ্র.* ২)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. পৃ. ৭৫, *Aspects of the Novel* : E. M. Forster.

৪. হয়তো একটি বাংলা নাটকের কথা মনে আসবে, দীনবন্ধু মিত্রের *নীলদর্পণ* (১৮৬০); কিন্তু মৃত্যু সেখানে এমন বীজময় নয়—অনেকখানি আরোপিত ও উদ্দেশ্যময়।

৫. উদ্দিষ্ট কবিতাটি জীবনানন্দ দাশের 'মৃত্যুর আগে' (*ধূসর পাণ্ডুলিপি*)।

৬. এবং জীবনানন্দ। উদ্দিষ্ট কবিতার নাম 'আট বছর আগের একদিন' (*মহাপৃথিবী*)। মানিক ও জীবনানন্দে এই কারণহীন মৃত্যুর তথ্য প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন জ্যোতির্ময় দত্ত ['জীবনানন্দ দাশ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', *কবিতা*, আশ্বিন ১৩৬৬]

৭. মানিকের 'আত্মসমালোচনা' :

> পুতুলনাচের ইতিকথা? তবে আর কথা কি, মানিকবাবু মানুষকে পুতুল বানিয়েছেন, ভাগ্যের দাস বানিয়েছেন।
>
> এটা হলো বিচারকদের রায়।
>
> যারা বিচার করে না, যারা আজ বিশ বছর ধরে বইটাকে জীবন্ত রেখেছে, তারা টের পায় এ বইখানা মানুষকে যারা পুতুলের মত নাচায় তাদের বিরুদ্ধে দরদী প্রতিবাদ। প্রচণ্ড বিক্ষোভ নয়, স্থায়ী দরদী প্রতিবাদ।
>
> ['ছিন্ন লেখা' : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। *এক্ষণ*, শারদীয়া ১৩৮৪]

৮. 'উপন্যাসের ধারা' নামে পরে সংকলিত হয়েছে। *মা. গ্র.* ২।

৯. ৪২-সংখ্যক পত্র, যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, ১৯৭৬।

১০. মানিকের *পুতুলনাচের ইতিকথা*-র চলচ্চিত্ররূপ এবং অনুবাদ-সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য গৃহীত হয়েছে *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* গ্রন্থ থেকে।

১১. সংস্করণ নির্ধারণে সহায়তা : সরোজ দত্তের 'ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' (১৯৯৩)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনের জটিলতা

কি জানেন, মানুষকে মানুষ বোঝে না বলেই তো বেঁচে থাকা এতো কষ্টকর।
[পৃ. ৪৯৩, 'জীবনের জটিলতা', *মা. গ্র.* ১]

মানুষ ও মানুষীর সম্পর্কই মানবজীবনের কেন্দ্রীয় বিষয় বলে ঘোষণা করেছিলেন ডি. এইচ. লরেন্স।[১] আর একথা বলেছিলেন তিনি উপন্যাস প্রসঙ্গেই—যে-সাহিত্যিক মাধ্যমটিতে মানবজীবনকে সবচেয়ে সম্পূর্ণভাবে রূপায়িত করা সম্ভব। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের অন্যতম প্রধান বিষয় এটিই—মানুষ ও মানুষীর সম্পর্ক। *জীবনের জটিলতা* উপন্যাসে আর্থ-সামাজিক পটভূমি আছে ঠিকই, কিন্তু আছে তা নিছক পটভূমি হিশেবেই। অর্থাভাবও আছে, নায়কের জীবনেই আছে, কিন্তু এই উপন্যাসের সংকটের কেন্দ্র অন্যত্র—মানুষ-মানুষীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে।

বিমল ও প্রমীলা এই দুই ভাই-বোন এই উপন্যাসের দুটি কেন্দ্রীয় চরিত্র। এদের ভেদ করে ও ঘিরে কাটাকুটি ও জটিল বুনন চলেছে অন্য কয়েকজন মানুষ-মানুষীর—শান্তা ও অধরের, নগেন ও লাবণ্যের; কাকীমা ও সজনীর। প্রথম পরিচ্ছেদটি মূল কাহিনীর সঙ্গে অসংযুক্ত—বিমল ও প্রমীলার বাল্যবেলার একটি ছবি। বাকি দশটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত মূল কাহিনী এই।—বিমল, তেইশ বছরের নবীন যুবক, প্রেমে পড়ে অধরের স্ত্রী শান্তার। ধনীকন্যা লাবণ্য বিমলকে অসম্ভব ভালোবাসে, কিন্তু 'জীবন একটা অদ্ভুত কাব্য' (পৃ. ৪৪২) কি না, তাই লাবণ্যকে অগ্রাহ্য করে অশিক্ষিতা পরস্ত্রী শান্তাকেই ভালোবাসে বিমল। শান্তাও তাকে ভালোবাসে। অধরের সঙ্গে বিমলের আড়াআড়ি সম্পর্ক। বিমল যে তার স্ত্রীকে ভালোবাসে, অধর তা জানে। অধর, একটু স্থূল প্রকৃতির

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ, চেষ্টা করেও স্ত্রীর মন পায় না। ক্রমশ অধরের ভালোবাসা হয়ে ওঠে সর্বগ্রাসী। 'এসব মানুষ যা ধরে তার শেষ না দেখিয়া ছাড়ে না।' (পৃ. ৪৮৭) এদিকে বিমল ও শান্তার প্রেম প্রচ্ছন্নতা থেকে বেরিয়ে এসে পরস্পরের কাছে স্বীকৃত হয় : 'একদিন—অকস্মাৎ—সংক্ষেপে।' (পৃ. ৪৯৪) পাশের বাড়ি থেকে অধর তা দেখে ফেলে হয়ে ওঠে ক্রুদ্ধ এবং কিছুটা তারই প্ররোচনায় (এবং আত্মদহনেও) শান্তা ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে যায়। সে অবশ্য তৎক্ষণাৎ মরে না, কয়েক দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে, এবং বিমলের প্রতি তার প্রেম তখন হয়ে ওঠে নগ্ন, নিঃসংকোচ ও নির্বাধ। কয়েক দিন পরে শান্তা মারা যায়। এদিকে প্রমীলার প্রেমিক নগেন তাকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে লাবণ্যকে নিয়ে লক্ষ্ণৌ ভ্রমণ করছিল। একদিন তাদের বিবাহের নিমন্ত্রণপত্রও আসে। বিপত্নীক অধর প্রমীলাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। এই অবস্থায় প্রমীলা যখন আত্মহত্যা আর আত্মরক্ষার দ্বিধান্বিত দোলায় ছাদে পায়চারি করছিল, তখন তাকে ধরে ফেলে বিমল। অতঃপর বিমলের চেষ্টা হবে মৃতা শান্তার স্মৃতি ভুলে প্রমীলাকে বাঁচিয়ে তোলা, বাঁচিয়ে রাখা। তাই এখন 'তার অনেক কাজ।' (পৃ. ৫৩৭) হয়তো ঐ কর্মলিপ্ততার মধ্য দিয়ে বিমলের আত্মজাগরণ ঘটবে, তার আবদ্ধ ও অচরিতার্থ প্রেম মুক্তি পাবে আকাশে, দায়িত্বের ভার তাকে বাঁচিয়ে দেবে। এরকম একটি ইশারায় উপন্যাসটি শেষ হয়।

এই কাহিনীর মধ্যে তাঁর স্বভাবী ভঙ্গিতে মানিক প্রতি মুহূর্তেই উপস্থিত। মানিকের প্রতিটি উপন্যাসের গঠনপ্রণালির মধ্যে একটুখানি স্বাতন্ত্র্য আছে। এই উপন্যাসের ফর্ম বা রূপবন্ধন এর নিজস্ব এবং এই উপন্যাসের অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য। মূল কাহিনীর সঙ্গে অসংযুক্ত প্রথম পরিচ্ছেদটিতে এই উপন্যাসের দুই কেন্দ্রীয় চরিত্র বিমল ও প্রমীলার বাল্যকালের একটি ছবি আছে। কিন্তু এ ছবি ঠিক ছবি নয়; এ যেন আসলে পরবর্তী সমগ্র উপন্যাসের মর্মগ্রাহী একটি দর্পণ। শৈশবেই আমাদের পরবর্তী সমস্ত কর্মের বীজ বোনা হয়ে যায়—এরকম একটি নির্দেশ, যা মনস্তত্ত্বসম্মতও হতে পারে নিয়তিচালিতও হতে পারে, এই পরিচ্ছেদ থেকে আমরা পেয়ে যাই। 'পথে কুড়াইয়া পাওয়া একটা অচল সিকির আশ্রয় করিয়া এত ব্যাপার ঘটিয়া যায়। এমনি মানুষের জীবন, এমনি জীবন মানুষের!' (পৃ. ৪৩৮) এই উক্তির দর্শন যেন সারা উপন্যাসে প্রতিবিম্বিত। একদিন বালক বিমল যেমন যে-কোনো প্রকারে ছোটো বোনকে খুশি করতে চেয়েছিল, উত্তরকালেও সে-ই নেয় তার 'সব ভার' (পৃ. ৫৩৬)। এদিক থেকে প্রথম পরিচ্ছেদটি আপাতভাবে অসংযুক্ত হলেও উপন্যাসটির মর্মের সঙ্গে গভীরভাবে বাঁধা। মানিকের সকল উপন্যাসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রূপবন্ধন যে তার বিষয়ের সঙ্গে ওতপ্রোত যুক্ত, এই উপন্যাস থেকে তা আর-একবার প্রমাণিত হয়।

উপন্যাসটির প্রকৃত সূচনা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে। তার প্রথমেই মানিকের তির্যক উক্তি তথা বাক্য সারা উপন্যাসের প্রকৃতি ও পরিণামের দ্যোতক: 'গলির নাম জীবনময় লেন, দুপাশের বাড়ির চাপে বহুকাল জীবন ত্যাগ করিয়াছে—শবের মত শীতল। বারচারেক দিক পরিবর্তন করিয়া এই গলি যে পুরাতন বাড়িটির বাহিরের জীর্ণ দরজায় শেষ হইয়াছে সেই বাড়িতে প্রমথ আজ সাত বৎসর সপরিবারে বাস করিতেছে।' (পৃ. ৪৩৯) জীবনময় লেনের মর্মভেদী ঠাট্টা, কানাগলির সর্বশেষ বাড়ির আবদ্ধতা ও ঘূর্ণিপাক এইসবই এই উপন্যাসে আবর্ত সৃষ্টি করেছে।

ছোটো এই উপন্যাসে নিরন্তর দুঃখ, অশ্রু, হতাশা, ব্যঙ্গ, ক্রোধ, রূঢ়তা, সংঘর্ষ, ব্যর্থতা, আত্মহত্যা। চরিত্রদের আলোড়িত অনুভূতি এখানে জোয়ারের ঢেউয়ের মতো অবিরত উঠেছে, পড়েছে। কেন্দ্রীয় তিনটি নারীচরিত্রই অসুখী ও ব্যর্থ: শান্তা বিমলকে ভালোবেসে আত্মহত্যা করল; প্রমীলা নগেনকে ভালোবেসে তাকে পেল না এবং অধরের সঙ্গে বিবাহের আগে আত্মহত্যায় প্রলুব্ধ হয়েও আত্মহত্যা করল না বটে, কিন্তু রইল বেঁচে মরে; আর বিমলকে ভালোবেসে নগেনের সঙ্গে বাধ্য হয়ে বাস করতে লাগল লাবণ্য, যেহেতু বিমল ভালোবাসে অন্য একজনকে। প্রধান তিনটি পুরুষচরিত্রও অসুখী ও ব্যর্থ: বিমল শান্তাকে ভালোবেসেও তাকে হারাল; যারা বিমলের তুলনায় কঠোর ও হৃদয়হীন, সেই অধর ও নগেনের জীবনও ট্র্যাজিক: 'বিমলের চেয়েও উগ্রভাবে অন্ধভাবে' যখন শান্তাকে ভালোবাসল অধর, তখনই তাকে দেখতে হলো তার স্ত্রী বিমলের চুম্বনে আলিঙ্গনে ধরা দিয়েছে; আর নগেনও কি সুখী? এক নারী থেকে অন্য নারীতে সে যে কেন ক্রমাগত ঘুরে ফিরছে তা কেউ জানে না। তাহলে কি অপ্রাপ্তিই সব? অপ্রাপ্তিই জীবনের ধর্ম? তাহলে কি এই উপন্যাসের ধ্রুবপদ এই উপন্যাসের সমকালে রচিত *পদ্মানদীর মাঝি*র একটি লোকসংগীতে পরিব্যক্ত হয়েছে?—'যে যাহারে ভালবাসে সে তাহারে পায় না কেন, গানে এই গভীর সমস্যার কথা আছে।' শুধু গানেই নয়, একই বছরে প্রকাশিত (১৯৩৬) *পদ্মানদীর মাঝি* এবং *জীবনের জটিলতা* উপন্যাসেও। যেন রবীন্দ্রনাথের *মায়ার খেলা* গীতিনাট্যের বস্তুভিত্তি রচিত হয়েছে এই উপন্যাসে। সনাতন সংঘর্ষই নয় শুধু, তা থেকে উত্থিত আত্মহননও এই উপন্যাসে উপর্যুপরি। মৃত্যু ও প্রেম, এই দুটি বিষয়ই এই উপন্যাসে জড়িত-মিশ্রিত হয়ে আছে। মৃত্যুকে এই উপন্যাসে মানিক বলেছেন, 'প্রকৃতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবচেয়ে প্রবল বন্ধন' (পৃ. ৪৮৬)। তিনটি আত্মহত্যার প্রসঙ্গ আছে: দুটি সফল, আর-একটি ব্যর্থ। সফল দুটি আত্মহত্যার অন্যতম কারণ বিমল নিজে; নগেনের দাক্ষিণ্যে-পাওয়া বিমলের চাকরির ফলে একটি যুবকের চাকরি খোয়াতে হয়—বিমলের সামনেই সে চলন্ত বাসের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়; দ্বিতীয়টি বিমলের প্রেমিকা শান্তার ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে কয়েক দিন ভুগে মারা যাওয়া। ব্যর্থ আত্মহত্যার প্রচেষ্টাটি ছিল প্রমীলার—সে-ও ছাদে ঘোরাঘুরি করছিল লাফিয়ে পড়ার চিন্তায়; বিমল তাকে বাঁচিয়ে দেয়। আত্মদহনই এইসব আত্মহননের কারণ।

বিমল বেকার কিন্তু আত্মমর্যাদাবান। তাই শান্তার সঙ্গে প্রেম করে ঠিকই কিন্তু হাজার প্রয়োজনেও তার দেওয়া টাকা সে নেয় না। নগেন তার বোনকে অপমান করায় নগেনের সুপারিশে পাওয়া একশ পঁচিশ টাকা বেতনের চাকরিটি অনায়াসে ছেড়ে দিয়ে সাতাশ টাকা মাইনের দৈনিক পত্রিকার প্রুফ রিডারের চাকরি নেয়। এই স্বাধীন সত্তাই তাকে প্রমীলার 'সব ভার' নেওয়ার শক্তি দেয় শেষে। প্রেমের ক্ষেত্রেও ঐ স্বাধীনতার বোধ কাজ করেছে—'বি.এ. পাশ অত্যন্ত আধুনিক' ধনীকন্যা কুমারী লাবণ্যকে বাদ দিয়ে 'রয়েল রীডার পড়া পরের বৌ গেঁয়ো মেয়ে' শান্তাকে ভালোবাসায়। প্রেমের দায়িত্বও বহন করতে চেয়েছে বিমল, শান্তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়ে। শান্তা রাজি হয়নি বলে তা সম্ভব হয়নি। বিমল প্রথম থেকেই তার প্রেমের ব্যাপারে নিঃসংশয়। শান্তার প্রাথমিক দ্বিধা কেটে গেছে তারই দৌলতে। লেখক হিশেবেও বিমল দৃঢ়চারিত্রিক। অভাবের জন্যে আত্মবিক্রয় করেনি। প্রমীলাকে সে একবার যা বলেছিল, তাতে তার ঐ দৃঢ় চারিত্রশক্তির পরিচয়ই পাই আমরা: 'আমি ফরমাসী ফাঁকিবাজ সাহিত্যিক নই মিলি। তিন দিন সিগারেট না খেয়ে থেকেছি, নির্লজ্জের মতো টাকা ধার করেছি, কিন্তু বাজে লেখা একটা লিখিনি।' (পৃ. ৫২৪) বিমলের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে যায়: তার প্রেমিকা শান্তা আত্মহত্যা করে, তার সহোদরা প্রমীলা প্রেমিক-কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়, আত্মসম্মানের খাতিরে ভালো চাকরিটি সে ছেড়ে দেয়: 'দুঃখ বদলায় না, ভোগ করিবার প্রক্রিয়াটা বদলায়।' (পৃ. ৫২২) কিন্তু শত দুঃখেও বিমল ভেঙে পড়ে না।

শান্তা বিমলকে বলেছিল 'দুঃখবাদী কবি' (পৃ. ৪৪০), আর লাবণ্য রাগ করে বলেছিল 'দরকারবাদী কবি' (পৃ. ৪৭৪)। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শান্তাই বুঝেছিল বিমলকে, লাবণ্য বোঝেনি (লাবণ্য তাকে তাই বলে, 'লাবণ্যের মত মেয়ের কাছেও তুমি একটি রহস্য হয়ে রইলে বাবু।'—পৃ. ৫৩০) অবিবাহিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিমল যেমন 'এক মেঘাচ্ছন্ন দুপুরে' শান্তাকে জানালায় বসে থাকতে দেখেই 'বাস্তব স্বপ্নের মত' তাকে আবিষ্কার করে 'আশ্চর্য' হয়ে গিয়েছিল, বিমলের প্রতি বিবাহিতা শান্তার প্রেমের জাগরণ তেমনভাবে ঘটেনি, ঘটেছে আস্তে-আস্তে—প্রায়-অলক্ষ্যে—কিন্তু অনিবার্যভাবে, ফেরার পথ বন্ধ করে: 'কতদিন সে [শান্তা] বিমলের কাছে ছুটিয়া গিয়াছে—কেন গিয়াছে না জানিয়া। ইহার সঙ্গে লড়াই চলে না।' (পৃ. ৪৬১) অধরের স্থূল প্রেমকে সে যত ঠেলে সরিয়েছে তত আকৃষ্ট হয়েছে বিমলের প্রতি: 'বিমল তাহাকে নিয়া একদিন এমনি কাব্য করিয়াছিল—কিন্তু এভাবে নয়। [অধরের মতো] এমন রূঢ় নির্মম আমোদের জন্য নয়।' (পৃ. ৪৮১) পরস্পরের কাছে যেদিন তারা প্রকাশিত হলো, সেদিনও বিমল-শান্তার সম্বোধন ছিল আপনা-আপনি করে; কিন্তু শান্তার আত্মহত্যার চেষ্টার পরে, মৃত্যুর আগের দিনগুলিতে তাদের সম্পর্ক হয়ে ওঠে আরো প্রগাঢ়, 'তুমি' বলে, শান্তার সমস্ত দ্বিধা-সংশয় ঘুচে যাওয়ায় সে আর কোনো আড়ালই রাখে না। ছাদ থেকে সে লাফ দিয়েছিল 'কল্পনায় বিমলের বুকে নিজেকে সঁপিয়া দেওয়ার মত' (পৃ. ৪৯৯)। আর তারপর যে-কদিন বেঁচে থাকে তার প্রেম আকস্মিক আঘাতে অলজ্জ, উন্মুক্ত, নিরর্গল করে দেয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে-বোঝাপড়ার কথা বিমলকে বলেছিল অশিক্ষিতা গেঁয়ো মেয়ে শান্তা ('মানুষকে মানুষ বোঝে না বলেই তো বেঁচে থাকা এতো কষ্টকর।'—পৃ. ৪৯৩), যা বিমল আর তার মধ্যে রচিত হয়েছিল, স্বামী-স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও অধর ও শান্তার মধ্যে সেই বোঝাপড়া কখনো হয়নি। 'অধর যেন জীবন-যুদ্ধের জন্য বিশেষ করিয়া সৃষ্টি করা যোদ্ধা।' (পৃ. ৪৫৪) অধর স্থূল, রূঢ়ভাষী, পরিহাসদক্ষ, 'উগ্র' ও 'গম্ভীর' আর শান্তা 'ভীরু' ও 'ক্ষীণ'। স্ত্রীকে যখন হঠাৎ ভালোবাসতে গেল অধর, তখন তার উগ্র ভালোবাসা শান্তার শীতলতায় প্রতিহত হয়। স্বামীকে শান্তার মনে হয় 'দয়ার বৈজ্ঞানিকের মত', 'দয়া করার ভয়ানক পন্থা যে আবিষ্কার করিয়াছে।' (পৃ. ৪৬৫) আর শান্তা সব সময় মনে-মনে স্বামীর সঙ্গে বিমলের তুলনা দেয়। নির্ঘুম রাতে 'শান্তার মনে হয় আলোকরেখার অন্য প্রান্তে বিমল চোখ রাখিয়া বসিয়া আছে।' (পৃ. ৪৫৯) স্ত্রীর ভালোবাসা না পেতে-পেতে অধর যখন মরিয়া, তখন সে স্বচক্ষে দেখল শান্তা ও বিমলের সপ্রেম চুম্বনের দৃশ্য। আর তারপরই সে শান্তাকে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেয়: 'আমি হলে মরতাম শান্তা, অসতী হওয়ার জন্য নয়, একজন নির্দোষী মানুষকে ঠকানোর জন্য আমি মরতাম।' (পৃ. ৪৫৪); কিন্তু অধর অনুতাপহীন। তাই বিমলের সংলাপ এরকম: 'শান্তাকে আপনি বাঁচাতে পারতেন—আমাকে বাঁচাতে দিতে পারতেন।' (পৃ. ৫২৬) আর তার উত্তরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধরের উক্তি এরকম : 'শান্তা বাঁচতে চায়নি। ও আপনাকে ভালবাসত। ওকে বাঁচালে কি হত জানেন? আবার ছাত থেকে ঝাঁপ দিত। মিছামিছি ওর যন্ত্রণা বাড়াতে চাইনি।' (পৃ. ৫২৬) আসলে অধরের মনের গড়ন শান্তা ও বিমলের চেয়ে একেবারেই আলাদা; এবং শান্তা ও বিমলের মনের গড়ন কাছাকাছি। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে বোঝাপড়া হয়েছিল এবং অধরের সঙ্গে শান্তা ও বিমল কারোরই বনেনি।

এমনকি এ তো আমরা দেখছি উপন্যাসের শেষে এসে যে প্রমীলাও অধরের সঙ্গে বিয়ে হতে পারে এই আশঙ্কায় আত্মহত্যার চিন্তা করছে। প্রমীলাও অধরের থেকে একেবারে ভিন্ন গোত্রের মানুষ। উপন্যাসের প্রথম দিকে সে তো অধরকে পরিষ্কার বলেই ছিল : 'ওসব আপনি বুঝবেন না, সব লোকে যদি সব জিনিষ বুঝতে পারত তবে আর ভাবনা ছিল না।' (পৃ. ৪৫৬) প্রমীলা ছিল নগেনের প্রেমিকা। 'ছিল', কেননা উপন্যাসে আমরা যখন তাকে দেখি, তখন নগেন অন্য প্রেমিকা (লাবণ্যকে) জুটিয়েছে। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে নগেন-প্রমীলা একসময় ঘনিষ্ঠ প্রেম করেছে, সম্ভবত দেহমিলনও বাদ থাকেনি, কেননা বলেছেন লেখক : 'তার [প্রমীলার] নিজের অবস্থা শোচনীয়, এক অদ্ভুত মানুষের অদ্ভুত খেয়াল তাকে শেষ করিয়া দিয়াছে, স্বামী থাকিতে কুমারী।' (পৃ. ৫২৯) শান্তার মৃত্যুর পর প্রমীলা চেষ্টা করেছে 'শান্তা যে দুটি মানুষকে ভাঙ্গিয়া দিয়া গিয়াছে' (পৃ. ৫২৯), বিমল ও অধরকে, তাদের জোড়া লাগানোর, আবার বাঁচিয়ে তোলার। কিন্তু নগেন-লাবণ্যের বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র যখন এসে পড়ে, অধরকে যখন প্রমীলা-বিমলের বাবা প্রমথ পাকা কথা দিয়ে দেয়, তখন, ততদিনে, 'নিজের অদৃষ্টকে ও চিনিয়াছে।' (পৃ. ৫৩৯) তারপর প্রমীলা আত্মহত্যার চেষ্টা করে—শান্তার মতোই ছাদ থেকে লাফ দিয়ে। বিমলের বাধায় নিবৃত্ত হয়। শেষ পর্যন্ত সে হয়তো বিমলের উপর নির্ভর করেই বাঁচার চেষ্টা করবে—এই ইঙ্গিতে উপন্যাস শেষ হয়।

১৯৩৪-৩৬ : এই তিনটি বছর মানিকের জীবনের সবচেয়ে ফলবান বছর। এই তিন বছরে রচিত ও প্রকাশিত হয় তাঁর পাঁচটি উপন্যাস (*জননী*, ১৯৩৫; *দিবারাত্রির কাব্য*, ১৯৩৫; *পুতুলনাচের ইতিকথা*, ১৯৩৬; *পদ্মানদীর মাঝি*, ১৯৩৬; *জীবনের জটিলতা*, ১৯৩৬) এবং একটি গল্পগ্রন্থ (*অতসী মামী* ১৯৩৫)। এই রচনাগুলির একটি পরম্পরা আছে—কখনোই অসংলগ্ন নয়। এই পর্যায়ের উপন্যাসগুলির একটি কেন্দ্রীয় বিষয় প্রেম। আরো ব্যাপক আকারে বলতে হলে সামাজিক বিভিন্ন মানুষের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন ক্রমাগত পরীক্ষিত হয়েছে এইসব উপন্যাসে। *জীবনের জটিলতা* উপন্যাসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামাজিক বিভিন্ন মানুষের মধ্যে সম্পর্কের জটিলতা বর্ণিত হয়েছে : দম্পতির (সজনী ও কাকীমা, অধর ও শান্তা), প্রেমিক-প্রেমিকার (বিমল ও শান্তা, নগেন ও প্রমীলা), এমনকি নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তিদেরও (বিমল ও সদ্য-চাকরি-হারানো যুবক)। এই জটিলতা এমনই যে *দিবারাত্রির কাব্য, পদ্মানদীর মাঝি* বা *পুতুলনাচের ইতিকথায়* প্রকৃতির যেটুকু ভূমিকা ছিল, এখানে তার কিছুমাত্র নেই।[২] এই উপন্যাস নিসর্গহীন কলকাতার পটভূমিতে রচিত। এখানে নেই বুদ্ধদেব বসু-কথিত 'অলৌকিকের উদ্ভাস'।[৩] পূর্বোক্ত উপন্যাসগুলিতে চরিত্রদের উপরে যেভাবে রহস্য বা রূপকের প্রতিকার লেগে থাকে, *জীবনের জটিলতায়* তা নেই; এই উপন্যাসের চরিত্র ও ঘটনা বাস্তবের শক্ত ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে। তাঁর প্রথম উপন্যাস *দিবারাত্রির কাব্য*-এ যে-স্বপ্নময়তা, রূপকের প্রতিভাস, তা থেকে সরে এসে একদিকে গ্রামীণ নিম্নবিত্তের জীবন নিয়ে লেখেন *পদ্মানদীর মাঝি*, অন্যদিকে শাহরিক মধ্যবিত্তের জীবন নিয়ে *জীবনের জটিলতা*। তবে *পদ্মানদীর মাঝির* ব্যাপক জীবনচিত্রের তুলনায় *জীবনের জটিলতা* অনেকখানি ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তাহলেও, অন্তর্বাস্তবতার উপন্যাস হয়েও *জীবনের জটিলতা* বহির্বাস্তবকে একতিল উপেক্ষা করেনি। বেকার বিমল প্রমীলার মাকড়ি ধার নেয়; ট্রামের পয়সা ফাঁকি দিয়ে মনে করে 'সে সত্য সত্যই চারটা পয়সা উপার্জন করিয়াছে।' (পৃ. ৪৪৬) শেষ পরিচ্ছেদেও দেখা যায় বিমল সদাগরী আপিস, মাসিকের আপিস, খবরের কাগজ আপিস ঘুরে একটা প্রুফ দেখার কাজ জোগাড় করে বাড়ি ফেরে। মধ্যবিত্ত মানুষের প্রকৃতি মূর্ত হয়েছে আত্মহত্যার আগে চাকরিচ্যুত যুবকের জবানিতে, 'কাল বাড়িতে পাঁচ সিকের হরিলুট হয়ে গেছে। কত কাল পরে বৌ হাসিমুখে কথা বলেছিল। কাল দুবেলা ভাতের সঙ্গে কি পেয়েছি জানেন? দুধ। আর বিকেলে লুচি জলখাবার।...' (পৃ. ৪৮৪) মানিক যে মধ্যবিত্ত জীবনের নির্দয় রূপকার, তাঁর পরবর্তী অনেক গল্পে-উপন্যাসে তা পরিস্ফুট হয়েছে; কিন্তু *জীবনের জটিলতা* রচনার সময়েই তিনি মধ্যবিত্ত জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ মোহহীন ও নিরাসক্ত। যেহেতু এই উপন্যাসে লেখকের লক্ষ্য বিভিন্ন চরিত্রের মানসপ্রতিক্রিয়া, কাজেই বহির্বাস্তবতার বিষয়টি অতখানি নজরে পড়ে না। কিন্তু এই উপন্যাসে অন্তর্বাস্তবতা ও বহির্বাস্তবতা কখনো বিশ্বাস্যতা বা সম্ভাব্যতা অতিক্রম করে না। *দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাসে বা *অতসী মামীর*[৪] কয়েকটি গল্পে চরিত্র, ঘটনা ও পটভূমির উপরে যে-স্বপ্নাঞ্জন লেগে ছিল, *জীবনের জটিলতা* তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। বহির্বাস্তব ও অন্তর্বাস্তব—দুদিক থেকেই তা দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। সাবলীল ও শক্ত, সুস্থ ও পরিণত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনের রচনা। সেদিক থেকে *জীবনের জটিলতা* মানিকের প্রথম পর্যায়ের একটি প্রতিভূ-উপন্যাসও বটে। যদিও তা তাঁর রচিত সমকালীন মহান উপন্যাসগুলির মতো (*দিবারাত্রির কাব্য, পুতুলনাচের ইতিকথা, পদ্মানদীর মাঝি*) উতল ও বিচিত্রদ্যুতিমান নয়।

জীবনের জটিলতা—উপন্যাসের এই নামকরণ সরল। মানিকের অধিকাংশ উপন্যাসের নামকরণই এরকম সরল ও সাধারণ, সরাসরি বিষয়নির্দেশী। 'পদ্মানদীর মাঝি', 'দিবারাত্রির কাব্য', 'ধরা-বাঁধা জীবন', 'প্রতিবিম্ব', 'সহরতলী', 'দর্পণ', 'আরোগ্য', 'হরফ', 'সহরবাসের ইতিকথা'—এইসব নাম সরাসরি বিষয়জ্ঞাপক, নিরলংকার, অচতুর। 'জীবনের জটিলতা'ও তাই। মানিকের সমস্ত উপন্যাসেরই যদি একক কোনো শিরোনাম দেওয়া হয়, তাহলে এই নাম যথার্থ হবে। কিন্তু নামকরণের সারল্যের সঙ্গে মানিকের উপন্যাসের অন্তঃপ্রকৃতির মিল নেই—ঐ অন্তঃপ্রকৃতি সরল-বক্র চালে মিশ্রিত।[৫] তাই, *জীবনের জটিলতায়* নরনারীর অনুভূতি ও আবেগই শুধু বিপুল বেগে আন্দোলিত হয়নি, আত্মহত্যার মতো তীব্রতম ঘটনাও একাধিক ঘটেছে।[৬] মানিকের প্রথম-পর্যায়ী উপন্যাসে শিল্পী ও দার্শনিকের একটি সমন্বয়ী দৃষ্টির সাক্ষাৎ আমরা পাই। মানিকের অসামান্য শৈল্পিক কুশলতা এখানে যে তাঁর উপন্যাসের প্রধান চরিত্রেরা নিয়তিচালিত হয়েও একরঙা নয়, জটিল ও অন্তঃপরিবর্তনশীল : অপ্রেমিক অধরও তাই একসময় পাগলের মতো ভালোবাসতে থাকে শান্তাকে, বিমলকে ভালোবেসেও বিবাহিত জীবনের বন্ধনে দহনে শান্তা জ্বলতে থাকে; আর বিমল তো আনুপূর্ব পরিবর্তমান। এ বইয়ে ব্যবহৃত হয়েছে মানিকের স্বভাবশোভন বাহুল্যবর্জিত সরল ভাষা; কখনো-কখনো কূটাভাসদ্যুতিময় কি যৌগিক বাক্য। আর সমস্তই গতিশীল সজীবতায় কিন্তু আশ্চর্য নির্বহুল সংযমে। আর দার্শনিকতা?

মানিকের প্রথম পর্যায়ের প্রায় সব নায়কের মতো বিমলও অবিরলভাবে বিশ্লেষণশীল। তার স্বভাব 'অন্তরালের মানুষ' (পৃ. ৪৭৩) খুঁজে বেড়ানো। 'সারা বিকালটা ঘুরিয়াও পাঁচটা টাকা জোগাড় করা গেলো না। আবার নগেনের কাছে হাত পাতা ছাড়া উপায় নাই।' (পৃ. ৪৩৯) এখানেই উপন্যাসের প্রকৃত আরম্ভ। এর মধ্যে বিমলের যে অনিশ্চিতি ও পরনির্ভরশীলতা আভাসিত, উপন্যাসের শেষ সেভাবে হচ্ছে না, হচ্ছে একেবারেই উল্টোভাবে: একটি দৃঢ় অঙ্গীকারে। মানিকের প্রথম-পর্যায়ী উপন্যাসের মতো এই উপন্যাসের চরিত্রেরাও নিয়তিচালিতই মনে হয়—মনে হয় এরা এমন-একটি তীব্র জলোচ্ছ্বাসে ভাসমান, যার উদ্ধার তাদের হাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই। প্রমীলা, শান্তা, লাবণ্য, নগেন, কাকীমা, সজনী, এমনকি হৃদয়হীন অধর, এমনকি অন্তরালসন্ধানী বিমল—প্রত্যেকেই ভেসে চলেছে নিরুপায়ের মতো। কিন্তু বিমল শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যায়। নিজের জীবনে না-পারলেও প্রমীলার ভার নেওয়ায় তার সংগ্রামশীলতা রূপ পায়। 'তার [বিমলের] অনেক কাজ।' (পৃ. ৫৩৭) নিজের জীবনে শান্তি না-পেলেও, সহোদরা প্রমীলার জীবন বিপর্যস্ত হয়ে গেলেও, ঐ বোনকে একটু শান্তি দেবার জন্যেই অতঃপর বিমল সচেষ্ট হয়। জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে সে কারণ হয়েছে দুটি আত্মহত্যার; তৃতীয়টি সে ঠেকাল। প্রমীলাকে আত্মহত্যার প্রলোভন থেকে মুক্ত করে এনে সে বলে, '...আমি তোর সব ভার নিলাম।' (পৃ. ৫৩৬) মৃতা প্রেমিকার শেষ স্মৃতিচিহ্নটিও দগ্ধ করল। অতঃপর সে প্রমীলাকে বাঁচাবার চেষ্টা করে যাবে।[৭] আর এ কর্মলিপ্ততায় তারও ঘটবে আত্মমুক্তি। বিমলও, মানিকের প্রথম-পর্যায়ী অনেক নায়কের মতো অস্তিত্ববাদী—যার মুক্তি হয় দায়িত্ব গ্রহণে, স্বাধীন সত্তায়, লিপ্ততায়, যুক্ততায়।

তথ্যনির্দেশ

১. পুরো কথাগুলি এই (১৯২৫ সালে প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল) :

> The great relationship, for humanity, will always be the relation between man and woman. The relation between man and man, woman and woman, parent and child, will always be subsidiary./ And the relation between man and woman will change for ever, and will for ever be the new central clue to human life. It is the 'relation itself' which is the quick and the central clue to life, nor the man nor the woman nor the children that result from the relationship as a contigency.
>
> ['Morality and the Novel', *Selected Literary Criticism*, D. H. Lawrence]

২. সমকালীন ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) একেবারে বিপরীত মানিক, তাঁর উপন্যাসে নিসর্গের ভূমিকা প্রায় নেই বললেই চলে, তাঁর লক্ষ্যের সবখানি মানুষ।

৩. মন্তব্যটি ছিল এই :

> "পদ্মানদীর মাঝি"তে এমনকি "পতুলনাচের ইতিকথা"য়—তাদের নিখুঁত বাস্তবসদৃশতা সত্ত্বেও—এই অলৌকিকের উদ্ভাস আমরা অনুভব করতে পারি; বর্ণিত মানুষেরা যেন অন্য কিছুর প্রতিনিধি, এই অনুভবের ফলে তারা নতুন একটি আয়তন পায়—যেটা তথ্যগত নয়, ভাবগত।
>
> ['মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', *স্বদেশ ও সংস্কৃতি*: বুদ্ধদেব বসু]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪. *অতসী মামী* মানিকের প্রথম গল্পগ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রথম গল্প 'অতসী মামী' থেকে শেষ গল্প 'আত্মহত্যার অধিকার' যেন মানিকের সম্পূর্ণ সাহিত্যজীবনের একটি রূপক। কয়েকটি গল্পের পরেই মানিক তার আত্মজগৎ নির্মাণ করে নিয়েছিলেন। 'শিপ্রার অপমৃত্যু' গল্পে নারীপুরুষের প্রেম, যা বৃহত্তর সমাজ-পরিবেশের সঙ্গে অযুক্ত *দিবারাত্রির কাব্য* ও *জীবনের জটিলতা*তেও তা-ই ছিল তাঁর উপজীব্য। 'সর্পিল' ও 'বৃহত্তর-মহত্তর' দাম্পত্য প্রেমের জটিল কুটিলতা ও অন্তঃসারশূন্যতা উন্মোচিত করেছে। মানিকের অন্যতম প্রধান পরীক্ষাস্থল দাম্পত্য সম্পর্ক। আর তখনই মানিক তাঁর অসাধারণ মনোজগতের কূটাভাসের সন্ধান পেয়ে গিয়েছিলেন—মমতাদি স্বামীসন্তানের প্রতি অপরিসীম ঘৃণা প্রকাশের পরই তাদের কুশল জানতে চায়। ['বৃহত্তর-মহত্তর']

৫. মানিকের পরবর্তী প্রজন্মের কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বিশ্লেষণ :

> ...বইয়ের নাম হিসাবে "জীবনের জটিলতা" আমার পছন্দ হয়নি। বড় সরল নাম। জটিলকে যদি সোজা ভাষায় শুধু জটিলই বললাম তাহলে তো সমস্ত জটাজুট চোখের সামনে তুলেই ধরা হল। তখন নামটি পড়ে আমার তাই-ই মনে হয়েছিল। / সেই বয়সে বুঝিনি জীবনের সমস্ত জটিলতা সরলতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বলেই তা জটিল। তা সারল্যের নাম নেয়, রূপ নেয়, অন্যকে ভোলায়, নিজেকেও বিভ্রান্ত করে।'
>
> ['একটি নাম আর কয়েকটি বই' : নরেন্দ্রনাথ মিত্র, *দেশ*, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৬৬]

AMARBOI.COM

৬. আত্মহত্যার প্রসঙ্গ প্রাথমিক মানিক-সাহিত্যে উপর্যুপরি। *দিবারাত্রির কাব্য*-এ হেরম্বের স্ত্রী আত্মহত্যা করেছিল, আনন্দও তাই। *পুতুলনাচের ইতিকথায়* যাদব ও তার স্ত্রীর যুগল আত্মহত্যা। 'আত্মহত্যার অধিকার' (*অতসী মামী*) গল্পে নীলমণির স্বেচ্ছামৃত্যুর বর্ণনা নেই, শুধু তার মর্মান্তিক পটভূমিটুকু তৈরি করা হয়েছে। 'ফাঁসি' গল্পে ফাঁসির আসামি গণপতি ফাঁসিকাঠ থেকে অব্যাহতি পায় বটে, কিন্তু তার স্ত্রী রমা অসম্ভব মানসিক চাপ সহ্য করতে না-পেরে আত্মহত্যা করে।

৭. আমাদের মনে পড়ে যায় *চতুষ্কোণ*-এর রাজকুমার বা *প্রতিবিম্ব*-এর তারককে—অনেক হতাশা, মোহভঙ্গ, বিপর্যয়ের পর তারাও একটি দায়িত্বে আবদ্ধ হয়ে শান্তি পায়। মানিকের এইসব নায়ক পরাজিত অথচ অপরাজেয় অগ্নিতে শেষ পর্যন্ত দীপ্যমান। বিমলও তাই। এমনকি *পদ্মানদীর মাঝির* কুবের, ময়নাদ্বীপে নিয়তিচালিত হয়ে সে যায় ঠিকই, কিন্তু এই যাত্রার সূত্রেই সে পেয়ে যায় তার প্রেমিকা নারীকে। মানিকের প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসসমূহের নায়করা রক্তাক্ত, পরাজিত, কিন্তু এক কণা আশা তাদের থাকেই—একেবারে আশাহীন গহ্বরে তিনি তাদের নিক্ষেপ করেন না জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) বা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর (১৯২২-৮২) মতো। আর তাঁর উপন্যাসসমূহ রক্তাক্ত হলেও শেষ হয় একটি শমশান্তিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অহিংসা

> আশ্রম নির্জ্জন, কিন্তু সে অনেক নরনারীর নির্জ্জনতা, আশ্রমের নিয়মে বাঁধা জীবন শান্ত, কিন্তু সে-নিয়মও অসাধারণ, সে-শান্তিও অসামান্য। কি যেন ঘটিবার অপেক্ষায় গাছপালায় ঘেরা আশ্রমের ছোট ছোট কুটিরগুলিতে প্রতি মুহূর্তে উন্মুখ হইয়া থাকা যায়—মনে হয়, এই বুঝি আশ্রমের গাম্ভীর্যপূর্ণ শান্ত ভাব চুরমার করিয়া প্রচণ্ড একটা অবরুদ্ধ শক্তি আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিবে।
>
> [পৃ. ৮৬, 'অহিংসা', *মা. গ্র.* ৪]

AMARBOI.COM

১. পটভূমি-পরিচয়

অহিংসা প্রথম প্রকাশিত হয় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত *পরিচয়* পত্রিকার মাঘ ১৩৪৫ সংখ্যা থেকে পৌষ ১৩৪৭ সংখ্যা পর্যন্ত, ধারাবাহিকভাবে। ১৯৩৯ সালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স একত্রিশ, বিয়ে করেছেন তার আগের বছর, পিতা ও ভ্রাতাদের সঙ্গে একান্নবর্তী সংসারে থাকেন, মৃগী রোগের শিকার, ১ জানুয়ারিতে *বঙ্গশ্রী* পত্রিকার চাকরি ছেড়েছেন, স্থাপন করেছেন একটি প্রেস ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। সে-বছরই সাময়িক পত্রিকায় বেরিয়েছে তাঁর *সহরতলী* উপন্যাস; তার আগে পার হয়ে এসেছেন *দিবারাত্রির কাব্য, পুতুলনাচের ইতিকথা, পদ্মানদীর মাঝি* প্রভৃতি বিখ্যাত ও অসামান্য উপন্যাসের জগৎ (মোট ছ'টি উপন্যাস); প্রকাশিত হয়েছে চারটি গল্পগ্রন্থ। *অহিংসা* গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় আর-একটু দেরিতে—১৯৪১ সালে, ডি.এম. লাইব্রেরি থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. লেখকের মন্তব্য

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় *অহিংসা* উপন্যাসের কোনো ভূমিকা লেখেননি। কিন্তু *অহিংসার* দুবছর পরে প্রকাশিত *প্রতিবিম্ব* (১৯৪৩) উপন্যাসের ভূমিকায় *অহিংসা* উপন্যাস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কথা বলেছিলেন :

> আমার "অহিংসা" বইখানা নিয়ে এরকম অভিযোগ উঠেছিল। দেশে অহিংসা নীতিতে রাজনৈতিক আন্দোলন চলছে। বইখানার নাম অহিংসা। সুতরাং যদিও বইখানাতে রাজনৈতিক কোন ব্যাপার নেই, তবু ধরে নিতে হবে অহিংসা আন্দোলনের সঙ্গে কাহিনীর সংশ্রব আছে।
>
> 'কী বলতে চাচ্ছেন ঠিক ধরতে পারছি না মানিকবাবু।'
>
> 'যা বলিনি তা ধরতে চাইছেন কেন?'
>
> প্রশ্নকারী তিন ঘন্টা ধরে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন আমার লেখা বইয়ে আমি কী বলেছি আর কী বলিনি। নীতি বা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ না করেও সাধারণ মানুষ যে অজ্ঞাতসারেই অনেক অহিংস কাজ করে, হিংসার সঙ্গে অহিংসাও যে মানুষের মধ্যে থাকে এবং এই সাধারণ অহিংসাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষ নিয়ে যে উপন্যাস লেখা যায়, এটি তাকে কোনমতেই বুঝিয়ে দিতে পারলাম না।

আমরা সব সময় লেখকের উক্তিতে আস্থাশীল নই; কিংবা কথাটি এভাবে বলা যায়, তাঁর নিজের লেখা সম্পর্কেও লেখকের উক্তি আমরা অপরীক্ষিতভাবে গ্রহণ করতে রাজি নই। কেননা একটি সৃষ্টিকাজ এবং তার বিশ্লেষণ (লেখক-কৃত) সব সময় এক রেখায় চলে না। মানিকের রচনাতেই আছে এর উদাহরণ। *পুতুলনাচের ইতিকথা* (১৯৩৬) উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বক্তব্য এবং অনেক বছর পরে স্বয়ং লেখকের 'আত্মসমালোচনা'[১] মেলে না—আমাদের বিবেচনায়। কিন্তু *অহিংসা* উপন্যাস সম্পর্কে লেখকের বক্তব্যে আমরা বিশ্বাসী। *অহিংসা* কোনো অর্থেই রাজনৈতিক উপন্যাস নয়। এ সত্যি 'সাধারণ অহিংসাকে কেন্দ্র ক'রে সাধারণ মানুষ নিয়ে' লেখা একটি উপন্যাস। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের সঙ্গে এই উপন্যাসের কোনো সম্পর্ক নেই। এ উপন্যাস যে 'সাধারণ অহিংসাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষ নিয়ে' লেখা উপন্যাস, আমাদের আলোচনায় তা ক্রমশ স্পষ্ট হবে।

৩. সমালোচকদের মন্তব্য

এখন, *অহিংসা* উপন্যাস সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচকের কয়েকটি মন্তব্য ও বিশ্লেষণ পরীক্ষা করে দেখা যাক।

ক) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা* (১৩৭২) গ্রন্থে লিখেছেন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"অহিংসা" ও "অমৃতস্য পুত্রাঃ" গ্রন্থ দুইখানি অবিমিশ্র অসাফল্যের উদাহরণ। প্রথমটিতে আশ্রমের ইতিহাসটি ভণ্ডামি, ধর্মান্ধতা এবং কখনও গোপন, কখনও প্রকাশ্য যৌনলালসার উদ্ভট লীলাক্ষেত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই দুর্বোধ্য আখ্যানে লেখকের কোন স্থির লক্ষ্য বা স্পষ্ট উদ্দেশ্য দৃষ্টিগোচর হয় না। মাঝে মধ্যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-চেষ্টা ও গ্রন্থকারের নিজের জবানীতে উক্তি গ্রন্থের ঘোরালো আবহাওয়াকে আরও দুর্বোধ্য করিয়াছে। মহেশ চৌধুরী, সদানন্দ, বিপিন, মাধবী, বিভূতি প্রভৃতি কোন চরিত্রই ঠিক বোধগম্যতার স্তরে পৌঁছায় নাই—ইহারা যেন অন্ধকার কুয়াশার মধ্যে পরস্পরের সহিত ঠেলাঠেলি-সংঘর্ষ বাধাইয়া ও ক্ষণস্থায়ী, মূলহীন সম্বন্ধে জড়িত হইয়া এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে। "অমৃতস্য পুত্রাঃ"-এর মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও উদ্দেশ্যহীনতার চিহ্ন আরও সুপরিস্ফুট। এই দুইখানি উপন্যাসে গ্রন্থকারের উদ্ভট কল্পনাপ্রবণতা বাস্তবনিয়ন্ত্রণ অস্বীকার করিয়া এক সংগতিহীন ধূম্রলোক রচনা করিয়াছে। [পৃ. ৫১৯]

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের *অহিংসা* সম্পর্কে অভিযোগ মূলত তিনটি : ১. উদ্ভট কল্পনাপ্রবণতা; ২. আখ্যানটির লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের অস্পষ্টতা; এবং ৩. চরিত্রগুলিরও অস্পষ্টতা। লক্ষণীয়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পর্কিত পরিচ্ছেদটির শিরোনাম দিয়েছিলেন 'জীবনে সাংকেতিকতা ও উদ্ভট সমস্যার আরোপ'। *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা* প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৮ সালে; শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মানিকের কথাসাহিত্যের প্রথম বিস্তারিত আলোচকদের একজন, উত্তরকালে বইটির সংস্করণসমূহে তিনি মানিক-আলোচনা করেছিলেন আরো বিস্তারিতভাবে। 'উদ্ভট সমস্যা' (শ্রীকুমার-প্রযুক্ত) হয়তো যথার্থ প্রয়োগ হয়নি মানিক-সাহিত্যের বিশ্লেষণে, কিন্তু তাতে শ্রীকুমার বাবুর অভিপ্রায়টি অনচ্ছ থাকে না, বোঝা যায় মানিক-সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র দৃক্‌ভঙ্গি ও বক্তব্যের দিকেই তিনি ইঙ্গিত করছেন। আজ একটু দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি বলেই হয়তো আমাদের কাছে মানিকের ঐ প্রতিসরিত বাস্তবতা বা মনোবাস্তবতার রূপটি আরেকটু স্পষ্ট। মানিকের অন্তত প্রথম পর্যায়ের প্রায়-সব উপন্যাসেই বাস্তবতার অবিকল ছাঁচ-ছাপ পাওয়া যাবে না, বাস্তবতাকে সেখানে পাওয়া যাবে প্রতিসরিত বা প্রতিফলিত আকারে—ফলে বাস্তবতাও সেখানে একটি তির্যকতায় সমর্পিত। প্রথম পর্যায়ের অন্তত দুটি উপন্যাসে—*দিবারাত্রির কাব্য* এবং *পুতুলনাচের ইতিকথায়*—বাস্তবতার সঙ্গে মিশেছে অসামান্য কল্পনা, ফলে প্রচলিত বাস্তবতার সঙ্গে তাকে ঠিক মেলানো যাবে না। অন্তত ঐ দুই উপন্যাসপাঠকের কাছে *অহিংসা* 'উদ্ভট কল্পনাপ্রবণতার' সাক্ষ্য বলে মনে না-হওয়াই স্বাভাবিক—কেননা মানিকের প্রাথমিক জগৎটিই ছিল ওরকম। 'উদ্ভট কল্পনাপ্রবণতা' বলতে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যা বুঝিয়েছেন তা আমরা স্বীকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে নিতে পারি না—বরং আমাদের বিশ্বাস মানিক *অহিংসা* এবং অন্য কয়েকটি উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন 'অ-পূর্বপ্রযুক্ত কল্পনা'। এবং আমাদের বিশ্বাস, যে-কোনো শিল্পকর্মে, উপন্যাসেও, বাস্তবতা যেমন মূল্যবান তেমনি মূল্যবান কল্পনাও। প্রবহমান জীবন তথা প্রবহমান বাস্তবতা এক দিক থেকে অর্থহীন, কেননা তা কোনো তাৎপর্যঘন উদ্দেশ্যে বা বক্তব্যে স্থিরলক্ষ্য নয়—কিন্তু একটি উপন্যাসে ঐ বাস্তবতা বা জীবনের ব্যবহার একটি লক্ষ্যে স্থির। এমনকি ঘোর প্রকৃতিবাদী একটি উপন্যাসেও থাকে কল্পনার প্রয়োগ—কেননা বাস্তবতা ও কল্পনার বিতরণে তাকে নির্মাণ করতে হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একবার লিখেছিলেন :

> সচেতনভাবে বস্তুবাদের আদর্শ গ্রহণ করে সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাহিত্য করিনি বটে—কিন্তু ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সাহিত্যে আমাকে বাস্তবকে অবলম্বন করতে বাধ্য করেছিল। কোন সুনির্দিষ্ট জীবনাদর্শ দিতে পারিনি কিন্তু বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার অভাব খানিকটা মিটিয়েছি নিশ্চয়।
>
> ['সাহিত্য করার আগে', *মা. গ্র.* ১২]

আমাদের বিশ্বাস ঈষৎ ভিন্ন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস্তবতায় দখল যেমন ছিল প্রবল, তেমনি প্রবল ছিল কল্পনায় অধিকার। 'ভাবপ্রবণতা' এবং 'কল্পনা' এক জিনিশ নয়। বাস্তবতার পরিপোষণায় মানিক অবশ্যই উল্লেখ্য, এই উল্লেখযোগ্যতা আছে আরো অনেকেরই অর্জনে, মানিক স্বতন্ত্র হয়ে গেছেন তাঁর আশ্চর্য কল্পনার ব্যবহারে। তাঁর প্রথম পর্যায়ের প্রধান কয়েকটি উপন্যাস—*দিবারাত্রির কাব্য, পদ্মানদীর মাঝি, পুতুলনাচের ইতিকথা, অহিংসা*—বাস্তবতার যতখানি ততখানিই কল্পনার দান। আমরা মনে করি, মানিক নিছক বস্তুবাদী শিল্পী নন, তিনি যতখানি বস্তুবাদী শিল্পী ততখানিই কল্পনাবাদী শিল্পী; উত্তরকালে যখন তিনি বস্তুবাদের আদর্শ গ্রহণ করে কল্পনার ডানা ছেঁটে দিলেন তখন তাঁর সেই মহান শিল্প—অংশত হলেও—ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু মানিক-প্রযুক্ত কল্পনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বুদ্ধদেব বসু বা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কাব্যধর্মী উপন্যাসের[২] কল্পনার চেয়ে ছিল একেবারেই ভিন্ন গোত্রের—এবং এজন্যেই হয়তো সব সময় আমাদের চোখে পড়েনি। মানিকের মতো আত্মচেতন শিল্পী যে তাঁর নিজস্ব কল্পনার চরিত্রটিও জানতেন, তার সাক্ষ্য পাওয়া যাবে তাঁর এই উক্তিতে :

> ...লেখক যে ভাব আর ভাবনাই সাজিয়ে দিন উপন্যাসে, ভিতটা তাঁকে গাঁথতেই হবে খাঁটি বাস্তবতায়। যতই খাপছাড়া উদ্ভট হোক উপন্যাসের চরিত্র, মাটির পৃথিবীর মানুষ হয়ে তাকে খাপছাড়া উদ্ভট হতে হবে। যত অসম্ভব ঘটনাই ঘটুক উপন্যাসে, সম্ভাব্য ঘটনাকে আশ্রয় করেই তাকে কাল্পনিক অসম্ভবতার স্তরে উঠতে হবে।
>
> ['উপন্যাসের ধারা', *মা. গ্র.* ৩]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্য কাব্যধর্মী বা কল্পনাধর্মী ঔপন্যাসিকের সঙ্গে মানিকের পার্থক্য এখানেই; তিনি 'সম্ভাব্য ঘটনাকে আশ্রয় করেই' 'কাল্পনিক অসম্ভবতার স্তরে' উঠেছিলেন। সদানন্দ, বিপিন, মহেশ, মাধবীর চরিত্রের মধ্যেই এই অসম্ভবতা ও কূটাভাসিক (paradoxical) বিষয়াদি আছে বলে এবং তারা ক্রমচলিষ্ণু বলে, সহসা তাদের দুর্বোধ্য মনে হতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নয়। ঐ আশ্রমটি নিশ্চিত একদিকে ভণ্ডামি ও অন্যদিকে ধর্মান্ধতার একটি লীলাক্ষেত্র, প্রকাশ্য ও গোপন যৌনতারও ক্ষেত্র, কিন্তু তাতে কি আখ্যানটি দুর্বোধ্য হয়ে যাবে? মানিক যেমন আশ্রমের বহির্দেশ ছেড়ে চলে গেছেন তার নেপথ্যে, তেমনি আশ্রমবাসীদের বাইরের জীবন ছেড়ে ঢুকে গেছেন তাদের অন্তর্লোকে। এই আখ্যানের কোনো স্থির লক্ষ্য বা স্পষ্ট উদ্দেশ্য নেই বলে অভিযোগ করেছেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু উপন্যাসটির নিবিড় পাঠে আমরা কী দেখি?—উপন্যাসের সবগুলি প্রধান চরিত্র ক্রমচলিষ্ণু ও অন্তঃপরিবর্তিত এবং তাদের প্রত্যেকের আছে স্পষ্ট পরিণাম; সদানন্দ ও মাধবীর একত্রে আশ্রম ত্যাগ, মহেশ চৌধুরী ও বিপিনের নতুন করে আশ্রম গড়ে তোলার উদ্যোগ, বিভূতির অকালমৃত্যু। ঝোড়ো ঘটনাবলির পরে এই প্রশান্ত পরিণাম একটি স্পষ্ট উদ্দেশ্যেরই দ্যোতক। সুতরাং, সব মিলিয়ে আমাদের বিবেচনায় *অহিংসা* 'অবিমিশ্র অসাফল্যের উদাহরণ' তো নয়ই, বরং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম সফল ও গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস।

খ) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর* (১৯৬১) গ্রন্থে মানিকের উপন্যাসকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন :

> এক ভাগে পড়ে "পুতুলনাচের ইতিকথা" এবং "পদ্মানদীর মাঝি", আর এক ভাগে পড়ে "চতুষ্কোণ", "সরীসৃপ"৩, "অহিংসা" প্রভৃতি এবং তৃতীয় ভাগে পড়ে "সহরতলী", "চিহ্ন", "আরোগ্য" প্রভৃতি। [পৃ. ৩১২]

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এই তিন ভাগের চারিত্রলক্ষণ চিহ্নিত করেছেন এভাবে :

> যদিও তাঁর প্রথম পর্যায়ে এবং তৃতীয় পর্যায়ে বিস্তর পার্থক্য তথাপি এই দুই পর্যায়ে মানুষেরই অস্তিত্বের বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন মানিকবাবু হয়েছিলেন এবং সেক্ষেত্রে একমাত্র "চতুষ্কোণ" পর্যায়েই যৌন বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সুতরাং মাত্র "চতুষ্কোণ"কে অবলম্বন করে মানিকবাবুর রচনায় জীবন কম, যৌনতা বেশি এ অভিযোগ করা অসমীচীন। [পৃ. ৩১৩]

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত মানিক-উপন্যাসের বিভাজন বিষয়ে এই মুহূর্তে আমরা কোনো প্রশ্ন তুলছি না। আমাদের বক্তব্য শুধু এই, *চতুষ্কোণ* বা *অহিংসায়* যৌনপ্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও তাদের মূল উদ্দেশ্য মানবচরিত্রের রহস্যোদ্‌ঘাটন। *পুতুলনাচের ইতিকথা* উপন্যাসে গ্রাম যেমন পটভূমি মাত্র, *অহিংসায়* আশ্রম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেমনি—তার অতিরিক্ত কিছু নয়, প্রবহমান জীবনস্রোতই মানিকের লক্ষ্য। সেই প্রবহমানতায় আছে জীবনেরই স্তরে-স্তরে নিহিত প্রকাশ্য ও গোপন বিশাল বিস্ময়—অকল্পনীয় বিস্ময়। *পুতুলনাচের ইতিকথা* বা *অহিংসা* দুটি নাম থেকেও প্রমাণিত হয়, গাওদিয়া গ্রাম বা সদানন্দ সাধুর আশ্রম উপন্যাস দুটির পটভূমি মাত্র—তাদের লক্ষ্য মানবচরিত্র বা মানবভাগ্যের রহস্যের নির্দেশ বা প্রতিভাস রচনা। সদানন্দ, যে এই আশ্রমের প্রধান, এক সামান্য গৃহচ্যুতা নারীর শরীরী আকর্ষণে আকস্মিক বাঁধা পড়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে অনিশ্চিতের উদ্দেশে পাড়ি জমায়। আর ঐ ঘর-ছাড়া নারী, মাধবী, এমনকি আকস্মিক সৌভাগ্যে ঘর পেয়েও (অর্থাৎ বিভূতির সঙ্গে বিবাহিত হয়েও) ভেসে যায় সদানন্দের সঙ্গে। আদর্শবদ্ধ বিভূতি প্রায় আত্মাহুতিই দেয়। আর মহেশ চৌধুরী, যাকে বিপিন ও সদানন্দ একসময় ক্রমাগত অপমান করেছে, নিজের অসীম সহিষ্ণুতাবলে শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে ঐ আশ্রমেরই সম্ভাব্য সংগঠক। এই সমস্তই অপরিকল্পিত জীবনের বিস্ময়। আর এই অ-পূর্ব-পরিকল্পিত জীবনের বিস্ময় আছে বলেই *অহিংসা* নয় অন্তঃসারশূন্য ধর্মব্যবসায়ের আশ্রমিক কাহিনী এবং নয় যৌনপ্রধান কাহিনীও। *চতুষ্কোণ*-এ মানিক যেমন যৌনতাকে অতিক্রম করে গেছেন শেষ পর্যন্ত, এখানেও তাই। এখানেও মানিক শত জটিলতা সত্ত্বেও জীবনের পক্ষেই দরোজা ধরে আছেন। আমরা বিশ্বাস করি, *অহিংসা* এবং এই পর্যায়ের অন্যান্য রচনাতেও যৌনতার চেয়ে জীবনই বেশি, এবং তাঁর অন্যান্য পর্যায়ের উপন্যাসের মতো এখানেও মানিক 'মানুষেরই অস্তিত্বের বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন।'

গ) সরোজমোহন মিত্র *মানিক গ্রন্থাবলী* (চতুর্থ খণ্ড, ১৯৭০)-ভুক্ত 'গ্রন্থপরিচয়' অংশে লিখেছেন :

> এই উপন্যাস প্রধানতঃ এক আশ্রমিক ব্যবসার কাহিনী।...বিপিন নামে একজন হিসেবী, কর্মক্ষম মানুষ সাধারণ মানুষের ধর্মভাবকে মূলধন করে যে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল মানিক তারই এক স্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।...ধর্মপ্রাণ এই ভারতবর্ষে আছে বহু আশ্রম এবং বহু মহাপুরুষ। আমরা এদের বাহ্যিক রূপ দেখে বিস্ময় এবং শ্রদ্ধায় আপ্লুত হই। কিন্তু তার আড়ালে যে অনাচার এবং ভণ্ডামি পাহাড়প্রমাণ হয়ে আছে তাকে পাঠক সাধারণের কাছে তুলে ধরার কৃতিত্ব মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরই। 'মানিক তাঁর নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে এর ক্লেদাক্ত দিক, ব্যবসায়ী দিকটা যে প্রবল তা সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন। দূরদূরান্তের নিরীহ সরল গ্রামের মানুষের ভক্তিপরায়ণতার নির্মম পরিহাসের কথা মানিকের পূর্বে কোন লেখক প্রকাশ করেননি।'
>
> [*মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ৬]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই : আশ্রমিক ব্যবসার কাহিনী আছে এই উপন্যাসে, কিন্তু তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন কখনোই লেখকের মূল লক্ষ্য নয়, আশ্রমিক পটভূমি হিশেবে ব্যবহার করে জীবনের ও মানুষের গভীর রহস্যোদ্‌ঘাটনই লেখকের লক্ষ্য।

৪. 'অনেক নরনারীর নির্জনতা'

অহিংসা উপন্যাসে অসংখ্য চরিত্র ভিড় করেনি—যেমন করেছে *পুতুলনাচের ইতিকথা* উপন্যাসে। কিন্তু এরা প্রত্যেকেই তাদের অসামান্য স্বাতন্ত্র্য নিয়ে উপস্থিত। এবং স্বাতন্ত্র্য বলতে এখানে আমরা নিশ্চিত বোঝাচ্ছি না ছক-কাটা চরিত্র, বরং এই চরিত্রগুলি প্রায়-সবাই চলিষ্ণু ও অন্তঃপরিবর্তমান, অর্থাৎ উপন্যাসের প্রথমে যেমন ছিল, শেষ পর্যন্ত তেমন থাকেনি। এতগুলি বিস্ময়কর চরিত্রের তুলনা পাওয়া যাবে মানিকেরই আরো বিচিত্র চরিত্রময় *পুতুলনাচের ইতিকথা* উপন্যাসে। এই চরিত্রগুলি নিজেদের এবং তার চেয়ে বেশি পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে-সংঘট্টে, এক পরিণামের দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে। সদানন্দ, বিপিন, মাধবী, মহেশ চৌধুরী, বিভূতি, রত্নাবলী—সবগুলি চরিত্রের মধ্যেই আকর্ষণ-বিকর্ষণের অবিরল দোলাচল কাজ করে গেছে। কিন্তু এদের প্রত্যেকের জীবনদর্শন ও জীবনকে মোকাবিলা করার পদ্ধতি ও পরিণাম স্বতন্ত্র বলে চরিত্রগুলি স্বতন্ত্র আলোচনাসাপেক্ষ।

> আশ্রম নির্জ্জন, কিন্তু সে অনেক নরনারীর নির্জ্জনতা, আশ্রমের নিয়মে বাঁধা জীবন শান্ত, কিন্তু সে-নিয়মও অসাধারণ, সে-শান্তিও অসামান্য। [পৃ. ৮৭]

এই অপরূপ oxymoron বা প্রতীপাভাসের প্রতিভাস আছে এই নির্জন আশ্রমের ঘটনাঘন চরিত্রগুলির জীবনের উথালপাথাল ঢেউয়ে লুটোপুটি খাওয়ার মধ্যে। নিজেদের নিঃসঙ্গতার বৃত্তে ভ্রাম্যমাণ কয়েকটি মানুষ অন্যদের বৃত্তগুলি স্পর্শ করেছে—কাছে এসেছে—দূরে চলে গেছে। মানিকের প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসমালার আরো অসংখ্য চরিত্রের মতোই এরা অস্থির ও সন্ধানী, শান্তিহীন ও অসুখী, রক্তাক্ত ও নিয়তিনিয়ন্ত্রিত।

সদানন্দ : *অহিংসা* উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সদানন্দ। প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে শেষ (কুড়ি) পরিচ্ছেদ পর্যন্ত তাকে ঘিরেই ঘটনার আবর্ত, প্রবাহ ও মোহানা। সদানন্দের বিগত গৃহী জীবন সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু বলা হয়নি[৪]; সমগ্র উপন্যাসে সাধু সদানন্দের ক্রম-পতনই (প্রচলিত অর্থে) আমরা লক্ষ করি; সন্ন্যাসী সদানন্দের পূর্বের গৃহী জীবন সম্পর্কে কেবল ইশারা আছে তিনটি :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. ...সদানন্দও প্রায় এক যুগ হইল সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া পিঠের সঙ্গে মেশা কুণ্ডলীপাকানো পুঁটুলীর মত নারীদেহ চাহিয়া দেখে নাই। [পৃ. ২৯]

২ ...এক যুগেরও বেশী আগে আরেকজনকে এমনিভাবে শান্ত ও সংযত অবস্থা হইতে চোখের পলকে উন্মাদিনীতে পরিণত হইয়া যাইতে দেখিত মাঝে মাঝে। তবে সে এভাবে খাবারের প্লেট, চায়ের কাপ ছুঁড়িয়া মারিত না, কোলে মুখ গুঁজিয়া এভাবে কাঁদিতও না, দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া নিজেকে আহত করিয়া ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইত। [পৃ. ৩৪]

৩. ...বিশ-বাইশ বছর আগে একজনকে কোমরে আঁচল জড়াইয়া ঘর ঝাঁট দিতে দেখিয়াছিল বলিয়া মাধবীকেও যে ঘরই ঝাঁট দিতে হইবে তার কি মানে আছে! [পৃ. ৫১]

প্রথম উদ্ধৃতিদ্বয়ে 'এক যুগ' এবং পরের উদ্ধৃতিটিতে 'বিশ-বাইশ বছর আগে' থেকে মনে হয় সদানন্দ কোনো-এক নারীর সঙ্গে অন্তত আট-দশ বছর ঘর-সংসার করেছিল। তারপর কেন সে সন্ন্যাসী জীবনে প্রবেশ করে, সেই গৃহিণীই-বা কোথায় গেল—এসব তথ্য আমরা জানতে পারি না; কিন্তু ঐ বিগত গৃহী জীবন কি কোনো-না-কোনো ভাবে প্রভাবিত করেছিল সন্ন্যাসী সদানন্দকে? মাধবীর প্রতি তার ক্রমাগত আকর্ষণ এবং শেষ পর্যন্ত তাদের যুগল নিরুদ্দেশ যাত্রা—এখানেও লক্ষ করি তাদের যাত্রাটি নিরুদ্দেশে: আমরা জানি না, সদানন্দ ও মাধবীর প্রেম-ও-ঘৃণায়-বাঁধা জীবন কোনো নীড় বা শিশুর আকর্ষণে (মানিকেরই চিন্তার অনুসরণে বলছি) বিবাহ-বিধানকে মেনে নেবে কি না। অর্থাৎ মানিক সদানন্দ নামে এক ব্যক্তির জীবনের একটি অংশই আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন—তার অতীত আমরা জানি না, কেবল খানিকটা অনুমান করে নিতে পারি মাত্র; তার ভবিষ্যৎও আমাদের অজ্ঞাত থেকে যায়, কেবল কিছুটা অনুমান সম্ভব।

সদানন্দকে প্রথম আমরা দেখলাম (পরি. ১) তার আশ্রমের ভিতরে বক্তৃতা করতে-করতে চুপ করে যায়: 'এবার যেদিন রাধাই নদীর বুকে স্রোত দেখা দিল, সেদিন অহিংসা ও প্রেমের কথা বলিতে বলিতে সদানন্দ হঠাৎ চুপ করিয়া গেল।' রাধাই নদীর বুকে আকস্মিক জলসঞ্চারের মতো সদানন্দের মধ্যেও হঠাৎ একটি আবেগ সঞ্চারিত হয়, যা তার পরবর্তী জীবনকে আমূল পরিবর্তিত করে দেয়। আকস্মিক—মাধবীর সঙ্গে তার শারীর-সম্পর্ক আকস্মিকভাবেই সাধিত হয়েছিল। দীর্ঘদিন পরে এই নারীসম্বন্ধ হয়তো তার অবরুদ্ধ ক্ষুধাকে জাগ্রত করে দিয়েছিল। কেননা সদানন্দ সন্ন্যাসী হিশেবে ছিল নির্বিকার, 'দুঃসংবাদে বিচলিত হয় না, সুসংবাদে খুশীও হয় না' এবং মাধবীর সঙ্গে প্রথম আলাপে সে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধই হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যত্রও যেমন, এখানেও মানিকের আসল লক্ষ্য চরিত্রের ভিতর-সন্ধান। তাই মাধবীসম্ভোগের পরে 'বড় আপশোষ হইতেছিল সদানন্দের, অনুতাপ মিশ্রিত গ্লানিবোধ। তবু শরীর মন যেন হাল্কা হইয়া গিয়াছে।' (পৃ. ৩১) এই কূটাভাসের কারণ স্পষ্টতই যৌনতার গ্লানি ও তৃপ্তি একই সঙ্গে। কয়েক লাইন পরেই মানিক অসামান্যভাবে ধরে দিয়েছেন ঐ বিরোধী দ্বৈত মনোভাব: 'অন্যায়ের শাস্তি ও পুরস্কার কি এমনিভাবে একসঙ্গে আসে?'

যে-সদানন্দ 'দুঃসংবাদে বিচলিত হয় না, সুসংবাদে খুশীও হয় না', অর্থাৎ প্রকৃত সন্ন্যাসী, অর্থাৎ পরম নির্বিকার, তার সমস্ত সংযম ও নির্বিকারত্ব ভেসে যায় একটি মেয়ের (মাধবীর) আকর্ষণে। প্রথম পরিচ্ছেদেই আকস্মিক সুযোগে ও উত্তেজনায় সে মাধবীর কৌমার্য হরণ করে। তৃতীয় পরিচ্ছেদেই দেখা যায়, রাজপুত্র নারায়ণের সঙ্গে মাধবীকে নদীতীরে পাঠানোর পর সদানন্দের মন 'একান্ত যুক্তিহীনভাবেই' উতলা হয়ে থাকে। যুক্তিহীন—সদানন্দের দীর্ঘদিন-আচরিত নির্বিকারত্বের হিশেবে। কিন্তু আসলে তা যুক্তিহীন নয়, সম্পূর্ণতই যুক্তিপূর্ণ—মাধবীর সম্পর্কে এসে তার যে অন্তর-পরিবর্তন হয়েছিল সেদিক থেকে। এরপর সদানন্দের চরিত্র আর আদৌ নির্বিকার নয়—বরং সাধারণ বিচারে বিকারেরই অদ্বিতীয় উদাহরণ। বস্তুত সাধু হওয়ার পর এই প্রথম 'নিজের সঙ্গে নিজের বিষাক্ত আত্মীয়তা স্থাপনের মজাটা সদানন্দ পরিষ্কার টের পাইতে থাকে।' (পৃ. ৪০) তারপর মাধবীর প্রতি সদানন্দের আকর্ষণ হয়ে উঠেছে ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতম; ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে সদানন্দকে দেখা যায় সরাসরি মাধবীকে অভিসারের আহ্বান করতে। আশ্রম-জীবন জটিল হয়ে ওঠায় (সদানন্দেরই কারণে) একদিন মাধবী মহেশ চৌধুরীর আশ্রয়ে চলে যায়; বিপিনের সঙ্গে ঝগড়া করে সদানন্দও একদিন চলে আসে মহেশ চৌধুরীর বাড়িতে। মহেশ তার পুত্র বিভূতির সঙ্গে মাধবীর বিয়ের প্রস্তাব দিলে 'রাগে সদানন্দের গা যেন জ্বলিয়া যায়।' (পৃ. ১২৭) তারই প্রতিক্রিয়ায় সদানন্দ মহেশকে অনুরোধ করে এই বিবাহ বাতিল করার; এমনকি নির্জন ঘরে মাধবীকে ডেকে এনে তার হাত ধরে টানে। তারপর বিভূতির হাতে সদানন্দের মার খাওয়া, মহেশের আত্মনিগ্রহ। শেষ পর্যন্ত বিভূতি আর মাধবীর বিবাহ হয়েই যায়। তখন—

> ...মাধবীলতার জন্য বিশেষ কোনো কষ্ট হইতেছে, তাও সদানন্দের মনে হয় না। প্রথমটা সত্যই বড় রাগ হইয়াছিল, পছন্দসই একটা খেলনা হাতের মুঠার মধ্যে আসিয়া ফশকাইয়া গেলে ছোট ছেলের যেমন অবুঝ রাগ হয়, খেলনাটা একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলিবার সাধ জাগে, কিন্তু সে সব সাময়িক প্রতিক্রিয়া কি মিটিয়া যায় নাই? মাধবীলতাকে দেখিলে এখন কি একটা বিতৃষ্ণার ভাবই জাগে না তার? [পৃ. ১৪০]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খানিকটা এই 'অবুঝ রাগে' আর মূলত মাধবীর প্রতি এক দুর্নিবার আকর্ষণেই সদানন্দকে বিপিন আশ্রমে ফিরিয়ে নিতে চাইলে সে সোজাসুজি দাবি করে, 'মাধুকে আমার চাই।' (পৃ. ১৫২) রাগ যে তখনো ছিল তার প্রমাণ সদানন্দেরই তখনকার উক্তি, 'কি জানিস বিপিন, আগে মেয়েটাকে বড় মায়া করতাম, তখন কি জানি এমন পাজী সয়তান মেয়ে, তলে তলে এমন বজ্জাত! একটা রাত্রির জন্য ওকে শুধু আমি চাই, বাস, তারপর চুলোয় যাক, যা খুসী করুক, আমার বয়ে গেল। ওর অহঙ্কারটা ভাঙ্গতে হবে।' (পৃ. ১৫৩) কিন্তু এই রাগেরও অন্তরালে কেন্দ্রীয় কাজ করে যাচ্ছে মাধবীর প্রতি সদানন্দের অতি তীব্র আকর্ষণ—প্রেম ও যৌনতার মিশেলে অতি তীব্র আকর্ষণ। বিবাহিত মাধবীও কিছুতেই সদানন্দের আকর্ষণ থেকে মুক্ত হতে পারে না। বিভূতি নিহত হওয়ার পর মাধবী তার মৃত্যুর জন্যে সদানন্দকেই অভিযুক্ত করে। একেবারে শেষে সদানন্দ আর মাধবী একত্রেই নিরুদ্দেশে পাড়ি জমায়।

মাধবীর প্রতি সদানন্দের একটানা আকর্ষণই এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। এই আকর্ষণের সূচনা হয়েছে আকস্মিকভাবে মাধবীসম্ভোগের মধ্য দিয়ে। তারপর ক্রমাগত সদানন্দ ঝুঁকেছে মাধবীর দিকে—প্রথমে গোপনভাবে, পরে একরকম প্রকাশ্যেই। বিভূতির সঙ্গে মাধবীর বিবাহের পর ঐ সম্বন্ধ বা আকর্ষণ কমেইনি সদানন্দের—বরং সে যেন মরিয়া হয়ে গেছে মাধবীকে পাওয়ার জন্যে। *অহিংসা* সাধু সদানন্দের গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি প্রবল আকর্ষণেরই উপাখ্যান। এই উপন্যাসে বিপরীতের এই টান যেমন অনেক oxymoron ব্যবহারে, তেমনি চরিত্রপাত্রের আচরণে ও জীবনানুসন্ধানের ভিতরে সুপ্রকাশিত। সদানন্দ সম্পর্কে প্রথম পরিচ্ছেদেই একটি বাক্য ব্যবহার করা হয়েছিল এ রকম :

> ভাবিতে ভাবিতে বাহিরের মায়ার নেশা যেন গাঢ় হইয়া আসে, আশ্রমে ঢুকিতে অনিচ্ছা বাড়িয়া যায়। [পৃ. ২৬]

সদানন্দের এই 'বাহিরের মায়ার নেশা' মানে আশ্রমের বাইরের রঙিন মায়াবী জীবন অর্থাৎ সংসারের ডাক। পরিষ্কার বোঝা যায়, এবং তার পরবর্তী কার্যকলাপ থেকে প্রমাণিত হয়, সন্ন্যাসীর নয়—তার জীবন সংসারলিপ্ত জটিল মায়াময় গৃহীর জীবন।

বিপিনের সঙ্গে সদানন্দের বিমিশ্র love-hate সম্পর্ক। মানিক পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন :

> ...দুজনের মধ্যে একটা আশ্চর্য ঘনিষ্ঠতা আছে তাদের, একটা অতীন্দ্রিয় যোগাযোগ আছে, বোধ হয় ইন্দ্রিয়ের যখন বিকাশ হইতে থাকে—সেই শৈশব হইতে পরস্পরকে তারা ভালবাসিয়া আর ঘৃণা করিয়া আসিতেছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এজন্য। কতবার ছাড়াছাড়ি হইয়াছে জীবনে, কিন্তু এ জগতে নূতন আর একটি বন্ধুও তারা খুঁজিয়া পায় নাই। [পৃ. ৩১]

তাদের বন্ধু-সম্পর্কও এমন যে দুজন মিলেই তারা আশ্রমের নির্মাতা, একজনের অনুপস্থিতিতেই আশ্রম প্রায় অচল হয়ে পড়ে—তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিপিন আশ্রম ছেড়ে যাওয়ার পর সদানন্দ অসহায় বোধ করে; নবম পরিচ্ছেদে সদানন্দকে আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর দেখা যায় প্রথম-প্রথম চালাতে পারলেও বিপিনও ক্রমশ আশ্রমের ব্যাপারে যেন নির্ভরতা হারিয়ে ফেলছে। সদানন্দকে আবার আশ্রমে ফিরিয়ে আনতে হয় বিপিনকে। শেষ দৃশ্যে দেখা যায় তারা যৌথভাবে চেষ্টা করছে দাঙ্গার অভিযোগ থেকে নিজেদের ও আশ্রমকে বাঁচাতে।

কিন্তু এ পর্যন্তই। মানিকের মহত্ত্ব এইখানে যে তিনি জানেন জীবন ও মানুষের আছে কল্পনাতীত বিস্ময়; জীবনকে যেমন তেমনি মানুষকে কোনো ছকে বন্দী করে ফেলা যায় না তাই। ১৫-পরিচ্ছেদে সদানন্দ যখন সোজাসুজি বলে, 'মাধুকে আমার চাই', তখন 'বিপিন হাঁ করিয়া সদানন্দের দিকে চাহিয়া রহিল। এ রকম সদানন্দের সঙ্গে তার কোন দিন পরিচয় ছিল না।' (পৃ. ১৫২) বিপিনের সঙ্গে সদানন্দের সম্পর্কের সূত্র হিশেবে কাজ করেছে ক্রোধ, ভালোবাসা, ঘৃণা, নির্ভরতা অর্থাৎ সব-মিলিয়ে একটি বন্ধুতা।

AMARBOI.COM

তুলনামূলকভাবে মহেশের সঙ্গে সদানন্দের সম্পর্ক অনেক জটিল ও পরিবর্তনশীল, এমনকি উপন্যাসের শেষে তাদের প্রাথমিক সম্পর্ক যেন আমূল পাল্টে গেছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে আক্ষরিক বিনীতভাবে প্রবেশ করে মহেশ চৌধুরী যেন হয়ে উঠেছে অন্য চরিত্রগুলির এক নিয়ামকশক্তি। 'সদানন্দ ও মহেশ চৌধুরীর ব্যক্তিত্বের একটি মৌলিক সামঞ্জস্যের' (সামঞ্জস্যের কথাই বলেছেন মানিক—আমরা বৈপরীত্য কথাটিও ব্যবহার করতে পারি) কথা বলতে গিয়ে মানিক লক্ষ করেছেন মহেশ চৌধুরীর মধ্যে 'অচেতন মননশক্তি' আর সদানন্দের মধ্যে 'সচেতন মননশক্তি'। শেষ পর্যন্ত আমরা অবশ্য বিস্মিত হয়ে লক্ষ করি, অচেতন মননশক্তিরই বিজয়, আর সচেতন মননশক্তির লক্ষ্যভ্রষ্টতা। এই জয়-পরাজয়ের কাহিনী রাতারাতি সংঘটিত হয়নি—মানিক এর প্রতিটি স্তর পরতে পরতে উন্মোচন করে দিয়েছেন। তীব্র স্রোতে ধাবমান একটি গাছের শাখার মতো ভেসে গেছে সদানন্দ—নিয়তি কি তার সচেতন মননশক্তিকে আতীব্র বিদ্রূপে বিদ্ধ করেনি? যে-সদানন্দ একসময় তাকে বলেছিল, 'তোমায় না আশ্রমে আসতে বারণ ক'রে দিয়েছি?' (পৃ. ৫৪), তাকেই একসময় জানাতে হয় 'মহেশ, বিপিন আমাকে আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাই তোমার কাছে এলাম। তোমার বাড়ীতে থাকব।' (পৃ. ১০৭) যে-মহেশ চৌধুরী একদিন বলেছিল, '...একবার প্রভুর চরণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দর্শন করতে না দিলে আমি উঠব না।' এবং স্ত্রী-সমেত সদানন্দের দর্শনের জন্যে রাত্রিব্যাপী বৃষ্টিতে ভিজেছিল (পৃ. ৫৮ ও ৬১-৬২), সেই মহেশেরই 'পায়ের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে [সদানন্দ] বলে, মহেশ আমায় তুমি রক্ষা কর—বাঁচাও আমায়।' (পৃ. ১৪৩) যে-সদানন্দ ছিল একদিন আশ্রমপ্রধান এবং মহেশ চৌধুরী তার করুণাপ্রার্থী, উপন্যাসের অন্তিমে সেই সদানন্দকেই আশ্রম ত্যাগ করে চলে যেতে হয় আর মহেশ চৌধুরী হয়ে ওঠে ভাবী আশ্রমপ্রধান।—এইসবই কি এক নিবারণহীন নিদারুণ নিয়তির সাক্ষ্যবহ?

সদানন্দকে পুরোটাই মানুষ করে আঁকা হয়েছে—সে সন্ন্যাসী হলেও সন্ন্যাসীশোভন অলৌকিকতা বা ঈশ্বরসাধনা তার মধ্যে আদৌ দেখা যায় না। কামে, ক্রোধে, ঈর্ষায়, হিংসায় সে একজন মানুষ। প্রকৃত সন্ন্যাসী সে হতে পারেনি, তার নিরাসক্তি—আমরা প্রায় প্রথম থেকেই জেনেছি—একটি মুখোশ মাত্র। তাই বলে সে বিপিনের মতো ধুরন্ধর নয়, ভণ্ডও নয়, সাধারণ মানুষও নয় একেবারে। তার যাত্রা কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত হয়ে খাঁটি হয়ে ওঠায়।

> সদানন্দের সংযম সত্যই অসাধারণ ছিল, কারণ তার মধ্যে সমস্তই প্রচণ্ড শক্তিশালী, অসংযম পর্য্যন্ত। কেবল তাই নয়, সংযমও তার মাঝে মাঝে ভাঙ্গিয়া পড়ে। কামনার যার এমনিই জোর নাই, ভিতর হইতে যার মধ্যে বোমা ফাটিবার মত উপভোগের সাধ কোন দিন ঠেলা দেয় নাই, আত্মজয়ের তো তার প্রয়োজনও হয় না। [পৃ. ১৫৩]

সদানন্দকে আপাতচোখে ভণ্ড মনে হতে পারে; এক হিশেবে সে তো ভণ্ড বটেই, কেননা বিশ্বাসহীন ও অনীশ্বর এই ব্যক্তিটি অভিনয় করে যাচ্ছে আশ্রমিক এক পবিত্র সন্ন্যাসীর। কিন্তু তবু হাস্যহীন, শান্তিহীন, অস্থির, অবিশ্বাসী, বিশ্লেষণশীল, আত্মতাড়িত এই মানুষটিকে ভণ্ড বলতে বাধে আমাদের।[৫] হ্যাঁ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্য অনেক উপন্যাসের নায়কের মতোই[৬] সদানন্দও অস্থির, শান্তিহীন ও যন্ত্রণাকাতর। উপন্যাসের প্রথমেই এই নিরুত্তর জিজ্ঞাসাগুলি (কিংবা হয়তো এই জিজ্ঞাসাগুলির জবাব রয়েছে সদানন্দের পরবর্তী কার্যকলাপে)—এই জিজ্ঞাসাগুলি লক্ষণীয় :

> মনে তার শান্তি নাই কেন, এত মানুষকে সে শান্তি বিলাইতেছে? এত ক্ষোভ কেন তার, এমন আকস্মিক ক্রোধের সঞ্চার? ...এমন জ্বালাভরা অস্থিরতা তবে সে বোধ করে কেন? [পৃ. ২৬]

মাধবীও যন্ত্রণার্ত, তবু সদানন্দের যন্ত্রণার সঙ্গে তার বুঝি তুলনা হয় না :

> মাধবীর স্বস্তি ও কৃতজ্ঞতাবোধ অত্যন্ত স্পষ্ট। নিজের অস্বস্তি ও দুর্বোধ্য জ্বালাবোধ সদানন্দকে পীড়া দিতে থাকে। [পৃ. ৪৯]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাধবীর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির মুহূর্তগুলিও যন্ত্রণায় ভরা; তার শরীরসম্ভোগের এক 'অনুতাপমিশ্রিত গ্লানিবোধ' দখল করেছিল সদানন্দকে, পরবর্তীকালেও যন্ত্রণা থেকে নিস্তার পায়নি সে :

> অনেক ভাবিয়া, অনেক দ্বিধা করিয়া, মনকে শান্ত করিবার জন্য সাত দিন ঘরের কোণে নিজেকে বন্দী করিয়া রাখিয়া মনকে আরও বেশী অশান্ত করিয়া, অতিরিক্ত জ্বালাবোধের জন্যই মাধবীলতা সম্পর্কে অত্যাশ্চর্য আত্মসংযমের মধ্যে নিজেকে সত্য সত্যই মহাপুরুষ করিয়া ফেলিবার চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল। [পৃ. ৭২]

মহেশের সঙ্গে একবার সংক্ষিপ্ত দার্শনিক আলাপে সদানন্দকে এমনকি মনে হয় আত্মহত্যার সপক্ষে কথা বলছে :

> যারা বোকা তারাই বেঁচে থেকে রোগের জ্বালা শোকের জ্বালা সহ্য করে। অথচ আত্মহত্যা করা এত সহজ! [পৃ. ১৫৭]

অর্থাৎ, সমস্যা হচ্ছে অস্তিত্বের। সদানন্দের প্রকৃত সমস্যা এই অস্তিত্বের সমস্যা। কেন বাঁচব, কীভাবে বাঁচব—এই হচ্ছে তার জিজ্ঞাসা ও সন্ধানের পথ। ঈশ্বরবিশ্বাসী সে নয়—এবং সে শান্তিহীন; নাস্তিকের শান্তিও সে পায়নি। এক অতিতীব্র যন্ত্রণার মুহূর্তে তার আর্তচিৎকার :

> হে ঈশ্বর দয়া কর। ঈশ্বর বলে যদি কেউ থাকো, এ সময় আমায় দয়া কর। তুমি তো সব জানো আমি স্বীকার করি না তুমি আছ, তবু যদি থাকো, দয়া কর। [পৃ. ১৪২]

এমনকি মহেশ চৌধুরীর পায়ে পড়ে সে প্রায়-সক্রন্দনে বলে :

> মহেশ, আমায় তুমি ক্ষমা কর—বাঁচাও আমায়। [পৃ. ১৪৩]

আমরা জানি মহেশ চৌধুরীই শেষ পর্যন্ত তাকে বাঁচার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। কেননা মহেশ চৌধুরীও জানে অস্তিত্বের সমস্যাই প্রকৃত সমস্যা :

> কষ্ট পাবেন, বেঁচে থাকার সাধ থাকবে না, তবু বেঁচে থেকে কষ্ট ভোগ করবেন। এই সমস্যা আছে বলেই তো বেঁচে থাকার এত নিয়মকানুনের আবিষ্কার। আসল সাধু কি ঈশ্বরকে চায়, স্বর্গ চায়, পরকালের কথা ভাবে? সাধু চায়, বিশেষ কতকগুলি অবস্থায় বাঁচতে যখন হবেই, বাঁচার সবচেয়ে ভাল উপায় কি, তাই আবিষ্কার করতে। [পৃ. ১৪৩]

মহেশ চৌধুরী 'ভিন্ন ভিন্ন পথের অস্তিত্ব'ও স্বীকার করে; তার এবং বিপিনের পথ যা, সদানন্দ ও মাধবীর তা নয়। সদানন্দ যে কপট সন্ন্যাসীত্ব ত্যাগ করল অতিপ্রবল দেহজ কামনায়, তা তাই তার অধঃপতনও নয়—অস্তিত্বের পথ পেয়ে যাওয়া, মিথ্যা থেকে সত্য হয়ে ওঠা, খাঁটি হয়ে ওঠা।

সদানন্দ চরিত্রের অন্য দুটি দিক লক্ষণীয়—একটি তার নিজের অর্জন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্লেষণশীলতা; অন্যটি বাইরের, নিয়তিতাড়না। সদানন্দ মানিকের অন্য অনেক উপন্যাসের নায়কের মতোই[৭] বিশ্লেষণশীল। একটি বাক্য উদ্ধৃত করব :

> এত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সদানন্দের, এত তেজ ও সংযম, জীবনকে বিশ্লেষণ করিতে করিতে কি তীক্ষ্ণ হইয়াছে তার বিচারবুদ্ধি, এখন যেন জানিবার বুঝিবার ক্ষমতাটুকুও আর নাই। [পৃ. ৫২]

এই বাক্যের প্রথম তিনটি অংশে সদানন্দের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, তেজ, সংযম, বিচারবুদ্ধি ও বিশ্লেষণশীলতা—এই ছয়টি গুণের কথা বলা হয়েছে; কিন্তু উদ্ধৃত বাক্যের শেষাংশে এসে দেখা যায় ঐ সমস্ত গুণই ভেসে যায়। 'এখন যেন জানিবার বুঝিবার ক্ষমতাটুকুও আর নাই'—বাক্যশেষের এই অংশটি প্রকৃতপক্ষে সারা উপন্যাসেই পরিব্যাপ্ত। মাধবীর আকর্ষণে সদানন্দের সমস্ত বিচারবুদ্ধি ভেসে গেছে, সন্ন্যাসীসত্তা বিপর্যস্ত, যেন এক অন্ধ নিয়তির মতো মাধবী তাকে টেনেছে নিজের দিকে। ঐ বিশ্লেষণশীলতা এবং তার চেয়ে শক্তিমান নিয়তির টান[৮] সদানন্দকে চালিয়ে নিয়ে গেছে তার শেষ নিরুদ্দেশ যাত্রা অবধি। আর সেদিক থেকে উদ্ধৃত বাক্যটিতে যেন উপন্যাসটির সারাৎসার সমাহৃত হয়েছে।

মাধবী : মাধবী আত্মবিশ্লেষণশীল নয়—নিয়তিতাড়িত, পুরোপুরিই নিয়তিতাড়িত। তার অতীত আমাদের অজ্ঞাত—জীবনের জলস্রোতে ভেসে এসেছে সে; তার ভবিষ্যতের আভাস মাত্র আমরা জেনেছি—আবার সে স্রোতে ভেসে যায়। আমাদের জ্ঞাত দিনগুলি তার কেটেছে এক ঘোরের মতো। মাধবী সদানন্দের মতো ভিতর-সন্ধানী নয়, কিন্তু তার মতোই শান্তিহীন ও তাড়িত। জীবনের গভীর তিক্ত অভিজ্ঞতা তাকে যা শিখিয়েছে, তার প্রকাশ চমৎকার :

> সব ভাল, সব মিষ্টি, সব সুন্দর। জীবনে সুখী হওয়ার পথে একটা বাধাও আর নাই। কত আনন্দ জীবনে। আপশোষ শুধু এই যে, সে জানে, আবার গোড়া হইতে সব সুরু হইবে, দুর্ভাবনা, অস্বস্তিবোধ, আত্মগ্লানি, আর মাথার অনির্দিষ্ট দুর্বোধ্য যাতনা। প্রথমে সামান্যভাবে আরম্ভ হইয়া বাড়িতে বাড়িতে কয়েক দিনে উঠিয়া যাইবে চরমে, তখন আবার দু কাণে তালা লাগিয়া পাওয়া যাইবে শান্তি ও স্তব্ধতা।[৯] [পৃ. ১২৯]

সদানন্দের সঙ্গে আকস্মিকভাবে মাধবীর যে শারীর-সম্পর্ক সংঘটিত হয়, যে-অভিজ্ঞতা মাধবীর ছিল প্রথম, তা তার মনোজগতে সুদূর প্রভাব বিস্তার করে। সদানন্দের সম্পর্কে এলে সে বোধ করে আশ্চর্য এক শারীরিক সম্মোহন : 'সদানন্দ দেবতা না দানব মাধবীর জানা নাই কিন্তু এমন ভয় সে করে সদানন্দকে যে, কাছে আসিলেই তার দেহমন কেমন একসঙ্গে আড়ষ্ট হইয়া যায়, সদানন্দ তাকে বুকে তুলিয়া লইলেও যেজন্য সে নূতন কিছুই আর অনুভব করিতে পারে না...' (পৃ. ৬৮) মানিকের চরিত্রেরা জীবন্ত মানুষের মতোই চলিষ্ণু বলে মাধবীর এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনোভাবও পরিবর্তিত হয়ে যায় একদিন : 'মাধবীলতা আর সে মাধবীলতা নাই। সদানন্দের কাছে সবরকম চাপল্য হারাইয়া আর সে জড়সড় হইয়া যায় না, ভয়ে ভয়ে হিসাব করিয়া কথা বলে না, অনায়াসে ব্যঙ্গ করে।' (পৃ. ১১৫) সদানন্দের সঙ্গে মাধবীর সম্পর্ক যখন এরকম অনেকখানি স্বাভাবিক তখন মহেশ চৌধুরী বিভূতির সঙ্গে মাধবীর বিবাহের প্রস্তাব করে। এবং মাধবী রাজিও হয়। বিভূতির সঙ্গে মাধবীর বিয়ে হয়। সুখেই অতিবাহিত হয় দুজনের দাম্পত্য জীবন। বিভূতির আকস্মিক অস্বাভাবিক মৃত্যুর পরও সদানন্দের প্রতি তার বিরূপতা অব্যাহত থাকে। কিন্তু ক্রমশ এই তথ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সদানন্দকে ছাড়া তার চলবে না—তাই সামান্য অছিলায় সে আশ্রমে চলে আসে এবং শ্বশুর মহেশ চৌধুরীর কাছে সদানন্দকে স্বামীহন্তা বলে অভিযোগ করলেও তার পরেই সদানন্দের সঙ্গে নিরুদ্দেশে ভেসে যায় আবার।

মাধবী, মানিকের আরো অনেক বিবাহিত নারীর মতোই, অসুখী।[১০] সে-ও সদানন্দের মতোই যন্ত্রণাজর্জরিত, রক্তাক্ত। সে-ও সদানন্দের মতো জীবনের আশা-ভরসায় অবিশ্বাসী : 'প্রতিকারহীন জীবনব্যাপী ব্যর্থতা'য় সদানন্দ যেমন 'নির্ব্বিকার ভোঁতা একটা ক্ষোভ' শুধু অনুভব করে, তেমনি মাধবীও জানে শান্তি সে কোনো দিন পাবে না (মাধবী-সম্পর্কিত প্রথম উদ্ধৃতিটি দ্রষ্টব্য)। মাধবী আর সদানন্দের ক্ষতবিক্ষত জীবনের জন্যে আমরা বোধ করি বেদনাই—এই বিমর্ষ, আশাহীন জীবনের ঢেউয়ে লুটোপুটি খাওয়া দুটি মানুষ-মানুষী হয়তো একত্রে অন্য কোনোখানে কিছু শান্তি পাবে—উপন্যাসের শেষে এ রকম আশা হয় আমাদের।

মহেশ চৌধুরী : মহেশ চৌধুরীর পরিচয়জ্ঞাপক প্রথম বাক্যেই বলা হয়েছে : 'মানুষটা সে একটু খাপছাড়া কিন্তু তুচ্ছ নয়।' তুচ্ছ নয়, অর্থাৎ একান্ত সাধারণই, তার মধ্যেই তার জীবনের 'একনিষ্ঠ প্রক্রিয়া'র ফলে 'লোকে তাকে শ্রদ্ধা করে, বিশ্বাস করে, ভালবাসে।' তুচ্ছ-নয় এমন সামান্য এই মানুষটি, মহেশ চৌধুরী, 'আশ্রমে যে একেবারেই আমল পায় না, সুযোগ পাইলেই সকলের সামনে যাকে অপদস্থ করিবার জন্য সদানন্দকে বিপিন বিশেষভাবে বলিয়া রাখিয়াছে', নিজের আশ্চর্য সহিষ্ণুতাবলে এই মানুষটিই শেষে কেন্দ্র হয়ে ওঠে, আশ্রমগুরু সদানন্দ ও আশ্রমকন্যা মাধবী তার আশ্রয়েই চলে যায়, সদানন্দ এমনকি মহেশের পায়ে হুমড়ি খেয়ে সক্রন্দনে বলে, 'মহেশ, আমায় তুমি রক্ষা কর—বাঁচাও আমায়।' (পৃ. ১৪৩) কিংবা আর-এক আশ্রমপ্রধান বিপিনকে তার কাছেই কাতর আবেদন জানাতে হয়, 'আপনাকে যদি আশ্রমে পেতাম!' (পৃ. ২০৯) মহেশ চৌধুরী বিষয়ে প্রথম পরিচ্ছেদে (পরি. ৫) দেখা যায় সে সস্ত্রীক ঝড়-জলের ভিতরে রাত্রিব্যাপী অপেক্ষা করেছে সদানন্দ প্রভুর শুধু একবার চরণ দর্শনের জন্য আর শেষ দৃশ্যে (পরি. ২০)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখা যায় সেই মহেশ চৌধুরীর নির্দেশেই মাধবী আর সদানন্দকে একসঙ্গে সরিয়ে দেওয়া হয় আশ্রম থেকে।

মহেশ চৌধুরী এক আশ্চর্য মানুষ। তার বিনয়, সহিষ্ণুতা, বিশ্বাসের শেষ নেই। সে সদানন্দের (এবং বিপিনের) বিরোধী চরিত্রের মানুষ। তবে লোকে শ্রদ্ধা করে না (সদানন্দকে যেমন করে), ভালোবাসে। আর এই ভালোবাসা সে অর্জন করেছে নিজের চারিত্রবলে। আশ্রমগুরু সদানন্দ ও আশ্রমের প্রতি তার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অন্ত নেই, সদানন্দের দর্শনের আশায় সে ঝড়বৃষ্টির ভিতরে খোলা আকাশের নিচে যাপন করেছে এক রাত্রি, কিন্তু তারপর বিপিন যখন পরিষ্কার বলে, 'ভগবানকে ডাকবার জন্য আমরা আশ্রম করিনি', যখন আশ্রম সম্পর্কে তার ভক্তি ও বিশ্বাস খানিকটা হলেও টলে যায়, তখন—

> ...একটিমাত্র ভরসা থাকে মহেশের নিজের বিশ্বাস আঁকড়াইয়া থাকিবার ক্ষমতা। নিজে যা জানিয়াছে তার বেশী কিছু জানিতে বা বুঝিতে চায় না, সদানন্দের কথা হোক, শাস্ত্রের বাক্য হোক, তার নিজের ব্যাখ্যাই ব্যাখ্যা। এদিক দিয়া মহেশ ভাঙ্গিবে কিন্তু মচকাইবে না। [পৃ. ৯১]

এই উপন্যাসে মহেশ চৌধুরীর এই ব্যক্তিবিশ্বাসের জয়গাথাই গীত হয়েছে—কোনো শাস্ত্র বা গুরুর নির্দেশ নয়, 'সাধারণ মানুষ যে অজ্ঞাতসারেই[১১] অনেক অহিংস কাজ করে', এবং তাতেই মানুষের মুক্তি সম্ভব, মহেশের ভিতর দিয়ে এই সত্যই প্রমাণিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের প্রতি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে-ভালোবাসা ও বিশ্বাস পরবর্তীকালে দীপ্ততর ও তীব্রতর ও আরো-সোচ্চার হয়েছে, *অহিংসা* উপন্যাসেও আছে তার স্বাক্ষর—হয়তো তা একটু পরোক্ষে কাজ করেছে, কিন্তু তা কখনোই নিছক যৌনতায় নিঃশেষিত হয়নি (যেমন বলেছেন *অহিংসা* উপন্যাসের অধিকাংশ সমালোচক)।

মহেশ চৌধুরীর সহিষ্ণুতা প্রায় মর্ষকামিতার পাড় ঘেঁষে গেছে।[১২] আর আশ্চর্য সহিষ্ণুতা শেষ পর্যন্ত তাকে করেছে বিজয়ী, অসাধারণ সহিষ্ণুতাবলেই সে দখল করেছে আশ্রমটিকে। উপন্যাস শেষ হচ্ছে এই পরিষ্কার আশা-বাণীতে যে সে এবং বিপিন মিলে আশ্রমটিকে আবার গড়ে তুলবে—এবং খুব সম্ভবত সে-ই হবে ভাবী আশ্রমপ্রধান। দু-একবার বিচলিত হয়েছে বটে মহেশও, কিন্তু এমনকি সন্তানের মৃত্যুতেও সে অবিচলিত থেকেছে। মহেশের উক্তি : 'সাধু চায়, বিশেষ কতকগুলি অবস্থায় বাঁচতে যখন হবেই বাঁচার সবচেয়ে ভাল উপায় কি, তাই আবিষ্কার করতে।' মানুষের, জীবনের ও নিজের প্রতি বিশ্বাসে মহেশ চৌধুরী বাঁচার সবচেয়ে ভালো উপায় খুঁজে নিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫. শরীর ও আত্মা

এই উপন্যাসে মানিক নিজস্ব কিছু ঔপন্যাসিক কুশলতার ব্যবহার করেছেন। যেমন : প্রতীক ও প্রতীপাভাসের প্রয়োগ, উপন্যাস-অতিরিক্ত লেখকের মন্তব্য তথা ভাষ্যের সংযোজনা, দিবাস্বপ্নের ব্যবহার, বর্ণনার সংক্ষিপ্তি ইত্যাদি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই উপন্যাসে প্রকৃতির ভূমিকা *দিবারাত্রির কাব্য*র চেয়ে তো বটেই, এমনকি পুতুলনাচের ইতিকথার চেয়ে কম। মানুষই, মানুষের চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বগুলিই লেখকের সমস্ত মনোযোগ দখল করেছে। এমনকি প্রকৃতির সামান্যতম যে-ভূমিকা তাও মানবচরিত্রকে উজ্জ্বল রূপে উপস্থিত করবার জন্যে।

প্রতীক

মানিক তাঁর প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসে অনেক সময়ই প্রতীকের প্রয়োগ করেছেন। বস্তুবাদী ঔপন্যাসিক বলে খ্যাত ছিলেন তিনি, এবং নিজেকেও তিনি তাই মনে করতেন। ফলে তাঁর উপন্যাসের এই প্রতীক প্রয়োগের বিষয়টি অনেক সময় সমালোচকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

১. নদী : *অহিংসা* উপন্যাসের কেন্দ্রীয় কিন্তু অতিপ্রচ্ছন্ন প্রতীক একটি নদী, রাধাই নদী।[১৩] উপন্যাসের শুরু হয়েছে এভাবে : 'সদানন্দ সাধুর আশ্রমের তিন দিকটা তপোবনের মত। বাকী দিকটাতে একটা নদী আছে।' এই নদীটির নামই রাধাই। 'বড় আশ্চর্য্য নদী। প্রতি বছর বাঁচে আর মরে। আকাশে যেই কালো কালো মেঘ জমিয়া থমথম করে, লোকে জল আটকানোর জন্য চালের ফুটা আর ছাতির ফুটা মেরামত না করিয়া আর উপায় খুঁজিয়া পায় না, রাধাই নদীতে অমনি দেখা দেয় ঘোলা জলের স্রোত।' এবং তারপরই :

> সকলে অবাক হইয়া একবার তাকায় আকাশের দিকে, একবার তাকায় রাধাই নদীর দ্রুত বর্দ্ধনশীল জীবনসঞ্চারের দিকে। বড় রহস্যময় মনে হয় ব্যাপারটা সকলের কাছে। বৃষ্টি আর হইয়াছে কতটুকু, কদিনের ছাড়া ছাড়া বর্ষণে পথ-ঘাট ভাল করিয়া ভেজে নাই পর্য্যন্ত। কোন পুকুরে জল বাড়ে নাই, কোন ডোবায় জল জমে নাই। রাধাই এত জল পাইল কোথায়?

এই নদী কি জীবনের প্রতীক—রহস্যময় আশ্চর্য জীবনের? এই নদীর মতোই আকস্মিক আবেগের ওঠা-পড়ায় কি সদানন্দ আর মাধবী-মহেশ-বিপিন-রত্নাবলী-শশধররা আন্দোলিত হয়নি ক্রমাগত? উপন্যাসের প্রথম দৃশ্যে ঐ হঠাৎ-আসা জলরাশির দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল সদানন্দ। 'নদীতে এবার অনেক আগে জল এল, না বলাই?' সদানন্দের এই জিজ্ঞাসার পরে লেখকের বর্ণনা : 'কোথায় প্রেম ও অহিংসা, কোথায় রাধাই নদীতে জল আসা।' কিন্তু এই দুয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্বন্ধ যে নিবিড়, উপন্যাসটির সমগ্র জুড়ে তা প্রমাণিত হয়েছে। 'চোখের সামনে মরা নদীকে বাঁচিতে দেখিয়া সকলে বিস্মিত হয়।' সদানন্দও কি ছিল না এক মৃত নদী, মাধবীর আবির্ভাবের পরে যে বেঁচে উঠেছে, জেগে উঠছে—এবং তার এই জাগরণ আমাদের জন্যে বয়ে এনেছে বিপুল বিস্ময়। এবং তার পর, মাধবীসম্ভোগের পরের দিন সকালে নদীতীরে বেড়াতে গেল সদানন্দ। তখন—

> নদীর জল রাতারাতি আরও বাড়িয়াছে, ঘোলাটে জলের স্রোতে এখনও অনেক জঞ্জাল ভাসিয়া যাইতেছে, শুকনো নদীতে অনেকগুলি মাস ধরিয়া সেসব আবর্জ্জনা জমা হইয়াছিল। কাছাকাছি ছোট একটি আবর্তে কয়েকবার পাক খাইয়া একটা মরা কুকুর ভাসিয়া গেল। বড় আপশোষ হইতেছিল সদানন্দের, অনুতাপমিশ্রিত গ্লানিবোধ। তবু শরীর-মন যেন হাল্কা হইয়া গিয়াছে। [পৃ. ৩০]

নিম্নরেখাঙ্কিত বাক্য দুটির পাশাপাশি স্থাপনা লক্ষণীয় : একদিকে স্রোতের উচ্ছ্বাস, তার আবর্তে মৃত একটি কুকুর; অন্যদিকে সদানন্দের শরীর-মনের আনন্দের 'অক্ষয় প্রলেপে'র মধ্যে গ্লানি ও অনুতাপ।

২. সন্ধ্যা : মাধবীলতাকে মহীগড়ের রাজপুত্র নারায়ণ নদীতীরে বেড়াতে নিয়ে যাবার পরে সদানন্দের মনোভাব : 'একান্ত যুক্তিহীনভাবে'ই তার মন উতলা হয়ে থাকে। আর তারপরই লেখকের আশ্চর্য বর্ণনা :

> বর্ষার গোড়ায় একি অপরাহ্ন আসিয়াছে আজ। দীপ্তি সম্বরণ করিয়া বর্ণচ্ছটা বিতরণের আর কি দিন জুটিত না অকালে ক্লান্ত সূর্য্যের। [পৃ. ৩৯]

বর্ষা-সন্ধ্যার এই আকস্মিক বর্ণালি সদানন্দের মনোজগতেরই আকস্মিক রঙিন উদ্ভাসের প্রতীক। স্বেচ্ছায় মাধবীকে নারায়ণের সঙ্গে পাঠিয়ে তার যে-দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কা হয় মাধবীকে হারিয়ে ফেলার, তা-ই যেন প্রমাণ করে মাধবীর প্রতি তার তীব্র আকর্ষণের। এই পরিণাম সদানন্দের নিজেরও জানা ছিল না; মাধবীকে নারায়ণের সঙ্গে পাঠিয়ে তার আত্মোপলব্ধি ঘটল, জানল মাধবীর প্রতি তার অজ্ঞাতসারেই কী তীব্র আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে। অতঃপর সদানন্দ মাধবীর প্রতি তার মনোভাব গোপন করবার চেষ্টা করেনি আর—না মাধবীর কাছে, না অন্যদের কাছে। একবার আত্মপরিচয় পাবার পরে মাধবীকে পাওয়ার জন্যে সে সর্বরকম প্রক্রিয়ারই আশ্রয় নিয়েছে—এমনকি বিভূতিকে হত্যা করবার প্ররোচনা পর্যন্ত দিতে কুণ্ঠা করেনি। যা-ই হোক, এখানে আমাদের লক্ষ্য ছিল ঐ প্রতীকী বর্ণময় অদ্ভুত অপরাহ্ণে লেখক সদানন্দের গোপন মানসতার উদ্ভাস প্রতিফলিত করেছেন।

৩. বিড়াল : ষোড়শ পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে :

> দিনের বেলা মেলামেশা চলে, কিন্তু দিনের বেলা ভালবাসার খেলা মাধবীলতার পছন্দ হয় না। ...দিনে রাত্রে সব সময় মাধবীলতাকে নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিবার অধিকার জন্মানোর অল্পদিনের মধ্যেই বিভূতি টের পাইয়া গিয়াছে, দিনের বেলা মিলনের আনন্দ ভোগ করার ক্ষমতাটা মাধবীর যেন ভোঁতা হইয়া যায়। [পৃ. ১৬৩]

অথচ তার পরের পরিচ্ছেদেই তার স্বামী বিভূতি যখন একটি বিড়ালকে মেরে ফ্যালে, তার প্রতিক্রিয়া মাধবীর উপরে হয় সম্পূর্ণ বিপরীতভাবেই :

> ...খাওয়া-দাওয়ার পর মাধবীলতা যখন আজ শশধরের বৌ-এর সঙ্গে গল্প করার বদলে পান হাতে স্বামীর ঘরে ঢুকিয়া ভিতর হইতে দরজাটা বন্ধ করিয়া দেয়, বিভূতির মন তখন কঠিন কর্তব্য সম্পন্ন করার গাঢ় আর আঠার মতো চটচটে তৃপ্তিতে ভরিয়া গিয়াছে। দুপুরটা সেদিন দুজনের গভীর আনন্দে কাটিয়া গেল। পুরুষ আর নারীর প্রথম যৌবনের সব দুপুর ওরকম আনন্দে কাটে না। [পৃ. ১৭৯]

এই বর্ণনাটি এই সাক্ষ্য দেয় না যে মাধবী তার স্বামী বিভূতির 'কঠিন কর্তব্য' সম্পন্ন করায় প্রীত (বিভূতি যেমন বোধ করেছিল), বরং গূঢ়তর একটি তাৎপর্য মেলে ধরে, যা মাধবীলতার চরিত্রের একেবারে গভীরে আলো ফেলে : আসলে মাধবীর চরিত্র মর্ষকামীর, সে অত্যাচার ও পীড়ন ভালোবাসে। বিভূতির কোমলতা তার পছন্দ নয়—এবং সে আলোকলুব্ধ চিত্রল পতঙ্গের মতো ফিরে-ফিরে চলে যায় ধর্ষকামী ও ধর্ষণকারী সদানন্দের কাছে, স্বামীহন্তা সদানন্দের সঙ্গেই শেষ পর্যন্ত পাড়ি জমায় নিরুদ্দেশে। একটি বিড়াল প্রতীকের মতো এই ত্রিভুজ সম্পর্কের গোপন জটটি খুলে দেয়।

AMARBOI.COM

প্রতীপাভাস বা oxymoron

বাংলা সাহিত্যে মানিকই প্রথম আবিষ্কার ও চিহ্নিত করেন মানুষের মধ্যে বিচিত্র বিরোধী বিষয়সমূহের সহাবস্থান। তাঁর চরিত্রেরা যে অনেক সময় একটি বিন্দু থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত একটি বিন্দুতে এসে দাঁড়ায়, তার কারণ তাদের ভিতরেই ছিল ঐ বৈপরীত্য। এমনকি একই মানুষ একই সময়ে সম্পূর্ণ বিপরীত বা পরস্পরবিরোধী গুণে বা লক্ষণে সমৃদ্ধ—এ দেখিয়েছেন মানিক। অতিশয় আত্মচেতন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খুব-সম্ভবত নিজের ভিতরেও লক্ষ করেছিলেন বিপরীতের সন্নিপাত।[১৪] এর ফলেই মানুষ সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান মানিক এই উপন্যাসেই লিখেছেন এক জায়গায় :

> ধরা-বাঁধা নিয়মগুলি জীবনে কাজে লাগে না, ধরা-বাঁধা নিয়ম কি জীবনে বেশী আছে? যেগুলিকে অপরিবর্তনীয় নিয়ম বলিয়া মনে হয়, আসলে সেগুলি মানুষের আরোপ করা বিশেষণ মাত্র, উল্টাটাও অনায়াসে খাটিতে পারিত। মানুষ কি চায়, মানুষ কি করে এবং মানুষের কি চাওয়া উচিত আর মানুষের কি করা উচিত, এর কোনো নির্দিষ্ট ফরমূলা আছে? অন্যের প্রস্তুত করা ফরমূলা চোখ কান বুজিয়া অনুকরণ করা হয় বোকামি নয় গোঁয়ার্তুমি। [পৃ. ৮২]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানবচরিত্রের বৈপরীত্যের প্রতি এই শ্রদ্ধার প্রকাশ যেমন তাঁর উপন্যাসের (এবং গল্পের) অজস্র চরিত্র নির্মাণে স্বাক্ষরিত রয়েছে, তেমনি আছে তার সংহত প্রকাশ প্রতীপাভাস বা oxymoron-এর ব্যবহারে। *অহিংসা* উপন্যাসে প্রতীপাভাসের উপর্য্যুপরি ব্যবহার হয়তো সদানন্দ চরিত্রের গভীর আত্মবৈপরীত্যের দ্যোতক। কয়েকটি উদাহরণ :

১. বড় আপশোষ হইতেছিল সদানন্দের, অনুতাপমিশ্রিত গ্লানিবোধ। তবু শরীর-মন যেন হাল্কা হইয়া গিয়াছে। করুণা ও মমতার ব্যথায় হৃদয় ভারাক্রান্ত, তবু আনন্দের একটা অক্ষয় প্রলেপ পড়িয়াছে, মৃদু ও মধুর। ...অন্যায়ের শাস্তি ও পুরস্কার কি এমনিভাবে একসঙ্গে আসে? [পৃ. ৩১]

২. হয়তো সে ছিল নির্ম্মম, স্নেহ তার কাছে মাধবীলতা পায় নাই, শুধু নির্য্যাতন সহিয়াছে, হয়তো সে ছিল পরম স্নেহবান, তার আদরে জীবনের সমস্ত বৈচিত্র্য গলিয়া গিয়া মাধবীলতার জীবন একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছিল, [পৃ. ৩৪]

৩. এত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সদানন্দের, এত তেজ ও সংযম, জীবনকে বিশ্লেষণ করিতে করিতে কি তীক্ষ্ণ হইয়াছে তার বিচারবুদ্ধি, এখন যেন জানিবার বুঝিবার ক্ষমতাটুকুও আর নাই। [পৃ. ৫২]

৪. বড় রাগ হয় সদানন্দের—বড় আনন্দ হয়। [পৃ. ৫৫]

৫. ...এ আশ্রমে কোন ব্যাপারে সকলের চেয়ে মাধবীলতার সাহসটাই সবচেয়ে বেশী হইতে দেখা যায়। বোধ হয় কোন কোন ব্যাপারে সে সকলের চেয়ে ভীরু বলিয়া। [পৃ. ৬৩]

৬. আশ্রম নির্জ্জন, কিন্তু সে অনেক নরনারীর নির্জ্জনতা, আশ্রমের নিয়মে বাঁধা জীবন শান্ত, কিন্তু সে নিয়মও অসাধারণ, সে শান্তিও অসামান্য। [পৃ. ৮৭]

৭. সদানন্দের সংযম সত্যই অসাধারণ ছিল, কারণ তার মধ্যে সমস্তই প্রচণ্ড শক্তিশালী, অসংযম পর্য্যন্ত। [পৃ. ১৫৩]

৮. ...[সদানন্দের] ওসব দুর্ব্বলতা শক্তির প্রতিক্রিয়া, ওসব পাগলামি অতিরিক্ত জ্ঞানের অভিব্যক্তি। [পৃ. ১৫৪]

লেখকের মন্তব্য

মানিক এই উপন্যাসে অভিনব একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন। তা হচ্ছে 'লেখকের মন্তব্য'। এমনিতে সব ঔপন্যাসিকই উপন্যাসের ভিতরে কোনো-না-কোনোভাবে তাঁদের মন্তব্য, মতামত বা বিশ্লেষণ গ্রথিত করেন। কিন্তু এইখানে স্বতন্ত্রভাবে বন্ধনীর মধ্যে গ্রথিত করে দেওয়া হয়েছে, সেটাই লক্ষণীয়। মানিক প্রকৃত আধুনিক শিল্পী—রচনার অন্তর্গত সাক্ষ্যে। আধুনিক উপন্যাসের একটি লক্ষণ তাঁর বিশ্লেষণশীলতা। তাঁর অনেক নায়কের মতো মানিক নিজেও বিশ্লেষণপ্রিয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেজন্যেই কাহিনীর ভিতরে-ভিতরে তাঁর এই মন্তব্যগুলি গ্রথিত করে দিয়েছেন। এক-ধরনের সংক্ষেপীকরণ এই মন্তব্যগুলির পিছনে কাজ করেছে। মানিকের রচনায় যে-আশ্চর্য সংযত সংহতির পরিচয় আছে, লেখকের এই মন্তব্যগুলি এই উপন্যাসে তারই সহায়ক হয়েছে। শেষ 'লেখকের মন্তব্যে' যে-কথা লিখেছিলেন মানিক, তা তাঁর সমগ্র লেখকের মন্তব্যসমূহ সম্পর্কেই সত্য ও প্রযোজ্য :

> মহেশ চৌধুরীর এই অস্পষ্ট আর অসমাপ্ত চিন্তাকে মহেশ চৌধুরীর চিন্তার শক্তি ও ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া স্পষ্টতর করিয়া তুলিতে গেলে অনেক বাজে বকিতে হইবে, সময়ও নষ্ট হইবে অনেক। আলপিন ফুটাইয়া খাঁড়ার পরিচয় দেওয়ার চেয়ে মন্তব্যের এই ভোঁতা ছুরি বেশী কাজে লাগিবে মনে হয়। [পৃ. ২০১]

মানিকের ঐ বিশ্লেষণ-প্রবণতার কারণেই আমরা মনে করি মানিক যেমন জীবনবাদী লেখক, তেমনি সমানভাবেই মননশীল লেখকও। বাংলা বুদ্ধিবাদী উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের পরে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়[১৫] ও অন্নদাশঙ্কর রায়ের পাশেই মানিকের স্থান বলে আমরা মনে করি। তাঁর বুদ্ধিবাদিতা বা মননের ব্যবহার অবশ্য ওঁদের থেকে একটু স্বতন্ত্র—মানিকের জীবনসম্পৃক্তি সব সময়ই চলে মননের ধারার পাশে-পাশেই।

মানিক লেখকের মন্তব্য করেছেন যে-সব পরিচ্ছেদে, সেগুলি হলো : ২, ৫, ৬, ১৭ (দুটি) এবং ১৯—মোট ছয়টি। ২-পরিচ্ছেদে জরুরি একটি তথ্য জানা গেল যে মাধবীলতা ছিল কুমারী, অর্থাৎ পুরুষ সম্পর্কে অভিজ্ঞতাহীন। সাধু সদানন্দের কাছে সে করেছিল 'প্রতিবাদহীন আত্মসমর্পণ'। আগেই আমরা জেনেছি সদানন্দও দীর্ঘকাল নারীসঙ্গ পায়নি। একজনের প্রথম অভিজ্ঞতা, আর-একজনের দীর্ঘকাল পরে অভিজ্ঞতা—এর ফলে তারা দুজনই এই ঘটনায় বিলোড়িত হয়েছিল বিপুলভাবে, সদানন্দ ও মাধবীর পরবর্তী পরস্পর-আকর্ষী দীর্ঘ সম্পর্কের ভিত্তি এখানেই। ৫-পরিচ্ছেদে সদানন্দ ও মহেশ চৌধুরী, যে-দুজন সাধারণের ভক্তি অর্জন করেছিল তাদের ব্যক্তিত্বের একটি পৃথকতার প্রসঙ্গ তোলা হয়েছে। মানিক লক্ষ করেছেন সদানন্দের ছিল 'সচেতন মননশক্তি' আর মহেশ চৌধুরীর 'অচেতন মননশক্তি'; এঁদের প্রতি সাধারণের যে-ভক্তি অর্পিত হয়েছে তারও ভিতরে পার্থক্য আছে—সদানন্দ পেয়েছে সভয় শ্রদ্ধা আর মহেশ চৌধুরী প্রীতি। ৬-পরিচ্ছেদের মূল কথা মানুষের চরিত্রের অনির্দেশী সমৃদ্ধির কথা; মানিক তাঁর, অন্তত প্রথম পর্যায়ের, উপন্যাসে এই প্রমুক্ত মানুষেরই জয়গান গেয়েছেন, জীবনের ধরা-বাঁধা নিয়মে অবিশ্বাসী মানিক তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যেও ভরে দিয়েছেন জীবনের ঐ অ-পূর্ব-নির্দিষ্ট বিস্ময়, ফলে তা এত জীবন্ত ও সত্য ও সাহিত্য-গ্রাহ্য হয়ে উঠেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে রত্নাবলী প্রসঙ্গে নারীচরিত্রকেও তিনি বিশেষিত করেছেন। ১৭-পরিচ্ছেদে একবার মাধবীলতা ও অন্যবার মহেশ চৌধুরীর প্রসঙ্গ আছে। ১৯-পরিচ্ছেদে আবার আছে মহেশ চৌধুরীর প্রসঙ্গ। এখানে এমন-একটি প্রসঙ্গ তোলা হয়েছে, যা হয়তো এই জটিল উপন্যাসের জটিলতর নামকরণ-রহস্যের উন্মোচক চাবি হতে পারে। মহেশ চৌধুরীর মনে হয়েছে, পৃথিবীর মানুষ অনেকদিন থেকে অসুখে ভুগছে, এর মীমাংসা মহাপুরুষেরা করেছেন মন্দকে চাপা দিতে গিয়ে; কিন্তু এই চিকিৎসা ব্যর্থ হয়েছে; কেননা 'চাপা দিলে সত্যই রোগ সারে না, হিমালয় পাহাড়ের মত বিরাট স্তূপ সুগন্ধি ফুলের নীচে চাপা দিলেও নয়।' (এই উক্তিটি অবশ্য 'লেখকের মন্তব্যে'র আগে সংস্থাপিত) সুতরাং শাস্ত্রনির্দিষ্ট বা মহাপুরুষ-নির্দেশিত পথে নয়—মানুষের মুক্তি আসবে 'মনুষ্যত্বকে অতিক্রম' না-করে মানুষের যে-সহজ স্বাভাবিক শুভবোধ তারই ভিতর দিয়ে।[১৬]

দিবাস্বপ্ন

অহিংসার মতো জটিল-গভীর উপন্যাসে দিবাস্বপ্নের ব্যবহার স্বাভাবিক। দিবাস্বপ্নের দুটি উদাহরণ :

১. এইসব ভাবিতে ভাবিতে রত্নাবলীর সর্বাঙ্গ কাঁটা দেয় ...হাঁটিয়া চলিতে চলিতে দুজন কখন উঠিয়া বসিয়াছে গরুর গাড়ীতে ছাউনির মধ্যে, গাড়ীর দোলনে এদিক ওদিক টলিতে কখন তারা জড়াইয়া ধরিয়াছে পরস্পরকে, কখন শশধরের দুটি হাত অন্ধের দুটি হাতের মত রত্নাবলীর সর্বাঙ্গে ব্যাকুল আগ্রহে খুঁজিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে রত্নাবলীর সর্বাঙ্গের পরিচয়—[পৃ. ৭৮]

২. ...প্রকাণ্ড গভীর একটা বন, যার মধ্যে আনুমানিক আবছা অন্ধকার, বাঘ ভালুক সিংহ, চিরস্থায়ী ভয় ও বিষাদ—বনের ঠিক বাহিরে ঝলমলে সূর্য্যালোকে দাঁড়াইয়া অজ্ঞাত কারণের অসহ্য শোকে শান্ত ও নির্ব্বিকার সদানন্দ চুপচাপ গা এলাইয়া দিয়া মাটি হইতে কয়েক হাত উঁচুতে বাতাসে ভাসিতেছে। [পৃ. ১৪১]

এই দিবাস্বপ্ন দুটি রত্নাবলী আর সদানন্দের চরিত্রের গভীরে আলো ফেলে।

বর্ণনার সংক্ষিপ্তি

মানিকের বর্ণনার সংক্ষিপ্ততা, সংহতি, সংযম, তীক্ষ্নতা, তির্যকতা প্রভৃতি তাঁর বিশিষ্টতায় চিহ্নিত। উপন্যাসের নায়িকা, অসামান্য আকর্ষণশক্তি-সম্পন্ন এক তরুণী, তার বর্ণনায় মানিকের অননুকরণীয় নৈর্ব্যক্তিকতা এবং অসামান্য বাস্তবতাবোধ কাজ করেছে :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> কবে কে দা' কুড়াল কিছু একটা অস্ত্র দিয়া আঘাত করিয়াছিল গাছটার গুঁড়িতে, সেই ক্ষতের চিহ্ন, মাটি ঘেঁষিয়া কয়েকটা সরু সরু শিকড়ের ইঙ্গিত, সিমেন্টে বিপিন কবে আনমনে পানের পিক ফেলিয়াছিল তার প্রায় মুছিয়া যাওয়া দাগ, হাত দেড়েক তফাতে নর্দমার কাছে এক বালতি জল আর একটা ঘষামাজা ঘটি আর এই আবেষ্টনীর মধ্যে অতিরিক্ত একটি মেয়ে। [পৃ. ২৭]

কিংবা ছোট্ট একটি বাক্য ঐ আশ্রমজীবনের ধর্মাচরণের পরিচায়ক :

> ঈশ্বরকে ডাকার চেয়ে গুরুদেবের ডাক বড়। [পৃ. ৩৭]

কিংবা অন্যত্র :

> দুজন পুরুষের মধ্যে, বিশেষতঃ বিপিন আর সদানন্দের মত দুজন পুরুষ বন্ধুর মধ্যে এত মৃদু, এতখানি ভদ্রতাসম্মত কলহ হইতে পারে, এতদিন কে তা ভাবিতে পারিত! [পৃ. ৭৪]

'পুরুষ' এই একটি শব্দের উপরে জোর দেওয়ায় সমগ্র পরিবেশটি মুহূর্তে অর্থদীপ্ত হয়ে ওঠে।

সিরিয়াস ও আত্মসচেতন এই উপন্যাসের শরীর ও আত্মা জুড়ে এমন কয়েকটি বিষয়ের মৌলিক স্থাপনা, সংক্ষিপ্ত হলেও যেগুলির স্বতন্ত্র পর্যালোচনা প্রয়োজন।

আশ্রম

অহিংসার পটভূমি আশ্রম। মানিক কখনো কখনো তাঁর উপন্যাসের পটভূমি নির্মাণ করেছেন জনপদ থেকে দূরে, যেখানে 'অনেক নির্জন নরনারীর' কোলাহল। *অহিংসাও* তাই। এই আশ্রমিক পরিবেশ সম্পর্কে মানিক যে-বর্ণনায় সংযমের পরিচয় দিয়েছেন তার কোনো তুলনা নেই। চরিত্রদের সম্পর্কে নিজেই অনেক মন্তব্য করেছেন তিনি—আশ্রম সম্পর্কে আশ্চর্য নীরব তিনি, সেখানে তিনি যা করেছেন তা হচ্ছে ঘটনার বা কথোপকথনের উন্মোচন। দুই আশ্রমপ্রধান, সদানন্দ ও বিপিন, দুজনকেই তিনি প্রথম থেকেই এঁকেছেন একেবারে সাধারণ মানুষের মাপে—বিপিন অন্তরালে সদানন্দের সঙ্গে একরকম ব্যবহার করে, তুইতোকারি গালাগালিও চলে, কিন্তু আপাতভাবে 'প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে সব সময়েই শিষ্যত্বের খোলসটা বজায় রাখিয়া চলে।' আর সদানন্দ তো প্রথম পরিচ্ছেদেই প্রথম সুযোগেই একটি নারী ধর্ষণ করে। 'সদানন্দের বোকামিতে' রাগে গা জ্বলে গেলেও বিপিন তাকে সম্বোধন করে 'প্রভু' বলে। এমনিভাবে প্রথম থেকেই মানিক আশ্রমের অপার্থিব বিষয়টিকে আমলে আনেননি। ২-পরিচ্ছেদের শেষ বাক্যটি তাৎপর্যময় : 'ঈশ্বরকে ডাকার চেয়ে গুরুদেবের ডাক বড়।' বিপিন ও সদানন্দের মধ্যে ভালোবাসা ও ঘৃণার দোটানা তো চলেছেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, এমনকি ব্যক্তিগতভাবে এই দুজন আশ্রমপ্রধানের কেউই ঈশ্বরবিশ্বাসী নয়। সদানন্দ ব্যঙ্গ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে একবার বলেছিল, 'জীবন, ধর্ম্ম, সমাজ, দেশ, এইসবের জন্য বড় বড় কাজ করা আশ্রমের উদ্দেশ্য।' এমনই ব্যঙ্গনিপুণ ছিল তার উক্তি যে মাধবী বলেছিল, 'এভাবে বলছেন যে? তাই উদ্দেশ্য নয় আশ্রমের?' আত্মজর্জরিত সদানন্দ তার এক আত্মিক সংকটে প্রার্থনা করেছিল এমনিভাবে, 'তুমি তো জানো আমি স্বীকার করি না তুমি আছ, তবু যদি থাকো, দয়া কর।' সদানন্দ নিজের মনে যখন আশ্রমের বিরুদ্ধে ভেবেছে তখন ভিতরের ব্যাপারটি ফাঁস হয়ে যায় 'অনাচার ও ব্যভিচারে ভরা বিপিনের টাকা রোজগারের উপায় যে-আশ্রম।' তবু সদানন্দের মনে কিছুটা হলেও দ্বিধা ছিল। তাই সে একবার বলেছিল, 'বড়লোকের পা চাটা আর টাকা রোজগারের ফন্দি আঁটবার জন্য আশ্রম করেছিলি বিপিন? তাহলে ব্যবসা করলেই হত।' বিপিন তার জবাবে স্পষ্ট বলেছিল, 'এ ব্যবসা মন্দ কি প্রভু?' অর্থাৎ বিপিন আশ্রমকে পুরোপুরি একটি ব্যবসা হিশেবেই গ্রহণ করেছে। বিপিন তো মহেশ চৌধুরীকে পরিষ্কারই বলেছে একবার, 'ভগবানকে ডাকবার জন্য আমরা আশ্রম করিনি।' ব্যবসা যে কতখানি তার প্রমাণ একটি বর্ণনা :

> কিন্তু পায়ে আছড়াইয়া পড়ার (তিন টাকা প্রণামী দেওয়ার পরেও) আর হাউমাউ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করার (প্রণামী—আড়াই টাকা) ফল দেখিয়া সকলের সাহস গেল। [পৃ. ১৫৫]

শুধু আশ্রমকর্তাদের ব্যাপারে নয়, ভক্তদের ব্যাপারেও মানিকের দৃষ্টি সমান নির্মোহ ও ক্ষুরধার :

> ঘরের কড়ি পরকে দেওয়া ত্যাগ বৈকি। বিনিময়ে পুণ্য অবশ্য তারা পায়। কিন্তু বর্ষাকালে পুণ্যের দরকারটা এত কমিয়া যায় কেন ওদের? পুণ্যও কি বাজারের ডাল মাছ তরকারীর সামিল ওদের কাছে, জলকাদা ভাঙ্গিয়া যোগাড় করার চেয়ে ঘরে যা আছে তাই দিয়া কাজ চালাইয়া দেয়? [পৃ. ৪৫]

আশ্রমকে পটভূমি হিশেবে ব্যবহার করেছেন লেখক; আশ্রমজীবনের গোপন অনেক-কিছুই এখানে উন্মোচিত হয়েছে, কিন্তু উন্মোচিত হয়েছে আশ্চর্য নৈর্ব্যক্তিকভাবে—কোনো রগরগে উপাখ্যানের সম্ভাবনা মানিক অনায়াসেই এড়িয়ে গেছেন। আবার, অন্য দিক থেকে, আশ্রম পটভূমি হিশেবেই থেকেছে, তার বেশি নয়—মানবচরিত্র ও মানবভাগ্যের রূপায়ণই মানিকের লক্ষ্য।

যৌনতা

এই উপন্যাসে যৌনতার প্রবলপ্রচুর ব্যবহার আছে। সদানন্দ ও মাধবী, রত্নাবলী ও শশধর, বিপিন ও বিভূতি (এক মহেশ চৌধুরী বাদে) প্রত্যেকেরই যৌনচেতনার নানারকম পরিচয় এতে প্রকাশিত। ৭-পরিচ্ছেদে মহেশ চৌধুরীর বাড়িতে গিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশ্রম সম্পর্কে মাধবীর যে মনে হয়েছিল 'আশ্রম নির্জ্জন, কিন্তু সে অনেক নরনারীর নির্জ্জনতা' এবং সেখানে যেন যে-কোনো মুহূর্তে কোনো 'অবরুদ্ধ শক্তি' (পৃ. ৮৭) আত্মপ্রকাশ করে ঘটনার ঘনঘটা সৃষ্টি করবে—এটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। 'অবরুদ্ধ শক্তি' তথা অবদমিত কামের প্রকাশ শুধু *অহিংসায়* নয়, মানিকের আরো অনেক উপন্যাসে (এবং গল্পে)[১৭] প্রকাশিত। বস্তুত মানিক তাঁর অভিজ্ঞতা এবং স্বজ্ঞার বলে উপলব্ধি করেছিলেন বাঙালি সমাজে অবদমিত কামই প্রবলতম।

সদানন্দের দীর্ঘদিনের অবরুদ্ধ কাম আত্মপ্রকাশ করেছে মাধবীকে ঘিরে। তার ব্যবহারে, এবং মাধবীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাকে মনে হয় অনেকখানি ধর্ষকামী (sadist)। বিপরীতভাবে মাধবীকে মনে হয় অনেকটা মর্ষকামী (masochist)। সদানন্দের ধর্ষকামিতা এবং মাধবীর মর্ষকামিতার ফলেই তাদের মধ্যে একটি অচ্ছেদ্য জোড় সৃষ্টি হয়েছে—যা মাধবীর বিবাহকেও ব্যর্থ করে দিল (কেননা বিভূতি ছিল অতিকোমল) এবং যা সদানন্দের সন্ন্যাসীসত্তাকে বিসর্জন দিতে বাধ্য করল। ৬-পরিচ্ছেদে যৌনতা, দমিত যৌনতা তীব্রতম আকার ধারণ করেছে। সদানন্দ, বিপিন, মাধবী, রত্নাবলী—প্রত্যেকেই এখানে যৌনপীড়িত কিন্তু কারো যৌনতাই সরল নয়, মনের নানা জটিলতায় বিসর্পিত। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ জুড়ে সদানন্দ যৌনকাতর : স্নানরতা রত্নাবলী আর উমাকে দেখে সদানন্দ, গোয়ালা বৌকে দেখে শিশুকে স্তন্যপান করাতে—এবং তারপরেই মাধবীকে অভিসারে আহ্বান করে। মানিক যুক্তি ও বিন্যাসের প্রতিটি স্তর বর্ণনা করেন; ফলে তাঁর চরিত্রের বিস্ময়কর আচরণও বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে। মাধবীর অক্রিয়তা ও 'প্রতিবাদহীন আত্মসমর্পণ' শুধু সদানন্দের কাছে প্রথম আত্মসমর্পণেই নয়—সারা উপন্যাসের সর্বত্রই প্রকাশিত হয়েছে। রত্নাবলী দমিত যৌনকাতর (পৃ. ৭৮ ও পৃ. ৮৩)। তার স্বপ্নকল্পনায় এবং মাধবীর গোপন ব্যাপারে অতিকৌতূহলে তার যৌনচিন্তা উচ্চারিত। বিপিন মাধবীর প্রতি মানসিক আকর্ষণ বোধ করে কিন্তু তার সমস্ত শারীরিক আকর্ষণের কেন্দ্র রত্নাবলী। এবং মাধবী ও রত্নাবলীকে মনে-মনে বিবসনা করে সে ঐ তুলনামূলক সিদ্ধান্তে পৌঁছোয়।

কিন্তু, সব সত্ত্বেও, যৌনতার প্রবলপ্রচুর আপ্রথমশেষ প্রয়োগ সত্ত্বেও, *অহিংসা* যৌনতাসর্বস্ব উপন্যাস নয়—পৌঁছে গেছে মহত্তর জায়গায়।

মনোবিশ্লেষণ

মানিক বহিঃপৃথিবীকে যতখানি আগ্রহে ধারণ করেন, ততখানিই আনন্দে অন্তঃপৃথিবীকে বিশ্লেষণ করেন। এই উপন্যাসের বহিঃপৃথিবী একটি আশ্রম, অন্তঃপৃথিবী কয়েকটি মানুষ-মানুষীর অবিরাম আকর্ষণ-বিকর্ষণের দোলাচলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আন্দোলিত। '...জীবনকে বিশ্লেষণ করিতে করিতে কি তীক্ষ্ণ হইয়াছে তার [নায়ক সদানন্দের] বিচারবুদ্ধি...' সদানন্দ 'সচেতন মননশক্তির' অধিকারী। সদানন্দ প্রকৃত অর্থে চিন্তাশীল :

> চিন্তা সে যে একরকম সব সময়ই করে, জীবনের তুচ্ছতম বিষয়টির মধ্যে রহস্যময় দুর্বোধ্যতা আবিষ্কার করা হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরাট রহস্যগুলির ফাঁকি ধরিয়া ফেলা পর্য্যন্ত নানা ধরনের বিচিত্র চিন্তায় মসগুল হইয়া সে যে দিন কাটাইয়া আসিতেছে, এটা তার খেয়ালও হয় না।

চিন্তাশীল সদানন্দ মনোজগতের বিচিত্র সব অলিগলিতে পরিভ্রমণ করে। যেমন একবার—

> ...একটা বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার সে লক্ষ্য করে। মহেশ চৌধুরীর একটা বড় রকম ক্ষতি করার চিন্তাকে প্রশ্রয় দিলেই হঠাৎ নিজেকে যেন তার সুস্থ মনে হইতে থাকে, দেহ মনের একটা যন্ত্রণাদায়ক অসুস্থ অবস্থা যেন চোখের পলকে জুড়াইয়া যায়। [পৃ. ১৪৬]

সদানন্দ ও মহেশের দার্শনিক আলাপেও তাদের চিন্তাশীলতার পরিচয় উদ্ঘাটিত। মনোজগতের নানা রহস্য ধরেছেন মানিক; যেমন মাটির উপরে শূন্যে ভাসমান সদানন্দ, কিংবা রত্নাবলীর দিবাস্বপ্ন, কিংবা হঠাৎ সদানন্দ মহেশ চৌধুরীকে মেরে বসার পরে—

> মাধবীলতা অস্ফুট শব্দ করিয়া মুখের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়াছে ডান হাতের চারটি আঙ্গুল—ছেলেবেলায় মাধবীর এই অভ্যাসটা ছিল, বড় হইয়া কোনদিন এভাবে সে মুখে আঙ্গুল ঢুকাইয়া দেয় নাই। [পৃ. ১০৩]

কেবল কেন্দ্রীয় চরিত্র নয়, অন্যান্য চরিত্রও, যেমন বিপিন ও মহেশও অল্পবিস্তর বিশ্লেষণশীল।

> বিপিন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়, সে দৃষ্টির বিশ্লেষণপটুতা অসাধারণ। বিপিন উসখুস করে, সেটা তার শারীরিক অস্বস্তিবোধের চরম প্রমাণ। [পৃ. ৭১]

মানিকের মূল ঝোঁক অন্তর্বাস্তবতায়। একটিমাত্র উদাহরণ দেব, তা থেকে তাঁর রচনাপদ্ধতির সাধারণ প্রমাণ পাওয়া যাবে। ঘটনা নয়, ঘটনার অন্তঃসারের দিকে তাঁর ঝোঁক, ঘটনার পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার দিকে :

> কাঠের মোটা একটা পিঁড়ি কাছেই পড়িয়া ছিল, দুহাতে পিঁড়িটা তুলিয়া নিয়া এমন জোরেই বিভূতি বিড়ালটিকে মারিয়া বসিল যে, মরিবার আগে একটা আওয়াজ করার সময়ও বেচারীর জুটিল না।
>
> সকলের আগে মহেশ চৌধুরীর মনে হইল তার পোষমানা জীবটি আর কোনদিন লেজ উঁচু করিয়া তার গায়ে গা ঘষিতে ঘষিতে ঘড়ঘড় আওয়াজ করিবে না। তারপর অনেক কথাই তার মনে হইতে লাগিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> জটিল, খাপছাড়া সব রাশি রাশি কথা—চিন্তাগুলি যেন ছেঁড়া কাগজের মত মনের ঘরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ দমকা হাওয়ায় এলোমেলো উড়িতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এরকম অবস্থায় মহেশ চৌধুরী কথা বলে না। তাছাড়া আর উপায় কি আছে? এমন অভ্যাস জন্মিয়া গিয়াছে যে, বিচার বিবেচনার পর একটা কিছু সিদ্ধান্ত দিয়া না বুঝিলে মনের ভাব আর প্রকাশ করা যায় না। [পৃ. ১৭৭]

এই বিড়াল মারার ঘটনাটি অন্য আর-একটি ব্যতিক্রম-ঘটনার সৃষ্টি করে : মাধবী আর বিভূতির দুপুরটা 'গভীর আনন্দে' কেটে যায়।

*অহিংসা*য় প্রচুর মনোবিশ্লেষণের ব্যাপার আছে, কিন্তু *অহিংসা* তার চেয়ে বড়ো।

আশ্রম, যৌনতা, মনোবিশ্লেষণ—এইসব ভিত্তিভূমির উপরে যে-প্রাসাদটি উঠেছে সেটি এসবের উর্ধ্বে; *অহিংসা* আশ্রম, যৌনতা, মনোবিশ্লেষণে ভরপুর হয়েও সেসব ছাড়িয়ে গেছে।

৬. 'আংশিক সমগ্রতার পরিধি' পরিভ্রমণ

> জগতে এমন কি আছে, যার সঙ্গে জগতের অন্য সমস্ত কিছু সংশ্লিষ্ট নয়? অস্তিত্বের অর্থই তাই—সমগ্রতা। বিচ্ছিন্ন কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই। [পৃ. ১৮৩]

এই বোধ অর্জনে ছিল মহেশ চৌধুরীর। সেজন্যেই সে নিরাসক্তভাবে দেখতে পেয়েছিল সদানন্দ, বিপিন, মাধবী, বিভূতি প্রত্যেককে। সেজন্যেই সে বিভূতির মৃত্যুতে অবিচলিত থেকেছে, সদানন্দের সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটিয়েছে আপন পুত্রবধূ মাধবীর। হিংসার সঙ্গে অহিংসার সহাবস্থান লক্ষ করেছেন মানিক *অহিংসা* উপন্যাস সূত্রে, *প্রতিবিম্ব* উপন্যাসের ভূমিকায়; অর্থাৎ এক সমদর্শিতা আছে তাঁর। তাই মধ্যদিনে-শুরু-আর-মধ্যরাত্রিতে-শেষ *অহিংসা* নামের এই জটিল-গভীর উপন্যাসে ব্যক্তি ও সমাজ রূপায়িত হয়েছে একই সঙ্গে। দ্বন্দ্ব আছে সর্বত্র—পিতা ও পুত্রে (মহেশ চৌধুরী ও বিভূতি), স্বামী ও স্ত্রীতে (বিভূতি ও মাধবীলতা), প্রেমিক ও প্রেমিকায় (সদানন্দ ও মাধবী), বন্ধুর ভিতরে (সদানন্দ ও বিপিন)। 'মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের নিয়মগুলি খাপছাড়া নয়?' (পৃ. ১৫৪) এই খাপছাড়া নিয়মগুলিকে এই উপন্যাসে বিহার করতে দেখি। এই উপন্যাস একই সঙ্গে বহিঃপৃথিবী ও অন্তঃপৃথিবীকে ধারণ করেছে—একদিকে আছে আশ্রম আর ভক্তমণ্ডলী; আর অন্যদিকে সদানন্দ, বিপিন, মাধবী, রত্নাবলী, শশধর প্রভৃতি চরিত্রের জটিল-কুটিল যৌনতা, আকর্ষণ-বিকর্ষণের ক্রমাগত টানাপোড়েন। মানিক লিখেছেন মহেশ চৌধুরীর বরাত দিয়ে :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীর সমস্ত দর্শন তাই একটিমাত্র উপায় অবলম্বন করিয়াছে—আংশিক সমগ্রতার পরিধি বাড়াইয়া চলা। [পৃ. ১৮৩]

উপন্যাসও কি করে? উপন্যাস কি মানুষের জীবনের সমগ্রকে ধরতে পারে? পারে না। সে-ও ধারণ করে আংশিক সমগ্রকে, সে-ও আংশিক সমগ্রতার পরিধি বাড়িয়ে চলে। *অহিংসা* উপন্যাসেও মানিক সে আংশিক সমগ্রতাকে ধারণ করেছেন—যৌনতা, মনোবিশ্লেষণ, আশ্রমকাহিনী, অস্তিত্বের সমস্যা, মানবসম্পর্কের লতাজাল, অন্তঃপৃথিবী-বহিঃপৃথিবী সব-মিলিয়েই মানিক পরিভ্রমণ করেছেন সেই আংশিক সমগ্রতার পরিধি।

অনেক সমালোচকই *অহিংসা* উপন্যাসকে যৌনতাসর্বস্ব বলে খারিজ করে দিয়েছেন (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজমোহন মিত্র)। আমাদের বিবেচনায়, এই উপন্যাসে যৌনতার সুপ্রচুর ব্যবহার থাকলেও *অহিংসা* কখনোই যৌনতাসর্বস্ব উপন্যাস নয়। এ আমাদের কখনোই কামে উদ্দীপ্ত করে না, বরং আমরা এই উপন্যাসে সব সময়ই জীবনের বিপুল বিস্ময়ের পরিচয় পেয়ে অভিভূত হয়ে যাই। এর অন্তিম অভিযাত্রাও—মাধবী-সদানন্দের নিরুদ্দেশ যাত্রা—কখনোই যৌনতা-উদ্বোধক নয়, বরং জীবনের এক অনির্বচনীয় বিস্ময়েরই পরিচায়ক। (উপন্যাসে ঐ সুনিশ্চিত পরিণাম সত্ত্বেও অনেকের কাছে উপন্যাসটি যে প্রহেলিকাপূর্ণ মনে হয়েছে তার কারণ মানিকের অসম্ভব বাকসংযম—মানিক কোথাও উদ্দেশ্যপ্রবণ নন। হয়তো বিপিন সম্পর্কে তিনি কিছু কটূক্তি করেছেন, কিন্তু সদানন্দ বিষয়ে তিনি আশ্চর্য সংযত। এজন্যেই মানিককে কোথাও মনে হয়নি আশ্রমের গোপন কাহিনী ফাঁস-করে-দেওয়া উপন্যাসের জনক, বরং সব সময়ই তাঁকে মনে হয়েছে গম্ভীর, সিরিয়াস, হাস্যহীন জীবনের রূপকার।) *অহিংসা* স্পষ্টতই যৌনতাকেন্দ্রী নয়—যৌনতাঊর্ধ্বী উপন্যাস। *অহিংসায়* যৌনতার ব্যবহার যেটুকু আছে, তা বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, কেননা 'বিচ্ছিন্ন কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই।' তা সমগ্রেরই একটি অংশ। *অহিংসাকে* আমরা জীবনশ্লিষ্ট কিছু যৌনতার ব্যবহার করেছে বলে খারিজ তো করতেই চাই না, বরং বলতে চাই মহৎ একটি উপন্যাস। মহৎ এজন্যে যে, সদানন্দ নামে সর্বতোভাবে পার্থিব চরিত্রটিকে (যার আছে প্রবল কাম, ক্রোধ ও জিঘাংসা) আমরা 'ভণ্ড' বলতে দ্বিধান্বিত হই। ক্রমাগত আত্মবিশ্লেষণশীল, অবিশ্বাসী, কখনো-কখনো সংশয়ী, কিন্তু অস্থির, শান্তিহীন এই মানুষটির রক্তপাত হয়েছে সারা উপন্যাস জুড়ে। তাকে যতখানি যৌনতাতাড়িত মনে হয়—ততোধিক মনে হয় নিয়তিতাড়িত। আভাসে এটুকু আমাদের জানানো হয়েছে যে একবার তার সংসার ভেঙেছে; তারপর অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিন নারীসংস্পর্শহীন সন্ন্যাস জীবন কাটিয়ে সে প্রথম যে-নারীর সংস্পর্শে এল, যার মধ্যে তার উদগ্র কামময় প্রেম যুক্ত, তারই জন্যে সে সমস্ত সম্ভ্রম ধুলায় লুটিয়ে নিরুদ্দেশে ভেসে গেল। রক্তাক্ত এই মানুষটির জন্যে আমরা করুণাই বোধ করি। একটি কৃত্রিম বিশ্বাসহীন জীবন ছেড়ে সদানন্দ বরং খাঁটি হয়ে ওঠে মাধবীর প্রতি তার কামনায়—সারা উপন্যাস জুড়ে আমরা লক্ষ করি সদানন্দের এই খাঁটি-হয়ে-ওঠার সাধনা। মহাপুরুষের মিথ্যা খোলস ত্যাগ করে সে যে খাঁটি মানুষ হয়ে উঠল, 'ফাঁপর ফাঁপর ভাব' উড়িয়ে দিয়ে সে যে খুঁজে পেল পায়ের নিচে শক্ত মাটি, সে যে তার নিজস্ব নারীকে খুঁজে নিল সর্বস্ব সমর্পণ করে—তা কি ঈশ্বরসাধনার চেয়ে একতিল কম? এই দুঃখী ও জর্জরিত, শান্তিহীন ও শান্তিসন্ধানী এবং মুক্তিকামী (উপন্যাসের প্রথম থেকেই ঐ সন্ন্যাসীর মিথ্যাবরণ সে পরিত্যাগ করতে উৎসুক মনে হয়—বিপিনের সঙ্গে তার একটি তফাত এখানে) মানুষটির জন্যে আমরা বেদনা বোধ করি। যেমন বেদনা বোধ করি কোন সংসারের বৃন্তচ্যুত এক তরুণী মাধবীলতা এই আশ্রমে উৎক্ষিপ্ত হয়ে এসে সদানন্দের বলয়ে ক্রমাগতই ঘূর্ণিত হতে থাকল—তাকে দেখে, বিবাহিত জীবনের সাধ আর-দশটি মেয়ের মতো তারও ছিল, সে-ও বিবাহিত হয়েছিল, কিন্তু সুখ-শান্তি পায়নি। জীবনের এই বিশাল ট্র্যাজেডির শেষে একমাত্র সান্ত্বনা শুধু এটুকু যে হয়তো ওরা ভবিষ্যতে কোনো নীড়ে স্বাশ্রিত হবে। যে-বিপুল 'সর্বস্পর্শী কারুণ্য' (আর্নল্ড বেনেট-কথিত 'all-embracing compassion') মহৎ ঔপন্যাসিকের লক্ষণ, এই উপন্যাসেও আছে তার সার্বত্রিক স্বাক্ষর : সদানন্দ ও মাধবী, বিপিন ও মহেশ চৌধুরী, শশধর ও রত্নাবলী এবং বিভূতি—কারো উপরেই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে পারি না আমরা, বরং সকলের জন্যেই বিমর্ষ বোধ করি, সকলের জন্যেই আমাদের সহানুভূতি আস্তীর্ণ হয়ে যায়। এমনকি বিপিন, যার সম্বন্ধে প্রথমেই বলা হয়েছে 'মানুষটা সে বড় চালাক, ভাবিয়া চিন্তিয়া ফন্দি না আঁটিয়া কখনও সে কিছু করে না, যদিবা করে, অন্তরালে করে।' (পৃ. ২৪) তাকেও এমনকি উপন্যাসের শেষ দিকে মনে হয় নিঃসহায়, যে সদানন্দকে উপদেশ দিয়েছিল মহেশ চৌধুরীকে অবজ্ঞা ও অবহেলা করবার জন্যে সেই মহেশ চৌধুরীকেই অনুরোধ করতে হয় তাকে, 'আপনাকে যদি আশ্রমে পেতাম!' (পৃ. ২০৯), মাধবীর প্রতি তারও আকর্ষণের সংবাদ একবার প্রকাশিত হয়ে গেছে ('রত্নাবলীর দেহটাই বড় বেহায়া। ...তবু মাধবীলতার আকর্ষণ কত বেশি।' এবং '...দুটি চোখই তার অপলক হইয়া থাকিবে রত্নাবলীর দিকে কিন্তু মন তার পড়িয়া থাকিবে মাধবীলতার কাছে।' (পৃ. ৮০-৮১) এবং তার পর সদানন্দকে সে যখন বলে, 'আরও একটা জিনিষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোকে দিলাম সদা। মাধুকে তুই নিস।' (পৃ. ১১৪) তখন সদানন্দ যতই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠুক 'মাধবীলতা যেন তার [বিপিনের] সম্পত্তি!'—আমরা কি বিপিনের ঈষৎ-বিচলিত হৃদয়েরই সাক্ষাৎ পাই না? আর বিভূতি—নিঃসহায় বিভূতি, নারী-ব্যাপারে যে ছিল একেবারেই অনভিজ্ঞ, বিবাহের পরে মাধবীকে যে ভালোবেসেছে, কিন্তু জীবনের ও প্রেমের জটিল খেলা সে না-জেনে পূর্ব-পরিত্যক্ত রাজনীতিকে আবার আঁকড়ে ধরে এবং পরিণামে এরকম আত্মহত্যারই পথ বেছে নেয়। দুটি উজ্জ্বল পার্শ্বচরিত্র, রত্নাবলী আর শশধর, পরস্পরের প্রতি অকূল আকাঙ্ক্ষা নিয়েও কখনো মিলিত হতে পারে না। এসব মানুষের ব্যথা ও আকাঙ্ক্ষার অচরিতার্থতায় মিশে আছে লেখকের ক্রোধ নয়—করুণা, সর্বব্যাপী সর্বআলিঙ্গনকারী করুণা। আর এই সর্বস্পর্শী করুণাই *অহিংসা* উপন্যাসকে করে তোলে মহৎ।

তথ্যনির্দেশ

১. 'পুতুলনাচের ইতিকথা : আত্মসমালোচনা'। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিন্ন লেখা, সম্পাদনা : যুগান্তর চক্রবর্তী। *এক্ষণ*, শারদীয়া ১৩৮৪।

২. এঁদের কাব্যধর্মী উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথের *চতুরঙ্গ* (১৯১৬), *শেষের কবিতা* (১৯৩০), বুদ্ধদেবের *বাসর-ঘর* (১৯৩৫), অচিন্ত্যকুমারের *আসমুদ্র* (১৯৩৪) প্রভৃতি।

৩. 'সরীসৃপ' উপন্যাস নয়—ছোটোগল্প। ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত *সরীসৃপ* গ্রন্থের নাম-গল্প।

৪. এ রকম আশ্চর্য বাচংযম আমরা লক্ষ করেছি *দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাসের নায়ক হেরম্বের বর্ণনায়ও; তার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে, এটুকু মাত্র জানতে পারি আমরা—তার কারণ বা বিস্তারিত কোনো কিছু নয়।

৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *অহিংসা*র সঙ্গে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর *লালসালু* (১৯৪৮) উপন্যাসের একটি সাযুজ্য লক্ষ করা যায়। *অহিংসা*র পটভূমি আশ্রম, নায়ক সন্ন্যাসী; *লালসালু*র পটভূমি মাজার, নায়ক একজন ফকির। সদানন্দ ও মজিদ—আপাতদৃষ্টিতে দুজন নায়কই ভণ্ড; কিন্তু ভিতরে দুজনই অস্থির ও শান্তিহীন ও নিয়তিতাড়িত; শুধু সদানন্দের শেষ-পরিণামে একটুখানি আশা বেজেছে, মজিদের তাও হয়নি—তাকে শেষ দৃশ্যে দেখা যায় শস্যহীন রিক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে থাকতে।

৬. যেমন *পুতুলনাচের ইতিকথা*র শশী, *দিবারাত্রির কাব্য*-এর হেরম্ব, *চতুষ্কোণ*-এর রাজকুমার ইত্যাদি।

৭. এখানেও শশী, হেরম্ব ও রাজকুমারের কথা বলা যায়। *অহিংসা*র সঙ্গে *পুতুলনাচের ইতিকথা*র তুলনা প্রায়ই এসে পড়ছে, তার কারণ নানারকম সাযুজ্যে এবং মহত্ত্বে এই দুটি অসাধারণ উপন্যাস তুলনীয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮. নিয়তির টান প্রথম পর্যায়ের আরও কোনো-কোনো উপন্যাসে আছে— *পুতুলনাচের ইতিকথা, পদ্মানদীর মাঝি*। কুবের-কপিলার প্রণয়ের পরিণামের সঙ্গে সদানন্দ-মাধবীর প্রণয়ের পরিণামের আশ্চর্য মিল আছে।

৯. সমকালীন কবি জীবনানন্দ দাশ মানুষের এই অশান্ত অনুভূতির কথা লিখেছিলেন 'বোধ' (*ধূসর পাণ্ডুলিপি*) কবিতায়।

১০. যেমন *দিবারাত্রির কাব্য*-এ সুপ্রিয়া, *পুতুলনাচের ইতিকথা*য় কুসুম কিংবা প্রায় সমকালে প্রকাশিত *বৌ* গল্পগ্রন্থের স্ত্রীরা।

১১. স্মর্তব্য, মহেশ চৌধুরী সম্পর্কে 'অচেতন মননশক্তি'র উল্লেখ করেছিলেন স্বয়ং লেখক।

১২. তুলনীয় : ১৯৪৮ সালে রচিত কিন্তু বছর বিশেক পরে প্রকাশিত জীবনানন্দ দাশের *মাল্যবান* উপন্যাসটির নায়ক মাল্যবান তার অপরূপ মর্ষকামিতায় পরাজিত হয় বটে কিন্তু সে-পরাজয় হয় জয়ের অধিক। ('জীবনানন্দের উপন্যাস', *শুদ্ধতম কবি*: আবদুল মান্নান সৈয়দ, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৭৭, পৃ. ২০০)

১৩. পরবর্তী একটি উপন্যাসে নদী কেন্দ্রীয় ও স্পষ্টতর প্রতীক হিশেবে দেখা দিয়েছে। মানিক-বিদ্ধ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর *কাঁদো নদী কাঁদো* (১৯৬৮) উপন্যাসটিতে বাকাল নামে একটি নদী হয়ে উঠেছে একটি নিশ্চিত প্রচ্ছন্ন অথচ প্রত্যক্ষ প্রতীক।

১৪. তাঁর আত্মচরিত্রে বিপরীতের সন্নিপাত ছিল বলেই অকম্যুনিস্ট মানিক লিখেছিলেন *পদ্মানদীর মাঝি*র মতো উপন্যাস, কিংবা কম্যুনিস্ট হয়েও কালী-মাতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। যে-দুজন বিদ্রোহী অকালমৃত ও অকালস্তব্ধ বাঙালি লেখকের সঙ্গে মানিকের তুলনা দেওয়া হয়, মাইকেল ও নজরুল, তাঁদের চরিত্রেও ছিল ঐ আত্মবৈপরীত্য।

১৫. এই তথ্যটি এখানে স্মরণীয় যে, ধূর্জটিপ্রসাদই মানিক সম্পর্কে প্রথম স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনা করেন ('মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', *পরিচয়*, কার্তিক ১৩৪৭)।

১৬. এই ব্যাখ্যার সঙ্গে *অহিংসা* উপন্যাসের মানিক-কৃত ব্যাখ্যাও মেলে অনেক—যা এই উপন্যাসের নামকরণের ইঙ্গিতবহ—'নীতি বা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ না করেও সাধারণ মানুষ যে অজ্ঞাতসারেই অনেক অহিংস কাজ করে, হিংসার সঙ্গে অহিংসাও যে মানুষের মধ্যে থাকে এবং এই সাধারণ অহিংসাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষ নিয়ে যে উপন্যাস লেখা যায়'— *অহিংসা* তারই সাক্ষ্য।

১৭. অবদমিত কামের প্রকৃষ্ট ঔপন্যাসিক উদাহরণ যেমন *অহিংসা*, তেমনি গল্পের অসাধারণ একটি উদাহরণ 'শৈলজ শিলা' (*মিহি ও মোটা কাহিনী*)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরা-বাঁধা জীবন

> প্রেমকে এত বড় করিয়া তুলিবার কোনো প্রয়োজন তো তার ছিল না, ব্যর্থতাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে কেউ তো তাকে অনুরোধ করে নাই।...আরও তো অনেক কিছু আছে জীবনে, সেসব অস্বীকার করিবার কোনো কারণ তো নাই। হাতের খেলনা কাড়িয়া নেওয়া হইয়াছে বলিয়া অবোধ শিশু ঘরের আসবাব ভাঙিতে আরম্ভ করে। সে তো শিশু নয়।
>
> [পৃ. ২৬২, 'ধরা-বাঁধা জীবন', *মা. গ্র.*]

AMARBOI.COM

পঞ্চাশ পৃষ্ঠার ছোটো উপন্যাস। ছোটো হলেও গুরুত্বপূর্ণ। ছোটো হলেও প্রকৃত অর্থে সম্পূর্ণ উপন্যাস। আসলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রায় যে-কোনো দুটি উপন্যাস একরকম নয়, প্রায় যে-কোনো উপন্যাসেই প্রাপ্তির কিছু-না-কিছু থেকে যায়, যা মানিক-মানসের বিচিত্র বহুমুখিতারই দ্যোতক, এবং ঔপন্যাসিক-শোভন বহুধা আগ্রহ, কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার প্রমাণ। *ধরা-বাঁধা জীবন* উপন্যাসেরও এমন-কিছু প্রসঙ্গ আছে, এর পরিণামও বটে, যা তার পূর্ব ও পরবর্তী উপন্যাসসমূহ থেকে স্বতন্ত্র সাযুজ্যও আছে অনেক। সেজন্যে এই উপন্যাস আলাদাভাবে আলোচ্য।

ধরা-বাঁধা জীবন সর্বতোভাবে, বিষয়ে ও বক্তব্যে, মধ্যবিত্ত জীবনের একটি নিরাবেগ, অনার্দ্র ও অকম্প্র আলেখ্য। মানিক-যে মধ্যবিত্ত জীবনের দয়াহীন রূপকার, মানিক-যে বাস্তব জীবনের নির্মম রূপকার, আর-কিছু না-হোক এই ছোটো উপন্যাসটি থেকেও তা প্রমাণ করা চলে। উপন্যাসটির শরীরে ও আত্মায় মধ্যবিত্ত মানসতা মোহহীনভাবে স্বাক্ষরিত। হয়তো উপন্যাসটি বিস্তারিত নয় বলেই তার একটি রেখাও কেঁপে যায়নি, প্রায় একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোটোগল্পের মতোই লক্ষ্যভেদ করেছে; কিন্তু আবার এটি উপন্যাসের অন্তঃশায়ী সম্প্রসার, সমগ্রতা ও অন্তিম শমশান্তিকেও ধারণ করেছে। গল্প ও উপন্যাসে মধ্যবর্তী এই স্বল্পব্যবহৃত মাধ্যমটি, নভেলা, এর শিল্পকলাও-যে মানিকের আয়ত্তে ছিল, উপন্যাসটি তার প্রমাণ।

সর্বতোভাবে শাহরিক মধ্যবিত্ত জীবনের কাহিনী *ধরা-বাঁধা জীবন* মানিকের প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসের মধ্যে *পদ্মানদীর মাঝি* ও *পুতুলনাচের ইতিকথায়* গ্রামীণ জীবন রূপায়িত হয়েছে; প্রথম নিম্নবিত্তের জীবনকাহিনী; দ্বিতীয়টির নায়ক শশী অপেক্ষাকৃত সচ্ছল হলেও তার চারপাশে মূলত নিম্নবিত্তেরাই, আর শশীর সমস্যার সঙ্গে মধ্যবিত্তের সমস্যার কোনো সম্পর্ক নেই। *দিবারাত্রির কাব্যের* কাহিনীর পটভূমি জনপদ থেকে অনেক দূরে, তার নায়ক-নায়িকার সম্পর্কও প্রেমে যৌনতায় রোমান্টিকতায় আবর্তিত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংকট ও সমস্যা সেখানে কিছুমাত্র ভূমিকা পালন করেনি। সেদিক থেকে *ধরা-বাঁধা জীবন* পূর্ণত ও মর্মত মধ্যবিত্ত জীবনেরই আখ্যান।

এবং সে-মধ্যবিত্ত জীবন রূপায়ণে বাস্তবতা কিছুমাত্র লঙ্ঘিত হয়নি ভূপেন ও প্রভার মানসের প্রতিটি স্তর যুক্তিগ্রথিত একটি ঘোরানো সিঁড়ির মতো উপস্থিত। 'ঘোরানো সিঁড়ি' বাক্যবন্ধটি লক্ষণীয়; অর্থাৎ জটিল; জটিল, কিন্তু যুক্তি, স্বচ্ছতা এবং কেন্দ্রমুখিতায় উপন্যাস নিবিড়। মানিকের প্রথম পর্বের উপন্যাসে আচরিত দুটি বিষয়, যা অনেক সময় অন্যোন্য-সম্পর্কিত, সেই রহস্য ও নিয়তির কোনো কুয়াশা ও চোরা টান নেই এই উপন্যাসে। উপন্যাসটিতে নেই এক-তিল অন্ধকার, বাস্তবকে এখানে দিবালোকের মতো উত্থাপন করেছেন মানিক। বাস্তবতার জন্যে মানিকের নিজের যে আকাঙ্ক্ষা[১] ও দাবি, এবং বাস্তববাদী লেখা হিশেবে তাঁর যে-খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা, তার অন্যতম ভিত্তি হতে পারে ছোটো এই অখ্যাত উপন্যাসটি। *পদ্মানদীর মাঝিতে* মানিক যদি গ্রামীণ নিম্নবিত্ত জীবনের প্রকৃত রূপদাতা, এই উপন্যাসে তাহলে তিনি শাহরিক মধ্যবিত্ত জীবনের খাঁটি উপস্থাপক। মাত্র পাঁচ বছরের পরিসরে (*পদ্মানদীর মাঝির* প্রকাশকাল ১৯৩৬, *ধরা-বাঁধা জীবন*-এর প্রকাশকাল ১৯৪১) এই দুটি মেরু-দূর বিষয়ের উপন্যাস লিখে তাঁর জীবন-রসিকতা ও জীবন-অভিজ্ঞতা যে কত ব্যাপক, এবং তার রূপদানেরও, তা প্রমাণ করে দিয়েছেন মানিক।

মানিক শুধু নিজেই আত্মচেতন নন, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রেরাও আত্মচেতন। যেমন, এই উপন্যাসের ভূপেন ও প্রভা। ভূপেন ও প্রভার ব্যক্তিত্বের সমস্যাই উপন্যাসের সমস্যা; তাদের ঐ ব্যক্তিত্বের সমস্যায় সমাজ এসে যুক্ত হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের ঐ ব্যক্তিত্বের বলয় থেকেই এক-একটি ঘটনা জন্ম নেয়, বা রচিত হয় ঘটনাপরম্পরা। ক্রমাগত ক্রিয়া ও তার প্রতিক্রিয়ার বুনন চলে তাই তাঁর উপন্যাসে। ব্যক্তিত্বের সমস্যা—কিন্তু মানিক কখনো ভোলেন না যে ব্যক্তিত্ব সমাজবিচ্ছিন্ন কিছু। ভূপেন ও প্রভা দুজনেই স্বতন্ত্র প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন; কিন্তু সমাজ, এক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে তারা বিচ্যুত বা মুক্ত নয় কখনোই। ব্যক্তিত্বের সমস্যা যেহেতু তাঁর উপন্যাসের সমস্যা, কাজেই চরিত্রই হয়ে ওঠে তাঁর উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়—এবং ঘটনার নিয়ামক। ফলে মানিকের অধিকাংশ উপন্যাসই চরিত্র-প্রধান। *ধরা-বাঁধা জীবন*ও তাই। শরৎচন্দ্রও তাঁর উপন্যাসে প্রাধান্য দেন চরিত্রেরই, কিন্তু মানিক নন শরৎচন্দ্রের মতো অনুকম্পাশীল কিংবা তাঁর চরিত্রদের সবখানি নিয়ন্ত্রণ করে না সমাজ।[২] মানিক বঙ্কিমচন্দ্রের মতো তাঁর চরিত্রপাত্রদের বিচারকও নন। মানিককে বরং মনে হয় বিশ্লেষণপ্রবণ ও নিরাসক্ত রবীন্দ্রনাথেরই উত্তরসাধক। রবীন্দ্রনাথের মতো মানিকের চরিত্রেরাও আত্মচেতন, পরতে-পরতে তাদের মন বিশ্লেষণ করে দেখান তিনি, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির টানাপোড়েন, আর সমস্তই করেন নিজে অনুপস্থিত থেকে, নিজে বিযুক্ত থেকে, আর রবীন্দ্রনাথে যা স্বাভাবিক সেই কবিত্ব বর্জন করে মানিক হয়ে ওঠেন আরো নগ্ন ও নির্মম ও বস্তুঘনিষ্ঠ।[৩]

এই উপন্যাসের আরম্ভ ও শেষ নিবিড় একটি ছোটোগল্পের মতোই—আকস্মিক ও সংক্ষিপ্ত, কিন্তু গভীরভাবে ব্যঞ্জনাগর্ভ ও ইশারাদ্যুতিমান। প্রথম বাক্যটি এই: 'একদিন ভূপেনের বৌ আর ছেলে মরিয়া গেল কিন্তু ভূপেন কাঁদিল না।' (পৃ. ২১৩) প্রথম বাক্যে যে-ঘটনার সারাংশ দেওয়া হয়েছে, কয়েক পৃষ্ঠা জুড়ে তার বিস্তারিত বর্ণনা। বাক্যের প্রথমাংশ কাজ করেছে পটভূমির, আর দ্বিতীয়াংশ একটি নবজীবনের সূচক। কিন্তু দুটিই বর্ণনা করা হয়েছে সযত্নে, স্তরে-স্তরে। স্ত্রী ও সন্তানের পর-পর মৃত্যুতে ভূপেন অসম্ভব শোক পায় কিন্তু কাঁদে না, এমনকি সেদিনই সে সিনেমা দেখে, এমনকি 'মুক্তির একটা অবাধ্য অনুভূতি'ও জাগে তার, এমনকি এতকাল পরে এই প্রথম প্রভার 'নীরব পূজা'র উত্তরে এ কথা জানিয়ে দেয় 'তুমি ছাড়া আমার কে আছে।' এইসব আপাত-ব্যতিক্রম ঘটনা এমনই স্বাভাবিকভাবে ঘটে যে পুরোটাই মনে হয় বিশ্বাস্য। কিন্তু প্রভা, ডাক্তারি যার জীবিকা, তার একটু ঠান্ডা সাড়া-দেওয়া ভূপেনকে কি একটু প্রতিহত করে?—'যত গুরুতর কাজই তার থাক, প্রভা তাকে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছে, 'আমার কাজ আছে, আপনি এবার যান।' (পৃ. ২১৯) আর তারপরই দেখা যায় 'ভূপেন কাঁদিতেছে।'—যে-কান্না সে স্ত্রী-পুত্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে কাঁদেনি। তারপর ভূপেন তীব্রভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকৃষ্ট হতে থাকে প্রভার প্রতি। এমনকি তাকে যখন সবাই মৃত্যুশোকগ্রস্ত মনে করছে, তখন সে জানায়, 'তুমি যা ভাবছ তা কিন্তু নয় প্রভা, তোমার জন্যই মনটা আমার বেশি অস্থির হয়ে পড়েছে।' (পৃ. ২২৫) প্রভার প্রতি অবিরল আকর্ষণের দিনগুলিতেই ক্রমশ একটি পিছুটান—হয়তো তা ঠিক ভালোবাসা নয়, শুধু এক অভ্যাস—দখল করে তাকে : 'আজও সে প্রভাকে চায় কিন্তু সরমা ছাড়া কি করিয়া তার দিন কাটিবে, তাও সে ভাবিয়া পাইতেছে না!' (পৃ. ২২৯) স্ত্রী-পুত্রের মৃত্যুর পরে যে-'মুক্তির একটা অবাধ্য অনুভূতি' হয়েছিল তার, তার ফলেই তার 'মুক্তির প্রথম প্রতিক্রিয়া' প্রভার কাছে বিবাহের প্রস্তাব, মুক্তির দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া মদ ও নারীসঙ্গ। দ্বিতীয়টিতে ভূপেন প্রায় ঘটনার সঙ্গে-সঙ্গেই বিবমিষা বোধ করে। আর প্রথমটিতে ব্যর্থ হয় ক্রমশ—খানিকটা প্রভার নিস্পৃহতায়, অংশত নিজের নিস্পৃহতায়। শেষ পর্যন্ত মৃতদার মৃতপুত্র ভূপেন ধরা-বাঁধা জীবনের বাইরে গিয়েই স্বস্তি খুঁজে পায়। আর প্রভা? সে অবিবাহিত বটে কিন্তু বয়স হয়ে গেছে তার, সন্তান কামনাও নেই আর, হয়তো ডাক্তার হিশেবে সন্তান প্রসবে সহায়তা করতে-করতে এক-ধরনের ঘৃণা জন্মেছে তার। ভূপেনের প্রতি তার যে-নীরব ভালোবাসা দীর্ঘদিন ধরে সুপ্ত ছিল, স্ত্রী-পুত্রের মৃত্যুর পরে ভূপেনের আকস্মিক উচ্ছ্বাসে সাড়া দিয়ে প্রমাণ করে তার সে-ভালোবাসা মরেনি। কিন্তু এই দুজন প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী পরস্পরের প্রতি পূর্ণভাবে আকৃষ্ট হয়েও মিলিত হতে পারে না, তারুণ্যের যুক্তিহীন আবেগ নেই আর ওদের। ভূপেনের প্রতি প্রভার ব্যবহার একটি রেখায় চলে না, নিজেকে পরিপূর্ণ ধরা দিলেও ভূপেন তাকে শারীরিকভাবে আকাঙ্ক্ষা করে না এই বিষাদে ও ক্ষোভে 'দেহ মন তার যেন জ্বালা করিতে থাকিত। কোন দিন ভূপেনকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিত, কোন দিন করিত অপমান।' (পৃ. ২৩৪) ভূপেনের বিবাহ-প্রস্তাবে প্রথমে হয় ভয়-ভাবনা, শেষে সে বিবাহ-ব্যাপারটি ছ'মাস স্থগিত রাখার প্রস্তাব করে। আর তখন দেখা যায় ভূপেনের প্রবল প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষার মধ্যেও কাজ করে যাচ্ছে একটি দ্বিধা : 'সেও কি বিবাহের দিন পিছাইয়া দিতে চাহিয়াছিল? প্রভা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিয়াছে, সে শুধু ইচ্ছাটা মনের মধ্যে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল?' (পৃ. ২৫৬) শেষ পর্যন্ত প্রভারই প্রস্তাবে ওদের সম্পর্ক শেষ হয় বয়স্কের অভিজ্ঞ চুক্তিতে : বিবাহিত হবে না তারা কিন্তু ভূপেন যখনই ইচ্ছা করবে পাবে প্রভাকে। তার পরও অবশ্য কাহিনীর একটুখানি বাকি থাকে। প্রভার সঙ্গে ঐ 'শেষ বুঝাপড়া'র পরও প্রভাকে একটু পরীক্ষা করে দেখতে ইচ্ছা হয় ভূপেনের কিন্তু তার বাড়িতে গিয়ে প্রভাকে কলহাস্যরত দেখে 'ভূপেন ঈর্ষা বোধ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, সে শুধু আশ্চর্য্য হইয়া যায়।' (পৃ. ২৬১) সহাস্যা প্রভা তার এই চেতনা ফিরিয়ে আনে যে প্রেমের বাইরেও 'অনেক কিছু আছে জীবনে'।

এই সামান্য অথচ অসামান্য কাহিনীর রূপায়ণে মানিকের বাস্তব চেতনা প্রতি মুহূর্তে থাকে সক্রিয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চরিত্র, ঘটনা ও পটভূমি নির্মাণে একটুও ফাঁক রাখেন না মানিক। কিন্তু মানিকের আগ্রহ বহির্বাস্তবতায় যতখানি, ততটাই ভিতর-মানুষের দিকে—হয়তো inner man-এর দিকে আর-একটু বেশি। তাই 'একদিন ভূপেনের বৌ আর ছেলে মরিয়া গেল, কিন্তু ভূপেন কাঁদিল না।' বহির্ঘটনার এই সংবাদ জ্ঞাপনের পর তিনি লেগে যান ভূপেনের ক্রন্দনের পটভূমি রচনা করায়। ঘটনার চেয়ে ঘটনার অন্তঃসারের দিকে সবখানি নজর তাঁর। সারা উপন্যাস জুড়েই তাই। একটি অংশ পরীক্ষা করে দেখা যাক : মদ ও নারীসঙ্গের জন্যে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে ভূপেন কোনো বাড়িতে যায়। সেখানে

বহির্ঘটনা	'সন্ধ্যার পর দোকানের মতো সাজানো ঘরে ঢুকিয়াই
ভূপেনের মন	মন তার [ভূপেনের] আরও দমিয়া যায়',
বহির্ঘটনা	'গেলাসে প্রথম চুমুক দিবার সময়
ভূপেনের মন	আতঙ্ক জাগে',
বহির্ঘটনা	'তিনটি স্ত্রীলোকের সান্নিধ্য
ভূপেনের মন	ভিতরের অমর অনাহত লাজুক তরুণটিকে পীড়ন করে...'
বহির্ঘটনা	'মাঝরাত্রে যখন পা টলিতেছে, বিশ্বজগৎ হইয়া গিয়াছে ফেনা আর বুদবুদ,'
ভূপেনের মন	'তখনো নিজের কাছে কৈফিয়ৎ চলিতে থাকে যে, লাভ কি? আর আপশোষ করিতে হয় যে, হায়, নিজেকে ভুলিবার এত আয়োজনও যদি ব্যর্থ হইল, তবে আর বাঁচা কেন?'
বহির্ঘটনা	'অচেতন ভূপেনকে উদ্ভট ভঙ্গিতে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তারা [ভূপেনের বন্ধুরা]'
ভূপেনের বন্ধুদের মন	'সবে ভাবে, আমরা ওর মত নই, আমাদের মাত্রা-জ্ঞান আছে, ফুর্তি করতে বসেও আমরা সংযম হারাই না।'

এমনিভাবে সারা উপন্যাসেই মানিক দেখিয়েছেন বহির্ঘটনাজাত মানসপ্রতিক্রিয়াগুলি। আমাদের বিবেচনায় মানিক যত না realist শিল্পী, তার চেয়ে বেশি inner-realist শিল্পী। ঘটনা ও ঘটনাজাত প্রতিক্রিয়া, ঘটনাপূর্ব মানসক্রিয়া—এইসবই রেখায়-রেখায় অঙ্কিত হয়েছে এখানে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহাজ চলে যাবার পর যে-ঢেউ ওঠে মানিক যেন সেগুলির ছবি তুলে এনেছেন এখানে, চিত্রিত করেছেন প্রবহমান স্রোতকেও, এবং জাহাজটিকেও। অন্তর্বাস্তবতা ও বহির্বাস্তবতা—এমনিভাবে বাস্তবতার সমগ্রতাকেই ধারণ করেন তিনি।[৪]

অন্তর্বাস্তবতা ও বহির্বাস্তবতা এ দুইকেই ধারণ করেন মানিক, তার প্রমাণ স্পষ্ট হবে ভূপেন ও প্রভার চারিত্রিক বিশ্লেষণের একটি ছক তৈরি করলে। ওদের মিলনে বাধা এসেছে দুদিক থেকে। এক, ওদের নিজেদের মনের বাধা, ভয়-ভাবনা, অভ্যস্ত জীবনের মসৃণতা থেকে চ্যুত হওয়ার ভয়; আর অন্যটি সামাজিক বাধা, বাইরের বাধা, সে-বাধা শরৎচন্দ্রীয় সমাজ-অনুশাসনের[৫] নয়—অর্থনৈতিক ছকটি এ রকম :

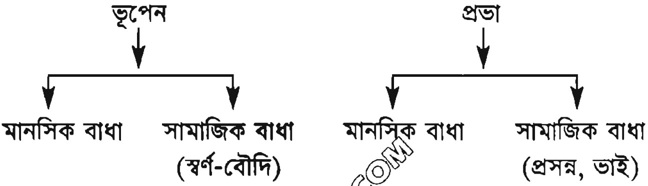

AMARBOI.COM

অনেক দিন 'নীরব পূজা'র পরে আকস্মিকভাবে স্ত্রী-পুত্রের মৃত্যুর পর ভূপেন যখন প্রভার কাছে প্রেমনিবেদন ও বিবাহপ্রস্তাব দেয়, প্রভা তখন নিশ্চিতভাবে আনন্দিত হয়ে ওঠে, সাড়াও দেয়। কিন্তু ক্রমশ 'ভয়' ও 'ভাবনা' (পৃ. ২৩৬) পেয়ে বসে তাকে। বিয়েটা পিছিয়ে দেবার প্রস্তাবও সে-ই করে (পৃ. ২৫৬)। ভয়-ভাবনা—সংসারের কর্তৃত্ব হারানোর ভয়-ভাবনা, নতুন জীবনে প্রবেশের ভয়-ভাবনা। এবং আশ্চর্য, প্রভা সম্পর্কে উত্তাল আবেগে প্লবমান ভূপেনেরও মনে হয় 'সেও কি বিবাহের দিন পিছাইয়া দিতে চাহিয়াছিল? প্রভা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিয়াছে, সে শুধু ইচ্ছাটা মনের মধ্যে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল?'[৬] (পৃ. ২৫৬) হয়তো এর কারণ ওরা দুজনই জীবনের প্রথম তারুণ্যকে অতিক্রম করেছে, বয়স্ক তারা, অভিজ্ঞ তারা, আবেগের চেয়ে যুক্তি ও হিসাব তাদের বেশি। লেখকের নিজেরই ভাষ্য :

> জীবনের সবচেয়ে বড় সার্থকতা হাতের মুঠোয় আসিয়া পড়িলেও গ্রহণ করিতে তারা যে ইতস্তত করিতেছে, হিসাব করিতে বসিয়াছে ভবিষ্যতে কতখানি লাভ আর কতখানি লোকসান দাঁড়াইবে, সে শুধু বয়স তাদের বেশি বলিয়া [পৃ. ২৪৩]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূপেন ও প্রভার আচরণে আছে এর সাক্ষ্য :

> এক যুগ আগে যে কথা বলা চলিত, সেগুলি অবশ্য মনের মধ্যে ভিড় করিয়াই থাকে, দুজনে শুধু উচ্চারণ করিয়া যায় কথাগুলি সময়োপযোগী অনুবাদ। [পৃ. ২৩৬]

কিংবা প্রভার উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে :

> আমি ভাবছি বিয়েতে কাজ নেই। অত ধরা-বাঁধার মধ্যে আমরা যেতে পারব না। [পৃ. ২৫৭]

একদিকে এই তাদের অন্তরের বাধা, অন্যদিকে বাইরের বাধা : দুজনের বাড়িতেই সকলের 'শঙ্কিত ও উদ্‌গ্রীব' অবস্থা—পাছে ভূপেন ও প্রভা বিবাহিত হয়। প্রভার ভাই প্রসন্নের আশঙ্কাটি একেবারেই আর্থনীতিক : 'নিজের চাকরির ৭৫ টাকায় সংসার চালানোর কথা ভাবিলে প্রসন্নের কপাল ঘামিয়া ওঠে।' (পৃ. ২৩৮) এবং সেজন্যে সে ভূপেনের কাছে এমনকি নিজের বোনের দুশ্চরিত্রতার বিষয়ে ইঙ্গিত দিতেও কসুর করে না—এই ভরসায় যেন ভূপেন অতঃপর প্রভাকে বিবাহ না করে। আর ভূপেনের বৌদির চিন্তা ও আশঙ্কা মুখ্যত প্রভা ভূপেনের স্ত্রী হয়ে সংসারে এলে তার কর্তৃত্ব কমে যাবে। (শিল্পবিশ্লেষণ-যে বিধিবদ্ধভাবে করা হয়ে থাকে, জীবন তো তেমন নয়; জীবনের প্রধানতম শিল্প-অনুকল্প উপন্যাসও তেমন নয়। পুরোপুরি ছকে বাঁধা হতে পারে না প্রভা-ভূপেন ও তাদের পার্শ্ববর্তীদের জীবনযাপন। প্রভার সম্ভাব্য বিবাহে প্রসন্নের প্রতিক্রিয়া আর ভূপেনের সম্ভাব্য বিবাহে তার বৌদির প্রতিক্রিয়া একই রঙে-আঁকাও একই ছকে-বাঁধা নয়।) বৌদির প্রতিক্রিয়া আর-একটু অন্তর্গূঢ় :

> ...বৌদিদির সঙ্গে আবার কি আগের মত ভাব করিবে না ভূপেন? কয়েক মাস পরে বৌদিদির বড় মেয়েটার বিবাহে কর্তব্যবোধে যতটা করুক, ভাইঝির উপর স্নেহের বশে যতটা করুক, বৌদির জন্য তার চেয়ে বেশি কিছু সে কি করিবে না? [পৃ. ২২১]

ধরা-বাঁধা জীবন মধ্যবিত্ত জীবনের অনুক্ষণ হিসাব-করা, অনুক্ষণ ভয়-ভাবনায়-পাওয়া (যে-ভয়-ভাবনা বাইরের নয়—শরৎচন্দ্রের মতো নায়ক-নায়িকার নিজেদেরই মনের ভয়ভাবনা : এইখানে উত্তর-শরৎ ঔপন্যাসিক হয়ে ওঠেন মানিক) জীবনের কাহিনী। ঐ ভয়ভাবনা আছে দুই তরফেই—প্রভা ও ভূপেন দুজনেরই। '...ভিন্ন দুটি বাড়িতে ভিন্ন দুটি ঘরে রাত জাগিয়া তারা পরস্পরের জন্য ছটফট করে। কিন্তু তাড়াতাড়ি বিবাহটা সারিয়া ফেলিবার তাগিদও কোন পক্ষ হইতে আসে না।' (পৃ. ২৩৯) তাদের মিলনের বাধা যতখানি তাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে ততখানি দায়ই মধ্যবিত্ত-সুলভ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মভাবনাশীল সংকীর্ণতায়।[৭] ভূপেন-প্রভার দুই পরিবারেই ঐ মধ্যবিত্ত-সুলভ আত্মকেন্দ্রী ভাবনার ছায়া।[৮]

আগেই বলেছি, মানিকের উপন্যাসে ব্যক্তিত্বের সমস্যাই হলো আসল সমস্যা। ভূপেন (ও প্রভা) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিভূ হলেও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বে বর্ণময়। তাদের ব্যক্তিত্বের মিলনের বাধাই তাদের মিলনে বাধা। ভূপেন মানিকের আরো অনেক নায়কের মতোই[৯], বয়স্ক, অভিজ্ঞ, ভাবনাময়[১০] ও পরীক্ষাশীল[১১]। ভূপেনের সমস্যা সত্তার সমস্যা, অস্তিত্বের সমস্যা, বেঁচে থাকার সমস্যা। মৃত্যুর পটভূমিতে অস্তিত্ব হয়ে ওঠে উজ্জ্বলতর; সেজন্যে মৃত্যুর ঝাঁকুনি দিয়ে শুরু হয়েছে এই উপন্যাস[১২], 'একদিন ভূপেনের বৌ আর ছেলে মরিয়া গেল', সূচনার এই বাক্যাংশের পর সারা উপন্যাস জুড়ে চলেছে ভূপেনের অস্তিত্বের রক্তাক্ত লড়াই। ভূপেন-যে স্ত্রী-পুত্রের মৃত্যুর পরে-পরেই সিনেমা দেখতে ছোটে, প্রভার প্রতি আতীব্র আকৃষ্ট হয়ে তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়, বেশ্যাবাড়ি যায়, মদ খায়, এমনকি প্রভার সঙ্গে প্রেম চলার সময়েই অন্য একটি মেয়ে শান্তিকে দেখে বিয়ে করার জন্যে—এসবই এক পরীক্ষা, জীবন নিয়ে পরীক্ষা, জীবনে যুক্ত হওয়া ও যুক্ত থাকার পরীক্ষা। জীবন নিয়ে চিন্তা করে ভূপেন, বিশ্লেষণ করে, কিন্তু সে অক্রিয় নয়—পরীক্ষার্থী। প্রভার প্রতি মাত্রাহীন আসক্তিতে আবেগের বহির্ভাগে আছে প্রেম কিন্তু অন্তস্তলে তার চলেছে আসলে অস্তিত্বের সংগ্রাম। বেশ্যাবাড়িতে মদ্যপানের পর 'মাঝরাত্রে যখন [ভূপেনের] পা টলিতেছে, বিশ্বজগৎ হইয়া গিয়াছে ফেনা আর বুদবুদ, তখনো নিজের কাছে কৈফিয়ৎ চলিতে থাকে যে, লাভ কি? আর আপশোষ করিতে হয় যে, হায়, নিজেকে ভুলিবার এত আয়োজনও যদি ব্যর্থ হইল তবে আর বাঁচা কেন?' (পৃ. ২৩১) ভূপেন লক্ষ করে, মধ্যবিত্ত একান্নবর্তী পরিবারের পরস্পর-নির্ভরশীলতা ও সম্পর্ক মূলত স্বার্থকেন্দ্রী: 'প্রয়োজন যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ মিলিয়া মিশিয়া আনন্দেই সকলে দিন কাটায়!' (পৃ. ২৬০) ভূপেন তার অস্তিত্বের অর্থসন্ধানে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষাশীল: 'চাহিলেই আমাকে পাইবে, এ কথাও হয়তো প্রভার মিথ্যা। সে কোনো দিন চাহিবে না জানিয়াই ও কথা প্রভা বলিতে পারিয়াছে।' (পৃ. ২৬১) সেজন্যে নিজের প্রয়োজনের জন্যে নয়, 'প্রভার মনকে শেষ জানা' জানবার জন্যে ভূপেন যায় প্রভার বাড়িতে। সেখানে প্রভার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই, নিচে থেকেই প্রভার 'উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দে' ভূপেনের জীবনার্থ সন্ধানের রুদ্ধ দরোজাটি খুলে যায়। মনে হয়, প্রভা এত আনন্দময় যেখানে সেখানে সে নিজে হাসতে ভুলে গেছে কেন? মুহূর্তে উপলব্ধ হয়, স্ত্রী-পুত্রের মৃত্যু, প্রেমে ব্যর্থতা তার চেয়ে জীবন অনেক বড়ো। প্রভার সঙ্গে দেখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না হলেও তার জীবন নিয়ে পরীক্ষার উত্তর সে পেয়ে যায়। এই উত্তর প্রথম দৃষ্টিতে আকস্মিক মনে হলেও, এর পটভূমি তৈরি হচ্ছিল আগে থেকেই, ভূপেনের মনের ভিতরে; সুতরাং এ আকস্মিক নয়, যদিও এই জবাবের মধ্যে একটি মোচড় আছে। ভূপেনের প্রাপ্ত জীবনজিজ্ঞাসার জবাব আসলে ত্রিস্তর : ১. 'কাজ আর সংসারের দায়িত্ব' আশ্রয় করে নিজেকে ভোলার চেষ্টা করে ভূপেন, 'এত সহজে নিজেকে ভোলা যায় দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যায়।' (পৃ. ২৬০) তাই তার এই দার্শনিক অভিজ্ঞান অর্জন : 'মূল্য দিলেই জগতের তুচ্ছ অবলম্বনও মূল্যবান হইয়া উঠিতে পারে।' (পৃ. ২৬০) *ধরা-বাঁধা জীবন*ও একটি অস্তিত্ববাদী উপন্যাস। বাঁচার লড়াই এবং শেষে দায়িত্বে আবদ্ধ হয়ে মুক্তি—এ অস্তিত্ববাদী উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়। ২. কিন্তু দায়িত্বে আবদ্ধ হয়েও বাঁচতে হবে নিরাসক্তভাবে। 'কারো সঙ্গে এমন সম্পর্ক গড়িয়া তোলার প্রয়োজন কি, যে সম্পর্ক চুকিয়া গেলে বাঁচিয়া থাকাটাই ভয়াবহ শাস্তিতে পরিণত হয়?' (পৃ. ২৬০) অর্থাৎ ভূপেন সিদ্ধান্ত নেয় : আর-কাউকে (স্ত্রী, পুত্র, প্রেমিকা কিংবা যে-ই হোক) ভালোবাসব না, আর-কারো সঙ্গে তীব্রভাবে গভীরভাবে জড়াব না, কেননা কারো সঙ্গে তীব্রভাবে যুক্ত হওয়ার পর যে-কোনো কারণেই হোক (মৃত্যু, বিচ্ছেদ বা আর কিছু) সম্পর্ক চুকে গেলে বেঁচে থাকা ভয়াবহ একটা শাস্তিতে পরিণত হয়—তার চেয়ে অযুক্ত ও নিরাসক্ত বেঁচে থাকাই ভালো। ৩. এইসবের পথ বেয়েই আসে চূড়ান্ত সমাধান : জীবনে মৃত্যু আছে বিচ্ছেদ আছে ('সরমা আর নন্তর জন্য শোক যদি তার হইয়া থাকে, হোক, প্রভা যদি স্বপ্ন আর কল্পনার জগৎকে মরুভূমি করিয়া দিয়া থাকে, দিক।' (পৃ. ২৬২) কিন্তু জীবন তার চেয়ে বড়ো : 'আরও তো অনেক কিছু আছে জীবনে, সেসব অস্বীকার করিবার কোন কারণ তো নাই।' (পৃ. ২৬২) সেই আরো-বড়ো জীবনেই যুক্ত হয়ে ভূপেন তা সমাধান খুঁজে নেয়।[১৩]

কিন্তু ভূপেন আত্মচেতনশীল হলেও লেখক তাকে মানুষ করে এঁকেছেন—আদর্শায়িতও করেননি, সর্বজ্ঞও করেননি। আদর্শায়িত করেননি—ভূপেন-প্রভার মিলনের পথে ছিল ভিতরের ও বাইরের বাস্তব বাধা। প্রভা একবার ভূপেনকে বলেছিল, 'আগে হলে সব ঠিক হয়ে যেত। আমরা যে বুড়ো হয়ে গেছি।' হয়তো বিশুদ্ধ অনপচয়িত আবেগতীব্র যৌবনে হলে মিলিত হতে পারত ওরা, সেখানে অমন আজ লাভ-লোকসানের হিসাব আর ভালোমন্দের ভয়ভাবনা দেখা দিতে না।—ভূপেনকে লেখক সর্বজ্ঞও করেননি—'তাই তার জানাও ছিল না প্রেম বাড়ে কমে, বাঁচে মরে।[১৪] (পৃ. ২৫৮) ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি প্রেমিক-প্রেমিকার জীবনে আসে প্রেমের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাফল্য বা ব্যর্থতা; বিবাহ, মৃত্যু বা বিচ্ছেদে সমাপ্ত হয়। কিন্তু মানিক দেখালেন প্রেমিক-প্রেমিকা শারীরিকভাবে জীবিত কিন্তু একদা-জাগ্রত প্রেমের মৃত্যু হয়েছে—কোনো বাইরের কারণে নয়, এমনিতেই প্রেম বাড়ে-কমে বাঁচে-মরে। প্রেমের এই বিস্ময়কর জন্ম-মৃত্যুর বিষয়টি মানিকের আবিষ্কার।

ভূপেনের প্রেমের সমস্যা আসলে তার অস্তিত্বেরই সমস্যা। হয়তো প্রভারও তাই। তাই ভূপেনের 'কেবলি মনে হইতেছে, তার দিক ভাবিয়া তো শুধু নয়, নিজেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য প্রভা তাকে মুক্তি দিয়েছে।[১৫] (পৃ. ২৬০) এই আত্মপ্রেম প্রভা ও ভূপেনের তো বটেই, মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই একটি চারিত্রলক্ষণ।

অনিবার্য একটি প্রশ্ন ওঠে: 'ধরা-বাঁধা জীবন' বলতে কী বুঝিয়েছেন মানিক? ভূপেনের জন্যে স্ত্রী-পুত্রের মৃত্যুর পরে অবিবাহিত অপুত্রক জীবনযাপন করাই ধরা-বাঁধা জীবন, না পুনর্বিবাহ করে সংসার-জীবনে প্রবেশ করা? প্রভার জন্যেও কোনটি? আমাদের বিবেচনায়, মানিক স্পষ্টতই বুঝিয়েছেন, বিবাহিত জীবনযাপনই হচ্ছে ধরা-বাঁধা জীবনযাপন। ধরা-বাঁধা ঐ জীবনে প্রবেশ করল না ভূপেন ও প্রভা, দুজনের জীবনেই রইল একটি মুক্তি। ঐ জীবনে প্রবেশ না-করেও তারা রয়ে গেল মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই বৃত্তাবদ্ধ জীবনে, দায়িত্বে ও অভ্যাসে আবদ্ধ হয়ে; হয়তো মদ ও স্ত্রীলোক কোনো দিন ভূপেনের জন্যে আনবে সামান্য বিরূপতামিশ্রিত মুক্তি, হয়তো প্রভার জীবনে ধীরেন-জনিত একটুখানি কলঙ্ক[১৬], আর তারা, ভূপেন ও প্রভা, রইল পরস্পরের জন্যে। হয়তো এক ধরা-বাঁধা জীবনে প্রবেশ না-করে অন্য-এক ধরা-বাঁধা জীবনের অভ্যাসের যান্ত্রিকতার মসৃণ ছন্দেই ওদের জীবন অতিবাহিত হয়ে যাবে।

মানিকের মহত্ত্ব এইখানে যে তার প্রায়-সব উপন্যাসের শেষেই একটি মুক্তির আভাস দ্যোতিত হয়। এই মুক্তি উপন্যাসে আসে বিরাট ও চলিষ্ণু জীবনের প্রতিরূপ হিশেবেই। এক বা একাধিক জীবনের নাটকীয় বিলোড়ন ও উত্থান-পতনের পরে শমশান্তি প্রবহমান বিশাল জীবনের প্রতিভাসই বহন করে আনে। মানিকের অনেক উপন্যাসের শেষেই দেখতে পাই মুক্তি, শান্তি, শম, উত্তরণ।[১৭] মানিক তাঁর উপন্যাসে কখনো মর্বিড নন, কোনো অন্ধকার উপন্যাস তিনি লেখেননি।[১৮] ভূপেনও তার স্ত্রী-পুত্রহীন প্রেমপ্রতিহত জীবনে শেষ-পর্যন্ত উপলব্ধি করে স্ত্রীহীনতা পুত্রহীনতা প্রেমহীনতার পরেও 'আজও তো অনেক কিছু আছে জীবনে।' মানিক এই উপন্যাসে ট্র্যাজেডির জন্যে বেছে নেননি মৃত্যু বা বিচ্ছেদের মতো বিশাল ঘটনা; কিন্তু আমাদের—আধুনিক মানুষের—দৈনন্দিন জীবনেই আছে অকল্পনীয় ট্র্যাজেডি। মানিক নিতান্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামান্য জীবনের মধ্যেই ঐ তাঁর অসামান্য আবিষ্কারটি উপহার দেন আমাদের। যে-ঘরে এই ট্র্যাজেডি চলতে থাকে, উপন্যাসের শেষে এসে দেখতে পাই সেই ঘরের একটি দরোজা খুলে গেল।

তথ্যনির্দেশ

১. একটি প্রবন্ধ থেকে তিনটি উদ্ধৃতি চয়ন করা যাক:

ক) গল্প উপন্যাস পড়ে নাড়া খেতাম গভীরভাবে, গল্প উপন্যাসের জীবন বুঝানোর জন্যে ব্যাকুল হয়ে তল্লাশ করতাম বাস্তব জীবন।

খ) ...ছোট বড় লেখকের বই ও মাসিকের লেখা পড়তে পড়তে এই প্রশ্নটাই ক্রমে ক্রমে আরও স্পষ্ট জোরালো হয়ে উঠতে লাগল যে, সাহিত্যে বাস্তবতা আসে না কেন, সাধারণ মানুষ ঠাঁই পায় না কেন?

গ) শৈশব থেকে সারা বাংলার গ্রামে শহরে ঘুরে যে জীবন দেখেছি, নিজের জীবনের বিরোধ ও সংঘাতের কঠোর চাপে ভাবালুতার আবরণ ছিঁড়ে ছিঁড়ে জীবনের যে কঠোর নগ্ন বাস্তব রূপ দেখেছি—সাহিত্যে কি তা আসবে না? এই বাস্তব জীবন যাদের—সেই সাধারণ বাস্তব মানুষ?

['উপন্যাসের ধারা', *মা. গ্র.* ২]

২. শরৎচন্দ্রের *পল্লীসমাজ* (১৯১৬) উপন্যাসের সঙ্গে মানিকের *ধরা-বাঁধা জীবন*-এর তুলনা করলে বোঝা যাবে মানিক চলে এসেছেন শরৎচন্দ্রের পৃথিবী ছেড়ে আধুনিক পৃথিবীতে। *পল্লীসমাজ*-এ রমা-রমেশের মিলনের অন্তরায় সম্পূর্ণভাবেই সমাজ, *ধরা-বাঁধা জীবন*-এ ভূপেন-প্রভা মিলনের আসল বাধা তারা নিজেরাই—সমাজ পাশ থেকে খানিকটা বাধা দিয়েছে, এইমাত্র।

৩. একটি তুলনা দেওয়া যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের *মালঞ্চ*-এর সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *ধরা-বাঁধা জীবন*-এর। *মালঞ্চ* যেখানে শেষ, *ধরা-বাঁধা জীবন*-এর শুরু সেখান থেকে। আদিত্যপত্নী নীরজার মৃত্যুতে সমাপ্ত হয় *মালঞ্চ*, আর ভূপেনপত্নী সরমার মৃত্যুতে *ধরা-বাঁধা জীবন*-এর সূচনা। শরৎচন্দ্র *পল্লীসমাজ*-এ দেখিয়েছিলেন নায়ক-নায়িকার মিলনে বাধা সমাজ; রবীন্দ্রনাথ *মালঞ্চ*-এ দেখালেন বাধা অন্য আর-একটি ব্যক্তিত্ব; আর মানিক দেখালেন বাধা বাইরের যতখানি তার চেয়ে অনেক বেশি বাধা ও দ্বিধা নায়ক-নায়িকার অন্তরেই। এদিক থেকে মানিক অনেক-বেশি আমাদের সময়ের শিল্পী, অনেক বেশি আধুনিক। *পল্লীসমাজ* যতখানি ট্র্যাজিক,. *ধরা-বাঁধা জীবন* কি তার চেয়ে কম ট্র্যাজিক—যেখানে শুধু জেগে থাকে, মানিকেরই ভাষায়, 'ভোঁতা যন্ত্রণাদায়ক বিষাদ'?

৪. কিন্তু বাস্তবতার সমগ্রতাকে (অন্তর্বাস্তবতা ও বহির্বাস্তবতা) ধারণ করতে গিয়ে কোনো-কোনো আধুনিক ঔপন্যাসিক (যেমন জেমস জয়েস বা ভার্জিনিয়া উলফ কিংবা বাংলার এদের অনুসরণে মানিক-সমকালীন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বা বুদ্ধদেব বসু) যেমন stream of consciousness বা চিৎপ্রবাহ প্রয়োগ করেছেন, মানিক কখনো তা করেননি। অবচেতন বা অবদমনের রূপ যখন দিয়েছেন মানিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখনো তিনি সম্পূর্ণ চেতন শিল্পী। মানিক মনোজগতের বিলোড়ক ঘূর্ণিস্রোতের মধ্যেও দৃঢ় হাতে চৈতন্যের হাল ধরে থাকেন।

৫. শরৎচন্দ্র মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার হলেও, মধ্যবিত্ত জীবনের অর্থনৈতিক চাপ ও টানাপোড়েনের ছবি তাঁর উপন্যাসে আসেনি। হয়তো মধ্যবিত্ত জীবন তখনো ছিল অনেকখানি মসৃণ, নিশ্চিন্ত ও অর্থনৈতিক চাপ-মুক্ত। তাহলেও তথ্য হিশেবে এটি উল্লেখযোগ্য যে শরৎচন্দ্রের মধ্যবিত্ত জীবন রূপায়ণে অর্থনীতি কোনো কাজ করেনি, তাঁর মনোযোগের সমস্ত কেন্দ্র ও বলয় অন্যত্র; এবং পরবর্তী ঔপন্যাসিকেরা মধ্যবিত্ত জীবনের আর্থনীতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কে অনেক-বেশি সচেতন। মানিক সম্পর্কে এ কথা বিশেষভাবে সত্য। এবং মানিক শুধু তার উত্তরপর্বেই নয়, প্রথম পর্বেও অর্থনীতি-যে মানবজীবনকে এবং মনকেও অনেকখানি প্রভাবিত করে তা লক্ষ করেছিলেন।

৬. এই আত্মবৈপরীত্য মানিকের চরিত্র নির্মাণের একটি অপরূপ কৌশল। মানবচরিত্র সম্পর্কে মানিকের নিবিড়-গভীর জ্ঞান ছিল বলেই তিনি জানতেন প্রভার জন্য পাগল ভূপেনের মনে বিপরীত এক বোধ তলায়-তলায় কাজ করে যাচ্ছে। চরিত্রের এই 'আত্মবৈপরীত্য' আর 'অন্তর্দ্বন্দ্ব' এক জিনিশ নয়—অন্তর্দ্বন্দ্বের চেয়ে এ অন্য এক নিগূঢ় জিনিশ। এবং সত্য, বাস্তব।

৭. ভূপেন ও প্রভার উপর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামাজিক-মানসিক প্রচাপ পূর্ণ মাত্রায় কাজ করেছে, তার ভিতরেই তারা এক রকম মুক্তি খুঁজে নিয়েছে। ঐ মধ্যবিত্ত জীবনমুক্ত সদানন্দ বেরিয়ে পড়েছে অচেনায় তার প্রিয়া মাধবীকে নিয়ে (*অহিংসা*); কুবের তো গিয়েছে ময়নাদ্বীপে তার প্রিয়া কপিলাকে নিয়ে (*পদ্মানদীর মাঝি*)—শেষোক্ত উপন্যাসে মধ্য ও উচ্চবিত্ত সমাজকে বিদ্রূপ ও ঘৃণাই হেনেছেন মানিক। 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পটিও প্রসঙ্গত স্মরণীয়—খোঁড়া ভিখু যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করে প্রিয়া পাঁচীকে কাঁধের উপর ফেলে রওনা দেয়। ঠিক ডি. এইচ. লরেন্সের মতো নয়, কিন্তু তার সঙ্গে তুলনাও আসে, মানিক বিশ্বাস করতেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংকীর্ণতামুক্ত আদিম জীবনের প্রাণপ্রাচুর্যে।

৮. প্রায়-সমকালে লেখা *সমুদ্রের স্বাদ* (১৯৪৩)-এর অনেকগুলি গল্পে মধ্যবিত্ত-জীবনের ফাঁপা, ফোঁপরা ও অন্তঃসারশূন্য জীবন রূপায়িত। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'সমুদ্রের স্বাদ', 'আফিম', 'বিবেক', 'ট্রাজেডির পর' ইত্যাদি গল্প।

৯. যেমন, *পুতুলনাচের ইতিকথার* শশী, *দিবারাত্রির কাব্য*-এর হেরম্ব, *চতুষ্কোণ*-এর রাজকুমার, *অহিংসার* সদানন্দ প্রভৃতি।

১০. কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যনায়কও এমনি বয়স্ক, প্রাজ্ঞ, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশ্লেষণশীল, ব্যর্থ, আবেগপ্লাবিত অথচ সংযত। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত *পরিচয়*-এ মানিক *অহিংসা* উপন্যাস ধারাবাহিক লিখেছিলেন, কয়েকটি গল্পও। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ 'উক্তি ও উপলব্ধি' (*কুলায় ও কালপুরুষ*) প্রবন্ধে সমকালীন কয়েকজন কথাসাহিত্যিক (অন্নদাশঙ্কর, ধূর্জটিপ্রসাদ, বুদ্ধদেব) সম্পর্কে মন্তব্য করলেও মানিক সম্পর্কে ছিলেন নিঃশব্দ। আর মানিক তো সমকালীন কবিদের শব্দমদে নিমজ্জন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

('শব্দ-মদের বিরুদ্ধে' : আবদুল মান্নান সৈয়দ। ভূঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*) আদৌ পছন্দ করেননি, বিরুদ্ধতাই করেছিলেন বরং। কিন্তু তবু এই দুই সমকালীন কবি ও ঔপন্যাসিকের নায়কের মধ্যে একটি আশ্চর্য সাযুজ্য লক্ষ করা যায়। 'ভালো কি তবে বেসেছি তারে আমি/ বিজ্ঞ হিয়া শিহরে তাই ডরে?' এই উক্তি হতে পারত শশী, কুবের কি ভূপেনেরও।

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, সুধীন্দ্রনাথ নিঃশব্দ থাকলেও সুধীন্দ্র-বলয়ের ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় *পরিচয়*-এর পৃষ্ঠাতেই প্রথম পূর্ণাঙ্গ স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখেছিলেন মানিক সম্পর্কে ('মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়'। *পরিচয়,* কার্তিক ১৩৪৭)। এবং সুধীন্দ্রনাথ নিঃশব্দ থাকলেও তাঁর সমকালীন কবি বুদ্ধদেব বসু (*মিহি ও মোটা কাহিনী* গ্রন্থের রিভিয়্যু, *চতুরঙ্গ,* পৌষ ১৩৪৫, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', *কবিতা,* পৌষ ১৩৬৩ ও *An Acre of green Grass*), বিষ্ণু দে ('গল্পে উপন্যাসে সাবালক বাংলা'; *পরিচয়,* ১৩৫৪), জীবনানন্দ দাশ ('Bengal Novel Today, *The Hindustan Standard,* 3rd September 1950) মানিক প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন।

১১. বুদ্ধিবাদী ঔপন্যাসিকদের (রবীন্দ্রনাথ, ধূর্জটিপ্রসাদ, অন্নদাশঙ্কর) সঙ্গে মিল থাকা সত্ত্বেও এইখানে মানিক আলাদা হয়ে যান—তাঁর নায়কদের জীবনভাবনার সঙ্গে-সঙ্গে জীবন নিয়েই অবিরল পরীক্ষাশীলতায়, কেবল তা বুদ্ধির স্তরে আবদ্ধ থাকে না, জীবনে বিকীর্ণ হয়।

১২. মৃত্যুর ঝাঁকুনি দিয়ে শুরু হয়েছিল অন্য দুটি অস্তিত্ববাদী উপন্যাস—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পুতুলনাচের ইতিকথা* আর আলবেয়ার কামুর *আউট সাইডার*।

১৩. এই সমাধান রবীন্দ্রধ্বনিত হলেও রাবীন্দ্রিক নয়—এ এসেছে বাস্তবের রূঢ় কঠিন রক্ত পথ ধরেই। পিপাসু কণ্টক ও আচ্ছন্নকারী ধূলি মাড়িয়েই এখানে আসতে হয়েছে।

১৪. *পুতুলনাচের ইতিকথা* উপন্যাসের নায়ক শশীও এই তথ্যটি জানত না, এবং সে ক্ষেত্রেও কুসুমের প্রেম দীর্ঘকাল উপবাসী থেকে মৃত্যুবরণ করেছিল একসময়। কুসুমের সঙ্গে আর কোনো মিল নেই—সেই গ্রাম্য অশিক্ষিতা নারীর সঙ্গে এই শাহরিক সুশিক্ষিতা নারীর। কিন্তু, মনে হয়, কুসুমের মতো প্রভার প্রেমও দীর্ঘদিন ক্ষুধার্ত ও অচরিতার্থ থেকে একসময় তার তারুণ্যশোভন তীব্রতা হারিয়ে ফেলেন।

১৫. এই ভয়াবহ আত্মজ্ঞানেরই অপর পিঠ সুধীন্দ্রনাথকেও জর্জরিত করে: 'জানি অলজ্জিত রাতে, শ্লথনীবি, কম্প্র আত্মদানে, দেয়নি সে মোরে অর্ঘ্য, খুঁজেছিল বসন্ত সখাকে।' ['জিজ্ঞাসা', *অর্কেস্ট্রা*]

১৬. মানিক, কুশলী শিল্পী, ধীরেন-প্রভার সম্পর্কটি ইচ্ছা করেই অস্পষ্ট রেখেছেন।

১৭. *চতুষ্কোণ* বা *অহিংসার* মতো রুদ্ধশ্বাস উপন্যাসেও, দেখা যায়, নায়ক শেষ পর্যন্ত একটি মুক্তির স্বাদ পায়।

১৮. পুরোপুরি অন্ধকার উপন্যাস লিখেছেন মানিকোত্তর মানিক-বিদ্ধ ঔপন্যাসিক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। তমসাচ্ছন্ন বিবরপ্রবেশী গল্প লিখেছেন মানিক: 'সরীসৃপ' (*সরীসৃপ*) কিংবা 'আততায়ী' (*সমুদ্রের স্বাদ*); কিন্তু কোনো উপন্যাস লেখেননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুষ্কোণ

> **নিজের সম্বন্ধে যত কেন জাগিয়াছে, [রাজকুমার] তার সবগুলির জবাব খুঁজিয়াছে যে অভিধানে শুধু সাধারণ চলতি মানে পাওয়া যায়। মুদীর হিসাবে যেন সুখ-দুঃখের হিসাব কষিয়াছে। ভূমিকম্পের কারণ খুঁজিয়াছে মাটির উপরে। আরও যে অনেক উষ্ণ গহন স্তর আছে মাটির নীচে এ যেন সে ভুলিয়াই গিয়াছিল।**
>
> [পৃ. ৩১১, 'চতুষ্কোণ', *মা. গ্ৰ.* ৬]

AMARBOI.COM

১. 'অনেক উষ্ণ গহন স্তর'

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা প্রথম থেকেই চলে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের রেখা ধরে। *চতুষ্কোণ*-এও তাই হয়েছে;—বরং *চতুষ্কোণই* মানিকের শরীর-মনের সন্ধানের দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বোত্তরণের এক চূড়ান্ত নিদর্শন। বাস্তববাদিতা সত্ত্বেও, যৌনতার ব্যবহার সত্ত্বেও মানিক-যে অজনপ্রিয়, তার কারণ, তাঁর লক্ষ্য সব সময় ব্যক্তির এই ভিতরদেশে, মনস্তত্ত্বে, বস্তুবাদিতা বা যৌনতায় তা অবসান মানে না, বস্তুবাদিতা বা যৌনতার আভ্যন্তর এলাকায় চলে যায় সত্যের সন্ধানে।

রাজকুমারের মাথা-ধরায় কাহিনীর সূচনা হয়েছে—সে-মাথা-ধরা অকারণ ও অনির্দেশী। মানিক এত বেশি যুক্তিবাদী ও মনস্তত্ত্বসম্মত যে যুক্তিহীনতাকেও শ্রদ্ধা করেন—এই উপন্যাস শুরু হয়েছে সেই যুক্তিহীন অনির্দেশী মাথা-ধরায়—

> তার চোখ ঠিক আছে, দাঁত ঠিক আছে, ব্লাডপ্রেসার ঠিক আছে, হজমশক্তি ঠিক আছে—শরীরের সমস্ত কলকজাগুলিই মোটামুটি এতখানি ঠিক আছে যে মাঝে মাঝে মাথা ধরার জন্য তাদের কোনটিকেই দায়ী করা যায় না। তবু মাঝে মাঝে মাথা ধরে।[১] [পৃ. ২৩৫]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনঃসমীক্ষণতত্ত্ব বলে যে, মানুষের মন কতগুলি প্রত্যক্ষ, চেতন ও যৌক্তিক ভাবেরই যোগফল নয়, তার ভিতরে অবচেতন ও অচেতনজাত বহু অযৌক্তিক উপাদানও পাওয়া যায়। মানিক-সাহিত্যে অবচেতনজাত ছেঁড়া উড়ো প্রাণের কথকতা পাওয়া যাবে না—যা আমরা দেখতে পাই সুররিয়ালিস্ট সাহিত্যচর্চায়; মানিকের অযৌক্তিকতা শিকল-ছেঁড়া নয়, বহির্বাস্তবতা থেকে অন্তর্বাস্তবতায় যখন তিনি প্রবেশ করেন, প্রায়ই করেন, তখনো তাঁর ভিত্তি শক্ত বাস্তবতায়, ফলে তাঁর অযৌক্তিকতাও যুক্তিগ্রথিত বা বস্তুভিত্তিক। এই দিক থেকেই বাস্তবতা সম্পর্কে তাঁর দাবি ('সাহিত্য করার আগে', *মা. গ্র.* ১২) স্বীকার্য এবং সত্য। এই বাস্তবতার চারিত্র কেবল স্বতন্ত্র : উনবিংশ শতাব্দীর প্রকৃতিপন্থী ও বস্তুরূপপন্থী বাস্তবতা নয়—এ বিংশ শতাব্দীর অন্তর্বাস্তবতা বা মনোবাস্তবতা। এই অর্থে মানিক inner-realist বা মনোবাস্তবতাবাদী শিল্পী।

মানিকের এই উপন্যাসে, এবং অন্য অনেক গল্প-উপন্যাসেও, ঘটনা বা চরিত্রের বর্ণনার সঙ্গে-সঙ্গে মানস-ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বর্ণনাও চলতে থাকে—নিছক ঘটনার বর্ণনা মানিক *চতুষ্কোণ*-এ অন্তত দেননি। বহির্লোক থেকে অন্তর্লোকে যাবার বিষয়টি অনেক সময় পাশাপাশি বাক্যেই সাধিত হয়—রেখাঙ্কিত বাক্যে পাওয়া যাবে মানিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পরিচয় :

> ঘরে গিয়া রাজকুমার রিণির কাছে দাঁড়াইয়া গান শুনিতে লাগিল। বড় কোমল গানের কথাগুলি, বড় মধুর গানের সুরটি। রাজকুমার হয়তো একটু মুগ্ধ হইয়া যাইত, কিন্তু সে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে টের পাইয়াও রিণি টের না পাওয়ার ভান করিয়া আপন মনে গান গাহিয়া চলিতেছে বুঝিতে পারিয়া গানটা আর রাজকুমারের তেমন ভাল লাগিল না। [পৃ. ২৪৯]

রাজকুমার এতই বিশ্লেষণপ্রবণ[২] যে, রিণির ঘর থেকে বেরিয়ে 'রেলিং ধরিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রাজকুমার ভাবিতে থাকে।' এবং তার ভাবনা তথা মনোবিশ্লেষণ চলতে থাকে যতক্ষণ না রিণির গান বন্ধ হয়। একবার যেন কিছুটা ঠাট্টা করেই লেখক বলেছেন, 'ব্যাখ্যা করিতে রাজকুমার চিরদিনই ওস্তাদ।' *চতুষ্কোণ* উপন্যাসে মনের এই প্রকাশ্য ও চোরা নদীর অনেক ঢেউ উঠেছে পড়েছে। যেমন :

> মানুষের মনের এটা কি জটিল রাজনীতির ব্যাপার কে জানে, সারাদিনের অবিরাম বর্ষণ হঠাৎ থামিয়া যাওয়াকে উপলক্ষ করিয়াই এক মুহূর্তে রাজা ভিখারী হইয়া যায়। [পৃ. ২৬৫]

কিংবা

> ....চতুষ্কোণ ঘরের মতোই চতুষ্কোণ টেবিলও মাঝে মাঝে প্রান্তরের বিস্তৃতি পায়, এত দূর মনে হয় একটি প্রান্ত হইতে আরেকটি প্রান্ত! [পৃ. ২৬৯]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজকুমারের মনে দ্বন্দ্ব ও মানসকূট দুই-ই আছে—তবে শেষোক্তটিই প্রধান। এই মানসকূটের ফলেই সে সহজ হতে পারে না, পারিপার্শ্বিক সবার সঙ্গে জটিল সম্পর্ক তৈরি করে ফেলে—বিশেষত তার চার প্রেমিকার সঙ্গে : গিরি, সরসী, রিণি ও মালতীর সঙ্গে। ফলে উপন্যাসের প্রায় প্রথম থেকেই, অর্থাৎ যখন থেকে রাজকুমারের জীবন আমরা জানতে পারি, তখনই—

> যে জটিল সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে ওদের [অর্থাৎ রাজকুমারের প্রেমিকাদের সঙ্গে] তার জট খুলিবে না, কেউ সহজ হইতে পারিবে না। [পৃ. ২৬৬]

'রাজকুমার একটু বেলুনের মত ফুলে উঠেছে', লেখকের এ উক্তি ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যেও লেখক তাকে মানবিক দোষে-গুণে তৈরি করেছেন: মনোরমার উদারতায় (?) রাজকুমারের হাসি পাওয়া (পৃ. ২৭১), মিথ্যা দুর্নামের সংস্পর্শে এসে দিশেহারা হয়ে যাওয়া (পৃ. ২৭৪), শ্যামলের স্বাস্থ্যের জন্য ঈর্ষা (পৃ. ২৭৩), হঠাৎ-আসা ঝোঁক (পৃ. ২৮৬), গভীর একাকিত্বের অনুভূতি (পৃ. ২৯১) : এইসবই তাকে মানুষ হিশেবে দাঁড় করিয়ে দেয়।

রাজকুমারের অনেক রকম মানসকূটের পরিচয় আছে এ উপন্যাসে, তার মধ্যে তীব্রতম হচ্ছে শরীরের গড়নের সঙ্গে মনের সম্পর্ক নির্ধারণের জন্যে নিরাবরণ নারীদেহ দর্শনের ইচ্ছা।

> কালীর হাতে সেলাই করা পাড়ের কাঁথা গায়ে টানিয়া শেষ রাত্রে বড়ই আরাম বোধ হয়। আধ ঘুম আধ জাগরণের সেই যুক্তিহীন নীতিহীন নিষ্পাপ জগতের অবাস্তব অবলম্বনে একটি অপরূপ নিরাবরণ দেহ আলগোছে ভাসিতে থাকে। [পৃ. ২৮৭]

এই যুক্তিহীনতার প্রসঙ্গ এই উপন্যাসে বারেবারেই আছে। আসলে এই যুক্তিহীনতার পিছনে আছে অবচেতন। গিরির হৃৎস্পন্দন পরীক্ষাও, যুক্তি দিয়ে রাজকুমার যতই অন্য রকম বোঝাক, হয়তো মূলত ঐ অবচেতনজাত কামের ঢল—যে-প্রবৃত্তিজাত সত্তা কাজ করেছে রাজকুমারের অবচেতনে তাকে সে বাস্তবমুখী সত্তা এবং নৈতিক সত্তায় অস্বীকার করতে চায়। তেমনি যুক্তিহীন ও আকস্মিক উপন্যাসের শেষদিকে রাজকুমারের এই দিবাস্বপ্ন :

> সমুদ্রের সংকেতে প্রতি বছর রাজকুমারের সালতামামী হয়। দূরের সমুদ্র সহরে তার কাছে আসে। জীবনের কয়েকটা দিন ভরিয়া থাকে ভিজা স্পর্শ, আঁসটে গন্ধ আর বালিয়াড়ির স্বপ্ন। প্রতি মুহূর্তে তার মনে হয়, দীর্ঘকায়া চম্পকবর্ণা এক নারী নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মাঠ বন নদী গ্রাম নগর পার হইয়া আগাইয়া আসিতেছে, শ্রেণীভারে থমথম করিতেছে তার গগনচুম্বী রসটম্বুর দেহে স্তম্ভিত ছন্দের ঢেউ, কটিতটে সৃষ্টি হইয়াছে নূতন দিগন্তের বঙ্কিম রেখা, মুখ ফিরিয়া খেলা করিতেছে নিশ্বাসে আলোড়িত মেঘ। মনে হয়, আসিতেছে। [পৃ. ৩৪৫]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার এক-ধরনের বিমর্ষতাবোধের শিকার সে; সে সর্বক্ষণ চিন্তাগ্রস্ত, গম্ভীর, বিমর্ষ :

> পুবের দেয়াল ঘেঁষিয়া দুটি বই-ভরা আলমারি অযথা গাম্ভীর্যের ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া আছে, রাজকুমারের মনের গাম্ভীর্যের রূপধরা ব্যঙ্গের মত। [পৃ. ২৬৭]

মানিকের অনেক নায়কের মতোই রাজকুমারও গভীরভাবে একাকী[৩]; ব্যক্তিগত, সামাজিক ও দার্শনিক বহু প্রশ্ন তার থাকলেও সে ঠিক সম্পর্ক তৈরি করতে পারে না।

> আবেগ আর অভিমানে সায় দেওয়ার তোষামোদ জানে না বলিয়া আত্মীয় বন্ধু অনেকের কাছেই সে পছন্দসই লোক নয়। দশজনের সঙ্গে খাপ খাইয়া চলার প্রধান মন্ত্রটিই সে বাতিল করিয়া দেয়। ভাবিতে ভাবিতে গভীর একাকিত্বের অনুভূতি তাকে বিষণ্ন করিয়া দেয়। [পৃ. ২৯১]

ব্যক্তিগতভাবে রাজকুমার অন্তর্বৃত মানুষ : 'নিজের মধ্যে নিজেকে নিয়া মসগুল।' (পৃ. ২১৭) সে অনেকখানিই বাঁচে মনের জগতে; তাই যখন

> বাহিরে কড়া রোদ, ঘরে উজ্জ্বল আলো, রাজকুমারের মনে যেন সন্ধ্যায় ছায়া, অমাবস্যা রাত্রির ছদ্মবেশী আগামী অন্ধকার। [পৃ. ৩৩৬]

এই উপন্যাসের প্রধান বিষয় রাজকুমারের এই আত্মসমীক্ষা। এই আত্মসমীক্ষার ফলেই তার এই অসাধারণ আত্মোপলব্ধি :

> অভিধান নিরর্থক। শব্দের মানে তারাই ঠিক করে, যে বলে আর যে শোনে। [পৃ. ২৭৮]

এইভাবেই সে অভিধানের সীমাবদ্ধতা জেনেছে, সন্ধান পেয়েছে মাটির নিচেকার অনেক উষ্ণ গহন স্তরের; অর্থাৎ সরাসরি জীবনে প্রবেশ করেছে—অভিধান ও ব্যাকরণের বাইরে যে-জীবন। এবং এই অন্তর্যাত্রাতেই একসময় ঘটেছে তার অবচেতন মনের শুদ্ধিকরণ ও রূপান্তর।

রাজকুমার ও তার প্রেমিকাদের সম্পর্কেও প্রচলিত প্রেম-উপাখ্যানের ছায়া নেই এ উপন্যাসে, বরং তাদের সম্পর্কের মধ্যে অনেক রকম আলোছায়ার বিন্যাস ও অবিন্যাস। এর ফলেই *চতুষ্কোণ* কল্লোলের বিখ্যাত সব প্রেম ও যৌন আখ্যানের চেয়ে স্বতন্ত্র হয়ে গেছে : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের (১৯০৩-৭৬) *বেদে* (১৯২৮), প্রবোধকুমার সান্যালের (১৯০৭-৮৩) *প্রিয় বান্ধবী* (১৯৩৩), বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-৭৪) *তিথিডোর* (১৯৪৯)-এর রোমান্টিক পৃথিবী থেকে আলাদা। রোজালিন্ড মাইল্‌স্‌ বিশ্বসাহিত্যের নারী-পুরুষের চরিত্রবিশ্লেষী যে নকশা তৈরি করেছিলেন[৪]—তার অনেকখানি *চতুষ্কোণ* উপন্যাসের নারী-পুরুষের সম্পর্কেও মেলে। অন্তর্দৃষ্টিতে সম্পর্ক নির্ধারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(উপন্যাসের শেষে সরসী যেখানে রিণির জন্যে রাজকুমারের সঙ্গের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছে); সামাজিক দৃষ্টি (কালী, মনোরমা ও সরসী); সমর্পণ (সরসী)/প্রত্যাখ্যান (গিরি); লিপ্ততা (রিণি, সরসী ও মালতী, এবং কালী, এমনকি মনোরমা)—নারীচরিত্রের এই কটি দিক। এদিকে রাজকুমারের মধ্যে পুরুষসুলভ পাশবিকতা (ক্ষীণ পরিমাণে হলেও); আগ্রাসন (গিরি ও কালীর হৃৎস্পন্দন পরীক্ষা, রিণিকে নগ্ন দেখার প্রস্তাব); বুদ্ধি (প্রায় সর্বত্রই; অন্যদের সম্বন্ধে তার ধারণা : 'অল্পবুদ্ধি অগভীর নরনারী', পৃ. ২৫৯); নৈর্ব্যক্তিকতা (প্রায় সর্বত্রই—এতগুলি নারীর সঙ্গে মেলামেশা করেও প্রায় কারো সঙ্গেই রাজকুমার গভীরভাবে লিপ্ত হয় না, বইয়ের শেষে রিণির সঙ্গে তার যে-সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাও যত না প্রেমে ততোধিক প্রয়োজনে-দায়িত্বশীলতায়); সততা (রাজকুমার প্রথমাবধি সৎ, ঐ সততাই তাকে অন্তিম দায়িত্বশীলতায় আবদ্ধ নয় উত্তীর্ণ করে)। মনস্তত্ত্বে জোর শুধু রাজকুমারের ক্ষেত্রে নয়, অন্যদের বেলাতেও ঘটেছে। একটি উদাহরণ : রাজকুমার যখন তার 'সৃষ্টিছাড়া' খেয়ালে শরীরের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ নির্ধারণের জন্যে তার 'ব্যগ্র উৎসুক চাহনি' মেয়েদের 'সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত' করে দেয় তখন রিণি, সরসী, মালতী এবং কালী, এমনকি মনোরমার প্রতিক্রিয়া (অর্থাৎ ভাবনা) আলাদা-আলাদাভাবে লেখক আমাদের জানিয়ে দেন। (পৃ. ২৮০-২৮২) এ প্রসঙ্গে আবু সয়ীদ আইয়ুবের উক্তির সঙ্গে (*চতুষ্কোণ*-এর আলোচনাসূত্রে) আমরা একমত :

> জানি না আধুনিক মনোবিকলনতত্ত্ব সম্বন্ধে মানিকবাবু কতোদূর অভিজ্ঞ। যদি তিনি অভিজ্ঞ না-হন, তাহলে তাঁর সহজাত গভীর অন্তর্দৃষ্টি আমাদের অবাক করে। যদি হন, তবে তাঁর লেখায় পাণ্ডিত্যের সংযম ও নিরাড়ম্বর পশ্চাদপসরণ প্রকৃত শিল্পীরই যোগ্য।
>
> ['সাহিত্যে যৌনপ্রসঙ্গ ও বর্তমান সমাজ',
> *পথের শেষ কোথায়* : আবু সয়ীদ আইয়ুব]

এই মনোবিকলনতত্ত্ব এবং যৌনতার সূত্রে পূর্ববর্তী একজন লেখকের সঙ্গে মানিকের গভীর সাযুজ্য আছে—তিনি ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা এই সম্পর্কটি পরীক্ষা করে দেখব।

২. দুই কাননের পাখি : মানিক ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : দুই সুদূর ঝরনার নাম, কত মাইল-মাইল ব্যবধানে এই দুটি ঝরনা মিশেছে আমাদের প্রাণধারায়। জীবনে ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্যে কোনো মিলই নেই তাঁদের। একজন প্রভাবে প্রতিপত্তিতে, আর্থিক ও সামাজিক সাফল্যে চূড়ায় উঠেছিলেন, অসাধারণ ভারসাম্যময়, বহুকর্মী এবং দীর্ঘজীবী; আর-একজন প্রায় সব দিক থেকে অসফল, উপন্যাসের পর উপন্যাসের ভিতর দিয়ে ছুটে গেছেন নিশিতে-পাওয়া মানুষের মতো, তিরিশ বছর বয়সের আগেই ছিঁড়ে গেছে মানসিক জ্যা, যেতে হয়েছে এমনকি মানসিক আরোগ্যভবনে, এবং শেষ-পর্যন্ত অকালমৃত্যু। রচনায় চরম ব্যক্তিবাদী হয়েও রবীন্দ্রনাথের সামাজিক ভূমিকা ও পরিপার্শ্বজ্ঞান কখনো স্খলিত হয়ে যায়নি; আর জীবনের সামাজিক দায়িত্বকে পরিপূর্ণ স্বীকার করেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের তীব্রতায় ক্রমাগত হয়ে উঠেছেন একাকী।[৫] (তাঁর ডায়েরি ও চিঠিপত্রেই দেখি সমস্ত পরিপার্শ্বকে আঘাত করে চলেছেন তিনি।—*অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*।) রবীন্দ্রনাথ ও মানিকের বৈযুজ্য বোধহয় আরো বিশাল; একজনের সাহিত্যের মূল ক্ষেত্র বোধহয় কবিতা, আর-একজনের অবশ্য উপন্যাস। টমাস মান-কথিত এবং বুদ্ধদেব বসু-সমর্থিত 'দেবতা' ও 'সন্তে'র দুই অমোঘ উদাহরণ—কিন্তু সেখানেও তাঁদের সাহিত্যচর্চার কেন্দ্রীয় জমি যেহেতু আলাদা, তাই পাশাপাশি এই দুটি নাম কখনো আসে না।

একেবারেই কি আসে না? না, আসে, এবং এজন্যেই তা এত উত্তেজক ও উদ্বোধক। দুই ভিন্ন কাননের পাখি হলেও ওঁরা দুজন এক রজনীতে একটি তরুশাখায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, দুজনের মধ্যে কোনো মিল নেই বলেই রাখি বেঁধেছিলেন একদিন।

হ্যাঁ, কোনো মিল নেই বলা যাচ্ছে না আর। এই দুজন একেবারে বিপরীত স্বভাব ও চরিত্রের ব্যক্তিও এক-জায়গায় মিলেছিলেন। দুজনই তাঁরা বাংলা উপন্যাসের চর্চা করেছিলেন এবং উপন্যাসচর্চার ক্ষেত্রেরই কোনো-কোনো আলপথে দেখা হয়েছিল দুজনের।

প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রোত্তর কবিতা বলতে আমরা বুঝি তিরিশের কবিতা, কেননা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) বা এমনকি নজরুল ইসলামও (১৮৯৯-১৯৭৬) রবীন্দ্রনাথকে সর্বাংশে অতিক্রম করতে পারেননি। কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর কথাসাহিত্য? ব্যাপারটা বোধহয় অমন সরল নয়। কেননা, রবীন্দ্রনাথের আয়ুষ্কাল ও সৃষ্টিকাল দীর্ঘ এবং বিচিত্র—যেমন কবিতায়, তেমনি উপন্যাসেও। উপন্যাসে তিনি বিহার করেন বঙ্কিমচন্দ্র থেকে বুদ্ধদেব পর্যন্ত।[৬] রবীন্দ্রোত্তর কথাসাহিত্যের প্রথম পুরুষ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)। অন্তত উত্তররৈবিক নতুন কথাসাহিত্যের জনকপুরুষ হিশেবেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব বিরাট—আমাদের নব্যশিক্ষিতের ফ্যাশন-তাড়নায় তিনি যত সহজে খারিজ হয়ে যান, ইতিহাস তাঁকে তার চেয়ে বড়ো মূল্যে অধিষ্ঠিত করে। কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পরে শরৎচন্দ্র নিশ্চিতভাবে অন্য জগতের কথা অন্য সুরে বলেছিলেন।

তিরিশের উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব মূলত তিনটি ধারায় প্রবাহিত হয়: ১. কবিত্বময় বা কাব্যধর্মী উপন্যাসের ধারা: প্রধানত *শেষের কবিতা* (১৯২৯) থেকে উৎসৃত। বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ এই ধারা থেকে অনেকখানি পরিগ্রহণ করেছেন।[৭] ২. বুদ্ধিপ্রধান উপন্যাসের ধারা: মূলত *গোরা* (১৯১০) থেকে সৃষ্ট। অন্নদাশঙ্কর রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ এই ধারার অনুসারী। ৩. মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের ধারা: *চোখের বালি* (১৯০২), *চতুরঙ্গ* (১৯১৬), *দুই বোন* (১৯৩৩), *মালঞ্চ* (১৯৩৩)[৮] প্রভৃতি ধারাবাহিকতায় রচিত; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধারার সাধক।[৯]

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই যদিও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান তিনটি উপন্যাস (*দিবারাত্রির কাব্য*, ১৯৩৫; *পুতুলনাচের ইতিকথা*, ১৯৩৬; *পদ্মানদীর মাঝি*, ১৯৩৬) প্রকাশিত হয়েছিল, এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালীন সাহিত্য সম্পর্কে সব সময়ই মন্তব্য করে যাচ্ছিলেন[১০] তবু মনে হয় যে-কোনো কারণেই হোক, মানিকের উপন্যাসগুলি রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়েনি; পড়লে, তিনি নিঃশব্দ থাকতে পারতেন না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কোনো মন্তব্য না পাওয়া গেলেও, মানিকের পূর্বসূরি-যাঁকে ধরা হয় সেই জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ।[১১] জগদীশ গুপ্তের ক্ষমতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নিঃসংশয়, কিন্তু তিনি যা প্রতিবাদ্য মনে করেছেন সে-সম্পর্কেও নিশ্চুপ থাকেননি, বরং বলেছেন কিছুটা রূঢ় ভঙ্গিতেই। রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল বাস্তবের ব্যবহার নিয়ে—জীবনের অতলশায়ী ট্র্যাজিক পরিণতি নিয়ে নয়। এই কথাটি বিস্তারযোগ্য। আবু সয়ীদ আইয়ুব ঠিকই বলেছেন যে, রবীন্দ্রকাব্যে আনুপূর্ব পাপ ও অমঙ্গলবোধ, পুণ্য ও কল্যাণচিন্তার সঙ্গে-সঙ্গেই জাগ্রত ও প্রবহমান ছিল; প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রকাব্য থেকে পাপ ও মঙ্গলবোধক উদাহরণ উৎকলন করে আবু সয়ীদ আইয়ুব দেখিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সম্পূর্ণ মানুষ—পাপ-ও-অমঙ্গল-চেতন কিন্তু আরো বেশি ক্ষেমংকরবোধ-সম্পন্ন। (*আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ*: আবু সয়ীদ আইয়ুব)। আবু সয়ীদ আইয়ুব রবীন্দ্রনাথের গদ্যপ্রসঙ্গ তোলেননি; সেখান থেকে উদাহরণ ও প্রমাণ দেওয়া আরো সহজ হতো। গদ্যে-পদ্যে যে-সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথ, জীবনের নির্মমতা, অহৃদয়তা ও ট্র্যাজিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিণতি সম্পর্কে তাঁর বোধ সতত জাগ্রত ছিল। কবিতা যেহেতু অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা, চিন্তা ও সংবেদনের প্রতিরূপ, অতএব, তাকে নির্বস্তুক বা আপাতনির্বস্তুক হলে চলে; কিন্তু গদ্য বস্তুসম্মত বলেই অব্যবহিত জীবন সেখানে স্পষ্ট ফোটে। তাই রবীন্দ্রনাথ লেখেন *নষ্টনীড়* ও *মালঞ্চ*-এর মতো 'দারুণ-পরিণাম' (শব্দটি রবীন্দ্রনাথের, ট্র্যাজিক অর্থে) রচনা, *চোখের বালির* মতো ব্যক্তি-টানাপোড়েনের চূড়ান্ত উপন্যাস, *চতুরঙ্গ, মালঞ্চ* ও *দুই বোন*-এর মতো যৌনতাকেন্দ্রী কাহিনী।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসেও ক্রমাগত ব্যবহৃত হয় নর-নারীর মনস্তত্ত্ব, অপ্রতিরোধ্য যৌনতা ও নির্মম পরিণাম। জীবনের সেই দুর্জ্ঞেয়তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান কয়েকটি উপন্যাসে (*দিবারাত্রির কাব্য, পুতুলনাচের ইতিকথা, পদ্মানদীর মাঝি, অহিংসা, চতুষ্কোণ* প্রভৃতি) উপস্থিত, রবীন্দ্রনাথ যার দেখা পেয়েছিলেন অন্তত একবার—*চতুরঙ্গ* উপন্যাসে। হয়তো *চতুরঙ্গের* কোনো-কোনো মুহূর্তের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায় *দিবারাত্রির কাব্য* বা *অহিংসা* বা *চতুষ্কোণ*-এর কোনো-কোনো মুহূর্তকে। *নষ্টনীড়* থেকে *সরীসৃপ*-এর দূরত্বও সম্ভবত একটি ধাপের। একজন সাম্প্রতিক সমালোচক সুন্দর দেখিয়েছেন এই দুর্জনের অন্য-একটি বহিঃসাদৃশ্য—রবীন্দ্রনাথের পদ্মানদীকেন্দ্রিক গল্পগুচ্ছের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীকেন্দ্রিক দুটি উপন্যাসের (*পদ্মানদীর মাঝি* ও *মাঝির ছেলে*)।[১২] বৈপরীত্যগুলিও পরিষ্কার: এই পরিচ্ছেদের সূচনায় কিছু আভাস আছে; আরো: কবি রবীন্দ্রনাথ একদিন যে-উপন্যাসে নিজেকে অবারিত করে দিয়েছিলেন, *শেষের কবিতায়*, যা তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে রচিত; আর গদ্যলেখক মানিক তাঁর প্রথম পর্যায়ের উপন্যাস *দিবারাত্রির কাব্য* (১৯৩৫)-তেই কবিতার সমস্ত চাপ, তাপ ও দায়ভার চুকিয়ে-মিটিয়ে দিয়েছিলেন। আবার, সত্য ও বাস্তবতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও মানিকের ধারণা ছিল একেবারেই উল্টো।[১৩] যে-রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মানিকের অনেকগুলি গোপন ও তাৎপর্যময় সাদৃশ্য ছিল, সেই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মানিক লিখেছেন:

> রবীন্দ্রসাহিত্যও পড়তাম, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাস পড়েও আমার মনে কোনো প্রশ্ন বা নালিশ জাগতো না। কবি বলে রবীন্দ্রনাথকে আমি সত্যই রেহাই দিয়েছিলাম।...বাংলা সাহিত্যে বস্তুবাদের আবির্ভাবকে সাহায্য করার দায়িত্ব থেকে আজ আমি তাঁকে রেহাই দিই। কেন দিই, সেটা এ প্রবন্ধে বলা সম্ভব নয়।
>
> ['সাহিত্য করার আগে', *মা. গ্র.* ১২]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন নয়, জানি না। তবে পরেও মানিক এ প্রসঙ্গে আর কোনো দিন কিছু বলেননি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাযুজ্য বিষয়ে অতিসচেতন মানিকও খুব অবহিত ছিলেন বলে মনে হয় না, কিংবা তাঁর প্রিয় শরৎচন্দ্রের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথকে তিনি পরিপাক করে নিয়েছিলেন। আর, এই তথ্য মনে রাখতে চাই যে, রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে মানিকের ঐ অভিযোগও তাঁর প্রথম জীবনের নয়—উত্তরকালের।

এই দুটি দুই জাতের পাখি—পরস্পরের অজ্ঞাতে—কেবল একটি অমারাত্রি একই গাছের ডালে কাটায়। তারপর উড়ে যায় যে যার কাননে।

রবীন্দ্রনাথ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই সাযুজ্যের মুহূর্তসূত্রগুলি এরকম :

ক) মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণপ্রবণতা;

খ) যৌনতা;

গ) নির্মম পরিণাম;

ঘ) ব্যক্তিকেন্দ্রিক হলেও সমাজ সম্পর্কে সচেতনতা;

ঙ) অনেক সময় এক-একটি পরিবারকে একক হিসাবে ব্যবহার করা—পারিবারিক অন্তর্বিরোধ;

চ) পদ্মাপারের মানুষদের নিয়ে রচনা;

ছ) উপন্যাসের বিষয়ে এবং আঙ্গিকে নতুন-নতুন পৃথিবী নির্মাণ।

মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণপ্রবণতা ও যৌনতার ব্যবহার এই দুই কথাশিল্পীর প্রধান মিলনসূত্র;—এবং এ দুটিই প্রচুর পরিমাণে আছে *চতুষ্কোণ* উপন্যাসে।

AMARBOI.COM

৩. নামায়ন

সরল ও তির্যক—দুরকমভাবেই মানিক তাঁর উপন্যাসের নামকরণ করতেন;—আমাদের দৃষ্টিতে সরল ও তির্যক। (মানিকের দৃষ্টিতে তা হয়তো ছিল একার্থবাচকই—সমস্তই সরল বা সমস্তই তির্যক, মানিকের বিশেষ নিজস্ব যে-দৃষ্টিতে উপন্যাস লেখা হতো, নামকরণও হতো সেই দৃষ্টিতেই।) সরল—*জননী*, *পদ্মানদীর মাঝি*, *চিন্তামণি*, *প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান*, *শান্তিলতা* ইত্যাদি; তির্যক—*পুতুলনাচের ইতিকথা*, *অহিংসা*, *চিহ্ন* ইত্যাদি। *চতুষ্কোণ*ও শেষোক্ত পর্যায়েরই।

উপন্যাস আরম্ভ হয়েছে রাজকুমারের মাথা-ধরার যন্ত্রণায়, এবং একটু পরেই তার ঘরের বর্ণনায়। ঘরটির একটি অনুপুঙ্খ বর্ণনা আছে। এই চারকোনা ঘরটির জন্যেই কি উপন্যাসের নাম চতুষ্কোণ? ঐ চারকোনা ঘরটিও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি প্রতীক, রুদ্ধশ্বাস সমাজের ও জীবনের? নাকি রাজকুমারের চার প্রেমিকার জন্যেই এরকম নামকরণ—গিরি, মালতী, রিণি আর সরসীর জন্যে?

শেষ প্রশ্ন থেকেই এগোনো যাক।—১৯৪০-৪২-এর ছোটো একটি নোটবই-এর উল্লেখ আছে *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* গ্রন্থে। তাতে *চতুষ্কোণ* উপন্যাস সম্পর্কে লেখকের একটুখানি নোট এরকম :

> চারটি মেয়ে—
> ১. শিক্ষিতা আধুনিক
> ২. সেকেলে ধরনের ঘরে শিক্ষিতা
> ৩. অশিক্ষিতা
> ৪. স্বাভাবিক
>
> [পৃ. ২৬২, *অ. মা. ব.*]

চতুষ্কোণ উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪২ সালে। উপন্যাসে নারীচরিত্রের ঐ প্রাথমিক পরিকল্পনা মোটামুটিভাবে পালিত হয়েছে।[১৪] এরকমভাবে :

১. শিক্ষিতা আধুনিক—রিণি
২. সেকেলে ধরনের ঘরে শিক্ষিতা—মালতী
৩. অশিক্ষিতা—গিরি
৪. স্বাভাবিক—সরসী

চতুষ্কোণ এই রিণি-মালতী-গিরি-সরসীর উপাখ্যান—রাজকুমারকে ঘিরে। এদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ যৌন আকর্ষণ-বিকর্ষণে আবর্তিত হয়েছে রাজকুমার। কিন্তু প্রথমত এই চারজন লেখকের মূল পরিকল্পনায় এবং উপন্যাসের প্রথমাংশে থাকলেও মূলত কি আছে এরাই চারজন? গিরিকে তো একবারের বেশি উপন্যাসে উপস্থিত হতেই দেখা যায়নি; এবং কালী, এমনকি মনোরমারও সঙ্গে, রাজকুমারের যে-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাতে উপন্যাসটিকে আর চার নায়িকা-কেন্দ্রী বলা চলে না। এবং ফলত 'চতুষ্কোণ' নামকরণ ঐ চারটি নারীর কারণে রাখা হয়েছে বলা চলে না (মানিকের প্রাথমিক পরিকল্পনা-ভিত্তিক নামকরণ ওরকম হলেও)।

বরং অনেক বেশি গ্রাহ্য মনে হয় আবু সয়ীদ আইয়ুবের ভাষ্য :

> বইয়ের "চতুষ্কোণ" নামটিতে বোঝায় সেই শেলফে-আলমারিতে-টেবিলে-চেয়ারে এবং রাজকুমারের ভাবনায়-দুর্ভাবনায় স্বপ্নের বিকারে দিবাস্বপ্নের জঞ্জালে ঠাসা ছোটো ঘরটিকে। কিন্তু "চতুষ্কোণ" বলতে আরও-কিছু বোঝায়। নামকরণে ইঙ্গিত রয়েছে সমাজের সেই সংকীর্ণ কক্ষটির দিকে যা উত্তেজনার উপকরণ-বাহুল্যে ঠাসা, সেখানে বিরাট পৃথিবী ও বৃহৎ সমাজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলো-বাতাস পৌঁছায় না, যার বাসিন্দাদের প্রচুর অবসর শুধু নিরানন্দ আমাদের পিছনে ধাবমান এবং বিক্ষুব্ধ। উপন্যাসের নায়ক রাজকুমার যখন এক চতুষ্কোণে ব'সে-ব'সে বই পড়ে, আর শুয়ে-শুয়ে হাজারো এলোমেলো ভাবনা ভেবে হাঁপিয়ে ওঠে, তখন সে বেরিয়ে যায় অন্য চতুষ্কোণটিতে।

['সাহিত্যে যৌন প্রসঙ্গ ও বর্তমান সমাজ', *পথের শেষ কোথায়*: আবু সয়ীদ আইয়ুব]

ঐ দুই, ব্যক্তিগত চতুষ্কোণ আর সামাজিক চতুষ্কোণ, মিলে রাজকুমারের পৃথিবী। উপন্যাসের নামায়নে ঐ চতুষ্কোণ হয়ে ওঠে ব্যক্তিক-সামাজিক প্রতীক। শুধু এই উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে আবু সয়ীদ আইয়ুব যা বলেননি, এবং যে-উক্তি জরুরি, তা হচ্ছে এই যে, শেষ-পর্যন্ত ঐ চতুষ্কোণ থেকে রাজকুমারের নিষ্ক্রমণ ঘটেছিল। এবং ঐ নিষ্ক্রান্তি রাজকুমারকে যেমন তেমনি উপন্যাসটিকে বৃহৎ জীবনে মুক্তি দিয়েছিল।

৪. যৌনতা

চতুষ্কোণ খুব স্পষ্টভাবেই যৌনচেতন উপন্যাস। এ গ্রন্থে প্রথমাবধি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, চেতন ও অবচেতন যৌনতার ব্যবহার আছে।

উপন্যাসের প্রথম দিনই যৌনতার ব্যবহার উপর্যুপরি, কিন্তু একটি আর-একটির অনুরূপ নয়—বিভিন্ন :

ক) রাজকুমারের যৌন-অভিযানের (এবং 'ভাবনা-অভিযানে'রও) সূচনা হয়েছে 'অবচেতনভাবে'। 'ডুরে শাড়ীর নীচে যেখানে গিরির দুর্বল হার্ট স্পন্দিত হইতেছিল, সেখানে হাত রাখিয়া রাজকুমার স্পন্দন অনুভব করার চেষ্টা করিতে লাগিল। গিরির মুখের বাদামী রঙ প্রথমে হইয়া গেল পাঁশুটে, তারপর হইয়া গেল কালোটে। একে আজ গায়ে তার সেমিজ নাই, তারপর চারিদিকে নাই মানুষ। কি সর্বনাশ!' গিরি ও তার মায়ের ক্রুদ্ধ-ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া রাজকুমারকে বিপরীতভাবে যৌন-সচেতন করে তোলে।

খ) বাড়িতে ফিরে এসে তার ভাড়াটে ও দূর-সম্পর্কের দিদি মনোরমার সঙ্গে তার ব্যবহার ঈষৎ সতর্ক। কিন্তু তারপরও 'মনোরমার স্তন হইতে খোকার হাত দুটি ছাড়াইয়া দিবার চেষ্টা তাকে করিতে হইল।...খোকার কচি হাত আর মনোরমার কোমল স্তনের স্পর্শ যেন অবিস্মরণীয় সুগন্ধি অনুভূতিতে ভরা তেজস্কর রসায়নের মত তার মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করিতে লাগিল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ) ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির প্রতি মুহূর্তের দ্বৈরথের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যান মানিক। একই দিনে তৃতীয়বার তার 'যৌন-অভিজ্ঞতা' ঘটে রিণির সঙ্গে। স্তব্ধগীতি রিণির 'চোখ ও মুখের আহ্বান' স্পষ্ট হলেও তাতে সাড়া দেয়নি রাজকুমার। এদিকে রাজকুমারের প্রত্যাখ্যান রিণিকে ক্ষুব্ধ ও ব্যঙ্গপ্রবণ করে তোলে।

তারপর রাজকুমারের একের পর এক যৌন-পরীক্ষা ও যৌন-চেতন অভিজ্ঞতা: কালীকে এক হাতে বেষ্টন করে ধরে তার হৃৎস্পন্দন পরীক্ষা; শরীরের সঙ্গে মনের সম্পর্ক নির্ধারণ করতে গিয়ে পরিচিত-অপরিচিত মেয়েদের 'সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত' তার ব্যগ্র ও উৎসুক দৃষ্টি; সরসীর নগ্নতা দর্শন—ইত্যাদি। শুধু রাজকুমার নয়, রাজকুমারকে ঘিরে রিণি, মালতী ও সরসীর, এবং কালীর, এমনকি পরোক্ষভাবে মনোরমারও, নানারকম যৌন অভীপ্সার প্রকাশ।

এই যৌনতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রয়ে গেছে চিন্তার স্তরে, সেজন্যেই ঘটেছে তার নানারকম চেতন-অবচেতন প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ জটিল-কুটিল প্রকাশ। (এই রচনার সর্বত্র তার বহু উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।) লক্ষণীয় যে, যৌনতা যখন চিন্তা বা বুদ্ধির স্তরে তখনই তার নানারকম জটিলতা; কিন্তু সরাসরি যখন যৌন-সংস্পর্শ ঘটেছে তখন রাজকুমারের উপর তার প্রতিক্রিয়া হয়েছে উদ্দীপক ও জীবনসঞ্চারী:

১. খোকার কচি হাত আর মনোরমার কোমল স্তনের স্পর্শ যেন অবিস্মরণীয় সুগন্ধি অনুভূতিতে ভরা তেজস্কর রসায়নের মত তার মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করিতে লাগিল। [পৃ. ২৪৪]

২. [সরসীকে নগ্ন দেখবার পর] অনির্বচনীয় আনন্দে রাজকুমারের চিত্ত ভরিয়া যায়, নিরবসন্ন সক্রিয় শান্তির মত এক অপূর্ব অনুভূতি জাগে। [পৃ. ৩১৩]

৩. [সরসীকে নগ্ন দেখবার পর] দূর হইতে দিনের পর দিন শুধু চাহিয়া দেখিতে দেখিতে হঠাৎ একদিন ধনীর দুলালের খেলনাটি বস্তি-বাসী শিশুর হাতে আসিলে সে যেমন আনন্দে পাগল হইয়া ভাবে, জীবনে তার পাওয়ার আর কিছুই বাকি নাই, আর্য শান্তি আহরণের সৌভাগ্যে বিপরীত আনন্দের উন্মাদনায় রাজকুমারেরও তেমনি মনে হইতে থাকে, এবারে সে তৃপ্তি পাইয়াছে, সম্মুখে তার পরিতৃপ্ত জীবন। [পৃ. ৩১৫]

৪. .... হারানো গোধূলির নিষ্প্রভ দিগন্তে সোনার থালার মত নতুন চাঁদকে উঠিতে দেখিয়া শিশু যেভাবে চাহিয়া থাকে তেমনি [রাজকুমার] মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখিতে থাকে মালতীকে।...দেহে মনে আবার সে সেদিনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মত [সরসীকে যেদিন নগ্ন দেখেছিল] নবজীবনের, মহৎ আনন্দের সঞ্চার অনুভব করে। [পৃ. ৩৩২]

এমনিভাবে রাজকুমার তার যৌনভাবনায় নয় যৌনসংস্পর্শে জীবনের পক্ষে দরোজা ধরে থাকে। তার শেষ পরিণতি-যে জীবনেরই দিকে, আবদ্ধ যৌনতায় নয় যৌনতার মুক্তিতে, ঐসবের ভিতরে রয়েছে তার পূর্বসূচনা। বুদ্ধির প্রচুর ব্যবহার সত্ত্বেও মানিকও বুদ্ধিবাদী নন, খণ্ডিত নন, জীবনবাদী, পরিপূর্ণ শিল্পী।

মানিকের শিল্পসফলতার এক প্রধান কারণ তিনি আত্মসম্পূর্ণ জগৎপরিধি নির্মাণ করতে সক্ষম। *চতুষ্কোণ* উপন্যাসেও এই আত্মসম্পূর্ণ জগৎপরিধি নির্মিত হয়েছে। ফলে যে-উপন্যাসের বিষয়ে যৌনতা, তার উপমা-উৎপ্রেক্ষাতেও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে সেই আবহ :

১. মাঝে মাঝে বাতাসে হঠাৎ যে শীতের আমেজ পাওয়া যায় এখনো তা ভিজা ভিজা মনে হয়, কান্নার শেষে তোয়ালে দিয়া মুছিয়া নেওয়ার পর মালতীর গায়ের শীতল স্পর্শের মত। [পৃ. ২৭৮]
২. কালীর দেহে যৌবনের বিকাশ যেমন এতটুকু ব্যস্ততা দেখা যায় না অথচ বিকাশ তার অনিবার্য গতিতে ঘটিতেই থাকে, মনোরমার অভিযানও তেমনি ধীর স্থির মন্থর গতিতে গড়িয়া উঠে। [পৃ. ২৭৮]
৩. মালতীর ঠোঁটে এলোমেলো নড়াচড়া চলে, চোখের পাতা যেন ঘন ঘন ওঠে নামে, চুলগুলি বিশৃঙ্খল হইয়া আছে। তার শোয়ার ভঙ্গিতেই গভীর অবসন্নতা। মহাকাব্যের শৃঙ্গারশ্রান্তা রমণীর বর্ণনা রাজকুমারের মনে পড়িয়া যায়। [পৃ. ৩৩৩]
৪. প্রতি মুহূর্তে তার [রাজকুমারের] মনে হয়, দীর্ঘকায়া চম্পকবর্ণা এক নারী নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মাঠ বন নদী গ্রাম নগর পার হইয়া আগাইয়া আসিতেছে, শ্রোণীভারে থমথম করিতেছে তার গগনচুম্বী রসটম্বুর দেহে স্তম্ভিত ছন্দের ঢেউ, কটিতটে সৃষ্টি হইয়াছে নূতন দিগন্তের বঙ্কিম রেখা, মুখ ফিরিয়া খেলা করিতেছে নিশ্বাসে আলোড়িত মেঘ। [পৃ. ৩৪৫]

চতুষ্কোণ উপন্যাস যৌনতাময়—তবে কখনোই যৌনসর্বস্ব নয়, বরং মনস্তত্ত্বসম্মত ও সমাজসম্মত। যৌনতা *চতুষ্কোণ* উপন্যাসে জীবনার্থ সন্ধানের একটি উপায়—জীবনের অচ্ছেদ্য অংশ যৌনতা, কিন্তু সে কোনো গন্তব্য নয় কখনো। শেষ পর্যন্ত মানিক যৌনতা-উর্ধ্ব, জীবন-শিল্পী।[১৫]

মানিকের যৌনতার এই ক'টি কুললক্ষণ, *চতুষ্কোণ* ও অন্যান্য গল্প-উপন্যাসের ভিত্তিতে, অতঃপর, আমরা চিহ্নিত করে নিতে পারি।

ক) মানিকের যৌনতা মনস্তত্ত্বসম্মত তো বটেই, তা সব সময় চরিত্রের মনোলোকে আলো ফেলে-ফেলে এগিয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ) প্রবলপ্রচুর যৌনতার ব্যবহার করেও মানিক প্রেমের অস্তিত্বে নিঃসংশয়; এজন্যেই তিনি অ-মর্বিড ও আশাবাদী।

গ) মানিক কখনোই যৌনতাসর্বস্ব নন—বরং বিবেকহীন যৌনতাকে আতীব্র আক্রমণ করেছেন।

ঘ) মানিকের যৌনতা কখনোই ব্যক্তিসর্বস্ব নয়, সমাজ-পটভূমি তিনি কখনোই বিস্মৃত হন না।

ঙ) মানিক মনে করেন যৌনতা জীবনের একটি সুস্থ, প্রধান, অত্যাজ্য অংশ; তাঁর গল্প-উপন্যাসে যৌনতা এসেছে জীবনরূপায়ণের অনিবার্য তাগিদে—ঔপন্যাসিক ডি. এইচ. লরেন্স-এর মতো যৌনতার নতুন কোনো বাণী প্রচারে তিনি আগ্রহী নন।

চ) তাঁর রচনায় এক আশ্চর্য নিরাসক্তি কাজ করে যায়; যৌনতার প্রবলপ্রচুর ব্যবহার সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত যৌনতাকে তিনি অতিক্রম করেন; তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহে মানিক যৌনতা-উর্ধ্ব, ব্যক্তি-উর্ধ্ব, সমাজ-উর্ধ্ব; এই আশ্চর্য নিরাসক্তির ফলেই তাঁর শৈল্পিক সংযম সব সময় অক্ষুণ্ন অটুট থাকে।

AMARBOI.COM

৫. যৌনতাকে ছাড়িয়ে

আমরা দেখলাম, *চতুষ্কোণে* উপন্যাসে যৌনতা এক প্রধান নিয়ামকশক্তি—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে, বিষয়ে ও ভাষায়, এক কথায় উপন্যাসটির শরীরে ও আত্মায় এ উপর্যুপরি কাজ করে গেছে। যৌনতা কোনো অপরাধজনক বিষয়বস্তু নয়, এ জীবনেরই অচ্ছেদ্য অংশ। বিংশ শতাব্দীর যৌনচেতন সাহিত্যে ডি. এইচ. লরেন্স একজন প্রধান ব্যক্তিত্ব; তাঁর স্মরণীয় উচ্চারণ :

> The great relationship, for humanity, will always be the relation between man and woman. The relation between man and man, woman and woman, parent and child, will always be subsidiary./ And the relation between man and woman will change for ever, and will be the new central clue to human life.
>
> ['Morality and the Novel' (1925) *Selected Diterang Criticism*: D. H. Lawrence]

মানিক তাঁর *চতুষ্কোণ* উপন্যাসে এই শাশ্বত সম্পর্কেরই এক বিচিত্র রূপ পরীক্ষা করেছেন। এবং যৌনতাকে খোলাখুলি স্বীকৃতি দিয়ে জীবনেরই একটি আচ্ছাদিত অংশে তীব্র আলোকসম্পাত করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ, 'তীব্র আলোকসম্পাত'। অতিসচেতন মানিক নিজেই বলেছেন :

> রাজকুমার একটু বেলুনের মত ফুলে ফেঁপে উঠেছে, কিন্তু তাতে আসবে যাবে কি? আমার উদ্দেশ্যও তাই ছিল। ['ভূমিকা', *চতুষ্কোণ*]

তীব্র আলো ফেলে একটি সত্যকেই তিনি আলোকিত করতে চেয়েছেন। সেজন্যে রাজকুমার খণ্ডিত নয়—জীবনের একটি অংশের ভিতর দিয়ে সে পূর্ণতা, বা আরো ভালো হয় যদি বলি একটি সত্য, একটি সত্যের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে।

আবার বহুনিন্দিত *চতুষ্কোণ* নিশ্চিতভাবে পর্নোগ্রাফি বা অশ্লীল উপন্যাস নয়। আমরা মনে রাখতে চাই উনিশ শতাব্দীর ফরাসি প্রকৃতিপন্থী ঔপন্যাসিকেরা, বিশেষত মোপাসাঁ ও জোলা, ছিলেন যৌন-অবদমিত। এঁদের বিরুদ্ধে সেকালে পর্নোগ্রাফি রচনার অভিযোগ আনা হয়েছিল। কিন্তু আমরা জানি :

> Pornography...is merely intended as an aid to auto-eroticism, and the intentions of Maupassant and Zola were not to help the reader towards an orgasm. They wanted to expand the field of the novel, to be allowed to describe any part of life that interested them. This is legitimate enough.
>
> ['The Craft of the Novel': Colin Wilson]

AMARBOI.COM

মানিকও *চতুষ্কোণ*-এ পর্নোগ্রাফি লেখেননি—এবং তাঁকে আমরা তাঁর প্রিয় ও স্বেচ্ছানির্বাচিত কোনো বিষয় নিয়ে লিখবার স্বাধীনতা নিশ্চয় দিতে পারি।

ঠিক পর্নোগ্রাফির নয়, *চতুষ্কোণ*-এর বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি বিকৃতির—যৌনবিকৃতির। অধিকাংশ সমালোচক, অধিকাংশ সমাজতান্ত্রিক সমালোচক এ বিষয়ে একমত :

> ১. ...পুতুলই হোক, আর যাই হোক, উদ্ভট, অদ্ভুত, উচ্ছৃঙ্খল, সাধারণ অসাধারণ সকল খেলার মধ্য দিয়ে তারা প্রত্যেকেই যে মানুষ এই সত্যটা অস্বীকার করবার মতো আক্রোশ তখনো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভাকে পেয়ে বসেনি। কিন্তু ক্রমেই তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পেয়ে বসে। 'টিকটিকি' ("মিহি ও মোটা কাহিনী", ১৯৩৮) প্রভৃতি ছোটগল্পে তা ক্রমেই শ্বাসরোধী একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করে চলে, "চতুষ্কোণে"র (১৯৪৮)* মতো উপন্যাসে পর্যন্ত সেই যৌন-প্রবৃত্তির বিকৃত বিস্তার দেখতে পাওয়া যায়।
>
> ['মানিক-প্রতিভা' : গোপাল হালদার। *পরিচয়*, পৌষ ১৩৬৩]

---

* গোপাল হালদার (১৯০২-৯৪) সেকালের আরো অনেক মানিক-সমালোচকের মতো *চতুষ্কোণ* উপন্যাসটিকে ১৯৪৮ সালে রচিত বলে ভুল করেছেন। *চতুষ্কোণ* লেখা হয়েছিল ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে তথা ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে। এটি আজ প্রমাণিত সত্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. কোনো কোনো সমালোচনায় শুধু এইটুকুই বলা হয় যে, তাঁর লেখার ধার নাকি কমে গেছে? আসলে কোন ধারের জন্যে এ আক্ষেপ? সে কি নেতিবাচক দৃষ্টি থেকে নেতিবাচক বিতৃষ্ণার ধার? বলতেই হবে তা কমেছে, এবং কমে ভালোই হয়েছে। সেকি "দিবারাত্রির কাব্যে"র কিংবা "চতুষ্কোণে"র ইন্দ্রিয়গত রোমান্টিক কল্পনা ও মর্বিড বিকৃতির ধার? বলতে হবে তা কমেছে এবং কমে ভালোই হয়েছে।

['মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথসন্ধান' : ননী ভৌমিক। *পরিচয়*, চৈত্র ১৩৬০]

৩. ... একটি অস্থায়ী পর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎকেন্দ্রিক চরিত্রের প্রতি দুর্বলতা, অস্বাভাবিকতার প্রতি অতি-মোহে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এই পর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্রসৃষ্টিতে আগ্রহ কমে এসেছে, মানুষের বিকৃতির প্রতি তাঁর মন অধিকতর ব্যস্ত। "চতুষ্কোণ" এই পর্বের সৃষ্টি।

['মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপক্ষে' : সুবীর রায় চৌধুরী। *নতুন সাহিত্য*, পৌষ, ১৩৬৩]

কিন্তু বিকৃতি বা অপচার কি দেখতে পাই আমরা রাজকুমারের মধ্যে? না, রাজকুমার বিকৃত নয়, বড়োজোর অস্বভাবী। তা নাহলে যৌনতার মধ্যে ডুবে না-গিয়ে সে কেন যৌনতার মধ্য দিয়ে জীবনার্থ সন্ধান করে ফিরবে? তা নাহলে কেন সে বলবে :

> আমার যেন সব খাপছাড়া, উদ্ভট। নাড়ী দেখার ছলে আমি গিরির সঙ্গে কেলেংকারী করি, শুধু খেয়ালের বশে রিণি মুখ বাড়িয়ে দিলে আমার কাছে সেটা বিরাট এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, সৌন্দর্যের বদলে মেয়েদের দেহে আমি খুঁজি আমার থিয়োরীর সমর্থন। আমার যেন সব বাঁকা, সব জটিল। [পৃ. ৩৪৩]

রাজকুমারের নিজের সম্বন্ধে এইসব উক্তি—'খাপছাড়া', 'উদ্ভট', 'বাঁকা', 'জটিল'—অনেকসময় সমালোচকদের বিপথগামী করেছে। আসলে রাজকুমারের সমস্যা যৌনতার নয়—যৌনতত্ত্বের সঙ্গে জীবনের সামঞ্জস্য সাধনের। এজন্যেই গিরি-রিণি-মালতী-সরসীর সঙ্গে তার সম্পর্ক কেবলি জটিল হতে থাকে। উপন্যাসের প্রথম দিকেই তার অনুভব :

> এমন একটা বিকৃত আবেষ্টনীর মধ্যে তারা মানুষ হইয়াছে যে, অস্বাভাবিক মিথ্যা অসংযমকেই তারা স্বাভাবিক সত্য বলিয়া জানিতে শিখিয়াছে। মানুষ কেবল পরের নয়, নিজেরও সংযমে বিশ্বাস করে না। অসংযমের চেয়ে সংযম যে মানুষের পক্ষে বেশি স্বাভাবিক, এ যেন কেউ কল্পনাও করিতে পারে না। [পৃ. ২৫১]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বিকৃতি' 'বিকার' এই শব্দগুলি এই উপন্যাসে অনেকবার প্রযুক্ত হয়েছে; কিন্তু 'বিকৃত আবেষ্টনী'র মধ্যে মানিকের প্রকৃত মনোভাব প্রকাশিত। বিকৃতি যদি কিছু থাকে তবে তা আছে ঐ আবেষ্টনীর মধ্যে, সম্পূর্ণ পারিপার্শ্বিকে, কোনো ব্যক্তিজীবনে নয়। আবেষ্টনী বা পারিপার্শ্বিক, তাই তো জীবন। মানিক এই জীবনের কথাই লিখেছেন এই উপন্যাসে—সম্পূর্ণ জীবনের; ফলে বিকৃত আবেষ্টনীর মধ্যে উপন্যাস শেষ হয়নি—রাজকুমারের সমস্যাই ছিল ঐ আবেষ্টনীর মধ্য দিয়ে সুস্থ পথ করে নেওয়া—এবং শেষ পর্যন্ত সে তা করেছে।

সেদিক থেকে এই উপন্যাসের উপসংহার অতিতাৎপর্যময়। রিণির মনোবৈকল্য ঘটবার পর রাজকুমার যখন তার শুশ্রূষায় লেগে যায়, তখনই রাজকুমার অলস তত্ত্বকল্পনা ছেড়ে জীবনে প্রবেশ করেছে। উপন্যাসের শেষ হয়েছে সরসীর একটি পরোক্ষ-বাক্যে। উপন্যাসের একেবারে অন্তিম বাক্যটি 'জীবন তো খেলার জিনিষ নয় মানুষের', সমস্ত উপন্যাসটিকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে তো বটেই, আমি বলব, মহত্ত্বে উন্নীত করেছে। পাগল রিণির দায়িত্বভার গ্রহণের মধ্য দিয়ে রাজকুমার সেই সামঞ্জস্য সাধন করে, এতকাল যা সে খুঁজছিল, তখন আমাদের মনে পড়ে যায় রাজকুমারকে যে এই উপন্যাসে গভীরভাবে বুঝেছে (শেষ পর্যন্ত) সেই সরসীর উক্তি :

> দেহের গড়নের সঙ্গে মানুষের প্রকৃতির সম্পর্ক কি তাই টেস্ট করার জন্য কেউ এভাবে ব্যাকুল হয়? তোমার আরও সিরিয়াস কিছু হয়েছে, এ শুধু তার একটা লক্ষণ।

এই 'আরও সিরিয়াস কিছু' হচ্ছে রাজকুমারের সেই তৃষ্ণা যা তাকে ঐ অতিকথিত 'বিকারে'র ওপারে নিয়ে এসেছে। আর তাই আমাদের বিবেচনায়, যে-উপন্যাস শুরু হয়েছে এক অনির্দেশী যাতনায় কিন্তু শেষ হয়েছে এক নির্দিষ্ট দায়িত্ববদ্ধতায় তাকে কিছুতেই বিকৃতির উপন্যাস বলা চলে না।

মনঃসমীক্ষণতত্ত্বে যাকে বলা হয় 'প্রতিরক্ষণ-কুশলতা', যার বলে অবচেতনের জীবনবিরোধী ও সমাজবিরোধী উপাদানগুলির সঙ্গে মানুষ সংগ্রাম করে চলে, সেই প্রতিরক্ষণ-কুশলতাতেই রাজকুমার শেষ-পর্যন্ত জয়ী হয়। 'একে জিতেছি' বলে যে-রাজকুমার একদিন নিজেকে দেখিয়ে দিত, এখন তার আত্মবিজয় সম্পূর্ণ হলো। অক্রিয় অবচেতন (উপন্যাসের সূচনাংশের মাথা-ধরা থেকে) রাজকুমার চলে এল সক্রিয় সচেতনতার (স্বেচ্ছায় অসুস্থমস্তিষ্ক রিণির দায়িত্বভার গ্রহণের মধ্য দিয়ে) জগতে। এজন্যেই অন্য একজন সমাজতান্ত্রিক সমালোচক যথার্থই লেখেন :

> নরনারীর যৌনজীবনের উল্লেখ করতে গিয়ে অবচেতনের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়ে তিনি সত্যচিত্র দিতে চেয়েছেন তাঁর বহু উপন্যাসে এবং ছোটগল্পে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চল্লিশের দশকেও "চতুষ্কোণ" উপন্যাসে "দিবারাত্রির কাব্য" সংক্রান্ত যৌন-মানসের ছবি এঁকেছেন। সেখানেও অবক্ষয়ীরা যেভাবে যৌনতাকে সর্বময় করে সমগ্র জীবনসত্যকে খণ্ডিত করতে চেয়েছে সেরকম কিছু করেননি তিনি। "দিবারাত্রির কাব্য" কিংবা "চতুষ্কোণ" উপন্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য যৌনতা নয়। উদ্দেশ্য, পূর্ণাঙ্গ মানব-মানবী-চরিত্র, বহু চরিত্রের মধ্যে বিশেষ বিশেষ চরিত্র-কথা।

['মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—কমিউনিস্ট, অতিআধুনিক, গণকথাশিল্পী' : রণেশ দাশগুপ্ত, *শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র*, এপ্রিল ১৯৭৮]

*পুতুলনাচের ইতিকথা*র সঙ্গে *চতুষ্কোণ*-এর কোনো দিক থেকেই কোনো মিল নেই, না কোনো মিল আছে শশীর সঙ্গে রাজকুমারের; কিন্তু আশ্চর্যভাবে, দুটি উপন্যাসই শেষ হচ্ছে এক দায়িত্ব গ্রহণে। শশী ও রাজকুমারের দায়িত্ব গ্রহণের পদ্ধতিও আলাদা, কিন্তু তাদের দায়িত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গভীরভাবে অস্তিত্ববাদী লেখক। মনে হয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অস্তিত্বের গভীর বিবরে প্রবেশ করেছিলেন, তাঁর সমগ্র চেতনাবলে অস্তিত্বের অন্তঃসার শোষণ করে নিয়েছিলেন। তাঁর নায়ক রাজকুমার ক্রমাগত 'হ'য়ে ওঠে', হয়ে ওঠে অস্তিত্ববাদী নায়ক, শেষ পর্যন্ত যার মুক্তি ঘটে অলস কল্পনায় বা তত্ত্বচিন্তায় নয়—দায়িত্বের পরিগ্রহণে। আর এই দায়িত্বের পরিগ্রহণ শেষ পর্যন্ত প্রমাণ করে দেয় রাজকুমার বিকারগ্রস্ত নয়—সন্ধানশীল।

মালতীকে পড়াতে গিয়ে একবার এক বর্ষণঘন রাত্রিতে রাজকুমার উঠে তার চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'নোট নিয়েছো?' 'চতুষ্কোণ টেবিলের অন্য তিন দিকের যেখানে খুসি দাঁড়াইয়া এ প্রশ্ন করা চলিত, মালতীর খাতাও দেখা চলিত। কিন্তু চতুষ্কোণ ঘরের মতই চতুষ্কোণ টেবিলেও মাঝে মাঝে প্রান্তরের বিস্তৃতি পায়, এত দূর মনে হয় একটি প্রান্ত হইতে আরেকটি প্রান্ত!' (পৃ. ২৬৭)—*চতুষ্কোণ* উপন্যাসটিও শেষ পর্যন্ত আবদ্ধ থাকেনি আর জীবনের একটি প্রদেশে, প্রান্তরের বিস্তৃতি পেয়েছে—সে-প্রান্তর জীবনেরই অন্য নাম।

তথ্যনির্দেশ

১. তুলনীয় দস্তয়েভস্কির *Notes From Underground* (১৮৬৪)-এর সূচনাংশ :

I am a sick man ... I am a spiteful man, I am an unattractive man. I believe my liver is diseased. However, I know nothing at all about my disease, and do not know for certain what ails me. I don't consult a

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

doctor for it, and never have, thought I have a respect for medicine and doctors. Besides, I am extremely superstitious, sufficiently so to respect medicine, anyway (I am well-educated enough not to be superstitious, but I am superstitious).

২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক নায়কই 'চিন্তাগ্রস্ত', আত্মব্যাখ্যাশীল, বিশ্লেষণপ্রবণ; যেমন *দিবারাত্রির কাব্য* (১৯৩৫)-এর হেরম্ব, *পুতুলনাচের ইতিকথা* (১৯৩৬)-র শশী, *আরোগ্য* (১৯৫৩)-র কেশব।

৩. *পুতুলনাচের ইতিকথার* নায়ক শশী পরিপূর্ণভাবে সামাজিক ও গাওদিয়া গ্রামের অসংখ্য ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত হলেও গভীরভাবে নিঃসঙ্গ।

৪. পুরো নকশাটি এই :

Female	Male
Sensitivity	Brutality
Precisions: Words as decoration	Scope: Words as tools
Insight into relationships	Analysis of structures
Perception of detail	Sense of the grand design
Social observation	Moral awareness
Slave Mentality :	Arrogance :
Manupulative skills	ability to dominate
Submission/Resignation	Agrression :
	'Masculine persovasive force'
Intuition	Intelligence
Subjectivity	Objectivity
Involvement	Detachment
Irony	Honesty

['The Fiction of Sex': Rosalind Miles]

৫. 'বিজনতাই হচ্ছে আত্মবিবরে প্রবেশের পথ' : দ্যালাক্রোয়ার এই বাণী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও জীবনানন্দ দাশে তিরিশের শ্রেষ্ঠ কথক ও শ্রেষ্ঠ কবির মধ্য দিয়ে আর-একবার প্রমাণিত হয়েছে। এই দুজন, পরস্পরের দিকে পিঠ ফিরিয়ে, হয়ে আছেন আধুনিক সাহিত্যের দুই পুরোধা পুরুষ।

৬. বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪) রবীন্দ্রনাথকে তাঁর *বউঠাকুরাণীর হাট* (১৮৮৩) পড়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রশংসাপত্র পাঠিয়েছিলেন, এবং রবীন্দ্রনাথ নিজে বুদ্ধদেব বসুর *বাসরঘর* (১৯৩৫) উপন্যাস পড়ে সপ্রশংস চিঠি পাঠিয়েছিলেন লেখককে।

৭. বুদ্ধদেব বসুর সাক্ষ্য :

"শেষের কবিতা"র প্রথম কিস্তি বেরোনো মাত্র বিকিয়ে যেতে হলো। মাসে মাসে এই আশ্চর্য নতুন রচনাটি পড়তে পড়তে আমাদের মনে হলো যেন একটা দুয়ার, যা আমাদের আনাড়ি হাতের আঘাতে কোনো উত্তর দেয়নি, তা এক যাদুকরের স্পর্শে হঠাৎ খুলে গেলো—দেখা গেলো আমাদেরই অনেক স্বপ্নের চোখ-ধাঁধানো মূর্তি। আমরা যা-কিছু চেষ্টা করছিলাম অথচ ঠিক পারছিলাম না, সেই সবই রবীন্দ্রনাথ করেছেন—কী সহজে, কী সম্পূর্ণ করে, কী সুন্দর ভঙ্গিতে! মনে হলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বইটা যেন আমাদেরই, অর্থাৎ নবীন লেখকদেরই উদ্দেশ্যে লেখা, আমাদেরই শিক্ষা দেবার জন্যে এটি গুরুদেবের একটি তির্যক ভর্ৎসনা। অবাক হয়ে দেখলুম রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক মূর্তি'—আমরা আধুনিক বলতে যা ভাবছিলাম ঠিক তা নয়, কিন্তু তারই কোনো সার্থক রূপান্তর যেন। আমাদের কল্পিত রবীন্দ্র-যুগের সীমানা এক ধাক্কায় অনেক দূরে সরে গেলো, যেটাকে আমরা 'রবীন্দ্র-যুগ' আখ্যা দিয়েছিলাম, সেটা যে নিজেই গতিশীল এবং পরিবর্তমান, তা বুঝতে পেরে অনেক ধারণা বদলে গেলো আমাদের। বারবার যিনি নবজাত, প্রায় সত্তর বছরে আবার তাঁর এক নতুন জন্ম।

['শেষের কবিতা', *রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য* : বুদ্ধদেব বসু]

৮. 'নষ্টনীড়'কেও এই পর্যায়েই ধরা উচিত; কেননা যৌনতা-মিশ্রিত মনস্তত্ত্বের ব্যবহার এই রচনাতেও আছে। এবং এ তথ্য এখানে স্মরণীয় যে, 'নষ্টনীড়' প্রথমে সাময়িক পত্রিকায় উপন্যাস হিসাবেই প্রকাশিত হয়েছিল।

৯. শরৎচন্দ্রের *গৃহদাহ* (১৯২০) প্রভৃতি কয়েকটি উপন্যাস এই ধারারই ফসল। স্মরণীয়, *চোখের বালি* প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের স্বীকৃতি ও উচ্ছ্বাস। এ তথ্যটিও এখানে মনে করা যেতে পারে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পূর্বজদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন শরৎচন্দ্র সম্পর্কে, এবং বহুবিতর্কিত *শেষ প্রশ্ন* (১৯৩১)-কে কল্লোলীয়রা অনেকে খারিজ করলেও মানিক যুক্তিময় সমর্থনই জানিয়েছিলেন। ['শেষ প্রশ্ন', *মা. গ্র.* ১৩]

১০. কল্লোলীয়দের অনেকেরই গল্প-উপন্যাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সপ্রশংস মন্তব্য আছে, এমনকি বিখ্যাত তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুজন—বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্কর—সম্পর্কেও; কিন্তু মানিক সম্পর্কে তিনি নীরব।

১১. রবীন্দ্রনাথ জগদীশ গুপ্তের (১৮৮৬-১৯৫৭) *লঘু-গুরু* (১৯৩১) উপন্যাস সম্পর্কে লিখেছিলেন *পরিচয়* পত্রিকায় (কার্তিক ১৩৩৮)। *জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড)-এর পরিশিষ্টে সংকলিত।

১২. 'পদ্মানদীর দ্বিতীয় মাঝি' : আবু হেনা মোস্তফা কামাল। ভূঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*।

১৩. রবীন্দ্রনাথের *সাহিত্য*, *সাহিত্যের স্বরূপ* ইত্যাদি গ্রন্থের প্রবন্ধমালা আর *মানিক গ্রন্থাবলী*তে ছড়ানো মানিকের প্রবন্ধমালা।

১৪. মানিক তাঁর প্রিয় ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতোই মনে হয় উপন্যাস নির্মাণে সবচেয়ে জোর দিতেন কাহিনীর সংগঠনে নয়—চরিত্রের উপরেই।

১৫. প্রসঙ্গত, মানিকের একটি গল্পগ্রন্থের কয়েকটি গল্প পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।—১৯৩৯ সালে প্রকাশিত *সরীসৃপ* গল্পগ্রন্থের বেশ কয়েকটি গল্পে যৌনতার ব্যবহার আছে; তা থেকে যৌনতা বিষয়ে মানিকের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যাবে। মানিকের যৌনতা-যে আনুপূর্ব মনস্তত্ত্বেরই রেখা ধরে চলে তার চূড়ান্ত উদাহরণ 'দিক-পরিবর্তন' গল্পটি : অল্পবয়সী বিধবা ঝি সখি চরিত্রবান ধনবান গৃহস্বামী ডাক্তার মনোহরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিপ্রবণ, এবং চাকর-ঠাকুর-দারোয়ান-কম্পাউন্ডারের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে; কিন্তু চরিত্রবান গৃহস্বামী মনোহর যখন সখির শরীরী আকর্ষণে সাড়া দিল তখনই সখির মন পরিবর্তিত হয়ে যায়, এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যদেরও সে আর ঠেকিয়ে রাখে না। তারপর সখি সন্তানসম্ভবা হলে গৃহস্বামী-চাকর-ঠাকুর-দারোয়ান-কম্পাউন্ডার-এর আপনাপন ভাবনা ও প্রতিক্রিয়াই কেবল লেখক দেখিয়েছেন। মানিক-যে কখনোই যৌনতাসর্বস্ব লেখক হয়ে ওঠেননি, হয়ে ওঠেননি মর্বিড বা রুগ্‌ণ মনের ভাষ্যকার, তার প্রমাণ 'বিষাক্ত প্রেম' গল্পটি; দুটি ভাসমান নরনারী সত্য আর সরলার সাময়িক প্রেমও তীব্র, সরলাকে বিষ খাইয়ে মরণাপন্ন করে সত্য যখন কিছু গয়না আর টাকা সংগ্রহ করে সরে পড়ার জন্যে প্রস্তুত তখনই তার ভয় হলো সরলা যদি মরে যায়, এবং তখনই সে সরলার চিকিৎসায় লেগে যায় অপরূপ এই ভাবনায়, 'একদিন কি টের পাওয়া যাবে না সরলা গয়নাগুলি কোথায় লুকিয়ে রাখে? যতদিন তা টের না পাওয়া যায়, ততদিন সে এমন ভাব দেখাবে যে সরলাকে ছেড়ে সে এক দণ্ড থাকতে পারে না, সরলার প্রেমে হৃদয় তার টইটম্বুর।' আবার মানিক যৌনতার প্রবলপ্রচুর প্রয়োগ করেন বটে কিন্তু বিবেকহীন যৌনসর্বস্বতাকে কি তিনি কোনো দিন সমর্থন জানিয়েছিলেন? কখনোই নয়। 'সরীসৃপ' গল্প এর সাক্ষ্য : বনমালীকে পরী তার সর্বস্ব সমর্পণ করার পরে পরী নিক্ষিপ্ত হয় বনমালীর নিয়মানুযায়ী বাড়ির নিচের তলায়; চারুর ছেলে ভুবন নিরুদ্দেশে চলে যায়। বনমালী নির্বিকার। তারপরই গল্পের আশ্চর্য উপসংহার: 'ঠিক সেই সময়ে মাথার উপর দিয়া একটা এরোপ্লেন উড়িয়া যাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে সেটা সুন্দরবনের উপরে পৌঁছিয়া গেল। মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনের পশুরা যেখানে আশ্রয় নিয়াছে।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিবিম্ব

> আমার বাড়ির কাছে জৈনুদ্দিনের ঘর, জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত বোধ হয় লাখ খানেক কথা ওর সঙ্গে আদান-প্রদান হয়েছে, কিন্তু ভাবতে গিয়ে দেখছি লোকটা কি ভাবে, কেমন করে ভাবে কিছুই জানি না। মানুষগুলিকে একটু চিনে আসি।
>
> [পৃ. ৪১৪, 'প্রতিবিম্ব', *মা. গ্র.* ২]

AMARBOI.COM

১. 'সংকীর্ণ গণ্ডী ভেঙে বিরাট জীবন্ত সমাজ'

বেয়াল্লিশ পৃষ্ঠার ছোটো কিন্তু তাৎপর্যঘন উপন্যাস। ১৯৪৩ সালে রচিত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কম্যুনিজম গ্রহণের আগের বছরে। সেদিক থেকে বলা যেতে পারে, ঔপন্যাসিকের প্রথম পর্যায়ের এটি শেষ উপন্যাস। মানব-ভাবনা মানিকের সব পর্যায়েরই রচনায় কেন্দ্রীয় বিষয়। তাহলেও কম্যুনিজম গ্রহণের আগে, অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ে, অন্তত তিনটি উপন্যাসে—*পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬), *সহরতলী* (১৯৪০-৪১) ও *প্রতিবিম্ব* (১৯৪৩) উপন্যাসে—বোঝা যায় মানিকের মানস-গতি কোন দিকে চলেছে। কম্যুনিজম গ্রহণের আগে মানিক-মানসের ভর ও কেন্দ্র ছিল অন্তর্বাস্তবতা, পরে বহির্বাস্তবতা, কিন্তু আগেও যেমন বহির্বাস্তবকে তিনি গ্রহণ করেছেন তেমনি পরেও তিনি অন্তর্বাস্তবকে অস্বীকার করেননি। *প্রতিবিম্ব*র ভিতরে মনোলোক ও বহির্লোকের দুটি বলয়ই কাজ করে গেছে—কিন্তু তার গতি স্পষ্টতই সাধারণ মানুষের অভিমুখে।

ছোটো হলেও আত্মসম্পূর্ণ এই উপন্যাসের মধ্যে মানিক-স্বভাবী ঔপন্যাসিক লক্ষণসমূহ সুপরিস্ফুট। নর্থপ ফ্রাই ঔপন্যাসিকের দুরকম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝোঁকের[১] (মানবীয় সম্বন্ধসমূহ এবং সামাজিক বিষয়) যে-গ্রহণযোগ্য বিশ্লেষণ করেছিলেন, মানিকের কাজ মূলত তার প্রথমটি নিয়েই, অর্থাৎ মানবীয় সম্বন্ধসমূহ নিয়েই। *প্রতিবিম্ব* উপন্যাসেও তাই হয়েছে। এই উপন্যাসের চারিত্রলক্ষণ : ক) ব্যক্তির আত্মকেন্দ্র নয়, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্কই বোনা হয়েছে সারা উপন্যাসে, উত্তর খোঁজা হয়েছে ব্যক্তির মধ্যেই; খ) ঘটনাগুলি যেন ব্যক্তিকে ক্রমাগত পরীক্ষাশীলতার মধ্য দিয়ে নিয়ে গেছে; জবাব খোঁজা হয়েছে ঘটনাবলির প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে।

উপন্যাসের একক (unit) ঘটনা। সেই হিসাবে এই ছোটো, নির্মেদ ও দ্রুতগামী উপন্যাসের প্রবহমানতাকে পরম্পর যে-মূল ঘটনাবলির দ্বারা চিহ্নিত করা যায়, সেগুলি এরকম :

ঘটনা ১ : স্বেচ্ছায় বেকার ও স্বাধীনচিত্ত তারক চাকরির জোয়ালে বাঁধা পড়তে চায় না। তাই চাকরির জন্যে দরখাস্ত না-পাঠিয়ে সে মুক্ত থাকতে চায়। বাপের কাছে ধরা পড়ার পর পরিষ্কার বলে, সে চাকরি করবে না।

ঘটনা ২ : পার্টিতে রামবাবু তাকে বেশি করে চেপে ধরতে চাইলে, সেখান থেকেও সে মুক্ত হয়ে যায়। কেননা সে যাপন করতে চায় 'সুন্দর স্বাধীন জীবন। অলস, মন্থর, সরস। কোথাও নিয়মও নেই, বাধ্য-বাধকতা নেই, রাজকতা নেই।' (পৃ. ৩৭৭)

ঘটনা ৩ : নববিবাহিত বৌকেও তারক জানিয়ে দেয়, সে চাকরি করবে না।

ঘটনা ৪ : বৌ তারককে রাজি করায় চাকরি করাতে।

ঘটনা ৫ : এ পর্যন্ত গ্রামের ঘটনা। তারপর শ্বশুর-নির্দেশিত চাকরির তল্লাশে তারক আসে শহরে, কলকাতায়। পার্টির একটি বাড়িতে ওঠে। নানারকম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায়। তার চূড়ান্ত হচ্ছে মনোজিনীর সঙ্গে সীতানাথের বাঁকা জটিলতা।

ঘটনা ৬ : ট্রামে 'অভদ্রলোক' নিম্নশ্রেণীর আচরণ—'ভদ্রলোকেরা চুপ,—সবাই, একসঙ্গে!' (মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্রোহহীনতা, ভীরুতা, মেরুদণ্ডহীনতা)।

ঘটনা ৭ : খুড়োশ্বশুরের বাড়ির অভিজ্ঞতা (মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভণ্ডামি)।

ঘটনা ৮ : দুর্ভিক্ষচিত্র (মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অক্রিয় বুদ্ধিজীবী-শোভন মৌখিক সহানুভূতির অসারতা)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটনা ৯ : চাকরির জন্যে ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে তারকের অভিনয়—কিছুই জানে না, এই অভিনয়। এই কৌশলে নিশ্চিত চাকরিটিও সে বর্জন করে।

ঘটনা ১০ : মনোজিনীকে তারক জানিয়ে দেয় চাকরি না-করে সে দেশে ফিরে যাবে। তার উক্তি : 'দেশের পরিচিত চাষী মজুরগুলোকে একবার চিনে আসতে হবে।' (পৃ. ৪১৪)

এই উপন্যাসের সমস্ত ঘটনা একটি গোপন ছকের মতো সাজানো। গ্রামে তারক তার বাবা, মা ও বৌকে জানিয়ে দেয় সে চাকরি করবে না, পার্টিকে জানিয়ে দেয় সে তার স্বাধীনতা খোয়াবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৌয়ের আবদারে ও শ্বশুরের নির্দেশে সে চাকরি নিতে কলকাতায় আসে, একরকম বাধ্য হয়েই। এখানে এসে একদিকে সে বুঝে নেয় পার্টিকর্মীদের অসরল সম্পর্ক, অন্যদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তঃসারশূন্যতা, ভীরুতা ও কাপট্য। সবশেষে তারক গ্রামে ফিরে আবার সেই স্বাধীন জীবনকে বরণ করে নেয়।

তারক, মানিকের প্রথম-পর্যায়ী অন্যান্য কয়েকজন নায়কের মতো, প্রাজ্ঞ ও বয়স্ক নয়; কিন্তু তাদেরই মতো আত্মসন্ধানী। আত্মসন্ধানী, স্বাধীনচিত্ত ও সদাজাগ্রত বলেই সে মধ্যবিত্তের প্রথাসিদ্ধ ছক কেটে বেরিয়ে পড়ে। সে সেই জীবনের আকাঙ্ক্ষা করে, যা 'সুন্দর স্বাধীন জীবন। অলস, মন্থর, সরস। কোথাও নিয়মও নেই, বাধ্য-বাধকতা নেই, রাজকতা নেই।' (পৃ. ৩৭৭) একটি রাজনৈতিক পার্টির কর্মী হয়েও পার্টিতে সে পুরোপুরি যুক্ত হয় না। কেননা 'একবার দলে ঢুকে পড়লে যদি একই সময়ে তার নিজের সিনেমা যাওয়ার ইচ্ছার সঙ্গে দলের কোন নির্দেশের সংঘর্ষ বাধে?' (পৃ. ৩৮০) ঐ স্বাধীনতা হারানোর ভয়েই সে সাধা চাকরি পায়ে ঠেলে। 'এত যে অফুরন্ত কাজ, বিচিত্র ও অভিনব—চাকরি ছাড়া তার কি কিছুই করা ভাগ্যে নেই!' (পৃ. ৩৯৯) তারক অকপট ও স্পষ্টবাক (মধ্যবিত্তের ব্যতিক্রম)। পার্টির নেতা রামবাবুকে সে মুখের উপর বলে দেয় যা সে পারবে না। সীতানাথ মাঝরাত্রিবেলা মনোজিনীকে আলিঙ্গন করতে গেলে তারক সীতানাথকে প্রয়োগ করে তার বিশুদ্ধ ন্যাকামিবর্জিত প্রহার। দুর্ভিক্ষে মৃত যুবতীর জন্যে শৌখিন হা-হুতাশ তার রুচিতে বাধে। পার্টির সেক্রেটারিকে পরিষ্কার বলে, 'আপনি নেতা হবার উপযুক্ত নন।' কলকাতায় এসে তারকের যে-অভিজ্ঞতা হয়, এক কথায় তাকে বলা যেতে পারে, মধ্যবিত্তের অন্তঃসারশূন্যতার অভিজ্ঞতা। তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর তুলনায় তথাকথিত মধ্যশ্রেণীর ভীরুতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা (ট্রামের ঘটনা, পৃ. ৪০২-৩), মধ্যবিত্তের কাপট্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(খুড়োশ্বশুরের বাড়ির ঘটনা, পৃ. ৪০৪), মধ্যশ্রেণী-নির্ভর পার্টির ভিতরেও নানারকম ফাঁকি ও ফাটল (যেমন, 'এদের [পার্টিকর্মীদের] এই ইচ্ছাকৃত দারিদ্র্যকে কোনো দিন এরা ইচ্ছাকৃত সচ্ছলতায় পরিণত করতে পারবে না, পার্টির জন্যেও যথেষ্ট টাকা সংগ্রহের শক্তি এদের নেই।'—পৃ. ৩৮৪)

কিংবা 'ফাঁকা বিনয় আর বাড়াবাড়ি ভদ্রতা বাদ দিতে গিয়ে এরা মানুষের সঙ্গে ফাঁক সৃষ্টি করছে।'—(পৃ. ৩৮৩)—সব-মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত মধ্যবিত্তদের প্রতি তারকের আর কোনো শ্রদ্ধাই অবশিষ্ট থাকে না। তার সমস্ত আশা-ভরসার পাত্র হয়ে ওঠে দেশের চাষী-মজুর। অন্তিম সিদ্ধান্ত তার : 'দেশের পরিচিত চাষী-মজুরগুলোকে একবার চিনে আসতে হবে।' মধ্যবিত্তের চোখে নয়, পার্টির চোখেও নয়, নিজেই চিনে আসতে হবে নিম্নবিত্তকে, যাদের সঙ্গে দীর্ঘকাল একত্রবাস করেও অন্তরঙ্গ চেনাজানা হয়নি।

তারকের এই সিদ্ধান্ত মানিকেরও সিদ্ধান্ত। মানিক, অতঃপর নিজে যোগদান করেন কম্যুনিস্ট পার্টিতে (১৯৪৪)—এই উপন্যাস লেখার পরের বছরেই। এই উপন্যাসের সঙ্গে মানিকের আত্মজীবনের এরকম কিছু মিল আছে। উপন্যাসের সূচনায় তারকের অগ্রজ ও বৌদির সঙ্গে যে-দ্বন্দ্ব, তা মানিকের জীবনেও ঘটেছিল। তারকের চরিত্রে মানিকের আত্ম-চরিত্রের কিছু ছায়াপাত ঘটেছে, তারকের দাদার চরিত্রে মানিকের দাদার প্রতিফলন। ১৯৪৩ সালে মানিক নিজে ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের স্বল্পকালস্থায়ী চাকরি ত্যাগ করেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তঃসারশূন্যতায় ক্ষুব্ধ ও আশাহত হয়ে চাষী-মজুরদের মধ্যে তারকের ফিরে যাওয়া অল্পকালের মধ্যে মানিকের নিজের জীবনেও ঘটেছে। জন স্টাইনবেক যে-কোনো উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রে লেখকের আত্ম-চরিত্রের প্রতিরূপ লক্ষ করেছিলেন।[২] তারকের চরিত্রে লেখকের আত্ম-চরিত্রের (শব্দটি স্টাইনবেক-এর : 'self-character') ছাপ স্পষ্ট : চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষা দুইয়েরই।

১৩৫০ (১৯৪৩)-এর দুর্ভিক্ষ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এই উপন্যাসের পটভূমি। এই উপন্যাস রচিত ও প্রকাশিতও হয় ১৯৪৩ সালে (*যুগান্তর*, শারদীয়া সংখ্যায় প্রথমে, পরে গ্রন্থাকারে)। দুর্ভিক্ষ ও মহাযুদ্ধ প্রত্যক্ষভাবে আসেনি, কিন্তু অগোচরেও থাকেনি (পৃ. ৩৭৭, ৩৯২, ৪০৪-৫)। তবু দুর্ভিক্ষ এই উপন্যাসে তেমনভাবে আসেনি, যেমন এসেছে মানিকেরই ছোটোগল্পে।[৩] তার কারণ, এই উপন্যাস মধ্যবিত্তেরই জীবনচিত্রণ; আর মন্বন্তরের প্রধান আক্রমণক্ষেত্র ছিল দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত। মধ্যবিত্ত জীবন এই উপন্যাসের ক্ষেত্র হলেও তার মধ্যবিত্ত নায়ক ঐ জীবনেরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তারক এক নিঃশব্দ বিদ্রোহী—যে মধ্যবিত্তের অতিপরিচিত ছক ভেঙে বেরিয়ে পড়েছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যবিত্ত জীবনব্যবস্থা (ছলনা ও কাপট্য যার কুললক্ষণ) এবং মধ্যবিত্ত জীবনাশ্রয়ী পার্টি (যার মধ্যে আছে অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা, যৌন শাঠ্য এবং প্রকৃত নেতার অভাব) তাকে শান্তি দিতে পারেনি। তাই সে 'দেশের পরিচিত চাষী মজুরগুলোকে একবার চিনে' আসার জন্যে পার্টি ও কলকাতা ছেড়ে আবার গ্রামজীবনেই ফিরে যায়। এই চেনা হচ্ছে প্রকৃত চেনার চেষ্টা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে প্রথমাবধি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত—এই দুই শ্রেণীই রূপায়িত হয়েছে। এই দুই শ্রেণীর রূপায়ণ করতে গিয়ে মানিক তাদের অন্তর্লোকের সঙ্গে পরিচিত হন। সেই পরিচয়ের ফসল ফলে যেমন তাঁর সাহিত্যে, তেমনি তাঁর ব্যক্তিজীবনেও। মানিক-সাহিত্য যেমন ক্রমশ নিম্ন শ্রেণী-ভিত্তিক হয়েছে, তেমনি তিনি নিজেও নেমে এসেছেন উচ্চ মধ্যবিত্ত থেকে নিম্নবিত্ত সমাজে। *প্রতিবিম্ব* উপন্যাসের সমকালে (১৯৪৩) প্রকাশিত *সমুদ্রের স্বাদ* গল্পগ্রন্থেরও পটভূমি ও উপজীব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে একটি নতুন-যোজিত ভূমিকায় মানিক যে-আত্মভাষ্য রচনা করেন, তা তাঁর ঐ মধ্যবিত্তের অন্তঃসার সন্ধানেরই একটি পরিচায়ক। ঐ ভূমিকা থেকে প্রাসঙ্গিক একটুখানি অংশ উদ্ধৃত করছি :

> ভাবের আবেগে গলে যেতে ব্যাকুল মধ্যবিত্তদের নিয়ে "সমুদ্রের স্বাদ"-এর গল্পগুলি লেখা। প্রথম বয়সে লেখা আরম্ভ করি দুটি স্পষ্ট তাগিদে, একদিকে চেনা চাষী মাঝি কুলি মজুরদের কাহিনী রচনা করার, অন্য দিকে নিজের অসংখ্য বিকারের মোহে মুর্চ্ছাহত মধ্যবিত্ত সমাজকে নিজের স্বরূপ চিনিয়ে দিয়ে সচেতন করার। জানা ছিল না যে স্বাভাবিক নিয়মেই এ সমাজের মরণ আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী এবং তাতেই মঙ্গল—সংকীর্ণ গণ্ডী ভেঙে বিরাট জীবন্ত সমাজে আত্ম-বিলোপ ঘটার মধ্যেই আগামী দিনের অফুরন্ত সম্ভাবনা।
>
> ['ভূমিকা', *সমুদ্রের স্বাদ*]

প্রতিবিম্ব উপন্যাসের নায়ক তারকের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই 'সংকীর্ণ গণ্ডী ভেঙে বিরাট জীবন্ত সমাজে' প্রবেশ—মধ্যবিত্তের সংকীর্ণ গণ্ডি ভেঙে নিম্নবিত্তের বিরাট জীবন্ত সমাজে নবপ্রস্থান।

উপন্যাসটি ঘটনায় ঠাসবুনোট। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এক-দৌড়ে শেষ হয়েছে। এই ছোটো উপন্যাসের এই বিশেষ ফর্ম বা রূপবন্ধন এর বিষয়ের অন্তশ্চারিত্রের সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত : নির্বাচিত কয়েকটি দ্রুত চলমান ঘটনার মধ্য দিয়ে গ্রাম থেকে শহর এবং শহর থেকে গ্রাম একটি ছোটো বৃত্ত সম্পূর্ণ ভ্রমণ করেছে। এর মধ্যেই এসেছে একটি পরিবারবৃত্ত : অতিস্নেহশীল বাপ-মা, তারক, তারকের দাদা ও বৌদি; পার্টির দ্বিতীয় একটি বৃত্ত : শৈলেশ, নিশীথ, মনোজিনী, সীতানাথ, সেক্রেটারি; এই দুই বৃত্ত থেকে জাগ্রত কয়েকটি ঘটনা, ঐ বৃত্তের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইরের কয়েকটি ঘটনা—এইসব রেখা আর বলয় একটি লক্ষ্যেরই অভিমুখী। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র তারক পরম্পর ও ধারাবাহিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে একটি সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছেছে। স্বাভাবিকভাবেই ঘটনাগুলি অতিনির্বাচিত, একটি ঘটনা বা ঘটনাজাত অভিজ্ঞতা মিলিয়ে যেতে-না-যেতে অন্য একটি ঘটনা বা ঘটনাজাত অভিজ্ঞতা আছড়ে পড়েছে। যেহেতু দীর্ঘ উপন্যাস নয়, কাজেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো ডালপালাই প্রসারিত হয়নি, অনুপুঙ্খও না, কয়েকটি দ্রুতধাবমান প্রয়োজনীয় মুহূর্তই অঙ্কিত হয়েছে। এই উপন্যাসের অবয়ব একেবারেই মেদহীন, অনতিরিক্ত। যেটুকু রং ও রেখা না-হলে উপন্যাস উপন্যাসই হয় না, কেবল যেন সেই সারাৎসারটুকুই ধরে দেওয়া হয়েছে ক্ষীণ ছোটো একটি অধ্যায়ে। কিন্তু তারই মধ্যে দেওয়া হয়েছে এক সম্পূর্ণতা। সবগুলি রেখা আর বলয় স্পষ্ট, দৃঢ় ও উদ্দেশ্যের অভিমুখ—এবং অকম্পিত। মানিকের ভাষাও নির্মেদ, বাহুল্যবর্জিত। উপন্যাস শুরু হয়ে যায় খুব সাধারণ, অনাটকীয় একটি বাক্যে 'বেশি না হোক, বাপ প্রতি মাসে পেনসন পান।' মানিক-যে প্রয়োজনের বেশি একটুও কথা বলেন না তার প্রমাণ তারকের বৌয়ের কোনো নাম নেই, কিন্তু তার এক-টুকরো বর্ণনাই তাকে জীবিত করে তোলে :

> সদরের একজন মোক্তারের মেয়ে। বেশ দেখতে। সবই যেন বেশ বৌটির। চলাফেরা ওঠা বসা বেশ, লজ্জা বেশ, আত্মসমর্পণ বেশ, ঠোঁট বেশ, ফিসফিস কথা বেশ! [পৃ. ৩৭৭]

কিংবা যেমন কল্লোলী কবিরা কোনো-কোনো শব্দের বা বাক্যের ক্রমাগত আবৃত্তি-পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে একটি আবহ সৃষ্টি করতেন[৪] তেমনি করেছেন একটি দুর্ভিক্ষপীড়িত শিশুর বর্ণনায় :

> ছেলেটা একেবারে উলঙ্গ, বাঁকা মেরুদণ্ড আর পাঁজরের হাড়গুলির চেয়ে তার মাংসহীন পাছায় শতকুঞ্চনে কুঞ্চিত চামড়াই যেন বরফ-শৈত্যের শিরশির শিরশির শিরশির শিরশির শিহরণ। [পৃ. ৪০৪]

আর মানিকের বিখ্যাত বাঁকা বাকভঙ্গি তো আছেই :

> তার [তারকের] মনে হল বাংলার জীবন যৌবন ধন মান কালস্রোতের বদলে শুধু জলস্রোতে ভেসে যাচ্ছে!

সংলাপের স্বাভাবিকত্ব ও স্বচ্ছন্দ সাবলীলতা মানিকের একটি বৈশিষ্ট্য; উপন্যাসের শেষ বাক্যটিই শুধু স্মরণ করতে চাই, যেখানে তারক সোল্লাসে তার বৌকে বলছে :

> হার্ট ভাল হোক, তৈরি হয়ে নিই, তারপর একচোট দেখিয়ে দেব কাজ কাকে বলে! তার আগে ঘর ছেড়ে নড়ছি না। জেলের মত ঘরে কয়েদী হয়ে থাকব, তুমি পুলিশের মত আমায় পাহারা দিও। [পৃ. ৪১৫]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই উপন্যাসের স্ট্রাকচার বা গঠনপ্রণালি ঘনসন্নিবদ্ধ। উপন্যাসে প্রতিটি বিষয় থাকে পরস্পরসম্পর্কিত।[৫] ছোটো উপন্যাসে এই নিবিড়তা ও পরস্পরসম্বন্ধ আরো স্বাভাবিক। এই অন্তর্বুনন *প্রতিবিম্ব*-এ ছড়িয়ে আছে নিঃশব্দ একটি জালের মতো। এই অন্তর্বুনন নানাভাবে সম্পন্ন হয়েছে: গ্রাম—শহর—গ্রাম; পরিবার—পার্টি; বস্তু—কল্পনা। আর সমস্ত কাহিনী ক্রমাগত অগ্রসর হয়ে গেছে অ-জটিল কেন্দ্রাভিমুখ একটি ধারায়—তারককে মধ্যখানে রেখে। 'আধুনিক উপন্যাসের স্বল্পরেখ সংহত বক্রতা'[৬] *প্রতিবিম্ব* উপন্যাসে পরিপূর্ণ উপস্থিত।

২. 'লেখকের বক্তব্য' ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

যুগান্তর পূজাবার্ষিকীতে প্রকাশের পর *প্রতিবিম্ব* নিয়ে একটি বিতর্ক উপস্থিত হয়। কাজেই গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বেয়াল্লিশ পৃষ্ঠার উপন্যাসে দুপৃষ্ঠার একটি ভূমিকা জুড়ে দেন। তাতে তিনি *প্রতিবিম্ব* বিষয়ে বিতর্ক যেমন খণ্ডন করবার চেষ্টা করেন, তেমনি তাঁর পুরোনো একটি উপন্যাস, *অহিংসা* (১৯৪১), বিষয়েও অভিযোগ নিরাকরণের চেষ্টা করেন।

'লেখকের বক্তব্য' নামে ঐ ভূমিকায় মানিক লেখেন:

> আপনাদের স্পষ্ট ভাষায় বলে দেওয়া কর্তব্য মনে করছি যে 'প্রতিবিম্বের' মধ্যে কোনো বিশেষ পার্টির স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোনো ইঙ্গিত খুঁজবার চেষ্টা করবেন না।

কিন্তু প্রায় সব সমালোচকই বলেছেন এবং তা পরিষ্কারভাবেই প্রতিভাত হয় যে তারকের পার্টি স্পষ্টতই কম্যুনিস্ট পার্টি। একটি সাক্ষ্য:

> বইয়ের ভূমিকায় লেখক যা-ই বলুন, যে-কোনো সতর্ক পাঠকই বলবেন 'প্রতিবিম্বে' কমিউনিস্ট পার্টিই মানিকের লক্ষ্য।
>
> [পৃ. ৫৫০, পরিশিষ্ট চ, *মা. গ্র.* ১৩: ক্ষেত্র গুপ্ত]

মানিকের এ উক্তি বরং স্বীকার্য:

> বইখানা যে মনের বিব্রত দৃষ্টিভঙ্গী ও চেতনার আপেক্ষিক সঞ্চরণশীলতার প্রান্তগ্রাহী প্রতিবিম্ব, সেই চেতনাশ্রয়ী মনই এজন্য দায়ী। পরিবেশের দ্রুত আবর্তনশীল আকর্ষণ ও বিকর্ষণের চাপ মনকে এই অবস্থায় এনে দেয়। অতিক্রান্ত মনের সংখ্যা বেশি নয়।

এ আসলে অনেকখানি কম্যুনিস্ট কর্মী ও সমালোচকদের কাছে কৈফিয়ত-স্বরূপ। কেননা যে-'মন্তব্য ও অভিযোগ' লেখককে শুনতে হয়েছে, তা মূলত এঁদের কাছ থেকেই। একজন মানিক-সমালোচক তৎকালীন পরিবেশ ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানিয়েছেন:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

His joining the ranks of Communists came to many as a surprise. Most people had come to vegard Manik's "Pratibimba" then recently published as anti-communist in spirit. So his conversion to communism struck them as something abrupt and unusual.

[পৃ. ৩৮, *Manik Bandyopadhayay*, Saroj Mohan Mitra]

একজন কম্যুনিস্ট কর্মী ও সমালোচকের সমকালীন প্রতিক্রিয়ার চিত্রের উদ্ধৃতি এখানে প্রাসঙ্গিক :

...মানিকবাবুর আর একটি ছোটো গল্প [উপন্যাস][৭] 'প্রতিবিম্ব'। এতে তিনি কয়েকটি কমিউনিস্ট চরিত্রের অবতারণা করেন।[৮] আমাদের সম্পর্কে তাঁর আন্তরিক সদিচ্ছা প্রকাশ পেয়েছিল এ গল্পের [উপন্যাসের] ছত্রে ছত্রে। তবু এতে প্রকট হয়ে উঠেছিল প্রগতি সম্পর্কে তাঁর এতদিনকার আধা-নৈরাজ্যবাদী ধারণার জের। তাই অধিকাংশ চরিত্রই আমাদের কাছে বেশ কিছুটা অস্বাভাবিক বোধ হয়েছিল। সব মিলিয়ে গল্পটি [উপন্যাসটি] উৎরোয়নি মোটেই। তবু এ গল্পের [উপন্যাসের] সূত্র ধরেই মানিকবাবুর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ঘটে। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের 'ফ্যাসিস্তবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে' যোগ দেন ১৯৪৩ সালের গোড়ায়। এর কিছু দিনের মধ্যেই একদিন একান্তে পেয়ে তাঁকে সভয়ে জানিয়েছিলাম 'প্রতিবিম্ব' সম্পর্কে আমাদের মতামত। 'সভয়ে' কারণ বড়ো লেখকের উত্তুঙ্গ আত্মাভিমানের পরিচয় তখনো আমরা পাচ্ছি পদে পদেই। / মানিকবাবু কিন্তু আমাকে দ্বিতীয়বার অবাক করলেন এই বলে : 'অর্থাৎ গল্পটা [উপন্যাসটা] কিছুই হয়নি বলতে চান তো? তা কি করে হবে বলুন? কতটুকু জানি আপনাদের? যখন আপনাদের ঠিকমত চিনব দেখবেন তখন গল্প [উপন্যাস] উতরোয় কি উতরোয় না!'

['মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রগতি লেখক আন্দোলন' : চিন্মোহন সেহানবীশ, *পরিচয়*, পৌষ ১৩৬৩]

যেন এ ধরনের অভিযোগের জবাবেই মানিক *প্রতিবিম্বর* ভূমিকাটি লিখেছিলেন বলে মনে হয়। কিন্তু, আমাদের মতে, উদ্ধৃত সমালোচকের উক্তি শিল্পবিবেচনার দিক থেকে অবান্তর। তিনি শিল্পে কল্পনার দিকটিকে সম্ভবত কোনো মূল্য দান করেননি, বাস্তবের—বহির্বাস্তবের অবিকল প্রতিরূপই আশা করেছিলেন, তাই এই উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্রই তাঁর ও তাঁদের কাছে 'অস্বাভাবিক' মনে হয়েছিল। আসলে মানিকের অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসের চরিত্রদের অধিকাংশের মধ্যে একটুখানি অস্বাভাবিকত্ব লেগে থাকে (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাথমিকভাবে যাকে চিহ্নিত করেছিলেন 'জীবনে সাংকেতিকতা ও উদ্ভট সমস্যার আরোপ' বলে)।[৯] আর মানিক-যে সমালোচকের অভিযোগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বীকার করে নেন তা-ও কোনো কিছু প্রমাণ করে না, শুধু এটুকুই জানিয়ে দেয় : এক, মানিকের সহিষ্ণুতা ছিল অসম্ভব; দুই, নতুন একটি বিষয় সম্পর্কে তাঁর ঔপন্যাসিক-শোভন তথ্যের তৃষ্ণা ছিল বিপুল; তিন, মানিকের মানস ছিল সতত সম্মুখযাত্রিক, যে-সাহিত্য লেখা হয়ে গেছে তার সম্বন্ধে তিনি ছিলেন নির্মোহ, পরবর্তী রচনাকে সার্থকতার সন্ধান দিতেই তিনি ছিলেন সচেষ্ট।

মানিকের উপন্যাসকর্মের স্ট্রাকচার বা গঠনপদ্ধতির একটি নিজস্ব চিহ্নিত কুশলতা আছে, ছোটো পরিধির মধ্যেও যা একটি ভ্রমণ সম্পন্ন করে, আন্তর ভ্রমণ। এবং তা, অনেক সময়ই, শান্ত রস পরিণামী, অন্তত মানসভ্রমণের একটি সম্পূর্ণ আস্বাদ সে দেয় তার পাঠককে এর সঙ্গে পরিচয়ের অভাব থেকেই মানিকের বিরুদ্ধে যৌনতার বিকারের, মর্বিডিটির, অনতিক্রান্তির (অর্থাৎ বলিষ্ঠ ভাবাদর্শ প্রচারের *প্রতিবিম্ব* প্রসঙ্গে মানিক বলেছিলেন, 'অতিক্রান্ত মনের সংখ্যা বেশি নয়।' অভিযোগ ওঠে। তাঁর প্রায় সব উপন্যাস থেকেই মানিক-যে একটা মানস-অভিযাত্রা প্রেরণ করেন, সেটা বিস্মৃত হলেই এ ধরনের সমালোচক নিক্রান্ত হয়—*প্রতিবিম্ব* প্রসঙ্গে যেমন রায় দিয়েছেন একজন সমালোচক :

> তারক নিজের তরুণী ভার্যার সাহচর্য লাভ করবার জন্য বৃদ্ধ পিতার ভারবাহী হয়ে পিতার কাছে স্থায়ী হয়েই থেকে গেল। এই বিবেকহীন যুবক এর পর যাপন করবে একটা বিকারগ্রস্ত ঘরোয়া জীবন। অথচ সে মনকে এই বলে প্রবোধ দিচ্ছে যে, এর ফাঁকে সে শ্রমজীবী মানসকে ঘনিষ্ঠভাবে জেনে নেবে।
>
> [পৃ. ১৭৪, *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*: নাজমা জেসমিন চৌধুরী]

AMARBOI.COM

ঘরোয়া জীবন যাপন করাই যদি বিকারগ্রস্তের লক্ষণ হয়, তাহলে তো মুশকিল! 'দেশের পরিচিত চাষী-মজুরগুলোকে একবার চিনে আসতে হবে।' এই উক্তি তারকের নিজের উদ্দেশে প্রবোধবাক্য নয়; এ তার জীবনাভিজ্ঞান। এ উক্তিকে না-বুঝতে পারলে তারকের জীবনার্থকেই বোঝা যাবে না। মধ্যবিত্ত জীবনের শঠতা, হীনতা, ভীরুতা, কাপট্য, জটিলতা অর্থাৎ মধ্যবিত্ততা থেকে সে যে এক ব্যতিক্রম, তা তো এই ছোটো উপন্যাসেও আগাগোড়া বজায় থেকেছে। তার আপাত-আলস্যের মধ্যেও সে যে সন্ধিৎসু, সে যে বাধ্যতামূলকভাবেই কয়েকটি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অর্জন করল এই জ্ঞান যে নিম্নবিত্তেরা অন্তত একজোট ও অনাত্মকেন্দ্রী ('পশ্চিমা লোকটি গোড়ায় একা ছিল, কেউ তার পক্ষ নেয়নি। কিন্তু তাকে ত্যাগ করেনি কেউ, অসময়ে বর্জন করেনি।'—পৃ. ৪০৬) আর মধ্যবিত্তেরা জটিল, আত্মবিভক্ত ও আত্মবলয়িত ('সবাই এখন একসঙ্গে, মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ভদ্রলোককে একা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে দিয়েছে।'—পৃ. ৪০৬)—এইসব অভিজ্ঞতাই তারককে তার গন্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছে—সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর কিন্তু এই বক্তব্য কোনো চীৎকৃত উচ্চারণে আসেনি, উপন্যাসে জীবন যেভাবে রচিত হয় সেভাবেই এসেছে। এই বক্তব্য যে প্রবোধবাক্য দূরের ব্যাপার কথার কথাও নয়, মানিক তো তাঁর জীবন দিয়েই প্রমাণ করেছেন। পরবর্তী বছরে কম্যুনিজম গ্রহণ করেন তিনি—সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর একটি মাধ্যম হিশেবে। তাই *প্রতিবিম্ব*কে কম্যুনিস্ট-বিরোধী উপন্যাস হিশেবে যাঁরা চিহ্নিত করেছিলেন তাঁরা যে মানিকের অন্তঃসন্ধান বুঝতে পারেননি, সেটাই স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে হয়। আসলে উপন্যাসের অন্তিমে তারকের সিদ্ধান্তটি বুঝে উঠতে না-পারাই সম্ভবত এই বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে।

তারকের গ্রামে ফিরে যাওয়া কি তার পরাজয়? তার 'অলস মন্থর সরস' জীবনে ফিরে যাওয়ার ইঙ্গিত? দেখা যাচ্ছে, কোনো-কোনো সমালোচক তা-ই মনে করেছেন। আমাদের বিবেচনায়, শেষ অংশের হালকা চালের বর্ণনাভঙ্গিই হয়তো এরকম ভুল সিদ্ধান্তের জন্যে দায়ী। কেননা, তারক তো তার আগেই পরিষ্কার বলেছে, জোর দিয়েই বলেছে, 'মানুষগুলোকে একটু চিনে আসি।' আমাদের বিশ্বাস, *প্রতিবিম্ব* কোনো পরাজয়ধর্মী উপন্যাস নয়। তারকের গ্রামে ফিরে-যাওয়া আসলে তার পরবর্তী যাত্রাপথের একটি নির্দেশক। কীভাবে বাঁচব?—এটাই তো ছিল তারকের সমস্যা। মধ্যবিত্ত সংসারে থেকেও সে কোনো প্রচলিত জীবনযাপন-প্রথার ধার ধারেনি। তারকের বেঁচে-থাকার পদ্ধতিও সে নিজের মতো করেই তৈরি করে নেয়। মানিকের আরো কোনো-কোনো উপন্যাসের নায়কের মতো (খানিকটা তাঁর নিজেরও মতো) তারকের চরিত্রে আছে অস্তিত্ববাদী ছাপ।

উপন্যাসের অন্তিমে এক দার্শনিক সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছে তারক। কিন্তু তারক তো উপন্যাসের নায়ক, সাহিত্যের যে-প্রকরণকে ডি. এইচ. লরেন্স বলেছেন 'bright book of life'; কাজেই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা বা প্রচার তার লক্ষ্য হতে পারে না (মনে হয়, কেউ-কেউ উপন্যাসের কাছ থেকে ওরকম আশা করায় বিভ্রান্ত হয়েছেন)। ফলে তারকের কাছ থেকে, অন্য-সব চরিত্রের কাছ থেকেও, আমরা আশা করি এক সজীব, প্রত্যক্ষ, তত্ত্বাতীত জীবনস্পর্শ। আর তা আমরা পূর্ণভাবেই পাই। ট্রামে মার-খাওয়া পশ্চিমা লোকটি যখন প্রহারকারী ভদ্রলোকের শার্ট-টাই মুঠো করে ধরে বলে, 'কাহে মারা বাবুজী?' কিংবা তারকের কাছে কথা বলতে গিয়ে মনোজিনীর অবচেতনের আকস্মিক উদ্ভাস, '...ওরা [তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকেরা] আপনাদের "যদি" "কিন্তু"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হয়তো"র নাগাল পায়নি।...' কিংবা বৌয়ের উদ্দেশে তারকের শেষ উক্তি, 'জেলের মত ঘরে কয়েদী হয়ে থাকব, তুমি পুলিশের মত আমায় পাহারা দিও।' তখন আমরা জীবনের কাঁচা-তাজা স্বাদ-গন্ধ পাই। এই উপন্যাস যখন লেখা হয় তখনো মানিক কম্যুনিস্ট মতবাদে দীক্ষিত হননি। উত্তরকালে অন্তত কয়েকটি গল্প-উপন্যাসে লেখকের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার ঝোঁক গল্প-উপন্যাসের স্বাভাবিক তত্ত্বাতীত জীবনময়তা নষ্ট করেছে *প্রতিবিম্ব*-এ তা হয়নি। উপন্যাসটি, তার নায়ক তারকের মতোই, স্বাধীন ও বিমুক্ত থেকেছে।

তথ্যনির্দেশ

১. 'The novelist shows his exuberance either by an exhaustive analysis of human relationships, as in Henry James, or of social phenomena, as in Tolstoy.' ['Specific Continues Form', *The Anatomy of Criticisms*]

২. A novel may be said to be the man who writes it. Now it is nearly always true that a novelist, perhaps unconsciously identifies himself with the one chief or central character in his novel. Into this character he puts not only what he thinks he is but what he hopes to be. We can call this spokesman the self-character [John Stein beck]

৩. মানিকের *আজকাল পরশুর গল্প* (১৯৪৬) ও *পরিস্থিতি* (১৯৪৬) গ্রন্থের সবগুলি গল্প ১৩৫০-এর মন্বন্তর নিয়ে লেখা। ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত *চিন্তামণি* উপন্যাসেরও বিষয় তাই।

৪. মুখ্যত জীবনানন্দ দাশ ও বুদ্ধদেব বসু।

৫. বাক্যটি ডি. এইচ. লরেন্স-এর: 'In a novel everything is relative to everything else.'

৬. পৃ. ৫৪, 'উপন্যাসের স্বরূপ' : শিশির চট্টোপাধ্যায়।

৭. সমালোচক *প্রতিবিম্ব*কে বারবার ভুল করে গল্প বলে উল্লেখ করেছেন, আমরা পরিশোধন করে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে 'উপন্যাস' শব্দটি বসিয়েছি।

৮. দেখা যাচ্ছে: চিন্মোহন সেহানবীশও একে কম্যুনিস্ট চরিত্র চিত্রণ বলেই মনে করেছিলেন।

৯. পৃ. ৫১৩, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিন্তামণি

> জমিদার মহাজন উকিল ডাক্তার দোকানী পশারী আত্মীয় পরিজন। বন্ধু ও পর নিয়ে যত মানুষের সঙ্গে ছিল তাদের [গ্রামের চাষীদের] কারবার, কটা মাসে যেন কেমন হয়ে গেছে তারা সকলে, কথা ও ব্যবহার যেন বদলে গেছে আগাগোড়া, লেনদেনের স্বাভাবিক হৃদয়হীনতা যেন দাঁড়িয়ে গেছে উলঙ্গ কুৎসিত নিষ্ঠুরতায়, লোভের যে অত্যাচার ছিল শুধু আদায়ের জন্য—আদায়ের পরে যেন তা বজায় থাকছে আরো তীব্র ব্যক্তিগত বিদ্বেষ হয়ে।
>
> [পৃ. ১৩ 'চিন্তামণি', *মা. গ্র.* ৬]

AMARBOI.COM

ছোটো, কিন্তু উপন্যাসের সর্বলক্ষণে সম্পন্ন *চিন্তামণি*। মাত্র ৭১ পৃষ্ঠা, ছয়টি পরিচ্ছেদ। তার মধ্যেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং উপন্যাসের অনেকগুলি বিশিষ্টতা সঞ্চিত হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) ও পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ (১৩৫০, ১৯৪৩) মানিক-মানসে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে।[১] উপন্যাসে (এবং গল্পে) সমকালীন দেশ-কালকে মানিক অতিদ্রুত রূপায়িত করতে শুরু করেন এই পর্যায়ে। ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত *চিন্তামণি* উপন্যাস এবং *আজকাল পরশুর গল্প* ও *পরিস্থিতি* ও ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত *খতিয়ান*[২] গল্পগ্রন্থত্রয়ে তৎকালীন ভঙ্গুর বাংলা ও তার মানুষজন উঠে এল চলচ্চিত্রের মতো। 'নিজের অসংখ্য বিকারের মোহে মূর্ছাহত মধ্যবিত্ত সমাজ' (ব্যাক্যাংশটি মানিকেরই, *সমুদ্রের স্বাদ* গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা থেকে) সম্পর্কে মানিকের কোনো দিনই কোনো ভরসা বা উচ্চাশা ছিল না (সাক্ষ্য : *পদ্মানদীর মাঝি*, *দর্পণ*, *জীয়ন্ত* প্রভৃতি) যে-নিম্নবিত্ত ছিল তার সমস্ত আশাভরসার স্থল, তার সকল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূল্যবোধের চিত্রটি এই *চিন্তামণি* উপন্যাসে দেখিয়েছেন মানিক, দেখিয়েছেন এক-এক করে সমস্ত দরোজারই বন্ধ হয়ে যাওয়া।

মানিকের উপন্যাসগুলি নায়কপ্রধান। *চিন্তামণি*—উপন্যাসের এই নামকরণ কি প্রমাণ করছে এই উপন্যাস নায়িকাপ্রধান? সে-ক্ষেত্রে এই তথ্যটি স্মরণীয় যে, এই উপন্যাসটি *পূর্ব্বাশা* পত্রিকায় প্রথম যখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়, তখন এর নাম ছিল *রাঙামাটির চাষী*। এবং 'রাঙামাটির চাষী' হচ্ছে এই উপন্যাসের নায়ক গৌরাঙ্গ বা গৌর। এখানে *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬) উপন্যাসের সঙ্গে এই উপন্যাসের তুলনা-প্রতিতুলনা অনিবার্যভাবে এসে পড়ে (*পদ্মানদীর মাঝি*ও প্রথম *পূর্ব্বাশা* পত্রিকায় আংশিক প্রকাশিত হয়েছিল)। প্রধান সাযুজ্য এই: ক) দুটিই আঞ্চলিক উপন্যাস *পদ্মানদীর মাঝি* পূর্ববঙ্গের ও *চিন্তামণি* পশ্চিমবঙ্গের (চব্বিশ পরগনা এলাকার) পটভূমিতে স্থাপিত; উপভাষা উভয় উপন্যাসে সংলাপে ও বর্ণনায় (উপন্যাসে চরিত্র বিকাশ ও ঘটনা সংস্থানের যে-দুটি প্রধান অস্ত্র) কাজে লেগেছে; কাজেই এ সিদ্ধান্তে আসা যায়: স্থানিক বর্ণিমা (local colour) উভয় ক্ষেত্রেই লেখকের অভীষ্ট ছিল (*পুতুলনাচের ইতিকথা* ও *সার্বজনীন* উপন্যাসে আত্মসচেতন মানিক ইচ্ছা করেই স্থানিক বর্ণিমা পরিহার করেছিলেন); খ) দুটি উপন্যাসেই পারিবেশিক চাপ জীবিকা পরিবর্তনে নায়ককে বাধ্য করেছে: কুবের মাঝির চাষীতে রূপান্তর, চাষী গৌরের শ্রমিকে রূপান্তরণ (দুটি ক্ষেত্রেই ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়ে উপন্যাস সমাপ্ত হয়েছে); গ) উভয় উপন্যাসেই অন্তত নায়ক-নায়িকা একায়তনিক নয়—চলিষ্ণু চরিত্র; ঘ) *রাঙামাটির চাষী*—এই প্রথম নামকরণে ছিল *পদ্মানদীর মাঝি*র মতো নায়কের প্রাধান্য আর প্রধান বৈযুজ্য এই: ক) *পদ্মানদীর মাঝি*তে জেলেজীবন যতখানি তার চেয়ে *চিন্তামণি*তে চাষীজীবন রূপায়ণের দিকে মানিকের লক্ষ্য ছিল বেশি; খ) প্রথমোক্ত উপন্যাসে কুবের-কপিলার পারিবারিক পরিণামই নির্দেশিত, কিন্তু পরবর্তী উপন্যাসে গৌর-চিন্তামণির মিলনের ইঙ্গিতে এক জনগোষ্ঠীর প্রমুক্তির ইশারা আভাসিত; গ) *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসে নিয়তির ভূমিকা রহস্যের ব্যবহার প্রচুর, অন্যপক্ষে *চিন্তামণি* সম্পূর্ণ বস্তুনির্ভর—প্রকাশ্য দিবালোকে উদ্ভাসিত; ঘ) দুটি উপন্যাসেই নিম্নবিত্তের কাহিনী বর্ণিত হলেও *পদ্মানদীর মাঝি*র দারিদ্র্যের মধ্যে নদীর মতোই একটি প্রমুক্তি প্রবাহিত, পক্ষান্তরে *চিন্তামণি*র ক্ষুধা ও দারিদ্র্য ভয়াবহভাবে শ্বাসরোধী।—আসলে একবার *রাঙামাটির চাষী* (পত্রিকায়) আর-একবার *চিন্তামণি* (গ্রন্থাকারে) নামকরণ করলেও, মনে হয়, এই উপন্যাসে গৌর বা চিন্তামণির চরিত্র চিত্রণই মানিকের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না (কেননা ব্যক্তি পাত্র থেকে তখন তার দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে বৃহত্তর সামাজিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধারের প্রতি); বরং গৌর ও চিন্তামণিকে কেন্দ্রে রেখে এক জনগোষ্ঠীর নিম্নাবতরণের চিত্র রচনাই ছিল তার অন্বিষ্ট। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের *পল্লীসমাজ* (শরৎচন্দ্র-রচিত, ১৯১৬) যে ভিতরে-ভিতরে কত পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল, তিরিশের দশকের দুটি উপন্যাসে মানিক তা দেখিয়েছিলেন *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬) ও *পুতুলনাচের ইতিকথায়* (১৯৩৬)। চল্লিশের দশকে সেই গ্রামও-যে ভিতরে-বাইরে একেবারে ছত্রখান হয়ে গিয়েছিল, মানিকই আবার তা দেখালেন দয়াহীন অকম্প্র অক্ষরে—*চিন্তামণি* (১৯৪৬) সেই ক্রম-অন্তঃসারশূন্যতার নিষ্করুণ ও করুণ কাহিনী।

সফল উপন্যাসে পাঁচটি বিষয় বিবেচনায় আনতে হয় : ১. প্লট বা সুগ্রথিত কাহিনী; ২. চরিত্র; ৩. সংলাপ; ৪. বর্ণনা; ৫. বক্তব্য। *চিন্তামণি* উপন্যাসে এই পাঁচটি বিষয় কীভাবে কাজ করেছে, এখানে তা আমরা সংক্ষেপে পরীক্ষা করে দেখব।

১. প্লট বা সুগ্রথিত কাহিনী : ঘটনায় অর্থময় পরম্পরা কাহিনী নির্মাণ করে। মানিকের মতো অন্তর্মুখী ঔপন্যাসিকেরও ঘটনা ছাড়া চলে না। *চিন্তামণি*র মতো সামাজিক বাস্তবতার উপন্যাসে ঘটনা তো থাকবেই।

সমগ্র কাহিনীর ঘটনাস্থল মধুবনী। চব্বিশ পরগনার খিদিরপুর গ্রামের চিন্তামণি 'পেটের খুদায়' (চিন্তামণির দিদির ভাষায়) মধুবনীতে এসেছে। এখানেই উপন্যাসের সমস্ত ঘটনা ঘটে। উপন্যাসের শেষ হয় যখন, তখন চিন্তামণি 'শুকিয়ে মরবে' (চিন্তামণির ভাষায়) এই ভয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার প্রেমিক গৌরের সঙ্গে বড়নিছিপুর চলে যাবার। কাহিনীর পটভূমিবৃত্তটি এরকম : (খিদিরপুর)—মধুবনী—(বড়নিছিপুর)। খিদিরপুরে ছিল চিন্তামণি আর চলে যাবে বড়নিছিপুরে; এ দুটি স্থানই উপন্যাসে আসেনি—কিন্তু দুই প্রান্ত থেকে উপন্যাসটিকে আঁট করে ধরে আছে; আর মধুবনীই উপন্যাসের সমস্ত বর্তমানকাল জুড়ে থাকে।

মধুবনীতে হরের্নাম রাইস মিলের মালিক নীলকণ্ঠ ঘোষালের বাড়িতে দাসীর কাজ পায় চিন্তামণি। এই মধুবনীতেই আছে গৌরাঙ্গ, ডাকনাম গৌর, চাষী, অবস্থা পড়ে গিয়ে এখন দুধ বিক্রি করে সংসার চালায়। তার চাঁদকাকা তাকে ঠকিয়ে সম্পত্তি করেছে অনেক। জিনিষপত্রের অগ্নিমূল্য। চাষীদের দুর্দশার শেষ নেই। গৌরের বন্ধু রঘু অপেক্ষাকৃত অবস্থাসম্পন্ন; তার দুই বৌ—বিরজা আর দুর্গা। দুর্গার জন্যে ডাক্তারের নির্দেশিত 'ফুড' যখন কোথাও পাওয়া যায় না, তখন নীলকণ্ঠের বাড়ি থেকে 'ফুড' চুরি করে চিন্তামণি দেয় গৌরকে। দুর্গা অবশ্য বাঁচে না। গৌরের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হলো চিন্তামণির। সম্পর্ক আরো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাঢ় হয়, রাতে গৌর তার কাছে যায়, চিন্তামণি তাকে শরীরে মনে ভালোবাসে। এরই মধ্যে গৌর তার মামাবাড়িতে যায় চিন্তামণির প্রতি হঠাৎ-বিতৃষ্ণায়। চিন্তামণিও ভাবে পটলের সঙ্গে জুটে যাবে কি না। কয়েক দিন পরে মধুবনীতে ফিরে আসে গৌর। ততদিনে দুর্ভিক্ষ করাল রূপ নিয়েছে। চিন্তামণির দিদির পত্রাবলিতেও আমরা জানতে পারি গ্রামের নরনারীর দুর্দশার করুণ চিত্র। সে নিজেও খিদিরপুর ছেড়ে বড়নিছিপুরে যায় কাজ করতে—প্রথমে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে, পরে ব্যারাকে—সে-ও দাসীর কাজ। অভাবের দিনে বন্ধু রঘুও গৌরকে বর্জন করে। চাঁদ কাকা মৃত; গৌরের মা-ও মারা যায়। অভাবের তাড়নায় চিন্তামণিকে উপহৃত পৈছে ফেরত আনতে গিয়ে গৌরের অবদমিত আবেগ প্রকাশ পায়। ধরা দেয় চিন্তামণিও। সর্বগ্রাসী অভাবের মধ্যে তারা সিদ্ধান্ত নেয় বড়নিছিপুরে কারখানার মজুর হতে চলে যাবে তারা।

ছোটো, কিন্তু সুগ্রথিত কাহিনী। চিন্তামণি ও গৌরকে কেন্দ্রে রেখেই কাহিনী অগ্রসর হয়েছে। চিন্তামণি গৌরের প্রেমকাহিনী এতে বর্ণিত হয়েছে—কিন্তু কাহিনীকথন রীতি কখনোই ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, সম্পূর্ণ সমাজকেন্দ্রিক। চিন্তামণি-গৌরের চারপাশে শুধু অনেক সামাজিক চরিত্র ভিড় করে আসেনি, তাদের প্রেমের গতিও নিয়ন্ত্রণ করেছে আর্থ-সামাজিক সমকালীন চাপ। মানিকের উপন্যাসে একদিন যে ভূমিকা ছিল নিয়তির, এখন তার জায়গা দখল করেছে অর্থনীতি; কিংবা কথাটি ঘুরিয়ে এভাবে বলা যায়, অনির্দেশী নিয়তি নয়, সুনির্দিষ্ট অর্থনীতিই এখন মানিকের চরিত্রদের নিয়তি। আর এই উপন্যাসে তা এক সর্বাত্মক ভাঙনের রূপ নিয়েছে, এই উপন্যাসে চতুর্দিক থেকে বেজে উঠেছে 'গ্রামপতনের শব্দ'।[৩] কিন্তু স্মরণীয়, সেই গ্রামপতনের ধ্বনিকে শব্দরূপ দেবার সময় মানিক তার স্বভাবশোভন নির্লিপ্ততায় ছিলেন স্থির, তাকে সাবয়ব করতে গিয়ে কাহিনীর গ্রন্থনকে শিথিল বা অশিল্পিত করেননি। চরিত্রই বক্তব্যের নির্দেশ দিয়েছে, লেখক এসে তার জায়গা জোড়েননি। কিন্তু আমরা জানি, 'ঔপন্যাসিক নিছক কাহিনীকার নন।'[৪] তার অর্থ কাহিনীকে বাদ দিয়ে নয়—কাহিনীর মধ্য থেকেই ঔপন্যাসিক যে-তাৎপর্য সঞ্চয় ও নিষ্কাশন করে আনছেন তা-ই গুরুত্বপূর্ণ। *চিন্তামণি* উপন্যাসেও সংক্ষিপ্ত ও নির্বহুল একটি কাহিনীর বাচ্যে ও ব্যঞ্জনায় সেই গুরুত্ব প্রতিভাসিত হয়েছে। কথাটি অন্যভাবেও বলা যেতে পারে: *চিন্তামণি* সামাজিক বাস্তবতার অনুপুঙ্খ চিত্র রচনা করলেও সমাজচিত্র নয়—উপন্যাসই। 'রোজ রোজ মানুষের জীবনে সমাজে যা ঘটে তার ধারাবাহিক বিবরণ দিলে একটা সমাজচিত্র লেখা যায়, গল্প নয়। যা সচরাচর ঘটে তার মধ্য থেকে বেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিতে হয় এমন ঘটনা যা সচরাচর ঘটে না। অর্থাৎ যা অসাধারণ—একক।'[৫] যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের সামাজিক বাস্তবতার মধ্য দিয়ে চিন্তামণি ও গৌরই ঐ অসাধারণ ও একক রচনা করে এই উপন্যাসে; একে করে তুলেছে বিবরণধর্মী ও নিস্তাপ সমাজচিত্র নয়—উত্তাল ও তরঙ্গায়িত জীবনের উপন্যাস।

২. চরিত্র : *চিন্তামণি* উপন্যাসের চরিত্রপাত্রদের বিবেচনায় ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত *শুভাশুভ* উপন্যাসের লেখক-কৃত ভূমিকার একটি বাক্যের উদ্ধৃতি জরুরি :

> আমার বিশ্বাস, প্রধান নায়ক ও নায়িকাদের প্রধান করে বজায় রেখেও সংশ্লিষ্ট আরও অনেক চরিত্র আমদানি করলে উপন্যাসের শ্রেণীগত সামাজিক বাস্তবতা রূপায়ণে সাহায্য হয়।
>
> ['লেখকের কথা', 'শুভাশুভ', *মা. গ্র.* ১০]

*চিন্তামণি*তে (ও উপান্ত্য-পর্যায়ী অন্যান্য উপন্যাসে) অনেক চরিত্রের ভিড়ের কারণ এই একটি উক্তিতেই স্পষ্ট হয়। *চিন্তামণি*র মতো সামাজিক বাস্তবতার উপন্যাসেও অনেক চরিত্র (এখানে একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে দেওয়া হলো)

অ) চিন্তামণি
(পরোক্ষে) তার দিদি

আ) গৌরাঙ্গ, গৌর
গৌরের মা

ই) রঘু
বিরজা, রঘুর বড়ো বৌ
দুর্গা, রঘুর ছোটো বৌ

ঈ) নীলকণ্ঠ ঘোষাল
তরুবালা, নীলকণ্ঠের বড়ো মেয়ে
সুনীতি, নীলকণ্ঠের ছোটো মেয়ে

উ) চন্দ্রকান্ত, চাঁদকাকা, গৌরের কাকা
পুঁটু, চাঁদকাকার মেয়ে
পুঁটুর মা, চাঁদকাকার বৌ
বুড়ি, চাঁদকাকার শাশুড়ি

ঊ) অদ্বৈত, গৌরের বড়ো মামা
বড়ো মামী
মেজো মামী
সেজো মামী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ) (অন্যান্য চরিত্র :)

পটলবাবু। হারান। তিনু। মথুর ডাক্তার।

সরোজ বাঁড়ুজ্যে। কালাচাঁদ। বরুল তাঁতী।

জুগু। কুনু। রহিম। নবকান্ত লাইতি।

এসব অনেক চরিত্রই একটি-দুটি আঁচড়ে আঁকা। চিন্তামণি ও গৌরকে বাদ দিয়ে এই উপন্যাসে যে-চরিত্রটি সবচেয়ে গুরুত্ববহ, সে চিন্তামণির দিদি। সারা উপন্যাসে একবারও সে সশরীরে দেখা দেয়নি, কিন্তু চিন্তামণি ও গৌরও বোধহয় নয় তার চেয়ে উজ্জ্বলতর। উপন্যাসের শুরু ও শেষ হয়েছে তারই লেখা ব্যাকরণ-ভুল কিন্তু প্রাণপণ পত্রে; উপন্যাসে আছে তার সর্বসমেত ছয়টি পত্র (শেষ পত্রটি আংশিক); এই উপন্যাসের সংগঠনে ও আত্মায় তার প্রভাব অতিতীব্র। চিঠিপত্রেই সে জীবিত হয়ে উঠেছে : তার আন্তরিক উপভাষিক পত্রের ছত্রে-ছত্রে : আত্মীয়স্বজন ও নিজের অবস্থার অনুপুঙ্খ প্রকাশে, ছোটো বোনের প্রতি ভালোবাসায় ('তুমি পেটের খুদায় মধুবনী গিয়াছ, এই দুক্ষ আমারই অন্তরে জানে।'—পৃ. ৩, পত্রসংখ্যা ১) কি অকুণ্ঠ দাবিতে ('কয়টা টাকা পাঠাইতে লিখিলাম তুমি পাঠাইলে না। কয় মাস বেতন পাইয়াছ তথাপি ইহা কিরূপ। তোমাকে কতকাল খাওয়াইয়াছি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ।'—পৃ. ৩০, পত্রসংখ্যা ৩) কি বিমিশ্র সুখে-দুশ্চিন্তায় ('তুমি আসিতেছ জানিয়া কিরূপ সুখী হইয়াছি তাহা কিরূপে বলিব। মনে খালি ডর পাই যে তোমার কাঁচা বয়স, পুরুষ রক্ষক না থাকিলে না জানি কি বিপদে পড়িবা।'—পৃ. ৭১, পত্রসংখ্যা ৬)।

গৌরের দুই আত্মীয়, চাঁদকাকা ও অদ্বৈত মামা (বা পুরো মামাবাড়ির লোকেরা—ছোটো মামা রাধাচরণ বাদে) পরস্পরের বিপরীত: চাঁদকাকা লোভী, কৃপণ, গৌরকে ঠকায়, 'কাকী পর্যন্ত বলে না যে, আয় রে বাবা, বোস' (পৃ. ৯); আর মামাবাড়ির লোকেরা 'পরম শান্ত, সন্তুষ্ট এবং ধার্মিক, একান্নবর্তী আদর্শ চাষীর পরিবার।' (পৃ. ৫০), মামীরা নিজে না-খেয়ে গৌরকে খাওয়ায়। জীবনের বহুধা বৈচিত্র্যকে জানতেন বলেই অল্পপরিসর এই উপন্যাসেও মানিক এইসব বিরোধী ও বিপরীত চরিত্র সৃজন করেছেন—এবং তাতে জীবনের সাক্ষাৎ স্পর্শই লেগেছে। বোঝা যায়, যে-ধ্বংসোন্মুখ পৃথিবীর ছবি এঁকেছেন মানিক তা তিনি আঁকেননি স্বেচ্ছাকৃত কালো রঙে ছুপিয়ে—ঐ দুর্ভিক্ষের মধ্যেও মামাবাড়ির আদর ঠিকই আছে; রঘুর বন্ধুতাও যদি ফিকে হয়ে এসে থাকে তা কেবল অর্থনৈতিক চাপে। এই উপন্যাসে ঐ দুঃসময়ে একমাত্র সচ্ছল পরিবার নীলকণ্ঠ ঘোষালের। নীলকণ্ঠ ধনবান, কিন্তু সকালবেলাও জেগে-জেগে দেখে 'টাকার স্বপ্ন'—রঘুর মুমূর্ষু বৌ দুর্গার জন্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা 'ফুড' বিক্রি করতেও সে রাজি নয়, এমনই সংকীর্ণ। আর তার গৃহিণী? 'অনেক লম্পটের শোষণে ছিবড়ে বনা বাজারের মেয়েলোকের মত এ বাড়ির গিন্নির চেহারা, গলার মোটা চেন হারটি সোনার শিকলের মত।' (পৃ. ২২) এদের প্রতি মানিকের ঘৃণা স্বপ্রকাশিত।

কিন্তু এসব চরিত্র আঁকা হয়েছে দু-একটি রেখায় কি রঙে। *চিন্তামণি*র মতো ছোটো বহুচরিত্রময় সামাজিক উপন্যাসে এর চেয়ে বেশি অবকাশ ছিল না। শুধু চিন্তামণি ও গৌরের চরিত্র বর্ণিল, আলো-ছায়ার সম্পাতে জটিল ও সজীব, এবং চলিষ্ণু।

চিন্তামণি একদা-বিবাহিতা, অধুনা বিধবা, বয়স্কা, অভিজ্ঞ, দরিদ্র, ক্ষুধা আর দারিদ্র্য তাকে চব্বিশ পরগনার ছায়াঘন খিদিরপুর গ্রাম থেকে মধুবনীতে নিয়ে এসেছে। কিন্তু অভাব ও দারিদ্র্য তার সজীবতা ও সপ্রাণতা হরণ করতে পারেনি। সে জীবনতৃষ্ণার্ত। (তুলনায় চিন্তামণির দিদির 'বয়স হইয়াছে।'—পৃ. ৬৬, পত্রসংখ্যা ৫) চিন্তামণি রূপসচেতন (...এই বাজারে এত বছর মিহি কোড়া থানকে ফেরতা দিয়ে পরে আর কপাল-ঢাকা মেয়েটি ঘোমটা টেনে চাবির গোছায় ভারি রিং আঁচলে বেঁধে পিঠে ঝোলায়...' পৃ. ৬), শরীরসচেতন (...দমক মেরে পিছন ফিরে সে হাঁটতে শুরু করে দেয় তাড়াতাড়ি ছোট ছোট পা ফেলে হাঁটার ভঙ্গিতে। অনেকদিন থেকে সে জানে এমনি করে হাঁটার সময় কোমরের নীচে দেহের গাঁথুনি তার মানুষের নজর টেনে নেয়। কোনদিন তার কোমর দুলিয়ে হাঁটা দেখার কপাল যদি নাই হয়ে থাকে এ ছোঁড়ার [গৌরের], আজকে দেখুক।'—পৃ. ২৪) কিন্তু এসবই তার যৌবনের স্বভাবী প্রকাশ, অন্তরে সে কোমল, দরদী : মুমূর্ষু দুর্গার জন্যে নীলকণ্ঠের বাড়ি থেকে 'ফুড' চুরি করে সে-ই এনে দিয়েছিল গৌরকে। মানবচরিত্র মানিক গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন বলেই তাঁর রচিত চরিত্রে আমরা দেখতে পাই বৈপরীত্যের সমন্বয়। এই সমন্বিত বৈপরীত্য আছে চিন্তামণির চরিত্রেও : একদিকে সে গভীরভাবে আবেগপ্রবণ, অন্যদিকে বাস্তববাদী : চিন্তামণি একবার গভীর আবেগে আন্দোলিত হয়ে গৌরের পায়ে হাত রেখে বলেছিল, 'মাপ করো। শুনছ? মাপ চাইছি তোমার ঠেঁয়ে। আর কিছু চাইনে আমি, সত্যি চাইনে। যদি চাই তো খানকি বোলো মোকে।'[৭] (পৃ. ৪৫), অন্যদিকে গৌর মামাবাড়ি গেলে খানিকটা রাগে খানিকটা 'নিশ্চিন্ত স্বাভাবিক সুখে'র আশায় চিন্তামণি ভাবে, '... আজ রাতেই বোঝাপড়া চুকে যাক পটলের সঙ্গে।' (পৃ. ৫৪) চিন্তামণি অবশ্য সত্যিই ভালোবেসেছিল গৌরকে। তাই গৌর যখন তার কাছে আত্মসমর্পণ করে, তখন তারও আর বাধা দেবার ক্ষমতা থাকে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরুণ ও অনভিজ্ঞ হলেও গৌর, মানিকের অন্য নায়কদের মতোই জীবন ব্যাপারে সিরিয়াস : 'জীবন তার কাছে ভয়ানক ভারী আর গভীর, একটুখানি কুঁড়েঘরে বুড়ি মা, কচি বোন আর গাই-বাছুরটি নিয়ে সমারোহহীন যে জীবনটুকু সে যাপন করে।'[৮] (পৃ. ২৩) *পুতুলনাচের ইতিকথার* শশীর মতো তারও চরিত্রে আছে দুটি ভাগ : একদিকে 'কল্পনা, ভাবাবেগ ও রসবোধ', অন্যদিকে 'সাধারণ সাংসারিক বুদ্ধি ও ধনসম্পত্তির প্রতি মমতা' (উদ্ধৃতিচিহ্নের অন্তর্ভূত শব্দগুলি মানিকেরই—শশীর চরিত্রজ্ঞাপক)। মেঠো রাস্তা গৌরের কল্পনা উদ্বোধন করে। তার বাস্তব পরিচয় চাষী বা গোয়ালা—কিন্তু সে গানও রচনা করতে পারে (পৃ. ২৩)। গৌর তরুণ বলেই এমনকি চিন্তামণির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের পর তার মনে পড়ে 'ভোলার মেয়ে কালী, রঘুর ভগ্নী পাঁচী, কেষ্ট শম্ভু পরান রসিকদের নতুন বৌ আর দাঁতপুরে তার মামাবাড়ির পাড়ায় যে একটা মোটাসোটা মেয়ে থাকে, এদের কথা' (পৃ. ৪৪) কিংবা 'একটি ছিপছিপে কিন্তু পরিপুষ্ট সাঁওতালী মেয়েকে বিয়ে করার অবাস্তব অসম্ভব কল্পনা' (পৃ. ৪৮) কিংবা 'বিয়ে করা কচি বৌকে নিয়ে সংসার করার' (পৃ. ৬৪) পাঠ। (অতিচেতন মানিক চিন্তামণিরও গৌর-প্রেমের বাইরের অতীত একটি বেদনার্ত স্মৃতিরেখা উপহার দিয়েছেন : 'মৃদু একটা ব্যাকুলতা মনে আসে চিন্তামণির, বিয়ের আগে গৌরের বয়সী সেই যে একজন তাকে তীব্র যন্ত্রণা দিয়েছিল মৃদু বেদনার সঙ্গে তার কথা মনে পড়ে এতকাল পরে।'—পৃ. ২৫) এগুলো গৌরের স্বপ্ন-কল্পনার দিক। তার বাস্তব দিকও আছে। চাঁদকাকা সম্পত্তি বাড়ালে সে 'ঈর্ষার তীব্র জ্বালা' বোধ করে। নীলকণ্ঠকে প্রচুর জল-মেশানো দুধ খাইয়ে 'হিংসার সুখে' মনপ্রাণ তার তাজা হয়ে ওঠে।' (পৃ. ২২) চিন্তামণিরই অগ্রণী ভূমিকায় গৌর তার প্রেমে পড়েছিল—তীব্রভাবেই পড়েছিল। কিন্তু তার বাস্তব সাংসারিক বুদ্ধিই তাকে পরামর্শ দেয় 'বিয়ে করা কচি বৌ' নিয়ে ঘরসংসার করবার। আর তখনই 'চিন্তামণির শক্ত বাঁধন কেটে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার অস্পষ্ট ইচ্ছাও অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।' (পৃ. ৬৪) দুর্ভিক্ষ আরো করাল মূর্তি নিলে, বন্ধু রঘু তাকে বর্জন করলে, মা মারা গেলে তাদের অপ্রতিরোধ্য প্রেমও যেমন পরস্পরের কাছে স্বীকৃত হয় তেমনি যেন বাস্তব প্রয়োজনেই তাদের একত্রিত করে।

বাস্তবতা ও কল্পনার মিশেলে, অন্তর্বাস্তবতা ও বহির্বাস্তবতার মিশেলে চিন্তামণি ও গৌর জীবন্ত চরিত্রে পরিণত হয়েছে।

৩. সংলাপ : উপন্যাসে লেখকের অবলম্বন দুটি : অ) সংলাপ, আ) বর্ণনা। সংলাপ চরিত্র চিত্রণের প্রধান হাতিয়ার। মানিকের সংলাপ রচনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দক্ষতা অসামান্য। দুই ধরনের সংলাপ লিখেছেন তিনি : অ) সাধারণ চলতি গদ্যভাষায়, আ) আঞ্চলিক গদ্যভাষায়, বা উপভাষায়। উপভাষা তিনি ব্যবহার করেছেন মূলত দুই অঞ্চলের : অ) পূর্ববঙ্গ ও আ) চব্বিশ পরগনার।[৯]

চিন্তামণি উপন্যাসের নরনারীরা চব্বিশ পরগনা অঞ্চলের। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে তারা ঐ অঞ্চলের ভাষায় কথা বলেছে। সেদিক থেকে এই উপন্যাসে একটি স্থানিক বর্ণিমা (local colour) ফুটে উঠেছে।

৪. **বর্ণনা :** মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাভাবিক সাবলীল গদ্য শৈল্পীর মধ্যেও আবার *চিন্তামণি* আরেকটু বিশিষ্টতা যোগ করেছে। সেটা হচ্ছে গদ্যভাষায় স্থানিক বর্ণিমা লাগানো। *চিন্তামণি* আঞ্চলিক উপন্যাস। তাই এই রং লাগানো ছিল প্রয়োজনীয়। সেই স্থানিক রং লেগেছে নানাভাবে : এক, চরিত্রপাত্রদের সংলাপে; দুই, চিন্তামণির দিদির পত্রাবলিতে (যা এই ছোটো উপন্যাসকে আনুপূর্ব একসূত্রে গ্রথিত রেখেছে); তিন, এমনকি বর্ণনায়। সংলাপ ও চিন্তামণির দিদির পত্রাবলির কথা আগেই বলা হয়েছে; বর্ণনার স্থানিক বর্ণিমা সঞ্চারের দু-একটি দৃষ্টান্ত এখানে সংকলন করা গেল :

১. আজ তারা যেন কোথায় উধাও হয়েছে। উধাও কি হয়েছে? না রোগাপটকা বনে' গাঁয়েই আছে তাই ঐ বন্ননা খাটে না? [পৃ. ৫]
২. হাওয়ায় ভাসা কথার বেলা সমাজ তাই কানা। পিছে যদি কেউ লাগে আর হাতে-নাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, হা দ্যাখো, তখন সমাজ দণ্ড দিয়ে বলে যে আজ থেকে তুমি পতিত হলে, প্রাচিত্তির করে যদি ভোজ দেও সমাজকে তবেই উঠতে পারো সমাজে নইলে নয়। [পৃ. ৬]
৩. লাল কাঁকরের পথটা এখন ধুলোয় কাদায় কাদা, হেথায় হোথায় গাড়ীর চাকার গর্তে জমা জল। [পৃ. ৮]
৪. ঝি আর মজুর মাগীদের সাথে কি তার [চিন্তামণির] বনে, সে ছিল চিরটা কাল ঘরের মেয়ে, ঘরের বৌ আর ঘরের রাণী! [পৃ. ২৮]
৫. তার আপনপনার ঘটা দেখে গৌরের মা কুরিয়ে কুরিয়ে তাকিয়ে ছিল তার দিকে। ছেলে তার পুরুষ তো বটে, বিয়ে যদ্দিন না করছে মেয়েলোক একটা ঘাঁটে তো ঘাঁটুক, সস্তা আর বাজে মেয়েলোক। কিন্তু পীরিত জানা সোহাগ-বেতর পুরুষচাটা এ মাগীর খপ্পরে পড়লে ছেলে তো তার বিগড়ে যাবে! [পৃ. ৩৮]

প্রকৃত ঔপন্যাসিক উপমা-উৎপ্রেক্ষা ব্যবহারে[১০] কবিত্ব সৃষ্টি করতে চান না, বরং আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁর বর্ণিত জগৎটিকেই উজ্জ্বলতর গাঢ়তর করবার। *চিন্তামণি* থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. বুড়ো হারানের সাত বিঘে জমি, তার চার বিঘেতে বীজ ছড়ানো চলবে, তিন বিঘে বাঁজা হয়ে থাকবে উর্বরা বিধবা মেয়ের মত। [পৃ. ১১]
২. অনেক লম্পটের শোষণে ছিবড়ে বনা বাজারের মেয়েলোকের মত এ বাড়ির গিন্নির চেহারা, গলার মোটা চেন হারটি সোনার শিকলের মত। [পৃ. ২২]
৩. আর সেই সঙ্গে [চিন্তামণির] সস্তা মনে হয় নিজেকে, ফাঁকা মনে হয়, ফুরিয়ে যাওয়া চিকন গুড়ের চ্যাটালো হাঁড়ির মত। [পৃ. ২৫]
৪. গলাটা ভারি রঘুর। ভিজে ঢাকের মত ভারি। [পৃ. ২৬]
৫. বাঁড়ুয্যে হাসে খুব কম, যখন হাসে হাসিটা তার বাজীর বোমার মত দমাস করে ফেটে চীনা পটকার মত পটাস পটাস ফেটে চলে। [পৃ. ৩৫]

৫. বক্তব্য : *চিন্তামণি* পুরোপুরি বস্তুপৃথিবীর পটে স্থাপিত উপন্যাস। এই উপন্যাস রচনার অনেক বছর আগেই মানিক ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা থেকে প্রবেশ করেছিলেন সমাজবলয়ে। তখন আর তাঁর উপন্যাসে তাঁর প্রথম-পর্যায়ী উপন্যাসের নিয়তির টান বা রহস্যের ছায়া-উপচ্ছায়া একতিল লেগে ছিল না। তবে অন্তর্লোককে মানিক একেবারে অস্বীকার কোনো কালেই করেননি। *চিন্তামণি* উপন্যাসেও বহির্বাস্তবতার সঙ্গে অন্তর্বাস্তবতা যুক্ত হয়েছে। তবে তখন মানিকের ঔপন্যাসিক-প্রত্যয় এক নবপর্যায়ে প্রবেশ করেছিল। তিনি বুঝেছিলেন, সমকালের রূপায়ণ ঔপন্যাসিকের এক অবশ্যপাল্য দায়িত্ব।[১১]

বহির্বাস্তবতার দিক থেকে এই উপন্যাসে তিনটি বিষয় রূপায়িত হয়েছে : এক, যুদ্ধজনিত দুর্ভিক্ষ, অর্থনৈতিক মহাসংকট—ফল : মৃত্যু, আত্মহত্যা, নারীদেহের পণ্যে পরিণতি, মূল্যবোধের নিম্নাবতরণ; দুই, আঞ্চলিকতা; এবং তিন, কৃষকের শ্রমিকে রূপান্তর। দুর্ভিক্ষ (১৯৪৩) ও মহাযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) বাংলার একটি গ্রামকে-যে কোন নরকে নিয়ে ফেলেছিল, *চিন্তামণি* উপন্যাসে আছে তার শ্বাসরোধী চিত্র। সেদিন অভাব, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হয়ে উঠেছিল বিভীষিকার মতো : চাঁপাবালার আত্মহত্যা; হৈমীর কলংক; গৃহস্থ ঘরের কন্যা ও বধূ চিন্তামণি ও তার দিদির স্বগ্রাম থেকে উচ্ছিন্ন হয়ে ধনবানের গৃহে ও সৈন্যদের ব্যারাকে দাসীর কাজ গ্রহণ; ব্যারাকে-ব্যারাকে গ্রামের চাষী বধূ-কন্যাদের বাধ্যতামূলক দেহদান; দুর্গা, চাঁদকাকার শাশুড়ি, চাঁদকাকা, পুঁটু, গৌরের মা-র মৃত্যু। অসীম অর্থাভাব থেকেই সেদিন সৃষ্টি হয়েছিল মূল্যবোধের চরম সংকট, জীবিত থেকেই মরে যাওয়া।[১২] নিম্নবিত্তের সব-হারানোর এই কাহিনীতে দেখা যায় পারিবারিক-সামাজিক সম্পর্কগুলি ছারখার হয়ে যাচ্ছে চূড়ান্ত অর্থনৈতিক চাপে : কাকা তার ভাইপোকে ঠকায় এবং ভাইপো তার জন্যে মামলা করে (চাঁদকাকা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গৌর); জামাতা তার মাতৃসমা শাশুড়ির জমানো টাকার জন্যে লালসায় জ্বলে, এবং শাশুড়ির মৃত্যুর পর টাকা হাতে না-পাওয়া পর্যন্ত শান্ত হয় না (চাঁদকাকা ও বুড়ি); নারী তার সতীত্ব বিসর্জন দেয় শুধু বেঁচে-থাকার তাগিদে; বন্ধু বন্ধুর প্রতি সমস্ত সহানুভূতি হারিয়ে ফেলে (রঘু ও গৌর)। নিম্নবিত্তের স্বভাবী সংগ্রামশীলতার এতটুকু অবশেষ থাকে না আর। মহাযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের পীড়নে *চিন্তামণি* উপন্যাসে মূল্যবোধের যে-গোধূলিভাষ্য রচনা করেছেন মানিক, তার কোনো তুলনা নেই।[১৩] দুর্ভিক্ষ নিয়ে মানিকের পরিকল্পিত মহাউপন্যাস হয়তো লেখা হয়নি[১৪], কিন্তু *চিন্তামণি* অন্তত তার একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু শক্তিমান অনুকল্প রচনা করেছে। *চিন্তামণি* উপন্যাসে 'প্রধান নায়ক ও নায়িকাদের প্রধান করে বজায় রেখেও সংশ্লিষ্ট আরও অনেক চরিত্র' (মানিকেরই উচ্চারণে, 'শুভাশুভে'র ভূমিকা থেকে) মানিক রচনা করেন। জিনিশপত্রের দুর্লভতা, দুর্মূল্য, জমিদারের শোষণ, ধনবানের সংকীর্ণতা—সব-মিলিয়ে সম্পূর্ণ একটি সামাজিক বাস্তবতার আয়তন তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে জীবিকা পরিবর্তনের পালাও চলতে থাকে: কৃষকের (গৌর) শ্রমিকে রূপান্তর[১৫] (চাষী গৃহস্থ কন্যা ও বধূরও)।

পুরো বহির্বাস্তবতার এই উপন্যাসেও মানিক অন্তর্লোক বিস্মৃত হননি। মানিকের বিশিষ্টতা এখানেই। 'তিনি আধুনিক মনোবিজ্ঞানের চেতন-অবচেতনের সূত্রগুলিকে শ্রমজীবী নরনারীর ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাভাবনা এবং কর্মের ক্রিয়া প্রক্রিয়া প্রকাশের চাবিকাঠি হিসেবে ব্যবহার করেছেন।'[১৬] সাধারণত নিম্নবিত্তের জীবনচিত্রণে লেখকের সৃষ্টি নিছকই আবদ্ধ থাকে বহিরঙ্গ বর্ণনায়। মানিকের কৃতিত্ব ও বিশিষ্টতা এখানে যে বহির্বাস্তবের সঙ্গে এখানে যোগ দেয় অন্তর্বাস্তব। ছোটো, বহুচরিত্রময় উপন্যাসে তেমন সুযোগ খুব বেশি ছিল না। নায়ক-নায়িকার জীবনচিত্রণে লেখক সেই অবকাশ সৃষ্টি করে নিয়েছেন। চিন্তামণির জীবনের এমন দু-একটি মুহূর্ত: 'সাইকেল চেপে পটল যখন অনেক দূরে গেছে তখন যেমন চিন্তামণির মনটা উঠল কেমন করে। শ্রাবণ শেষের বৃষ্টি-ছাড়া বাতাস-ছাড়া দিন, ভাদ্র মাসের উজ্জ্বল কড়া রোদে ঘাম ছোটানো গরম! পুজোর আর কটা দিন বা বাকী। এমন দিনে এই বিদেশে সে বিদেশিনী গো! একেবারে একাকিনী সে!' (পৃ. ৮) কিংবা 'মৃদু একটা ব্যাকুলতা মনে আসে চিন্তামণির, বিয়ের আগে গৌরের বয়সী সেই যে একজন তাকে তীব্র যন্ত্রণা দিয়েছিল মৃদু বেদনার সঙ্গে তার কথা মনে পড়ে এতকাল পরে।' (পৃ. ২৫) আর গৌরের কাছে জীবন 'ভয়ানক ভারী আর গভীর', তারও মনোজগতের বিচিত্র বিরোধী স্তরসমূহ উন্মোচিত হয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপন্যাসে, তার মমতা ও কাম, হিংসা ও বাস্তববুদ্ধি। তার একটি মানসিক অবস্থা: দুর্গার মৃত্যুর পর 'শোকে উন্মত্ত প্রায় রঘুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে শোকার্ত হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসে সাধারণ চলনসই দুঃখ বোধ করতে গৌর খানিকক্ষণ নারাজ হয়ে থাকে।' (পৃ. ২৫) বহির্বাস্তবের সঙ্গে-সঙ্গে অন্তর্বাস্তব যুক্ত হওয়ায় চিন্তামণি ও গৌরকে কিছুতেই নিছক দাসী ও কৃষক হিশেবে মনে হয় না আমাদের।

'বক্তব্যহীন উপন্যাস উপন্যাসই নয়।'[১৭] কাহিনী নির্বাচন, চরিত্র নির্মাণ, পরিবেশ নির্মাণ—এই সমস্তের মধ্য দিয়েই সেই বক্তব্য তৈরি হয়। ঔপন্যাসিকের বক্তব্য মানে কোনো-একটি উপকরণ নিয়ে আলোচনা নয়, সব-মিলিয়েই, এমনকি শিল্পরূপেরও। ছোটো উপন্যাস হিশেবে *চিন্তামণি* নির্মেদ, নির্বহুল। সারা উপন্যাসকে আঁটো করে বেঁধেছে চিন্তামণির দিদির পত্র—উপন্যাসের শুরু ও শেষ তারই হাতে। শেষ পত্রটি অসম্পূর্ণ। লেখকের অসামান্য সংযত শিল্পজ্ঞানের পরিচায়ক। 'মনে খালি ডর পাই যে তোমার কাঁচা বয়স, পুরুষ রক্ষক না থাকিলে না জানি কি বিপদে পড়িবা।...' না, আমরা জানি, চিন্তামণির বিপদের কোনো কারণ নেই, তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তার প্রেমিক পুরুষ। আগেই তা আমরা জেনেছি। সুতরাং এর পর পত্র দীর্ঘ হলেই তা হতো বাহুল্য। এখানে প্রযুক্ত হয়েছে ছোটোগল্পপ্রতিম কৌশল।[১৮] আরো অনেক শিল্পীর হাতের সূক্ষ্ম কাজ ছড়িয়ে আছে এই উপন্যাসে। যেমন, একটি বাক্য হয়ে উঠেছে একটি বিস্তীর্ণ ব্যথাসঞ্চারী অতীতের দ্যোতক: 'মৃদু একটা ব্যাকুলতা মনে আসে চিন্তামণির, বিয়ের আগে গৌরের বয়সী সেই যে একজন তাকে তীব্র যন্ত্রণা দিয়েছিল মৃদু বেদনায় সঙ্গে তার কথা মনে পড়ে এতকাল পরে।' (পৃ. ২৫) আছে ব্যক্তির অন্তর ও বাইরের জটিল বিমিশ্র বুনন। প্রথমবার চিন্তামণির সংস্পর্শে এসে গৌরের মনে হচ্ছিল: "চিন্তামণি যদি নীলকণ্ঠের সেই বড় মেয়ে তরুবালার মত গালে টোকা মেরে বলে, 'আ মরণ!'" (পৃ. ৪১) আর তার কিছুক্ষণ পরই: "শেডে ভেজা ধানের পচাটে গন্ধ অনুভব করতে করতে ফাটল ধরা চোকলা ওঠা সিমেন্টের নোংরা মেঝেতে ঘষড়ে গিয়ে সে চিন্তামণির গা ঘেঁষল। চিন্তামণি নিশ্বাস ফেলে বলল, 'আ মরণ!'" (পৃ. ৪২) মনোজগতের সূক্ষ্ম দিক্‌পরিবর্তন: 'ঘেরা শেডের নিচে [গৌর] পচা ধানের গন্ধ সহ্য করতে পারে না, কিন্তু তারপর চিন্তামণি এলে তার এক রাশি চুলে পচা নারকেল তেলের গন্ধ তাকে বাঁচায়।' (পৃ. ৪৪) শুধু চরিত্রে নয়, সমস্ত উপন্যাসের মধ্যেই মানিক এক-ধরনের গতি বা চলিষ্ণুতা সৃষ্টি করেন—এ তাঁর এক বিস্ময়কর সৃষ্টিকুশলতা। উপন্যাসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝামাঝি এসে বলা হলো : 'মজুর হতে খাঁটি চাষী মরমে মরে যায়। ভূমিহীন চাষী পর্যন্ত।' (পৃ. ৩১) উপন্যাসের অন্তিমে এসে আমরা জানলাম চাষী গৌরের পরিণতি হচ্ছে মজুর হিশেবেই; কিন্তু তার ট্র্যাজেডির ইঙ্গিতের সঙ্গে আছে বাঁচারও ইঙ্গিত।

এই আলোচনার সূচনায় আমরা বলেছিলাম, *চিন্তামণি* উপন্যাসে মানিক দেখিয়েছেন সমস্ত দরোজার বন্ধ হয়ে যাওয়া। এখন মনে হচ্ছে, এই উক্তি ঈষৎ সংশোধনসাপেক্ষ। *চিন্তামণি* উপন্যাস শেষ হয়নি নেতিবাচকতায়। হাজারদুয়ারি প্রাসাদের ন-শো নিরানব্বইটি দরোজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর একটি দরোজা খোলা রইল। সেটি প্রেম ও পরস্পরনির্ভরতার, যৌথ কর্মোদ্যোগের। চিন্তামণি ও গৌর প্রেমে ও প্রয়োজনে সেই যৌথ কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করবে, শ্বাসরোধী ঐ পরিস্থিতিতে এভাবেই ক্রমমুক্তি ঘটবে তাদের, ব্যক্তির—এবং ব্যক্তিমুকুরে প্রতিফলিত সমাজের;—এই ইশারায় উপন্যাস শেষ হয় এক অস্তিবাচকতায়। ঐ অস্তিবাচকতা লেখকের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি নয়—উপন্যাসের অন্তর্গত কাহিনী, চরিত্র ও পরিবেশের, ব্যক্তি ও সমাজের, দেশ ও কালের গতি ও সংঘর্ষ থেকেই জাত।

AMARBOI.COM

তথ্যনির্দেশ

১. মানিকের মৃত্যুর (৩ ডিসেম্বর ১৯৫৬) পরদিন একটি দৈনিকে মানিকের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী বেরিয়েছিল, তা থেকে প্রাসঙ্গিক একটি উদ্ধৃতি :

> The black famine of 1942-43 in Bengal produced a great change in Sri Bandopadhaya's mental outlook. Its horrible sights had a humanising effect on his mind. Hitner to under the influence of freud, it now understood man in other and more human trends. About this time he also made a deep study of Marxism,
>
> [*Hindusthan Standard*, 4 December 1956]

২. *আজ কাল পরশুর গল্প* গ্রন্থে অন্তর্ভূত গল্প : ১. আজ কাল পরশুর গল্প; ২. দুঃশাসনীয়; ৩. নমুনা; ৪. মঙ্গলা; ৫. বুড়ী; ৬. গোপাল শাসমল; ৭. নেশা; ৮. বেড়া; ৯. তারপর; ১০. স্বার্থপর ও ভীরুর লড়াই; ১১. শত্রুমিত্র; ১২. রাঘব মালাকর; ১৩. যাকে ঘুষ দিতে হয়; ১৪. কৃপাময় সামন্ত; ১৫. নেড়ী; ১৬. সামঞ্জস্য। *পরিস্থিতি* গ্রন্থে অন্তর্ভূত গল্প : ১. প্যানিক; ২. সাড়ে সাত সের চাল; ৩. প্রাণ; ৪. রাসের মেলা; ৫. মাসি পিসি; ৬. অমানুষিক; ৭. পেট ব্যথা; ৮. শিল্পী; ৯. কংক্রীট; ১০. রিক্সাওয়ালা; ১১. প্রাণের গুদাম; ১২. ছেঁড়া। এবং *খতিয়ান* গ্রন্থে অন্তর্ভূত গল্প : ১. খতিয়ান; ২. ছাঁটাই রহস্য; ৩. চক্রান্ত; ৪. গুণ্ডামী; ৫. কানাই তাঁতী; ৬. চোরাই; ৭. চালক; ৮. টিচার; ৯. ছিনিয়ে খায়নি কেন; ১০. একান্নবর্তী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. 'গ্রামপতনের শব্দ' জীবনানন্দ দাশের 'পৃথিবীলোক' (*জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা*) কবিতার একটি পঙ্‌ক্তি। জীবনানন্দের অন্য একটি কবিতার সঙ্গে মানিকের এই উপন্যাসের গভীর সাযুজ্য আছে। ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হয় *চিন্তামণি*। জীবনানন্দের '১৯৪৬-৪৭' (*জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা*) দীর্ঘ কবিতাটিকে *চিন্তামণি*রই একটি কাব্যভাষ্য বলে মনে হয়। একটি স্তবকাংশ: 'অনির্বচনীয় হুন্ডি একজন দু-জনের হাতে।/ পৃথিবীর এইসব উঁচু লোকদের দাবি এসে/ সবি নেয়, নারীকেও নিয়ে যায়।/ বাকি সব মানুষেরা অন্ধকারে হেমন্তের অবিরল পাতার মতন/ কোথাও নদীর পানে উড়ে যেতে চায়,/ অথবা মাটির দিকে—পৃথিবীর কোনো পুনঃপ্রবাহের বীজের ভিতরে/ মিশে গিয়ে।' অন্য একটি স্তবক: 'বাংলার লক্ষ গ্রাম নিরাশায় আলোহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ নিস্তেজ।/ সূর্য অস্তে চ'লে গেলে কেমন সুকেশী অন্ধকার/ খোঁপা বেঁধে নিতে আসে—কিন্তু কার হাতে?/ আলুলায়িত হ'য়ে চেয়ে থাকে—কিন্তু কার তরে?/ হাত নেই—কোথাও মানুষ নেই; বাংলার লক্ষ গ্রামরাত্রি একদিন/ আলপনার, পটের ছবির মতো সুহাস্যা, পটলচেরা চোখের মানুষী/ হ'তে পেরেছিলো প্রায়; নিভে গেছে সব।' এই সর্বব্যাপী তমসায় শেষ-পর্যন্ত জীবনানন্দ 'চেতনার-বলয়ের নিজ গুণে' আস্থা রেখেছিলেন, মানিক প্রেমে ও যৌথ কর্মে।

৪. ঔপন্যাসিক হেনরি ফিল্ডিং (১৭০৭-৫৪)-এর এই উক্তি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন র‍্যালফ ফকস তাঁর *নভেল অ্যান্ড দি পিপল* (পৃ. ৮৮) গ্রন্থে। র‍্যালফ ফকস-এর পরবর্তী উক্তিটিও *চিন্তামণি* প্রসঙ্গে প্রযোজ্য: '...ঔপন্যাসিক অবশ্যই পরিচিত থাকবেন পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে, কার্যকারণ সম্বন্ধের সঙ্গে, সংঘাত ও সংকটের সঙ্গে। কেবলমাত্র বর্ণনা বা ভাববাদী বিশ্লেষণ নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন না।' (পৃ. ৮৮)

৫. পৃ. ৯, *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড), ক্ষেত্র গুপ্ত।

৬. *চিন্তামণি*র এই পত্রগুলির সংখ্যা গ্রন্থমধ্যে নেই—আলোচনার সুবিধার্থে আমরা চিহ্নিত করেছি।

৭. প্রেমের আবেগের আকস্মিক আতীব্র প্রকাশ মানিকের আরো কোনো-কোনো উপন্যাসে ঘটেছে—*পুতুলনাচের ইতিকথা*য় শশীর জীবনে, *জীবনের জটিলতা*য় ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ার পর শান্তার জীবনে।

৮. তুলনীয়:

> শশী ইহাও বুঝিয়াছে যে জীবনকে শ্রদ্ধা না করিলে জীবন আনন্দ দেয় না। শ্রদ্ধার সঙ্গে আনন্দের বিনিময়, জীবনদেবতার এই রীতি। / শশী তাই প্রাণপণে জীবনকে শ্রদ্ধা করে। সংকীর্ণ জীবন, মলিন জীবন, দুর্বল পঙ্গু জীবন,—সমস্ত জীবনকে। নিজের জীবনকে সে শ্রদ্ধা করে সকলের চেয়ে বেশী।
>
> [পৃ. ৫৮, 'পুতুলনাচের ইতিকথা', *মা. গ্র.* ৩]

৯. পূর্ববঙ্গের ভাষা প্রয়োগ করেছেন দুটি উপন্যাসে *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬) ও *মাঝির ছেলে* (১৯৫৯) এবং কিছু ছোটোগল্পে। চব্বিশ পরগনার ভাষা ব্যবহার করেছেন *চিন্তামণি* (১৯৪৬) উপন্যাসে এবং কিছু উত্তরকালীন ছোটোগল্পে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০. *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬) উপন্যাসেও বর্ণনার মধ্যে উপভাষা প্রয়োগ ও উপমা-উৎপ্রেক্ষা ব্যবহারের মধ্যে বর্ণিত জগৎটিকে স্পষ্টতর করার কুশলতা আছে।

১১. র‍্যালফ ফকস আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ফিল্ডিং-এর একটি ঔপন্যাসিক বিবেচনা : 'ফিল্ডিং বলেন, যতক্ষণ কোন লেখক তাঁর সমকালের জ্ঞান আয়ত্ত করার যথার্থ কোন চেষ্টা না চালান, ততক্ষণ তিনি সফল ঔপন্যাসিক হতে পারেন না।' [পৃ. ৯৫, *নভেল অ্যান্ড দি পিপল*]

১২. এই বর্ণনাও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরই। 'অমানুষিক' (*পরিস্থিতি*) গল্পে দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রাম থেকে খাদ্যান্বেষণে যে-স্বামী চলে গিয়েছিল একদিন, সে গ্রামে ফিরে দেখে তার স্ত্রী তারই গৃহে একজন ধনবানের রক্ষিতা। এখন তার 'কঙ্কালসার বৌটা হৃষ্টপুষ্ট সুন্দরী যুবতী।' কিন্তু তবু : 'কেমন যেন হয়ে গেছে কুজা। একসঙ্গে জীবন্ত আর মরা।'

১৩. মানিকের *চিন্তামণি* নিম্নবিত্তের মূল্যবোধ বিনষ্টির যেমন উপন্যাস, তেমনি মধ্যবিত্তের সর্বস্ব হারানোর আখ্যান জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর *বারো ঘর এক উঠোন*।

১৪. মানিকের ডায়েরি থেকে *চিন্তামণির* গ্রন্থাকারে প্রকাশ-বৎসরে—১৯৪৬ সালে—একটি উদ্ধৃতি :

V. Imp.

রাত্রি : দুর্ভিক্ষের সময়ের অনেকগুলি গল্প অথবা উপন্যাস প্রভাত : পরে নূতন জীবনের সূচনা : [পৃ. ১৪, *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*]

১৫. জীবিকা পরিবর্তনের এরকম কাহিনী মানিক আরো লিখেছেন। যেমন *পদ্মানদীর মাঝিতে* মাঝি রূপান্তরিত হয় আদিম কৃষকে।

১৬. 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—কমিউনিস্ট, অতিআধুনিক, গণকথাশিল্পী' : রণেশ দাশগুপ্ত। *শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র*, এপ্রিল, ১৯৭৮।

১৭. পৃ. ৫৫, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮. ছোটো উপন্যাসের চারিত্র প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : 'প্রকৃতপক্ষে ছোটগল্প ও উপন্যাসের আঙ্গিক ও স্বাদের মিশ্রণের মধ্য দিয়ে এই শিল্প রূপ গড়ে ওঠে।' (পৃ. ২৬, *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড : ক্ষেত্র গুপ্ত)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোটোগল্প

উপক্রমণিকা

> ...ছোটগল্প রচনায় রোমাঞ্চ আছে। এতে গভীর মনঃসংযোগ করতে হয়। এত দ্রুত তালের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে হয় বলেই মন কখনো বিশ্রাম পায় না। ছোটগল্প লেখার সময়ে প্রতি মুহূর্তে রোমাঞ্চ বোধ করি।
>
> —সাক্ষাৎকার : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৫৬

১৯৪৪ সালে *কেন লিখি* নামে একটি সংকলন বেরিয়েছিল ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘের পক্ষে। সংকলনটির সম্পাদক ছিলেন হিরণকুমার সান্যাল ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। 'বাংলাদেশের বিশিষ্ট কথাশিল্পীদের জবানবন্দী' এই ঘোষণা থাকলেও সংকলনটিতে কথাশিল্পীদের সঙ্গে কবিরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন। *কেন লিখি* সংকলনে লিখেছিলেন : ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শাহাদাৎ হোসেন, গোপাল হালদার, জীবনানন্দ দাশ, সরোজ বসু, শচীন সেনগুপ্ত, আবুল মনসুর আহমদ, অমিয় চক্রবর্তী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বিষ্ণু দে। ওই সংকলনের জন্যে অন্যদের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও একটি লেখা লিখেছিলেন। নিতান্তই ফরমাশি রচনা।

কিন্তু কী অসাধারণ সেই রচনা! বস্তুত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক পৃষ্ঠার ওই রচনাটিই ছিল ওই সংকলনের তীক্ষ্ণতম রচনা। তার মধ্যে প্রতিভাসিত হয়েছেন শিল্পী মাত্রই কিন্তু বিশেষভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছেন মানিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। 'লেখা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে যে সব কথা জানানো যায় না সেই কথাগুলি জানানোর জন্যেই আমি লিখি।' এই অসামান্য বাক্যটি ছিল রচনাটির প্রথম পঙ্‌ক্তি। অর্থাৎ লেখক মাত্রেই উপায়হীন লেখক। 'আড়াই বছর বয়স থেকে আমার দৃষ্টিভঙ্গির ইতিহাস আমি মোটামুটি জেনেছি।' এই উক্তির মধ্য দিয়ে মানিকের সমস্ত শিল্পকর্মের যে-সচেতন বুদ্ধিবাদী প্রয়াস তাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। *কেন লিখি*র তিন বছর পরে, ১৯৪৭ সালে, শারদীয় *স্বাধীনতা* পত্রিকায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রতিভা' নামে আরেকটি অসাধারণ প্রবন্ধ লিখলেন। ওই প্রবন্ধে মানিক দেখালেন, প্রতিভা কোনো 'ঈশ্বরদত্ত রহস্যময় জিনিষ' নয়। দেখালেন: 'প্রতিভা আসলে এক। বৈজ্ঞানিক আর কবির প্রতিভায় মৌলিক পার্থক্য কিছুই নেই—পার্থক্য শুধু বিকাশ আর প্রকাশে।' এখানে 'কবি' অর্থে লেখক শিল্পী মাত্রকেই বুঝেছিলেন মানিক। আর প্রতিভা জিনিশটা কী?—না, দক্ষতা অর্জনের বিশেষ ক্ষমতা। আর কিছুই নয়।

১৯৫১ সালের দিকে সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত *পূর্ব্বাশা* পত্রিকা তৎকালীন কয়েকজন ঔপন্যাসিকের উপন্যাস-ভাবনা প্রকাশ করে। অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ আপন-আপন উপন্যাসচিন্তা পরিব্যক্ত করেছিলেন কয়েকটি সংখ্যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'উপন্যাসের ধারা' প্রবন্ধে লিখেছিলেন প্রসঙ্গত: 'আমার বিজ্ঞান-প্রীতি, জাত বৈজ্ঞানিকের কেন-ধর্মী জীবন-জিজ্ঞাসা, ছাত্রবয়সেই লেখকের দায়িত্বকে অবিশ্বাস্য গুরুত্ব দিয়ে ছিনিমিনি খেলা থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি কতগুলি লক্ষণে ছিল সুস্পষ্ট নির্দেশ যে, সাধ করলে কবি হয়তো আমি হতে পারি; কিন্তু ঔপন্যাসিক হওয়াটাই আমার পক্ষে হবে উচিত ও স্বাভাবিক!' মানিক কবিতা লিখেছেন, নাটক লিখেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন, কিন্তু মূলত তিনি কথাশিল্পী—ঔপন্যাসিক ও ছোটোগল্পকার।

যত দূর জানা যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ছাপার হরফে দেখা দিতে থাকে তার ২০/২১ বছর বয়সে। ১৯২৮ সালে লিখতে শুরু করেন গল্প—প্রথম মুদ্রিত গল্প 'অতসী মামী'। ১৯২৯ সালে প্রথম উপন্যাস *দিবারাত্রির কাব্যর* আদি রচনা শুরু হয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁকে যেন ঔপন্যাসিক হিশেবেই পরিচিহ্নিত করা হয়—অন্য কিছু নন তিনি, তিনি ঔপন্যাসিক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কিন্তু আমরা বলতে চাই একই সঙ্গে গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। তাঁর ঔপন্যাসিক সাফল্যের চেয়ে গল্পকার হিশেবে সাফল্য কোনো অংশে কম নয়। এমনকি সুকুমার সেনের মতো ইতিহাসবিদ মনে করেন, 'ছোটোগল্পগুলিতেই শিল্পী মানিকবাবুর শ্রেষ্ঠ পরিচয় নিহিত।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় তিন দশক (১৯২৮-৫৬) ধরে লিখেছিলেন ৪০টির মতো উপন্যাস, ৩০০-র মতো গল্প। যিনি লিখেছিলেন 'লেখক নিছক কলম-পেষা মজুর' (*কেন লিখি*), তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত ৪৮ বছরের জীবন সম্পূর্ণ উৎসর্গ করেছিলেন সাহিত্যে। পিতার চাকরিসূত্রে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার অনেক এলাকা দেখা হয়েছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে অঙ্কে অনার্স নিয়ে, বি.এস-সি পর্যন্ত পড়েছিলেন, লেখাপড়া শেষ করেননি, কিন্তু সারা জীবন এক বিজ্ঞান-মানসতা অর্জন ও বহন করেছেন। 'অঙ্কশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বিএসসি পড়াবার সময় আমি সাহিত্য করতে নামি—বাড়ির লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে। কারণ, তখন আমি অনুভব করছিলাম যে, সাহিত্যজগতে একটা বড়রকম পরিবর্তন ঘটতে চলেছে, এরকম সন্ধিক্ষণে সাহিত্য সৃষ্টি করার বদলে অন্যকাজে সময় নষ্ট করা যায় না।' (মানিকের চিঠি, ২ আগস্ট ১৯৫২) এমনকি লেখা ব্যতীত অন্য জীবিকার জন্যেও সময় নষ্ট করা যায় না। তাই মানিক *বঙ্গশ্রী* পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিশেবে বছর দুয়েক (১৯৩৭-৩৮) আর ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের পাবলিসিটির অফিসার হিশেবে কয়েক মাস (১৯৪৩)—সাকুল্যে এটুকু সময় চাকরি করেন। আর-একবার স্বাধীন ব্যবসায়ের চেষ্টা করেন, 'উদয়াচল প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস' প্রতিষ্ঠা করে (১৯৩৯), অনুজ সুবোধকুমারের সহযোগিতায়; চলেনি; মানিকের *বৌ* গল্পগ্রন্থটি এই প্রতিষ্ঠান থেকেই প্রথম প্রকাশিত (১৯৪০)।

১৯৪৪ সালে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৩৫ থেকে ১৯৫৬ তাঁর মৃত্যুকাল অবধি এমন একটি বছরও যায়নি, যে বছর তাঁর কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ, একটি উপন্যাস, *জননী* ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত। জীবদ্দশায় প্রকাশিত সর্বশেষ গ্রন্থটিও উপন্যাস, *মাশুল* ১৯৫৬-র অক্টোবরে বেরিয়েছিল। ওই ১৯৩৫ ও ১৯৫৬ সালে তাঁর গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল : প্রথম গল্পগ্রন্থ *অতসী মামী* আর সর্বশেষ গল্পগ্রন্থ *স্বনির্বাচিত গল্প*। মৃত্যুর পরেও অনেক গল্প, উপন্যাস, ডায়েরি ও চিঠিপত্র, কিশোরতোষ রচনা, গ্রন্থাবলি ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে পুস্তকাকারে। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* (যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত, ১৯৭৬) এবং তেরো খণ্ডে *মানিক গ্রন্থাবলী* (১৯৬৩-৭৬)। এসবের বাইরেও অনেক রচনা পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠায় ও পাণ্ডুলিপিতে ছড়িয়ে আছে—আজও অগ্রন্থিত। মানিক অবিশ্রাম সাহিত্য রচনা ছাড়া বস্তুতপক্ষে আর কিছু করেননি। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-৯৪) আবির্ভাবের সত্তর বছর পরে ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব—এবং বাংলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপন্যাসের যাত্রা শুরুর চল্লিশ বছর পরে গল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগমন—এবং বাংলা ছোটোগল্পের অন্যতম প্রধান শিল্পী তিনি। এসবই সম্ভব হয়েছে প্রতিভার জাদুবলে—মানিক যাকে 'ঈশ্বরদত্ত রহস্যময় জিনিষ' বলতে নারাজ, যাকে তিনি চিহ্নিত করেছেন 'দক্ষতা অর্জনের বিশেষ ক্ষমতা' বলে, তারই কল্যাণে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কি কল্লোলীয়? অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মানিককে বলেছেন, 'কল্লোলের কুলবর্ধন'। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন belated kallolean কল্লোলের সর্বজ্যেষ্ঠ লেখক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪) আর সর্বানুজ বিষ্ণু দে (১৯০৯-৮২)। দীনেশরঞ্জন দাশ (১৮৮৮-১৯৪১) সম্পাদিত *কল্লোল* পত্রিকা বছর সাতেক (১৯২৩-৩০) চলেছিল। রবীন্দ্রোত্তর তরুণ লেখকদের মুখ্যতম মাধ্যম ছিল এই পত্রিকা। *কালিকলম, প্রগতি* ইত্যাদি আরো পত্রিকা ছিল তরুণ সাহিত্যের বাহন। কিন্তু *কল্লোল*—এই নামেই আধুনিক—উত্তররৈবিক আধুনিক সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তররৈবিক কথাসাহিত্যের আধুনিকতা যাঁদের হতে সূচিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁরা হচ্ছেন: নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৬), গোকুলচন্দ্র নাগ (১৮৯৪-১৯২৫), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০০-৭৬), মণীশ ঘটক (১৯০২-৭৯), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-৭৬), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-৭৪), অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২), প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৭-৮৩), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪) প্রমুখ। *কল্লোল* সম্পর্কে মানিক ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। তার সাক্ষ্য দেবে মৃত্যুর আগে *নতুন সাহিত্য* (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩) পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর সাক্ষাৎকার। আমরা এখানে অংশত উদ্ধৃত করছি:

> প্রশ্ন: আপনি তো কল্লোল যুগের আবহাওয়াকে সমকালীন দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছেন। সেই সাহিত্য-আন্দোলনের উদ্দেশ্য নিয়ে আজ যে বিচার-বিশ্লেষণ চলছে সে প্রসঙ্গে আপনার অভিমত কি? 'কল্লোল' প্রচেষ্টা কি ব্যর্থ?
>
> উত্তর: বাংলা সাহিত্যে *কল্লোল* এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ, 'কল্লোল যুগ' বাংলা সাহিত্যে এক বিপ্লবের যুগ, কল্লোল গোষ্ঠীর বা কল্লোলের আদর্শে আস্থাবান সমসাময়িক কথাশিল্পীরা দুর্দম অপরাজেয় যৌবনের প্রতীক, নতুন আশা-আনন্দ, নতুন জীবনাদর্শের সূত্রধর। সাম্প্রতিক কালের বাংলা কথাশিল্পে গর্ব করার মতো কোনো সম্পদই যদি থেকে থাকে, তবে সেজন্যে অধুনাকালীন গল্পকার-ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব যতখানি, *কল্লোলের* দান তার চেয়ে কম নয়। *কল্লোলের* মাধ্যমে যে নতুন জীবনচেতনা, যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> নতুন পথেরই জন্মলাভ করেছিল আজকের প্রগতিবাদী সাহিত্য তো সেই নতুন পথেরই অনুসারী।—প্রাক-*কল্লোল*কালে বাংলা সাহিত্য ছিল বিদগ্ধজনের সাহিত্য।...কিন্তু *কল্লোল*-তারুণ্য এল মুষ্টিবদ্ধ 'চ্যালেঞ্জ' নিয়ে। গ্রামের কিষাণী এসে নায়িকা হল সাহিত্যের, খেতখামারের চাষী সম্মানিত নায়কের আসন পেল গল্প-উপন্যাসে।

...একদিন অবশ্য *কল্লোলের* প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু তার মৃত্যু হয়নি। আজকের সাহিত্য *কল্লোলের* আদর্শকে স্বীকার করেছে। এখানেই তো *কল্লোলের* সার্থকতা।...*কল্লোলের* আরেক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা নরনারীর সম্পর্কের নতুন মূল্য নিরূপণ, মানুষের প্রেমের নতুন সংজ্ঞা নির্ণয়।

অন্যত্র, 'সাহিত্য করার আগে' প্রবন্ধে, মানিক অবশ্য 'কল্লোল যুগ'কে তীব্রভাবে সমালোচনাই করেছিলেন :

> জোরের সঙ্গে দাবি করা হয়েছিল যে, আমরা বস্তুপন্থী সাহিত্য সৃষ্টি করছি, কিন্তু প্রকৃত বস্তুবাদী আদর্শ কল্লোল, কালি-কলমীয় সাহিত্যিক অভিযানের পিছনে ছিল না।

এই প্রবন্ধে মানিক রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রকে যেমন তেমনি অব্যবহিত-অগ্রজ প্রেমেন্দ্র মিত্র-শৈলজানন্দকে সমালোচনা করেছিলেন বস্তুবাদের আদর্শ গ্রহণ না করার জন্যে। এখানে তিনি 'কল্লোল যুগ'কে দেখেছিলেন ভাববাদ ও বস্তুবাদের সংঘাতের রূপদানকারী হিশেবে। নিজের সম্পর্কে দাবি করেছিলেন, '...বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার অভাব খানিকটা মিটিয়েছি নিশ্চয়' এই বলে।

বুদ্ধদেব ও অচিন্ত্যকুমারের ভাষ্য অনুসারে আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিলম্বিত কল্লোলীয় বলেই মনে করি। এমনিতেই তিনি ছিলেন *কল্লোলের* লেখকদের সমসাময়িক, বুদ্ধদেব বসুর সমবয়সী—যদিও তাঁর সাহিত্যযাত্রা বুদ্ধদেবের বেশ পরে। ১৯২৮ সালে তাঁর প্রথম গল্প বেরিয়েছিল *বিচিত্রা* পত্রিকায়—সেদিন থেকে তিনি *কল্লোল* পত্রিকারও লেখক হতে পারতেন। এছাড়া বহু পত্রিকায় কল্লোলীয়দের সঙ্গে একই সঙ্গে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। আধুনিক কবিতা-আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা-ভবনে' যেতেন মানিক। কবিতা-ভবন থেকে প্রতিভা বসুর সম্পাদনায় যে *গল্পমালা* সিরিজ প্রকাশিত হতো, সেখান থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও একটি গল্প—'কে বাঁচায়'-সংবলিত পুস্তিকা বেরিয়েছিল। এই *গল্পমালা* সিরিজে স্বতন্ত্র পুস্তিকায় গল্প প্রকাশিত হয়েছিল পরশুরাম, অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের। মানিক সম্পর্কে *কল্লোলের* অনেক লেখকই মন্তব্য করেছেন। একসময়কার বিখ্যাত তিন নায়কই—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র—মন্তব্য করেছেন, অনুকূল রসগ্রাহী মন্তব্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথ কল্লোল যুগের অনেক লেখক সম্পর্কেই মন্তব্য করেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কোনো মতামত আমার চোখে পড়েনি। মনে হয় না, মানিক *দিবারাত্রির কাব্য*, *পদ্মানদীর মাঝি*, *পুতুলনাচের ইতিকথা* বা রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে প্রকাশিত আর কোনো বই রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন। মানিকের স্বভাবপ্রকৃতি ছিল একটু অন্যরকম। এসব বই পেলে বা পাঠ করলে রবীন্দ্রনাথ নিঃশব্দ থাকতেন, তাও ভাবা যায় না। ১৯৩৯ সালের ১১ নভেম্বরে সজনীকান্ত দাস বনফুলকে (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) এক চিঠিতে লিখছেন: 'তারাশঙ্কর সম্বন্ধেও তাঁহার [রবীন্দ্রনাথের] মত খুব উচ্চ তবে তাঁহার সন্দেহ হইয়াছে তারাশঙ্কর একটু ক্লান্ত হইয়াছে। তিনি রবীন্দ্রপরবর্তী গল্পসাহিত্যে তোমাদের দু'জনকে ছাড়া আর কাহারো নাম করিতে পারেন না। প্রেমেন্দ্রের লেখা তিনি পড়েন নাই, মানিক সম্বন্ধে তিনি হতাশ এবং আধুনিক দলের দ্বন্দ্বে পীড়িত।'

এই পত্রে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের সত্যাসত্য সম্বন্ধে আমরা স্থিরনিশ্চিত নই।

সে যা-ই হোক, মানিক-নির্দেশিত কল্লোলের দুটি বিশিষ্টতা—নিচুতলার জীবনচিত্রণ এবং নারী-পুরুষের সম্পর্কের নতুন মূল্যায়ন—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে তো দেখি এই দুটি বিষয়েরই সান্দ্র অনুবর্তন: সত্য বাস্তব গভীর প্রগাঢ় রূপায়ণ। সময় এবং স্বভাব—দুদিকের বিচারেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা কল্লোলীয় বলেই মনে করি।

AMARBOI.COM

গল্পভাবনা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত সৃজনশিল্পী: মূলত উপন্যাস ও গল্পই লিখে গেছেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে তিনি গল্প ও উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর কিছু কিছু ভাবনা-ধারণা লিপিবদ্ধও করেছেন। কোনো-কোনো গল্পের প্লটের সংক্ষিপ্তসারও লিখে রেখেছেন কয়েক লাইনে। একজন বিপুল সৃষ্টিশীল লেখকের অন্তর্গত যে-প্রবল চাপ ও অস্থিরতা ও অশৃঙ্খলা তারও সাক্ষ্য দেবে তাঁর অজস্র গল্পের সঙ্গে তাঁর ডায়েরিগুচ্ছ, নোটগুচ্ছ, পত্রগুচ্ছ, এরকম একটি নোটবই-এ নতুন ছোটোগল্প সম্পর্কে তাঁর ভাবনা তাঁর সমগ্র গল্পের অন্তর্লোকে আলো ফ্যালে:

'ছোটোগল্প'

১. গল্প—অনেক পরিবর্তন—ছোটোগল্প।

২. ঘটনাপ্রধান ছিল—এখন ঘটনা তুচ্ছ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. স্থান কাল পাত্র।

৪. বর্তমান ছোটোগল্পের প্রধান লক্ষণ—স্থানের সীমা, কালের সীমা, পাত্রের সীমা—আজ এই ঘটল তারপর দশ বছর পরে, এই ধরনের টেকনিক প্রায় নয়—যত কম সময়ে যত কম চরিত্র এনে জীবনের একটা দিকের ছবি দেওয়া যায়।

৫. আমার মতে—ছোটোগল্পের এই রূপ সমর্থন করি। শ্রেষ্ঠ ছোটোগল্প ক) আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ের ছেদ নেই, দুই মিনিট হোক দশ মিনিট হোক একটি মনের একটানা চিত্র—ইজিচেয়ারে বসে একজন ভাবছে তা অবশ্য নয়—অন্য চরিত্র ও ঘটনা থাকবে কিন্তু তার মনে যতটা থাকে।

৬. একটির বেশি মনের সাময়িক-চিত্র দিলে বড়গল্প বা ছোটো উপন্যাস হয়, ছোটোগল্প হয় না।

৭. সময়টুকুর মধ্যে মনে যা নেই তার সামান্য বর্ণনাও থাকবে না—লেখক নিজে বলছে এমন কিছুই থাকবে না।

অনেকবারই মানিক তাঁর প্রথম গল্প লেখার ইতিবৃত্ত জানিয়েছেন। আমরা জানি, 'অতসী মামী' গল্পটি মানিক লিখেছিলেন বন্ধুদের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করে। সেই গল্প *বিচিত্রা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। *বিচিত্রা* সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮১-১৯৬০) ঐ গল্পের পারিশ্রমিক স্বয়ং মানিকবাবুর বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসেছিলেন—এবং আরো গল্প লেখার আহ্বান জানিয়েছিলেন। *বিচিত্রা* পত্রিকায় তখন লিখছেন রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখকেরা। কিন্তু আমরা লক্ষ করে দেখি না, মানিক স্বয়ং তাঁর লেখার প্রস্তুতির কথাও জানিয়েছেন একাধিক প্রবন্ধে—যেমন 'গল্প লেখার গল্প' প্রবন্ধে। বলেছেন, 'বারো তেরো বছর বয়সের মধ্যে *বিষবৃক্ষ*, *গোরা*, *চরিত্রহীন* পড়া হয়ে গিয়েছে।' বলেছেন, 'বড় ঈর্ষা হতো বই যারা লেখেন তাদের উপর।' বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র পড়েই—অন্য লেখকদেরও—মানিক যখন প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন লেখক হয়ে উঠবার, আরো কিছুকাল পরে, তখন বন্ধুদের সঙ্গে তর্কসূত্রেই তিনি দ্রুত অবতীর্ণ হয়েছিলেন লেখক রূপে। ২০ বছর বয়সে গল্পকার হিশেবে আবির্ভূত হলেন। ২৭ বছর বয়সে গ্রন্থকার (একই সঙ্গে গল্পকার ও ঔপন্যাসিক) হিশেবে আবির্ভূত হলেন। মানিকের প্রথম জীবনের এবং পরবর্তী জীবনের নেপথ্য প্রস্তুতির কথাটা মনে রাখতে হবে। হঠাৎ রাতারাতি লেখক হয়ে গেলেন বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক করে—এমনটি নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সাহিত্যের কানমলা' প্রবন্ধে মানিক ক্রমাগত সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে গল্পের আরেক নতুন রূপ আবিষ্কার করেন। একটি উপন্যাসের ভিতর থেকে গল্প বের করে নিয়ে আসেন—একটু আধটু রদবদল করে। শারদীয়া সংখ্যার গল্পের দাবিতেই মানিকের এই আবিষ্কার। মানিক লক্ষ করেন, 'প্রত্যেক উপন্যাসেই একাধিক গল্পের উপাদান এবং সঙ্কেত কমবেশি থাকে।' লিখছেন, '*আরোগ্য* উপন্যাসটি লিখছিলাম। পূজা আসছে। বইটা লিখতে লিখতে খেয়াল হলো, এই উপন্যাসটিতেই সুন্দর কয়েকটি গল্প আছে। প্রায় একেবারেই তৈরি গল্প—একটু অদলবদল ঘষামাজা করলেই সত্যিকারের গল্প হয়ে যাবে।'

সচেতন মানিকের দৃষ্টি এড়ায় না: 'কোনো কোনো গল্পেও আবার উপন্যাসের বীজ থাকে।' কিন্তু তাঁর সমস্ত শিল্পকর্মে—তাঁর ফ্রয়েডীয় ও মার্ক্সীয় বিখ্যাত দুই পর্যায়েও—মানিক কখনোই যান্ত্রিক নন, সদাসর্বদা শিল্পী, সৃষ্টিশীল শিল্পী। তাই তাঁর চোখকান খোলা থাকে সব সময়। এই প্রবন্ধেও তিনি শেষ পর্যন্ত এই আবিষ্কারও গোপন করেন না: 'কোনো উপন্যাসে ছোটগল্প থাকে, কোনো উপন্যাসে থাকে না।' যুগান্তর চক্রবর্তী উপন্যাস থেকে নির্মিত এরকম ১৪টি গল্পের একটি তালিকা তৈরি করেছেন:

লাজুকলতার 'মীমাংসা' (গল্প) *পাশাপাশি* উপন্যাস থেকে।

লাজুকলতার 'বাহিরে ঘরে' (গল্প) *সার্বজনীন* উপন্যাস থেকে।

'শিল্পী' (গল্প— *পরিস্থিতি* গ্রন্থের নয়, অন্য গল্প), *আরোগ্য* উপন্যাস থেকে।

ফেরিওলার 'লেভেল ক্রসিং' (গল্প) *আরোগ্য* উপন্যাস থেকে।

লাজুকলতার 'চিকিৎসা' (গল্প) *হলুদ নদী সবুজ বন* উপন্যাস থেকে।

গল্পসংগ্রহ-এর 'বড়দিন' (গল্প) *হলুদ নদী সবুজ বন* উপন্যাস থেকে।

গল্পসংগ্রহ-এর 'প্রাক-শারদীয় কাহিনী' (গল্প) *হলুদ নদী সবুজ বন* উপন্যাস থেকে।

স্বনির্বাচিত গল্প-এর 'প্রাক-শারদীয় কাহিনী' (গল্প) *হলুদ নদী সবুজ বন* উপন্যাস থেকে।

গল্পসংগ্রহ-এর 'মানুষ হতবাক নয়' (গল্প) *মাশুল* উপন্যাস থেকে।

গল্পসংগ্রহ-এর 'হাসপাতাল' (গল্প) *প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান* থেকে।

শ্রেষ্ঠগল্প-এর 'বিচার' (গল্প) *শান্তিলতা* উপন্যাস থেকে।

গল্পসংগ্রহ-এর 'শান্তিলতার কথা' (গল্প) *শান্তিলতা* উপন্যাস থেকে।

গল্পসংগ্রহ-এর 'দুর্ঘটনা' (গল্প) *শান্তিলতা* উপন্যাস থেকে।

'ঘাসে কত পুষ্টি' (গল্প) পরিকল্পিত ও অসম্পূর্ণ *আশালতা* উপন্যাস থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরি ও নোটবই-এ অনেক গল্পের সংক্ষিপ্ত খসড়া আছে। এর কোনো-কোনোটির মানিক গল্পরূপ দিয়েছেন, কোনো-কোনোটি অস্পর্শিত রয়ে গেছে। 'সম্ভবপর গল্পের প্লট' এই নামে মানিক পরপর ১৮টি গল্পের প্লটের সংক্ষিপ্ত রেখালেখ্য এঁকেছিলেন—এর একাংশ উদ্ধৃত করছি নমুনা হিশেবে :

সম্ভবপর গল্পের প্লট

১. 'গৃহস্থ পথিক'—'১৫/২০ বৎসর পৃথিবী ঘুরিয়া একজন ঘরসংসার পাতিয়া বসিয়াছে।'

২. 'পথ'—'অশিক্ষিত দুইটি হিন্দু ও মুসলমান বালকের কলহবিবাদ—দু'জনের শিক্ষালাভের পর স্বাভাবিকভাবেই মিলন Better হিন্দু ও মুসলমান কলহ—একের পাড়া দিয়া অপরের পথ—ভয়ে যাতায়াত বন্ধ—ভীষণ কষ্ট।'

৩. 'অকর্মণ্য'—'অর্থোপার্জন ছাড়া সব কাজ করে তবু লোকে অকর্মণ্য বলে, অর্থোপার্জন করিতে গিয়া সব কাজ বাদ দিল তখন অকর্মণ্য নাম ঘুচিয়া গেল।'

৪. 'একজনের সাতটি মেয়ে'—'সাতটি মেয়ের বিভিন্ন জীবনের কাহিনী।'

৫. 'শহর-গ্রাম হইতে শহরে আসিয়াছে'—'বড়বাজারে ব্যাঙ্কে চেক্ ভাঙাইতে যাওয়ার সময় গল্প আরম্ভ—অন্যের চেক—উপন্যাস করা চলিবে।'

৬. 'পাশবিক অত্যাচার'—'দৈহিক অত্যাচার ছাড়াও যে পাশবিক অত্যাচার করা চলে—দেহ সম্পর্কে অতিরিক্ত ভদ্রতা যে কতকটা পাশবিক অত্যাচারের সামিল হইতে পারে—ইত্যাদি।'

৭. 'সেবক' (সেবিকা)—'বড় চাকুরে-মনিবের-সেবক-বাড়ির লোক তার সেবক—চাকরদাসি বাড়ির লোকের সেবক—ইত্যাদি অর্থাৎ সেবকের সেবক, তার সেবক তারও সেবক ইত্যাদি জীবনযুদ্ধ।'

৮. 'লড়াই'—'কার সঙ্গে?—গরীবের জীবনযুদ্ধ।'

৯. 'ক্ষুধা ও তৃষ্ণা' (অথবা 'স্তন')—'শরীরের তুলনায় স্তনের অস্বাভাবিক পরিপুষ্টি—নেশাখোর স্বামী—বেশ্যাবৃত্তি—যে লোক আসিল স্তন দেখিয়া ব্যাপার অনুমান : সমাপ্তি—লোকটি বলিবে : "আমার সামনে ছেলেকে মাই দেও।" ছেলের ক্ষুধা ও গলাশুকানোর নিবৃত্তি।'

১০. 'বৌ : ক্ষুধার কষ্ট'—'একদিন সহ্য করিতে না পারিয়া খোকাকে মাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিতে দিতে মাই নিজের মুখে চুষিতে লাগিল: খোকার ক্ষুধা তৃষ্ণা মিটিলে তার মিটিবে না কেন?'

১১. 'বোকা হাবা কুৎসিত ছেলে'—'ছেলে মরিয়া গেলে স্বামীর বদলে পরিচিত সুন্দর যুবকের দ্বারা স্ত্রীর সুশ্রী সবল সন্তান লাভ।'

ডায়েরিতে এরকম আরো অনেক গল্পের প্লট লিখে রেখেছেন—মাত্র ৪৮-বছরে মৃত্যু হওয়ায় মানিক সব প্লটের গল্পরূপ দেবার সময় পাননি।

গল্পের খতিয়ান

এক

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবদ্দশায় তাঁর ১৬টি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পগ্রন্থগুলির প্রকাশকাল-সমেত নামোল্লেখ করা হলো এখানে (মানিকের জীবদ্দশায় প্রকাশিত সংস্করণও উল্লেখ করা হলো): *অতসী মামী* ১৯৩৫। *প্রাগৈতিহাসিক* ১৯৩৭। *মিহি ও মোটা কাহিনী* ১৯৩৮। *সরীসৃপ* ১৯৩৯। *বৌ* ১৯৪০; *দ্বি সং* ১৯৪৬। *সমুদ্রের স্বাদ* ১৯৪৩। *ভেজাল* ১৯৪৪। *হলুদ পোড়া* ১৯৪৫। *আজ কাল পরশুর গল্প* ১৯৪৬; *দ্বি সং* ১৯৫০। *পরিস্থিতি* ১৯৪৬। *খতিয়ান* ১৯৪৭। *ছোট বড়* ১৯৪৮। *মাটির মাশুল* ১৯৪৮। *ছোট বকুলপুরের যাত্রী* ১৯৪৯। *ফেরিওলা* ১৯৫৩; *দ্বি সং* ১৯৫৫। *লাজুকলতা* ১৯৫৩।

এই ১৬টি গল্পগ্রন্থে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রায় ২০০টি গল্প অন্তর্ভূত হয়েছিল। এগুলির তালিকা এখানে দেওয়া হলো: ১ অতসী মামী ২ নেকী ৩ বৃহত্তর-মহত্তর ৪ শিপ্রার অপমৃত্যু ৫ সর্পিল ৬ পোড়াকপালী ৭ আগন্তুক ৮ মাটির সাকী ৯ মহাসঙ্গম ১০ আত্মহত্যার অধিকার (*অতসী মামী*) ১১ প্রাগৈতিহাসিক ১২ চোর ১৩ যাত্রা ১৪ প্রকৃতি ১৫ ফাঁসি ১৬ ভূমিকম্প ১৭ অন্ধ ১৮ চাকরি ১৯ মাথার রহস্য (*প্রাগৈতিহাসিক*) ২০ টিকটিকি ২১ বিপত্নীক ২২ ছায়া ২৩ হাত ২৪ বিড়ম্বনা ২৫ রকমারি ২৬ কবি ও ভাস্করের লড়াই ২৭ আশ্রয় ২৮ শৈলজশিলা ২৯ খুকী ৩০ অবগুণ্ঠিত ৩১ সিঁড়ি (*মিহি ও মোটা কাহিনী*) ৩২ মহাজন ৩৩ বন্যা ৩৪ মমতাদি ৩৫ মহাকালের জটার জট ৩৬ গুপ্তধন ৩৭ প্যাঁক ৩৮ বিষাক্ত প্রেম ৩৯ দিক-পরিবর্তন ৪০ নদীর বিদ্রোহ ৪১ মহাবীর ও অবলার ইতিকথা ৪২ দু'টি ছোটোগল্প: বোমা ৪৩: পার্থক্য ৪৪ সরীসৃপ (*সরীসৃপ*) ৪৫ দোকানীর বৌ ৪৬ কেরানীর বৌ ৪৭ সাহিত্যিকের বৌ ৪৮ বিপত্নীকের বৌ ৪৯ তেজী বৌ ৫০ কুষ্ঠরোগীর বৌ ৫১ পূজারীর বৌ ৫২ রাজার বৌ ৫৩ উদারচরিতানামের বৌ ৫৪ প্রৌঢ়ের বৌ ৫৫ সর্ববিদ্যাবিশারদের বৌ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫৬ অন্ধের বৌ ৫৭ জুয়াড়ীর বৌ (*বৌ*) ৫৮ সমুদ্রের স্বাদ ৫৯ ভিক্ষুক ৬০ পূজা কমিটি ৬১ আপিম ৬২ গুণ্ডা ৬৩ কাজল ৬৪ আততায়ী ৬৫ বিবেক ৬৬ ট্রাজেডির পর ৬৭ মালী ৬৮ সাধু ৬৯ একটি খোয়া ৭০ মানুষ হাসে কেন (*সমুদ্রের স্বাদ*) ৭১ ভয়ঙ্কর ৭২ রোমান্স ৭৩ ধনজনযৌবন ৭৪ মুখে ভাত ৭৫ মেয়ে ৭৬ দিশেহারা হরিণী ৭৭ মৃতজনে দেহ প্রাণ ৭৮ যে বাঁচায় ৭৯ বিলাসমন ৮০ বাস্ ৮১ স্বামী-স্ত্রী (*ভেজাল*) ৮২ হলুদ পোড়া ৮৩ বোমা ৮৪ তোমরা সবাই ভাল ৮৫ চুরি চুরি খেলা ৮৬ ধাক্কা ৮৭ ওমিলনাইন ৮৮ জন্মের ইতিহাস ৮৯ ফাঁদ ৯০ ভাঙা ঘর ৯১ অন্ধ ও ধাঁধা (*হলুদ পোড়া*) ৯২ আজ কাল পরশুর গল্প ৯৩ দুঃশাসনীয় ৯৪ নমুনা ৯৫ বুড়ী ৯৬ গোপাল শাসমল ৯৭ মঙ্গলা ৯৮ নেশা ৯৯ বেড়া ১০০ তারপর? ১০১ স্বার্থপর ও ভীরুর লড়াই ১০২ শত্রু-মিত্র ১০৩ রাঘব মালাকর ১০৪ যাকে ঘুষ দিতে হয় ১০৫ কৃপাময় সামন্ত ১০৬ নেড়ী ১০৭ সামঞ্জস্য (*আজ কাল পরশুর গল্প*) ১০৮ প্যানিক ১০৯ সাড়ে সাত সের চাল ১১০ প্রাণ ১১১ রাসের মেলা ১১২ মাসি পিসি ১১৩ অমানুষিক ১১৪ পেটব্যথা ১১৫ শিল্পী ১১৬ কংক্রীট ১১৭ রিকশাওয়ালা ১১৮ প্রাণের গুদাম ১১৯ ছেঁড়া (*পরিস্থিতি*) ১২০ খতিয়ান ২২১ ছাঁটাই রহস্য ১২২ চক্রান্ত ১২৩ গুণ্ডামী ১২৪ কানাই তাঁতী ১২৫ চোরাই ১২৬ চালক ১২৭ টিচার ১২৮ ছিনিয়ে খায়নি কেন ১২৯ একান্নবর্তী (*খতিয়ান*) ১৩০ ভালবাসা ১৩১ তথাকথিত ১৩২ ছেলেমানুষি ১৩৩ স্থানে ও স্তানে ১৩৪ স্টেশন রোড ১৩৫ পেরানটা ১৩৬ দিঘি ১৩৭ হারানের নাতজামাই ১৩৮ ধান ১৩৯ সাথী ১৪০ গায়েন ১৪১ নব আল্পনা ১৪২ ব্রিজ (*ছোট বড়*) ১৪৩ মাটির মাশুল ১৪৪ বক্তা ১৪৫ ঘর ও ঘরামি ১৪৬ ট্রামে ১৪৭ দেবতা ১৪৮ আপদ ১৪৯ পথান্তর ১৫০ সিদ্ধপুরুষ ১৫১ হ্যাংলা ১৫২ বাগদীপাড়া দিয়ে ১৫৩ পারিবারিক ১৫৪ ধর্ম ১৫৫ ভয়ংকর (*মাটির মাশুল*) ১৫৬ ছোট বকুলপুরের যাত্রী ১৫৭ মেজাজ ১৫৮ প্রাণাধিক ১৫৯ ঘর করলাম বাহির ১৬০ নিচু চোখে দু'আনা আর দু'পয়সা ১৬১ নিচু চোখে একটি মেয়েলি সমস্যা ১৬২ সখী (*ছোট বকুলপুরের যাত্রী*) ১৬৩ ফেরিওলা ১৬৪ সংঘাত ১৬৫ সতী ১৬৬ লেভেল ক্রসিং ১৬৭ ধাত ১৬৮ ঠাঁই নাই ঠাঁই চাই ১৬৯ চুরিচামারি ১৭০ দায়িক ১৭১ মহাকর্কট বটিকা ১৭২ আর না কান্না ১৭৩ মরব না শস্তায় ১৭৪ এক বাড়িতে (*ফেরিওলা*) ১৭৫ লাজুকলতা ১৭৬ গুণ্ডা ১৭৭ বাহিরে ঘরে ১৭৮ চিকিৎসা ১৭৯ মীমাংসা ১৮০ সুবালা ১৮১ অসহযোগী ১৮২ স্বাধীনতা ১৮৩ নিরুদ্দেশ ১৮৪ পাষণ্ড ১৮৫ উপদলীয় ১৮৬ এদিক-ওদিক ১৮৭ এপিঠ-ওপিঠ ১৮৮ পাসফেল ১৮৯ কলহান্তরিত (*লাজুকলতা*)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই তালিকায় যে-সব গল্প একবার কোনো গ্রন্থ হয়ে পরে আবার আরেকটি গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে, সেগুলি দ্বিতীয়বার আর উল্লেখিত হয়নি: যেমন, *অতসী মামীর* 'মাটির সাকী' গল্পটি *প্রাগৈতিহাসিক* গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল; 'চালক' *খতিয়ানে* প্রকাশিত হওয়ার পরে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল *ছোট বড়* গ্রন্থে, 'নব আল্পনা' ও 'ব্রিজ' *ছোট বড়* প্রকাশের পরে পুনর্মুদ্রিত হয় *ছোট বকুলপুরের যাত্রী* গ্রন্থে; 'সখী' *ছোট বকুলপুরের যাত্রী*তে প্রকাশের পরে *ফেরিওলা* গ্রন্থে পুনঃপ্রকাশিত; 'আপদ' *মাটির মাশুলে* প্রকাশের পর *লাজুকলতায়* পুনঃপ্রকাশিত। *মাটির মাশুল* গল্পগ্রন্থের 'ভয়ংকর' একাঙ্ক বলে এই তালিকায় পরিবর্জিত।

মানিকের জীবদ্দশায় তাঁর দুটি গল্পসংগ্রহ প্রকাশিত হয়: *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প* ১৯৫০; *দ্বি সং* ১৯৫৩। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বনির্বাচিত গল্প* ১৯৫৬। এই দুই গল্পসংগ্রহে পূর্বগ্রন্থিত তালিকার বাইরে আছে এই কয়েকটি গল্প :

১ বিচার ২ কে বাঁচায় কে বাঁচে (*শ্রেষ্ঠগল্প*) ৩ প্রাক-শারদীয় কাহিনী ৪ রক্ত-নোনতা (*স্বনির্বাচিত গল্প*)। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবদ্দশায় তাঁর গ্রন্থভুক্ত গল্প এই ১৯৩টি। আমরা সাধারণভাবে বলতে পারি শ' দুয়েক।

AMARBOI.COM

দুই

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় তাঁর কয়েকটি গল্পসংগ্রহ। এগুলি হচ্ছে: *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পসংগ্রহ* ১৯৫৭। *উত্তরকালের গল্পসংগ্রহ* ১৯৬৩। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প* (নতুনভাবে সম্পাদিত) ১৯৬৫। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাছাই গল্প* (১৯৮১)।

এইসব সংগ্রহে ইতঃপূর্বে অগ্রন্থিত যে-সব নতুন গল্প সংযোজিত হয়েছে, সেগুলি হচ্ছে: ১ বড়দিন ২ শান্তিলতার কথা ৩ সশস্ত্র প্রহরী ৪ মাছের লাজ ও মাংসের ঝাঁজ ৫ সবার আগে চাই ৬ হাসপাতাল ৭ জল-মাটি-দুধ-ভাত ৮ খাটাল ৯ দুর্ঘটনা ১০ গলায় দড়ি কেন ১১ কালোবাজারের প্রেমের দর ১২ মানুষ হতবাক নয় ১৩ ঢেউ (*গল্পসংগ্রহ*) ১৪ একটি বখাটে ছেলের কাহিনী ১৫ উপায় ১৬ কোন দিকে (*উত্তরকালের গল্পসংগ্রহ*)।

যুগান্তর চক্রবর্তী মানিকের অগ্রন্থিত রচনার যে-তালিকা তৈরি করেছেন (*অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* ১৯৭৬), তাতে রয়েছে তার অনেকগুলি গল্প: ১ স্নায়ু ২ মানুষ কাঁদে কেন ৩ চোখ ৪ কলহের জের ৫ সঞ্চয়াভিলাষীর অভিযান ৬ অকর্মণ্য ৭ প্রতিক্রিয়া ৮ গৃহিণী ৯ পুত্রার্থে ১০ অপর্ণার ভুল ১১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটক ১২ সন্ধ্যা ও তারা ১৩ খুনী ১৪ জোতদার ১৫ ব্যথার পূজা ১৬ সাধারণ প্রেম ১৭ জয়দ্রথ ১৮ শীত ১৯ চৈতালী আশা ২০ প্রেমিক ২১ সহানুভূতি ২২ বাজার ২৩ রাস্তায় ২৪ দলপতি ২৫ পশুর বিদ্রোহ ২৬ বাঘের বংশরক্ষা ২৭ দুটি যাত্রী ২৮ বন্ধু ২৯ অন্ন ৩০ ভীরু ৩১ শারদীয়া ৩২ ভোঁতা হৃদয় ৩৩ গেঁয়ো ৩৪ রূপান্তর ৩৫ গেঁয়ো (২নং) ৩৬ বিয়ে ৩৭ শিল্পী ৩৮ মায়া নয়—দায় ৩৯ স্টুডিও ৪০ বিচিত্রা ৪১ ছোট একটি গল্প ৪২ রত্নাকর ৪৩ অগ্নিশুদ্ধি ৪৪ বিষ ৪৫ গল্প ৪৬ রোমাঞ্চকর ৪৭ ঘাসে কত পুষ্টি ৪৮ মতিগতি ৪৯ চিন্তাজ্বর ৫০ তারপর ৫১ বিদ্রোহী ৫২ চাওয়ার শেষ ৫৩ মেজাজের গল্প ৫৪ পালাই! পালাই! ৫৫ সংক্রান্তি ৫৬ ডুবুরী ৫৭ জীবনের সমারোহ ৫৮ রফা ও দফার কাহিনী ৫৯ চাপা আগুন।

—তাহলে সব-মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবদ্দশায় শ-দুয়েক গল্প গ্রন্থিত হয়েছিল। লেখকের মৃত্যুর পরে আরো ষোলোটি গল্প গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে। এর বাইরে পত্র-পত্রিকায় ছড়ানো আরো আটটি গল্পের সন্ধান পাওয়া গেছে। নিশ্চিতভাবে পত্রপত্রিকায় আরো বেশ কিছু গল্প প্রকাশিত হয়—আমাদের অগোচর হয়ে আছে আজ। এখনো পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা মোটামুটি সিদ্ধান্ত নিতে পারি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কম বেশি শ-তিনেক ছোটোগল্প লিখেছিলেন।

AMARBOI.COM

গল্প—প্রথম পর্যায়

১৯৪৩ সালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেছিলেন। আমরা এই হিশেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগুচ্ছকে ভাগ করব দুটি পর্যায়ে: ১৯২৮-৪৩—প্রথম পর্যায়, ১৯৪৪-৫৬—দ্বিতীয় পর্যায়। এই বিভাজন কিছুটা কৃত্রিমভাবে সাধিত হলো। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পের তালিকা প্রকাশিত হলে ১৯৪৪-এর আগে-পরের গল্পগুচ্ছকে চিহ্নিত করা যাবে—তার আগে নয়। গল্পের অন্তর্বিষয়ের দিকে লক্ষ রেখে আমরা এই দুই পর্যায়ের গল্পগুচ্ছ আলোচনা করব।

সেই হিশেবে ১৯৪৪-এর পরে প্রকাশিত ‘ভেজাল’ ও ‘হলুদ পোড়া’কেও আমরা ’৪৪-অন্তর্বর্তী ধারার গল্প হিশেবে ধরছি। গল্পসংগ্রহগুলি বাদ দিয়ে মানিকের ষোলোটি গল্পগ্রন্থের ঠিক অর্ধেকাংশ আটটি গল্পগ্রন্থকে আমরা প্রথম পর্যায়ের আলোচ্য গল্পগ্রন্থ হিশেবে গ্রহণ করেছি। *অতসী মামী* ১৯৩৫; *প্রাগৈতিহাসিক* ১৯৩৭; *মিহি ও মোটা*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাহিনী ১৯৩৮; *সরীসৃপ* ১৯৩৯; *বৌ* ১৯৪০, দ্বি. স. ১৯৪৬; *সমুদ্রের স্বাদ* ১৯৪৩; *ভেজাল* ১৯৪৩; *হলুদ পোড়া* ১৯৪৫। কার্যত ১৯৪৬-এ প্রকাশিত *বৌ* গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ পর্যন্ত আমাদের আলোচনা-পরিধি বিস্তৃত। দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পগ্রন্থ হিশেবে থাকছে বাকি আটটি গল্পগ্রন্থ: *আজ কাল পরশুর গল্প* ১৯৪৬; *পরিস্থিতি* ১৯৪৬; *খতিয়ান* ১৯৪৭; *ছোট বড়* ১৯৪৮; *মাটির মাশুল* ১৯৪৮; *ছোট বকুলপুরের যাত্রী* ১৯৪৯; *ফেরিওলা* ১৯৫৩; *লাজুকলতা* ১৯৫৩।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগুচ্ছকে এই যে দুটি পর্যায়ে বিভাজন করে নিয়েছি (বা) কেউ কেউ করেছেন তিনটি স্তরে—এর কোনোটাই জল-অচল বিভাজ্য কোনো ব্যাপার নয়। মানিক চিরকালই মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের রূপকার। দ্বিতীয় গল্পগুচ্ছ *প্রাগৈতিহাসিক*-এর একটি গল্পে প্রাসঙ্গিক যে কথাগুলি মানিক বলেছেন তা-ই প্রমাণ করে নিম্নবিত্তের জীবনের বিপুল বিচিত্রতা কীভাবে তাঁকে আকর্ষণ করে, তার রহস্য উন্মোচন 'অনেক ভদ্রলোকের সুমার্জিত মনের দিগন্তে যাহার আভাস নাই। কবির নেশা নারী, চোরের নেশা চুরি।...সংসারে এমন লক্ষ লক্ষ সাধু আছে, যাহাদের লইয়া আমি গল্প লিখিতে পারি না। জীবনে তাহাদের গল্প নাই। প্রেমিকের মতো, অন্যায় অসঙ্গত চুরি-করা প্রেমের ব্যাপারে প্রেমিকের মতো চোরের জীবন গল্পময়।' ('চোর', *প্রাগৈতিহাসিক*) সামগ্রিকভাবে নিম্নবিত্তের জীবন চিত্রণেই মানিকের কুশলতা ও আনন্দ বেশি—ডাকাত থেকে ভিক্ষুকে পরিণতি ইত্যাদি বিষয়-আশয় (*প্রাগৈতিহাসিক*)।

'অতসী মামী' গল্পটি যেন অব্যবহিত-পূর্ব কল্লোল ধারাবাহিকতার চিহ্ন ধরে রেখেছে। এই গল্পের নায়কের যক্ষ্মারোগে মৃত্যু কল্লোলের গল্প-উপন্যাসের একটি সাধারণ লক্ষণ। *অতসী মামী* গল্পগ্রন্থের অনেকগুলি গল্পের নায়িকাই—পরিষ্কার বোঝা যায়—কল্লোল নায়িকাদের লক্ষণাক্রান্ত—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বা প্রবোধকুমার সান্যালের নায়িকাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক টের পাওয়া যায়। মানিকের *দিবারাত্রির কাব্য* (১৯৩৫) উপন্যাসের নায়িকার মতোই রোমান্টিক। মানিকের নায়িকারা ক্রমশ রোমান্টিকতামুক্ত বাস্তবভিত্তিতে অধিষ্ঠান করে। চরিত্রের কুহেলি-প্রহেলির জায়গায় দেখা যায় একটু বা মনোবিকলনী আবহ। কিন্তু *অতসী মামী* গল্পগ্রন্থের রচনাকাল অনুযায়ী সজ্জিত গল্পগুচ্ছে দেখা যাবে, মানিক ক্রমশ স্বভূমিতে অধিষ্ঠিত হচ্ছেন। ঐ গ্রন্থের সর্বশেষ গল্পের নাম 'সর্পিল'—মানিক ক্রমশ মনঃপৃথিবীর সর্পিলতায় প্রবেশ করছেন—এই ইঙ্গিত দ্যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেটুকু রোমান্টিকতার ফেনা ছিল তা কেটে গেল মানিকের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থেই। *প্রাগৈতিহাসিক* (১৯৩৭) এমন একটি গল্পগ্রন্থ, যেখানে মানিক নিজেকে দাঁড় করালেন বস্তুভিত্তির উপরে। দরকার ছিল মধ্যবিত্ত রোমান্টিকতার জগৎ থেকে মধ্যবিত্ত আর নিম্নবিত্তের বস্তুবাদী জগতে মানিকের চলে আসা। দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থেই মানিক নিজস্বতা পেলেন।

আশ্চর্য যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প, 'অতসী মামী' গল্পটাই, চলতি ভাষায় লেখা। *অতসী মামী* গল্পগ্রন্থের গল্পগুলি সাধু ও চলতি দুই রীতিতেই লেখা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী গল্পগ্রন্থ *প্রাগৈতিহাসিক*-এ দেখা যাচ্ছে, মানিক কেবল সাধু রীতিই অবলম্বন করেছেন। সাধু ও চলতি দুই রীতিতেই মানিক স্বচ্ছন্দ—তা ঠিক, কিন্তু মানিকের সাফল্য সম্ভবত সাধু রীতিতেই উজ্জ্বলতর। *প্রাগৈতিহাসিক* গ্রন্থের সবগুলি গল্পই সাধু রীতির। মানিক যখন স্বভূমিতে উত্তীর্ণ ও অধিষ্ঠিত হলেন, তখন, দেখা যাচ্ছে সাধু গদ্যই তাঁর অবলম্বন। কিন্তু গদ্যভাষার কথা নয়, *প্রাগৈতিহাসিক* বই-এর গল্পগুচ্ছে মানিকের অভীষ্ট হয়ে উঠল মানুষের মনোজগতের রহস্য উন্মোচন।

'ফাঁসি' গল্পে খুনের আসামি গণপতির একবার ফাঁসির হুকুম হয়ে গেল, তারপর শেষ মুহূর্তে ফাঁসির হুকুম রদ হওয়ায় সে বেঁচে গেল। অদ্ভুত মানিকের মনোবিশ্লেষণ : 'জীবন ফিরিয়া পাইয়া তার [গণপতির] নিজেরও তেমন উল্লাস হইল কই?' কিন্তু ফাঁসির আসামির পরিবারে এক ঝড় বয়ে গেছে : সাময়িক লজ্জা, সামাজিক উৎপীড়ন। গণপতির বোনকে শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে। মানুষের ঘৃণা ও কৌতূহল কী-পরিমাণ দুর্বহ হয়ে উঠেছিল, গণপতির স্ত্রী রমা যখন গণপতিকে চিরতরে ওই বাড়ি ছেড়ে যাবার প্রস্তাব করে তখনো বোঝা যায় না। বোঝা যায় গল্পের অনুচ্ছেদে : 'পরদিন সকালে রাজেন্দ্র উকিলের বাড়িতে একটা বিরাট হৈ চৈ শোনা গেল। বাড়ির মেঝো বৌ রমা নাকি গলায় ফাঁসি দিয়া মরিয়াছে।' একদিকে এরকম মনোবিশ্লেষণ, অন্যদিকে নিচুতলার মানুষের প্রতি মানিকের যে চিরন্তন আগ্রহ তারও স্বীকৃতি আছে, 'চোর' গল্পে। এই গল্পের নায়ক মধু একজন চোর। তার কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে মানিক বলছেন, 'সংসারে এমন লাখ লাখ সাধু আছে, যাহাদের লইয়া আমি গল্প লিখিতে পারি না। জীবনে তাহাদের গল্প নেই। প্রেমিকের মতো, অন্যায় অসংগত চুরি করা প্রেমের ব্যুৎপন্ন প্রেমিকের মতো চোরের জীবন গল্পময়।' এই চোর-ভিখিরিদের প্রতিই আমরা দেখেছি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনিবার আগ্রহ। 'চোর' গল্পের মধ্যখানে মধু'র ভাবনার ভাষা এরকম : মধু 'ভাবিল, কিসের পাপ? জগতে চোর নয় কে? সবাই চুরি করে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধু'র এই ভাবনারই বাস্তবায়ন দেখি এই গল্পে। নিচুতলার জীবনের রূপকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে আদিমতার জয়গান :

> হয়তো ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিকতা অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনদিন পাইবেও না।

ডি. এইচ. লরেন্স-এর সঙ্গে উচ্চারণের কিছু সাধর্ম সত্ত্বেও এখানেই, এবং অন্যত্র, আমরা লক্ষ করি—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর চরিত্রপাত্রের সঙ্গে ওরকম একাত্ম হয়ে যান না, একটি দূরত্ব রক্ষা করেন। এই দূরত্বের ফলেই মানিকের ১৯৪৪-এর পরবর্তী গল্প-উপন্যাসে রূপায়িত হতে থাকে মানুষ ও পৃথিবী ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ থেকে—এমনকি ঐ প্রথম পর্যায়েও তিনি বহুবিচিত্র জগৎ চিত্রিত করেন। অন্য একটি বিষয় এখানে লক্ষণীয়—'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের মতো মানিকের আরো কোনো-কোনো গল্পের উপসংহারে লেখকের মন্তব্য যোজিত হয়। যেমন 'সরীসৃপ' গল্পের শেষে :

> ঠিক সেই সময় মাথার উপর দিয়া একটা এরোপ্লেন উড়িয়া যাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে সেটা সুন্দরবনের উপরে পৌছিয়ে গেল। মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনের পশুরা যেখানে আশ্রয় নিয়াছে।

এরকম মন্তব্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক গল্পেই আছে। *সরীসৃপ* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পর্যায়ের একটি প্রতিনিধিত্বশীল গল্পগ্রন্থ, আরেকটি প্রতিভূ গল্পগ্রন্থ *বৌ*। *বৌ* গল্পগ্রন্থের তেরোটি গল্পে বিচিত্র পেশাজীবী মানুষের স্ত্রীদের মনোজগতের বিস্ময়কর চিত্রণ প্রমাণ করে মানিক অন্তর্জগতের কোন গভীর স্তর-স্তরান্তরে প্রবেশ করেছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র সাহিত্যজীবনের একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি *বৌ* গল্পগ্রন্থটি। একশো বছরের বাংলা গল্পসাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ *বৌ* গল্পগ্রন্থটি।

গল্প—দ্বিতীয় পর্যায়

দ্বিতীয় পর্যায়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পের প্রধান লক্ষণ কালচেতনা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, দেশবিভাগ, স্বাধীনতার মোহভঙ্গ—অনেক গল্পের পৃষ্ঠপট রচনা করেছে। মধ্যবিত্ত জীবন থেকে তাঁর দৃষ্টি ক্রমশ চলে এসেছে অনেকখানি নিম্নবিত্তে। অন্তর্বাস্তবতা কখনো তিনি পরিবর্জন করেননি, বহির্বাস্তবতা এখন বড়ো জায়গা দখল করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনোজগতের চিত্রণের চেয়ে বহির্জগতের চিত্রণ হয়ে উঠেছে চরিত্র। মানিক নিজেই অনেক সময় তাঁর সচেতনতার কথা জানিয়েছেন : 'আড়াই বছর বয়স থেকে আমার দৃষ্টিভঙ্গির ইতিহাস আমি মোটামুটি জেনেছি। (কেন লিখি) ছেলেবেলা থেকে 'কেন?' নামক মানসিক রোগে ভুগছি, ছোটো বড়ো সব বিষয়ের মর্মভেদ করার অদম্য আগ্রহ যে রোগের প্রধান লক্ষণ।' ('গল্প লেখার গল্প') দ্বিতীয় পর্যায়ে তাই গল্পের শেষে 'কেন?'-এর স্পষ্ট জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন গল্পের মধ্যেই। দ্বিতীয় পর্যায়ে তাই গল্পের নাম হয় 'ছিনিয়ে খায়নি কেন', 'গলায় দড়ি কেন', 'মানুষ কাঁদে কেন' এরকম। এখন আর গল্পের নাম হচ্ছে না 'সরীসৃপ', 'সর্পিল', 'প্রাগৈতিহাসিক'। এখন নামের মধ্যেই উদ্দেশ্যমূলকতা পরিষ্কার ধরা পড়ছে কখনো-কখনো : 'ঠাঁই নাই ঠাঁই চাই', 'আর না কান্না', 'মরবো না শস্তায়', 'সবার আগে চাই' ইত্যাদি। এই পর্যায়ে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধে মানিক তাঁর বাস্তবতার আরাধনার কথা বলেছেন। একই সঙ্গে তাঁর মধ্যে আদর্শিকতা যে কী প্রবল ছিল তারও প্রকাশ ঘটেছে : 'লেখক কে? পিতার মতো যিনি দেশের মানুষকে সন্তানের মতো জীবনাদর্শ বুঝিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করার ব্রত নিয়েছেন। পিতার মতো, গুরুর মতো, জীবনের নিয়ম-অনিয়ম, বাঁচার নিয়ম-অনিয়ম শেখান বলেই অল্পবয়সী লেখক-শিল্পীও জাতির কাছে পিতার মতো, গুরুর মতো সম্মান পান।' ('সাহিত্য-সমালোচনা প্রসঙ্গ') বাস্তবিকতা আর আদর্শিকতার সমন্বয় মানিকের দ্বিতীয় পর্যায়ের ছোটোগল্পের একটি প্রধান বিশিষ্টতা।

সমকালীন দেশ-কাল ধারণের চেষ্টা শুরু হয় মানিকের *আজ কাল পরশুর গল্প* (১৯৪৬) গল্পগ্রন্থ থেকে। এই পরিবর্তনের শুরু আসলে ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের কাল থেকে। চিন্মোহন সেহানবীশেরা একটু অবাকই হয়েছিলেন মানিকের কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান করায়। প্রথম থেকেই মানিক সমাজের নিচুতলার জীবনযাপনের রূপদাতা। সংবেদী মানিক *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬) উপন্যাসেই কি এই পঙ্‌ক্তিগুলি রচনা করেননি?—'ঘুমে ও শ্রান্তিতে কুবেরের চোখ দু'টি বুজিয়া আসিতে চায় আর সেই নিমীলন-পিপাসু চোখে রাগে দুঃখে আসিতে চায় জল। গরীবের মধ্যে সে গরীব, ছোটলোকের মধ্যে আরো বেশি ছোটলোক। এমনভাবে তাহাকে বঞ্চিত করিবার অধিকারটা সকলে তাই প্রথার মতো, সামাজিক ও ধর্ম-সম্পর্কীয় দশটা নিয়মের মতো অসংকোচে গ্রহণ করিয়াছে। সে প্রতিবাদ করিতেও পারিবে না। মনে মনে সকলেই যাহা জানে মুখ ফুটিয়া তাহা বলিবার অধিকার তাহার নাই।' *পদ্মানদীর মাঝির* নায়ক কুবেরের বর্ণনা এই। উত্তরকালে এই কুবেরই মানিক-সাহিত্যে হয়ে ওঠে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিবাদী। কুবের যে জেলেপাড়ার অধিবাসী, তার বর্ণনা এরকম: 'জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষণ্ণ। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সংকীর্ণতায়। আর দেশী মদে। তালের রস গাঁজিয়া যে মদ হয়, ক্ষুধার অন্ন পচিয়া যে মদ হয়। ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এইখানে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।' উত্তরকালের যে পরিবর্তিত মানিক, এখানে কি তাকে আমরা দেখছি না?—সুতরাং মানিকের কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান করা, সাহিত্যসৃষ্টির পরিবর্তন আকস্মিকতার ফল নয়—ধারাবাহিকতার ফল।

প্রথম পর্যায়েই মানিক শুধু অসাধারণ গল্প লিখেছেন, দ্বিতীয় পর্যায়ে লিখতে পারেননি—এই উক্তি অযথার্থ। 'হারানের নাতজামাই', 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী', 'রাসের মেলা', 'একান্নবর্তী'র মতো গল্প লেখেননি মানিক এ পর্যায়ে? মনে হয়, ১৩৫০ বা ১৯৪৩-৪৪-এর মন্বন্তর মানিকের চেতনায় বড়োরকম ঘা দিয়েছিল। মন্বন্তর সেদিন চিহ্নিত হয়েছিল কবিতায় গল্পে উপন্যাসে নাটকে চিত্রকলায় গানে ভাস্কর্যে পর্যন্ত। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) *অশনিসংকেত*, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) *মন্বন্তর*, গোপাল হালদারের (১৯০২-৯৩) *পঞ্চাশের পথে*, *ঊনপঞ্চাশী ও তেরো শো পঞ্চাশ*—ত্রয়ী উপন্যাস, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *চিন্তামণি* (১৯৪৬) ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষের বিখ্যাত উপন্যাস। তিরিশ ও চল্লিশের দশকের অনেক গল্পকারই দুর্ভিক্ষ নিয়ে গল্প লিখেছেন—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৫-৮৩), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-৭৬), রমেশচন্দ্র সেন (১৮৯৪-১৯৬৩), সরোজকুমার রায় চৌধুরী (১৯০৩-৭২), মনোজ বসু (১৯০১-৮৭), সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-৮০), জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-৭০), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-৭১), ননী ভৌমিক (১৯২২-৯৫), নবেন্দু ঘোষ (১৯১৭), সুশীল জানা (১৯১৬), আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৭-১৯৯৫) প্রমুখ। তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্ভিক্ষের শ্রেষ্ঠ গল্পকার।

১৯৪৪ সালে দুর্ভিক্ষের কবিতা নিয়ে সংকলন করেছিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-৪৭): *আকাল*। ঐ ১৯৪৪ সালেই আর-একটি দুর্ভিক্ষের গল্প-সংকলন সম্পাদনা করেছিলেন পরিমল গোস্বামী (১৮৯৭-১৯৭৬)। *মহামন্বন্তর* নামে ঐ সংকলনে গৃহীত হয়েছিল 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!' নামে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পটি দুর্ভিক্ষের প্রথম ও প্রধান গল্পসংগ্রহ *আজ কাল পরশুর গল্প* (১৯৪৬/জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩) থেকে। 'বৈশাখ ১৩৫৩'-চিহ্নিত ভূমিকায় মানিক লিখেছেন, 'গল্পগুলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রায় সমস্তই গত একবছরের মধ্যে লেখা।' সেদিক থেকে মনে হয় মানিকের দুর্ভিক্ষ-পরবর্তী অধিকাংশ গল্প দুর্ভিক্ষকালের অব্যবহিত পরের রচনা। *পরিস্থিতি* (১৯৪৬), *খতিয়ান* (১৯৪৭), *ছোট বড়* (১৯৪৮) প্রভৃতি গল্পগ্রন্থগুলিতেও মানিকের দুর্ভিক্ষের গল্প আছে। মানিকের দুর্ভিক্ষকেন্দ্রী গল্প এগুলি : ১ আজ কাল পরশুর গল্প ২ দুঃশাসনীয় ৩ নমুনা ৪ গোপাল শাসমল ৫ রাঘব মালাকর ৬ কৃপাময় সামন্ত ৭ নেড়ী (*আজ কাল পরশুর গল্প*), ৮ সাড়ে সাত সের চাল ৯ প্রাণ (*পরিস্থিতি*) ১০ ছিনিয়ে খায়নি কেন (*খতিয়ান*) ১১ ধান (*ছোট বড়*) ১২ কে বাঁচায়, কে বাঁচে! (*শ্রেষ্ঠগল্প*) ইত্যাদি।

'আজ কাল পরশুর গল্প' এই নামের মধ্যেই সাম্প্রতিকতা সূচিত। নাম-গল্পটিতে চরিত্রের পর চরিত্র : প্রধান ভূমিকা রামপদ আর তার বৌ মুক্তার : অন্যান্য চরিত্র সুদাস, নিকুঞ্জ, গদা, গোকুল, গদাধর, সুরমা, সাধনা, বনমালী, করালী, কানাই, ভুবন, ফণি, শঙ্কর, গিরির মা, আর ঘনশ্যাম দাস ও গিরি। গল্পটা তুলে এনেছে মন্বন্তরের সম্পূর্ণ পরিপ্রেক্ষিত। রামপদ'র বৌ মুক্তা অভাবে পড়ে মানসুকিয়া গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এখন মুক্তা ফিরে এসেছে কয়েক মাস পরে। নিয়ে এসেছে কয়েকজন গ্রামকর্মী। মুক্তাকে গ্রহণ করতে রামপদ অরাজি নয়। কিন্তু ঘনশ্যাম দাস আর দলবল বাধা দেবার ষড়যন্ত্র আঁটে। এই উপলক্ষে একটা সমাবেশেরও ব্যবস্থা করে ঘনশ্যাম। কিন্তু ঘনশ্যামের ব্যবহৃত গিরি আগেই ঘনশ্যামকে বলে রেখেছিল, 'মোর ঘরে ফেরবার পথে কাঁটা দেবার মতলব, না? ওর [রামপদর] বৌকে ঘরে ফিরতে না দিলে, মোকে কে ঘরে ফিরতে দেবে শুনি? মোকে একঘরে করবে না সবাই?' সভার মধ্যে গিরি, বনমালী, করালীরা এমন-সব প্রশ্ন তোলে যে সুবিধে করতে পারে না ঘনশ্যাম আর তার লোকেরা। সভা ভেস্তে যায়। অর্থাৎ মুক্তা ঠিকই রামপদ'র ঘরে পুনর্গৃহীত হয়। কিন্তু মুক্তা আর রামপদর কাহিনী বয়ানই মানিকের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়—দুর্ভিক্ষের সম্পূর্ণ ছবি তুলে ধরাই তার লক্ষ্য। তাই—গ্রামে ফেরা গিরিকে চিনতে পারে না গিরির মা।

গল্প শেষ হয় গিরির প্রতি গিরির মা'র এই মর্মভেদী মন্তব্যে : 'কে গো বাছা তুমি? হঠাৎ ডেকে চমকে দিলে?' 'দুঃশাসনীয়' গল্পেও চরিত্র অনেক : পাঁচী, মানদা, বৈকুণ্ঠ, কানু, বঙ্কু, ভূতি, রাবেয়া, আনোয়ার, আমিনা, অবিনাশ, ভোলা ইত্যাদি। হাতিপুর গ্রামের এইসব মানুষের বস্ত্রের অভাব সীমা ছাড়িয়েছে। এখানেও লেখকের লক্ষ্য দুর্ভিক্ষের পুরো পরিপ্রেক্ষিত তুলে আনা। গল্পের শেষে তাই এরকম একটি নিরাবেগ দীর্ঘবাক্য : 'কাপড় যে দিতে পারে না এমন মরদের পাশে আর শোবে না বলে রাবেয়া একটা বস্তায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কতকগুলি ইট-পাথর ভরে মাথাটা ভেতরে ঢুকিয়ে গলায় বস্তার মুখটা দড়ি জড়িয়ে এঁটে বেঁধে পুকুরের জলের নিচে, পাঁকে গিয়ে শুয়ে রইলো।' 'নমুনা' গল্পে দেখানো হয়েছে টাকার খেলা। দুর্ভিক্ষের দুর্দিনে কেশব চক্রবর্তীর মেয়ে শৈলকে শহরে নিয়ে এসেছে নারীব্যবসায়ী কালাচাঁদ; কেশবের শেষ অনুরোধে নাম-কে-ওয়াস্তে বিয়ের মন্ত্র পড়ে। ফলে কালাচাঁদের বাধে কোথাও—শৈলকে সে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু তার এসব কাজের সঙ্গিনী মন্দোদরী শেষ পর্যন্ত শৈলকে চালব্যবসায়ী গজেনের হাতে সঁপে দেয়। শুনে 'কালাচাঁদের মাথায় যেন আগুন ধরে গেল।' কিন্তু 'মন্দোদরী যখন তার হাতে একতাড়া নোট তুলে দ্যায়, তখন কালাচাঁদ টাকা গুণতে থাকে। গোণা শেষ হবার পর মনে হল সে যেন মন্ত্রবলে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।'

হিন্দুপুরাণের দ্রৌপদী-দুঃশাসনের রেফারেন্স মানিক নানাভাবে এনেছেন তাঁর দুর্ভিক্ষকেন্দ্রী গল্পগুচ্ছে। 'দুঃশাসনীয়' গল্পটি স্মরণীয়। ('দুঃশাসনীয়' শব্দটিও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্মাণ! মানিক-সাহিত্যে এরকম মানিক-নির্মিত কিছু শব্দপুঞ্জও আছে)। 'রাঘব মালাকর' গল্পের প্রথমেই তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে পাঠকের উদ্দেশে কিছু কথা আছে সরাসরি। কথাগুলি এই: 'পুরাণে বলে একদা নর-রূপী ভগবান স্নানরতা গোপিনীদের বস্ত্র অপহরণ করে নিয়ে তাদের অন্তর পরীক্ষা করেছিলেন—বহুকাল পরে আবার তিনি—এবার অদৃশ্য থেকে তার প্রতিনিধিদের দিয়ে, সমগ্র বাংলাদেশের নরনারীর বস্ত্র অপহরণ করে নিয়ে, কি পরীক্ষা করে দেখছেন, তা তিনিই জানেন—তবে দুঃশাসনকে জব্দ করে বস্ত্রহীনা হওয়ার নিদারুণ লজ্জা থেকে দ্রৌপদীকে তিনিই রক্ষা করেছিলেন, হে রাঘব মালাকর, জেলে বসে ফাটা কপালে মলম দিতে দিতে অন্তত সেই কথা স্মরণ করে মনকে সান্ত্বনা দিয়ো—আশা করি এই ছোট্ট কাহিনীটি পড়ার পর আপনিও ঠিক এই কথাই বলবেন—।' মানিকের গল্প কখনোই একরৈখিক নয়—সর্বদাই একটু ঘোরানো-প্যাঁচানো। 'রাঘব মালাকর' গল্পে গৌতমের কাছ থেকে কাপড় ছিনিয়ে নেয় রাঘব ও তার গ্রামবাসীরা। গল্পের শেষে এসে আমরা দেখি, পুলিশ যখন রাঘব ও গ্রামবাসীকে কাপড় লুট করবার জন্যে গ্রেপ্তার করতে যায়, তখন দ্যাখে: গ্রামবাসীদের মধ্যে 'লুট-করা কাপড়ের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে জোরালো একটা দাঙ্গা হয়ে গেছে গত রাত্রে। খুন হয়েছে দুজন, আহত হয়েছে অনেক। রাঘবের মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।'

'সাড়ে সাত সের চাল' গল্পটি দুর্ভিক্ষে গ্রাম উজাড়-হওয়ার কাহিনী। ৪-পৃষ্ঠার ছোট্ট গল্পটি আশ্চর্য বর্ণনার গুণে ভরাট পারিবারিক জীবনের পূর্ণতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে শূন্য হয়ে যাওয়ার জীবন্ত কাহিনী। কয়েকটি উত্তরহীন সংলাপ রাত্রির ছমছমে আবহাওয়াকে এবং অতীতের ভরা সুখের দিনগুলিকে আশ্চর্য কুশলতায় সামনে এনেছে :

'মনাদা!'

প্রথমবার একটু আস্তেই ডাকলো সন্ন্যাসী। তারপর জোরে।

'মনাদা!'

সাড়া নেই।

'সুবল কাকা!'

সাড়া নেই।

'সুখী পিসি!

সাড়া নেই।

সন্ন্যাসী একটু দম নিলো।

'সোনা বোঠান।'

সাড়া নেই।

'সোনা বোঠান। সোনা বোঠান!'

গলা চিরে গেল, বুক ফেটে গেল। তবুও তো সাড়া নেই। তখন সন্ন্যাসীর চোখে পড়ল, দরজার কড়ায় আটকানো তালার দিকে। তালাটা একটা কড়ায় ঝুলছে, আরেকটি কড়া ভেঙে খসে এসেছে দরজা থেকে।

'সাড়া নেই।' এই দু'টি শব্দের পুনঃপুন ব্যবহার পুরো পরিবেশটিকে জীয়ন্ত করে তুলেছে। 'ছিনিয়ে খায়নি কেন' গল্পে মানিক জবাব খুঁজেছেন মন্বন্তরের মানুষ না খেয়ে মরেছে কিন্তু তারপরও তারা ছিনিয়ে খায়নি কেন। যোগী ডাকাত এই প্রশ্নের উত্তর দ্যায় এভাবে : 'সেদিন বুঝলাম বাবু কেন এত লোক না খেয়ে মরেছে, এত খাবার হাতের কাছে থাকতে ছিনিয়ে খায়নি কেন। একদিন খেতে না-পেলে শরীরটা শুধু শুকোয় না, লড়াই করে ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচার তাগিদও ঝিমিয়ে যায়।' মানিকের স্বভাবশোভন তির্যকতায় গল্পের শেষাংশ অন্য জায়গায় চলে যায়; যোগী যখন জেলখানায় তখন তার বৌকে চলে যেতে হয়েছিল মন্দ বস্তিতে, জেল থেকে বেরিয়ে যোগী তাকে উদ্ধার করে সেখান থেকে। গল্পের শেষ হচ্ছে এভাবে : 'তার পরিবার খেতে না-পেয়ে হারিয়ে গিয়েছিল তো? যেভাবে পারে খেতে পেয়ে নিজেকে বাঁচিয়েছে তো? তারপর আর কোন কথা আছে?'

অদ্ভুত গল্প 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে'। অফিসে যাবার পথে মৃত্যুঞ্জয় জীবনে প্রথম অনাহারে মৃত্যু দেখে এমনভাবে আলোড়িত হলো যে তার সহকর্মী বন্ধু (নিখিল) বা স্ত্রী (টুনুর মা) তাকে ফেরাতে পারে না বিচিত্র এক মনোবিকলন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে। অফিস সে করে না আর, তার সিল্কের জামায় ধুলো জমে, ধুতির বদলে আসে ছেঁড়া ন্যাকড়া তার পরনে, দাড়িতে মুখ ঢেকে যায়। ছোটো একটা মগ হাতে মৃত্যুঞ্জয় কাড়াকাড়ি করে খায় লঙ্গরখানার খিচুড়ি। বলে, 'গাঁ থেকে এইছি। খেতে পাইনে বাবা। আমায় খেতে দাও।'—দুর্ভিক্ষের গল্পগুচ্ছে মানিক দুর্ভিক্ষের নানারকম স্তর-স্তরান্তরের ছবি তুলে রেখেছেন চিরকালের মতো; মানুষের বহির্জগৎ থেকে অন্তর্জগৎ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমি ব্যবহৃত হয়েছে কয়েকটি গল্পে: 'তারপর?', 'যাকে ঘুষ দিতে হয়', 'কৃপাময় সামন্ত' (*আজ কাল পরশুর গল্প*), 'প্রাণ' (*পরিস্থিতি*) ইত্যাদি। দুর্ভিক্ষ ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পরবর্তী জীবনের ছবি আছে 'রাসের মেলা', 'মাসি-পিসি', 'অমানুষিক (*পরিস্থিতি*) ইত্যাদি গল্পে। 'রাসের মেলা' গল্পের নায়িকা দত্তবাড়ির কাজের মেয়ে খাদু—পূর্ববঙ্গ থেকে যে গিয়ে ভিড়েছে কলকাতায়। 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের বিপরীত 'অমানুষিক' গল্পটি। বলিষ্ঠ ভিখিরি ভিখুর পরিবর্তে এখানে আছে ভীরু ভিতু পরাজিত ছিদাম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ মানুষকে বানিয়েছে এরকম। দুর্ভিক্ষের সময় বুড়ি মা, জোয়ান বৌ কুজা আর কচি মেয়েকে ফেলে ছিদাম একা চলে গিয়েছিল শহরে। সেখানে সে ভিক্ষা করে বেঁচে যায়। তারপর অনেকদিন পরে একদিন গ্রামে ফিরে এসে দ্যাখে, অবাক কাণ্ড: 'তার ভাঙাচোরা নোংরা ঘরখানা সাজানো গোছানো পরিষ্কার, তার কঙ্কালসার বৌটা হৃষ্টপুষ্ট সুন্দরী যুবতী। কুজার কাছেই ছিদাম জেনেছে, তার মা আর মেয়েটা মারা গেছে, শুধু বেঁচে আছে সে—কুজা, ললিতবাবুর রক্ষিতা হয়ে। কুজা কি সুখী? ছিদামের মনে হয় 'কেমন যেন হয়ে গেছে কুজা। একসঙ্গে জীবন্ত আর মরা।' গল্পের শেষে হঠাৎ ফিরে আসা ললিতবাবুর সাড়া পেয়ে কুজা নড়েও না, সাড়াও দেয় না, উদাসীনের মতো বসে থাকে। 'খুলে দে'—ছিদাম শেষে বলে নিজে থেকেই। মর্মভেদী মর্মচ্ছেদী অসাধারণ গল্প 'অমানুষিক'—ভয়ংকর পরিস্থিতির কাছে অসহায় আত্মসমর্পণের কাহিনী।

সমকালীন এইসব ছবি আঁকতে আঁকতেই মানিক হয়ে উঠলেন ক্রমশ প্রতিবাদী। *পরিস্থিতি* (১৯৪৬) গ্রন্থের 'শিল্পী' গল্পেই ভাষা পেল সেই প্রতিবাদ। মদন তাঁতী সূক্ষ্ম-শিল্পিত কাজ ছাড়া করে না। কাজ নেই তার। দুরবস্থার চরম। মহাজন ভুবনকে পাঠিয়েছে মদনের কাছে, 'সবার মতো মজুরি নিয়ে সাধারণ কাপড় বুনতে মন হয়েছে কিনা মদনের।' মদন নারাজ। শেষ পর্যন্ত মদন রাজি হয়ে যায়। সুতো এসে যায়। রাতে মদনের তাঁতের শব্দ শুনে লোকে ভেবেছে মদন তাহলে হার মেনেছে। কিন্তু মদন শেষ পর্যন্ত ভুবনের সুতো ফেরত দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্যায়। তাহলে সারা রাত তাঁত যে চলল? তাঁতীপাড়ার অর্ধেক মেয়ে পুরুষ খোঁজ করতে যায় যখন, তখন মদন বলে, 'চালিয়েছি খালি তাঁত। তাঁত না চালিয়ে খিঁচ ধরল পায়ে হাতে, তাই খালি তাঁত চালালাম একটু। ভুবনের সুতো দিয়ে তাঁত বুনব? বেইমানি করব তোমাদের সাথে কথা দিয়ে?'—এই অপরাজেয় মনোভাবনার প্রকাশ মানিকের উপান্ত অনেকগুলি গল্পে।

হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-ভিত্তিক কিছু গল্প লিখেছিলেন মানিক। ১৯৪৬-এর কলকাতার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। মানিকের ডায়েরির দু-একটি অংশের সামান্য উদ্ধৃতি :

> কালীঘাট অঞ্চলে শিখদের সঙ্গে মুসলিমদের ভীষণ সংঘর্ষ হয়েছে শুনলাম। বিকালে এ অঞ্চলে শান্তিসভা হবে শুনলাম। খুশি হয়ে নিজে বার হলাম—যতটা পারি সাহায্য করতে। যাকে দেখছি তাকে বলছি—মিটমাটের জন্যে সভায় যেতে। মসজিদের কাছে আনোয়ার শা রোডের একদল মুসলিম স্বীকার করলেন। মিটমাটের কথা কেন? অন্যেরা তাদের থামালেন। ফাঁড়ি পেরিয়ে পুলের নিচে যেতে এল বিরোধিতা—হিন্দুদের কাছ থেকে। কিসের মিটমাট—মুসলমানরা এই করছে, ওই করেছে! 'ব্যাটা কমিউনিস্ট' বলে আমায় মারে আর কি! প্রায় দেড়শো লোক মিলে ধরেছিল।
>
> ধীর-শান্ত আত্মপ্রতিষ্ঠ ভাব না বজায় রাখতে পারলে নিশ্চয় মার খেতাম। শালা কম্যুনিস্ট! মুসলমানদের দালাল। রব উঠছিল চারদিকে।

'ছেলেমানুষি', 'স্থানে ও স্তানে' (*ছোট বড়*)—এসব গল্প ১৯৪৬-এর হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ভিত্তিতে রচিত। 'ছেলেমানুষি' গল্পে বাড়ির দেয়াল-কেন্দ্রী প্রথম নিরীহ বাক্য 'ব্যবধান টেকেনি' আসলে গল্পের অন্তর্মূলে আলো ফ্যালে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রথমেও আবার ফিরে আসে বাক্যটি। পাশাপাশি দুই বাড়ির তারাপদ আর তার বৌ ইন্দিরা এবং নাসিরুদ্দীন আর তার বৌ হালিমা এবং তাদের দুই শিশুসন্তান গীতা আর হাবিব এই গল্পের প্রধান চরিত্র। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বড়োদের যখন প্রভাবিত করে, ছোটোরা তখন কী করে?—

> 'দাঙ্গা দাঙ্গা খেলবি?' গীতা বলে।
>
> 'লাঠি কই? ছোরা কই?' প্রশ্ন করে হাবিব।
>
> গীতা বলে, 'দাঁড়া।'
>
> গীতা চুপি চুপি অস্ত্র সংগ্রহ করে নিয়ে আসে।

গীতা আর হাবিবকে নিয়ে যখন দুই হিন্দু-মুসলমান পরিবারকে কেন্দ্র করে বড়ো আকারে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধার উপক্রম, তখন দেখা যায় গীতা আর হাবিব চিলেকোঠার ভিতর দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। 'কখন যে তারা দুজন চুপি চুপি সকলের চোখ এড়িয়ে ওই নিরাপদ আশ্রয়ে খেলতে উঠেছিল!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েকটি গল্পে আছে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে মানুষের অপরিবর্তিত ভাগ্যলেখার বিপন্নতার প্রতিচিত্রণ। এরকম একটি গল্প 'সখী' (*ছোট বকুলপুরের যাত্রী*)। রানী আর বিভা দুই সখী। বিভার বাড়িতে বেড়াতে এসেছে রানী। কিছুক্ষণ পরেই বোঝা গেল দুই সখী দাঁড়িয়ে আছে একই সমতলে—চূড়ান্ত অভাবের মধ্যে। গল্প শেষ হয় এক অপরাজেয় প্রতিজ্ঞায় : 'কী আছে অত ভয় পাবার, ভাবনা করার? সংসারে কুলি-মজুরও তো বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে।' 'একান্নবর্তী' গল্পে মানিক দেখিয়েছেন অর্থনৈতিক সাম্যই আসল ভিত্তি। চার ভাই : বীরেন, ধীরেন, হীরেন ও নীরেনের রোজগার এক-একরকম বলে। কেরানী হীরেন আর তার স্ত্রী লক্ষ্মী ভাইদের সংসারে তিষ্ঠোতে পারে না—জোট বাঁধে অন্য কেরানীদের সঙ্গে। লক্ষ্মী একদিন দুঃখে বেদনায় আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। এখন সুখী : 'ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে সে মরতে গিয়েছিল কদিন আগে দিশেহারা হরিণীর মতো, আজ বাঘিনীর মতো বাঁচতে শুধু সে রাজি নয়, বাঁচবেই এই তার জিদ।' 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'র (*ছোট বকুলপুরের যাত্রী*) মতো গল্পে শুধু তৈরি হয়ে উঠেছে একটি রাজনৈতিক মণ্ডলের আশ্চর্য আবহ। 'আর না কান্না' গল্পে কাহিনী থামিয়ে (গল্পের মাঝপথে) মানিকের অদ্ভুত আত্মঘোষণ : 'হে রাত আটটার তারায়-ভরা আকাশ, একবার বিদীর্ণ হও। কোটি বজ্রের গর্জনে ফেটে চৌচির হয়ে যাও। আমার বাংলার ছেলেমেয়েরা আজ খিদেয় কাতর হয়ে একখানা রুটির জন্য, একমুঠো ভাতের জন্য সংগ্রাম শুরু করেছে নিরুপায় মায়ের সঙ্গে।'

AMARBOI.COM

মানিকের দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পগুচ্ছে উঠে এসেছে সমকালীন দেশ-কাল : দুর্ভিক্ষ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, দেশবিভাগ, 'ঝুটা স্বাধীনতা' রাজনীতি, মধ্যবিত্ত আর নিম্নবিত্তের সংগ্রামমধুর জীবন, প্রতিবাদ, শ্রেণীসাম্য, জিজীবিষা। কিন্তু একরৈখিক নন এখানেও—বহুমাত্রিক, বহুস্তর; বহির্বাস্তবের সঙ্গে এখানেও দেখা গেছে অন্তর্বাস্তব, শ্রেণীচেতনার কথা বললেও যৌনচেতনাকে অস্বীকার করেননি এখানেও। এখানেও মানিক মানিক।

দুই পর্যায়ের দুটি প্রতিভূ-গল্প : 'সরীসৃপ' ও 'হারানের নাতজামাই'

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই পর্যায়ের—ফ্রয়েডীয় ও মার্ক্সীয়—দুটি প্রতিভূ-গল্প হচ্ছে : সরীসৃপ' ও 'হারানের নাতজামাই'। গল্প দুটির বিশদ-বিশ্লেষণ আমরা এখানে উপস্থিত করছি। *সরীসৃপ* (১৯৩৯) গল্পগ্রন্থের নাম-গল্প। 'হারানের নাতজামাই' মানিকের *ছোট বড়* (১৯৪৮) গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। দুটি গল্পই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জগদীশ ভট্টাচার্য ও যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প* (১৯৫০/১৯৭১) এবং দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *Primeval and other Stories* (১৯৫৮) সংকলনে স্থান পেয়েছে। দুটি গল্পই বিখ্যাত।

এক

সাধারণত ছোটোগল্পের আয়তনের তুলনায় 'সরীসৃপ' গল্পটি আকারে একটু বড়ো—৩২-পৃষ্ঠার (যে-সংস্করণটি আমি ব্যবহার করেছি তার কথা বলছি; *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প*, যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত, ১৩৭৮)। গল্পটি বৃহৎ বিরতিজ্ঞাপক, আটটি অংশে বিভক্ত; আর ঐ আটটি অংশে গল্পটি ধাপে ধাপে বিকশিত হয়েছে একমুখিতার কারণে, বৃহৎ হয়েও গল্পটি শেষ পর্যন্ত গল্পের স্বধর্মই রক্ষা ও উদ্‌যাপন করেছে। আর ঐ ৩২-পৃষ্ঠাব্যাপী গল্পটি পড়তে পড়তে খুলে গেছে—কোনো দ্রুততায় বা মন্থরতায় টাল খায়নি—জৈবনিক স্বাভাবিকতায় শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে গেছে। একাভিমুখী ও জৈবিক স্বাভাবিকতায় প্রতিবিম্বিত গল্পটির কাহিনীর সারাৎসার এরকম :

চারু স্বামী-শ্বশুরের উত্তরাধিকারিণী হিশেবে একটি বিরাট বাগানবাড়ি পেয়েছিল। শ্বশুর ও স্বামীর মৃত্যুর পর এই বাড়ি ও বাগান সে আর নিজের করায়ত্ত রাখতে পারল না—শ্বশুর রামতারণের মোসাহেব-পুত্র বনমালীর হাতে চলে যায়। চারুর স্বামী ছিল পাগল, তার ছেলে ভুবনও অপরিণতমস্তিষ্ক। প্রথম যৌবনে বনমালী চারুর প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করত; কিন্তু চারু তখন তাকে পাত্তা দ্যায়নি। বিধবা ও অসহায় অবস্থায় চারু বাড়ি রক্ষার্থে ও নিজের পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবনায় যখন বনমালীকে তুষ্ট করতে চায়, তখন সে 'একজন প্রৌঢ়া নারী', তার প্রতি বনমালীর আকর্ষণ ততদিনে অন্তর্হিত। চারুর ছোটো বোন পরী কিন্তু বনমালীকে প্রশ্রয় দ্যায়—বিশেষত সে যখন বিধবা হয়ে ঐ বাড়িতে এসে পড়ে, তখন বনমালীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে। বনমালীকে কেন্দ্রে রেখে দুই বোনের পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা চরম বিদ্বেষের রূপ নেয়। চারু পরীকে সুকৌশলে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার জন্যে কলেরার বীজ বহনকারী পাথরের বাটি থেকে প্রসাদ খেতে দ্যায় : কিন্তু কলেরায় নিজেই প্রাণত্যাগ করে। তারপর পরী জড়বুদ্ধি চারুর ছেলেকে চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করার অবধারিত ব্যবস্থা করে।

এদিকে বনমালী ভোগদখলের পর শূন্যপাত্রের মতো পরীকে নামিয়ে দ্যায় 'এ বাড়িতে যাদের স্থান ঝি-চাকরেরও নীচে, তাদের কাতারে।' চারুর মৃত্যুর পর তার ছেলের প্রতি বনমালীর যে মমত্ব দেখা দিয়েছিল, তাও দেখা যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষণকালীন। তার মা চারুর ছেলের খোঁজ করতে বলায় বনমালী শুধু উচ্চারণ করে, 'আপদ গেছে যাক।'

গল্পের চরিত্র অনেকগুলি : চারু, পরী, বনমালী, রামতারণ (চারুর শ্বশুর), ভুবন (চারুর ছেলে), খোকা (পরীর ছেলে), কনক (তারকেশ্বরের একটি বৌ), শিশু (কনকের দেওর), কেষ্ট (চাকর), পদ্ম (ঝি)। এইসব চরিত্রকেই যথাযথ রূপ দেওয়া হয়েছে—হয়তো দু-একটি বাক্যে বা তাদের মুখনিঃসৃত সংলাপে, তাতেই তারা জীবন্ত। যেমন, রামতারণ সম্পর্কে লেখকের বর্ণনা 'নিজের পাগল ছেলের বৌ বলিয়া নয়, স্ত্রীজাতির সতীত্বেই রামতারণ অবিশ্বাস করিত।' আসলে রামতারণেরই চরিত্রহীনতার সূচক। কিংবা চারু যখন পদ্মকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে তার অনুপস্থিতিতে ভুবনের সঙ্গে কে কেমন ব্যবহার করেছে, তখন : 'ধরিয়া আনিবার সময় কাল কেষ্ট বুঝি ভুবনকে একটু মারিয়াছিল, কিন্তু পদ্ম সে কথা গোপন করিয়া গেল।' পদ্ম'র চরিত্রকেও এইভাবে দ্বিমাত্রিকতা দান করা হয়েছে—কেবল চারুর হুকুমবরদার দাসী হিশেবে নয়। কিন্তু এইসব চরিত্র এই গল্পের পার্শ্বচরিত্র, কেন্দ্র চরিত্র তিনজন : চারু, পরী ও বনমালী।

AMARBOI.COM

চারু ও পরীর পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা ও ভালোবাসার টানাপোড়েন পুরো গল্পে বিধৃত। শেষ পর্যন্ত ভালোবাসার অবলেশমাত্র থাকেনি আর, ঈর্ষা এমন প্রকট আকার ধারণ করেছিল যে, চারু পরীকে হত্যার মতলব এঁটে কলেরা রোগীর ব্যবহৃত পাথরের বাটিতে প্রসাদ খেতে দ্যায়; আর পরী তো বোধহীন ভুবনকে চলন্ত টেন থেকে লাফিয়ে পড়ার বুদ্ধিই দিয়ে দ্যায়। এইসব হত্যা ও হত্যার চেষ্টার তুলনায় বনমালীর আচরণের নির্মমতা ও ভয়াবহতা কোনো অংশে কম নয়। বরং বেশি।

প্রথম যৌবনে যুবতী চারুকে পাহারা দিতে গিয়ে বনমালী ভিতরে-ভিতরে শরীরে-মনে প্রচণ্ড আকৃষ্ট হয়েছিল তার প্রতি। গল্পকার পরিষ্কার বলেছেন : 'চারু তার [বনমালীর] প্রথম বয়সের নেশা; অদম্য, অবুঝ, বহুকালস্থায়ী। যে বয়সে নারীদেহের সুলভতা সম্বন্ধে প্রথম জ্ঞান জন্মে, নারীমনের দুর্লভতায় প্রথম হতাশা জাগে, চারু সেই বয়সে, লেখকের ভাষায়, 'রীতিমত তাহাকে লইয়া খেলা করিত।' চারু নিজের স্বাভাবিক যৌনচাহিদাকে সংযত রেখেছিলো : 'নিজেকে সামলাইয়া না চলার দুরন্ত ইচ্ছার সঙ্গে' লড়াই করে বিজয়িনী হয়েছিলো। বনমালীর মূল আকর্ষণ ছিলো চারু। পরীর প্রতি বনমালী তখনই আকৃষ্ট হয়, যখন সে হঠাৎ খেয়াল করে, '...বিধবার বেশ ধারণ করায় পরীকে কমবয়সী চারুর মতো দেখাইতেছে। তার ব্যবহার, তার মনোবিকার,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার কথা বলিবার ভঙ্গি যেন চারুর যৌবনকাল হইতে নকল করা।' অতঃপর পরীর প্রতি তার অদম্য আকর্ষণ জন্মায়—এবং অতিদ্রুত তাদের সম্পর্কের নিম্নাবতরণ ঘটে। বস্তুত পরীর প্রতি বনমালীর কোনো মানসিক সম্মোহন ছিল না, সম্পূর্ণই ছিল সম্ভোগবৃত্তি। সুতরাং সম্ভোগের পর পরীকে ক্ষেন্তির পাশের ঘরে যে স্থান দিতে হয়, তা ছিল একান্ত স্বাভাবিক। স্বাভাবিকভাবেই পরীর 'নদীতে হাঁটু ডুবাইয়া বনমালী পার হইয়া গেল।'

বনমালী ধর্ষকামী পুরুষ। লেখকের বর্ণনাতেই আছে 'বনমালীর এক গ্রাসে পেট ভরানোর প্রবৃত্তি'র কথা। বনমালীর ধর্ষকামিতার আরো পরিচায়ক: 'এদিকে বনমালীর স্বাভাবিক সংযত নির্মমতায় পরী পাগল হইয়া উঠিল।' কিংবা 'পরীকে এখন সে [বনমালী] অবহেলা করিতেছে। অমন সুন্দর একটা পুতুলের আবোল-তাবোল নাচ দেখিতে তার ভারি মজা লাগিতেছে। এ অবস্থাটি অতিক্রান্ত না হইলে বনমালী তাহাকে কোথাও পাঠাইবে না।' এই ধর্ষকামিতার কারণেই 'পরীর সামনেই' চারুর ছেলেকে একটি বাড়ি লিখে দেবার প্রতিশ্রুতি দ্যায়। অবিবাহিত, মধ্যবয়সী পাটের দালাল বনমালীর নির্বিকার ভোগলিপ্সার আরো সাক্ষী ঐ বাড়িতেই আছে।

সম্পর্কের বৃত্ত আর প্রতিবৃত্ত রচনা করে চলেছে মানুষের মন। ছিল একদিন, যখন 'বনমালীর এক গ্রাসে পেট ভরানোর প্রবৃত্তি ক্ষুধাতুর বন্য জন্তুর মতো চারুর দুর্ভেদ্য সাবধানতা ঘেরিয়া পাক খাইয়া মরিত দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।' আর তারপর একদিন অবস্থা ঘুরে যায়: 'বনমালীর চারিদিকে পরী যে বৃত্ত রচনা করিয়া রাখে তার পরিধির বাহিরে চারু পাক খাইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, কোথাও প্রবেশের ফাঁক দেখিতে পায় না।'

গল্পের কোথাও বাস্তবতা লঙ্ঘন করা হয়নি। প্রত্যেকটি স্তর পরম্পরাবাহিত। বিবাহিতা, অবিধবা, সন্তানের জননী পরীকে আমরা প্রথমেই দেখেছি বনমালীর প্রতি আকৃষ্ট, বনমালীর অধিকারবোধ নিয়ে চারুর প্রতি ঈর্ষাতুরা। বনমালী যখন তরুণী সদ্যবিধবাকে জিজ্ঞেস করে, 'তুই পাউডার মেখেছিস?' তখন পরীর অগোপন জবাব: 'মেখেছিই তো, একশবার মেখেছি। আপনি কেন আমায় কালো বলেন?' বিধবা হওয়ার তিন মাসের মধ্যে পরী বনমালীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে অংশত তার নিজের অতৃপ্ত যৌনক্ষুধার জন্যে, অংশত তার সন্তানের স্বর্ণমণ্ডিত ভবিষ্যতের আশায়।

দুই বোনই প্রকাশ্যে নব্যধনী বনমালীকে তোষামোদ করে। রূপসী ছোটো বোন সম্ভোগউন্মত্তা পরীরানী বনমালীকে বলে, 'তুমি ঘরে এলে আমার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুল হয়ে যায়, সাবধানে থাকব!' আর বড়ো বোন অতৃপ্তকামনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চারুদর্শনা বনমালীকে মিনতি করে, 'আমি যদি তোমার মনে কোনো দিন ব্যথা দিয়ে থাকি, জেনো,... ।' এ-রকম তমসাচ্ছন্ন গল্পেও মানিক কিন্তু ফর্স্টর-কথিত বৃত্তচরিত্র অঙ্কনই করেন শেষ পর্যন্ত। ফলে দুরন্ত ইচ্ছার সঙ্গে লড়াই করে বিজয়িনী হওয়ার পরও চারুর এমন মনে হয় পরীর পরিবর্তে বরং সে-ই যদি সেসময় 'বনমালীর নিকট আত্মসমর্পণ করিত তাও ভাল ছিলো।' আর ধর্ষকামী, হৃদয়হীন বনমালী? সে 'সোজাসুজি কাহারো প্রতি নিষ্ঠুরতা দেখাইতে পারে না। সামনে যে উপস্থিত থাকে তাহাকে মনে বেদনা দেওয়া বনমালীর সাধ্যাতীত।' এজন্যেই তার একদা ভোগিনীদের সে একেবারে তাড়িয়ে দ্যায় না—বাড়ির একতলায় বসবাসের ব্যবস্থা করে দ্যায়। পরীকেও সেখানে সে পাঠিয়ে দিয়েছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যস্বভাব সংক্ষিপ্তিতে, তির্যকভাষণে, ইশারামূলকতায়, গূঢ় বাক্যের প্রয়োগে প্রকাশিত। ছোটোগল্পে এই শিল্পকুশলতা বিশেষভাবে বিজয়ী। 'সরীসৃপ' গল্পেও তার ঐ স্বভাবসম্মত শিল্পকুলশতা প্রযুক্ত হয়েছে।

লেখকের যে-বিশিষ্ট নিজস্ব বর্ণনাভঙ্গি—অমেদ, অফেন, অলিপ্ত, বিদ্রূপাক্ত, বিশ্লেষণাত্মক—এখানেও কালক্ষেপণ না-করে এইভাবে রূপ নিয়েছে: 'চারিদিকে বাগান, মাঝখানে প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ি।' পুরো ঘটনা (তারকেশ্বরে চারুর কয়েকটি দিনযাপন ব্যতীত) এই বাড়িতেই সংঘটিত হয়েছে। এই বাড়ির অধিকার নিয়ে এর প্রধান চরিত্রদের নগ্ন-লালসা উদ্দীপিত। এমনকি একথাও বলা যায়: এই বাড়ির মালিক চারুর শ্বশুর রামতারণ থেকে পরবর্তী মালিক বনমালী পর্যন্ত পরম্পরাক্রমে যা সংঘটিত হয়ে যাচ্ছে, তা স্বেচ্ছায়: মালিক পরিবর্তিত হচ্ছে, কিন্তু স্বেচ্ছাচারিতার স্রোত ধারাবাহিক বহমান।

প্রথম থেকেই শব্দ ও বাক্য ব্যবহারে ভবিষ্যৎ জ্ঞাপকতার চিহ্ন সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। গল্পের দ্বিতীয় অংশে চারুর 'শেষ জীবনে'র কথা বলা হয়েছে—যদিও আমরা জানতে পারি গল্পের বর্তমানকালে চারুর বয়স চল্লিশ। 'শেষ জীবনে'র প্রমাণ পরে পাওয়া যাবে, যখন মৃত্যু হয় চারুর। তারকেশ্বর থেকে ফিরে মৃত্যুর দিন, মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে, চারু পদ্মঝি-কে খামোখাই বলেছিল, 'আমি যে চিরকাল বাঁচব না, পদ্ম, তখন কী হবে?' পরীকে যখন স্বেচ্ছাকৃত অবহেলা করেছে বনমালী, তখনই আমরা জানতে পারি: 'এ অবস্থাটি অতিক্রান্ত না হইলে বনমালী তাহাকে কোথাও পাঠাইবে না।' গল্পের শেষে পরীকে কোথায় পাঠানো হলো, তা আমরা দেখতে পাই। এই ক্রমাগত ভবিষ্যৎজ্ঞাপকতায় গল্পটি ভরপুর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্পের তির্যকতা, অব্যক্ততার ভিতরে ব্যক্ততা মানিক ক্ষণে-ক্ষণে সঞ্চার করেন। যেমন, 'বনমালীর বুকের কাছে যদিও সে [পরী] জড়োসড়ো হইয়াই তাহার কথা শুনিতেছে, সেটা ভয়ে নয়।' কিংবা 'বনমালী তাহার [পরীর] আলো নিভানোর প্রয়োজনটা চাহিয়া দেখিল না।'

অপ্রয়োজনীয় নিসর্গবর্ণনা মানিক চিরকালই বর্জন করেছেন। এই গল্পেও। বর্ষণরাত্রি এই গল্পে দমিত-ক্ষুধিত যৌনতার পৃষ্ঠপট রচনা করেছে। 'আর গাছের ডাল হইতে টপটপ জল পড়িতেছিল। কতগুলি ফুলের গাছ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।' এসব কি নিছক বর্ণনাই? আমাদের মনে থাকে, আগের রাতে পরীকে বনমালীর সঙ্গে সঙ্গত হতে দেখেছে চারু। ঐ বর্ণনায় কি তার মানসলোকের প্রতিবিম্ব পড়েনি?

চিত্রকল্প-উপমা-প্রতীক এই গল্পে লেখক 'সঙ্গত নির্মমতায়' (মানিকের এই গল্পেরই বাক্যবন্ধ ব্যবহার করে বলছি) ছড়িয়ে দিয়েছেন। কোথাও এগুলি অলংকার নয়; সর্বদাই গল্পের আত্মার দিকে আঙুল নির্দেশ করছে। যেমন: 'আহত পশুর মতো ভুবন মধ্যে মধ্যে মা'র জন্য ছটফট করিয়া কাঁদে: বনমালীর শুষ্ক তৃণহীন জগতে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যায়।' দীর্ঘ বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়ার আশ্চর্য ব্যবহার: 'এবং পঞ্চমী তিথিতে একাদশী করিয়া গভীররাত্রে উন্মত্তার মতো বনমালীর রুদ্ধ দরজার সামনে মাথা-কপাল কুটিয়া আসিয়া ঘুমন্ত ছেলেটাকে হ্যাঁচকা টানে কোলে তুলিয়া লইয়া কয়েক সেকেন্ডের জন্য তাহার কচি গলাটি সজোরে টিপিয়া ধরিল।' পাঁচটি বাক্যের একটি অনুচ্ছেদাংশ উদ্ধৃত করি: 'এখন প্রকৃত বর্ষাকাল। প্রতি রাত্রেই প্রায় বাদল নামে। গাঢ় ভিজা অন্ধকারে বিবরবাসিনী নাগকন্যার মতো পরী ফুলিয়া ফুলিয়া সাশ্রু নিশ্বাস নেয়। খোকা কাঁদে, কঁকায়, তাহার গলা ভাঙিয়া আসে, শ্রান্ত হইয়া একসময় সে ঘুমাইয়া পড়ে। পরী সাড়া শব্দ দেয় না।'

এই অনুচ্ছেদাংশের পাঁচটি বাক্যই অসম্পূর্ণ। কোনো বাক্যই পুনরুক্তি নয়—সব সময়ই প্রাগ্রসর। তৃতীয় বাক্যের উপমাটি অলংকার নয়—প্রকৃত অবস্থার দ্যোতক, বর্ষণঘন রাতে তৃষ্ণার্ত রমণীর চিত্র। 'সাশ্রু নিশ্বাস'-এর বিশেষণটি একতিল নিরর্থক নয়। চতুর্থ বাক্যের উপবাক্যগুলি ক্রন্দনময় শিশুটিকে একটি বাক্যেই জীবন্ত করেছে। পুরো অনুচ্ছেদাংশটি ঘননিবিড়। এই নিবিড়তা মানিকের বিশিষ্টতা। গল্পে এ বিশেষভাবে লক্ষ্যভেদী।

'সরীসৃপ'-এর শেষাংশ গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ। যখন 'পাপের ভারা' পূর্ণ হয়েছে—পরীকে হত্যা করতে গিয়ে চারু নিজেই মৃত্যুবরণ করেছে কলেরায়, ভুবনকে অবধারিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে পরী, ভোগ সম্পূর্ণ করার পর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরীকে 'বাড়ির রাজা' বনমালী 'ঝি'-চাকরেরও নিচে যাদের অবস্থান তাদের আবাসে পাঠিয়েছে, তখন শয়তানি ও নীচতার পরে—

> একদিন হেমলতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হ্যাঁ রে, ভুবনের কোনো খোঁজ করলি না?'
>
> বনমালী বলিল, 'আপদ গেছে, যাক।'
>
> ঠিক সেই সময় মাথার উপর দিয়া একটা এরোপ্লেন উড়িয়া যাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে সেটা সুন্দরবনের উপর পৌছিয়া গেল। মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনের পশুরা যেখানে আশ্রয় লইয়াছে।

গল্পের একেবারে অন্ত্যম স্তবকটি বিস্ময়কর। একজন আধুনিক গল্পলেখক (খুব সম্ভবত রমানাথ রায়) শেষ অনুচ্ছেদটি বিষয়ে বলেছিলেন প্রক্ষিপ্ত বা অপ্রয়োজনীয়। বনমালী বলিল, 'আপদ গেছে যাক।' এখানেও গল্প শেষ হতে পারত। আর প্রাবন্ধিক রবীন্দ্র গুপ্তের কাছে গল্পের ঐ উপসংহার মনে হয়েছে রুদ্ধশ্বাস মর্বিডিটির পর 'চমৎকার রিলিফ'।

আসলে আকস্মিকতা বা উল্লম্ফন মানিকের আত্মস্বভাবী। গল্পের তৃতীয় অংশের শেষে এই বর্ণনাও কি খানিকটা আকস্মিক নয়?—'কাঁকরবিছানো পথের ঠিক মাঝখান হইতে দু'টি কচি সবুজ ঘাসের শীষ বাহির হইয়াছে দেখিয়া বনমালী থমকিয়া দাঁড়ায়। পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া যমজ ভাই-এর মতো তাদের দুটিকে সে চাপা দিয়ে দেয়।' মানিক তাঁর সমস্ত রচনায় এই উল্লম্ফন-প্রক্রিয়ার সাহায্য নিয়েছেন। এজন্যেই হয়তো যাকে বলে 'জনপ্রিয় লেখক', তা তিনি হতে পারেননি। সেদিক থেকে গল্পের উপসংহার মানিকের আত্মস্বভাবী। ছোটোগল্পের স্ব-স্বভাবী।

'সরীসৃপ' জটিল, তামসী গল্প। মানিক নিজেও এরকম অন্ধকার গল্প বেশি লেখেননি। কিন্তু লেখকের দৃষ্টি ও সততা নিরঙ্কুশ। লেখক যে স্রষ্টার মতো নির্বিকার, তার প্রমাণ : শেষ অনুচ্ছেদ অবধি তাঁর সাবলীলতায় একটু ফাটল ধরেনি, তাঁর বর্ণ-লেপনে এতটুকু অতিরিক্ততা বা কার্পণ্য নেই, প্রথম বাক্যের 'বাগান' থেকে শেষ বাক্যের 'বন' আসলে মানবিকতা থেকে পশুত্বে পৌছানোর একটি নিরপেক্ষ আলেখ্য, এই নিরপেক্ষ আলেখ্য রচনায় লেখকের হৃদয় ও চোখের পাতা একটুও কাঁপেনি।

দুই

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের বিস্তারিত ইতিবৃত্ত প্রণীত হয়নি। ফলে, আমরা তাঁর সাহিত্যকর্মের অনেক প্রয়োজনীয় পটভূমি ও গোপন খোঁড়লের সন্ধান পাইনি। 'হারানের নাতজামাই' গল্প প্রসঙ্গে নেপথ্যের কিছু কথা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিন্মোহন সেহানবীশ (১৯১৩-৮৭) লিখেছিলেন, "মনে পড়ে জেলে যাবার কিছুদিন আগে একদিন মানিকবাবুকে পীড়াপীড়ি করেছিলাম পুলিশী সন্ত্রাস-জর্জরিত বড়া-কমলাপুরে যাবার জন্যে—কিছুটা উদ্ধতভাবেই বলেছিলাম, 'লেখক হিসেবে না হয় নাই গেলেন, কমিউনিস্ট হিসাবেই যান।' তারপর একদিন জেলখানার পাঁচিল পেরিয়ে এল 'ছোট বুকুলপুরের যাত্রী'। সন্ত্রাসের ছমছমে আবহাওয়া মূর্ত হয়ে উঠেছিল ঐ আশ্চর্য গল্পটিতে। মনে মনে সেদিন মাপ চেয়েছিলাম মানিকবাবুর কাছে।" মানিকবাবু চিন্মোহন সেহানবীশের কথামতো বড়া-কমলাপুরে যাননি তখন।

কিন্তু গিয়েছিলেন যে তা জানা যাচ্ছে মানিক-গবেষক লিলি দত্তের গ্রন্থ *কৃষক-আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা কমল চট্টোপাধ্যায়*-এর জবানিতে। কমল চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'আমরা জেনেছিলাম, বহরমপুর, কমলাপুর, চক, পহলামপুর, বড়ার প্রায় সকল কর্মীর সঙ্গেই তিনি [মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়] আলাপ করেছেন।' কমলবাবু দুটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন—যে দুটি ঘটনা 'হারানের নাতজামাই' গল্পের পৃষ্ঠপট হিশেবে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয়। কাছাকাছি ধরনের দুটি ঘটনার প্রথমটি উদ্ধৃত করেছি কমলবাবুর জবানিতেই :

> শহর থেকে পার্টির একজন মেয়েকর্মীকে এখানে আনা হয়—এখানকার মেয়েদের মধ্যে কাজ করার জন্য। গ্রামে সে শীলা নামে পরিচিত হলো। কিছুদিনের মধ্যেই পুলিশ জানতে পারে, কমলাপুরে শীলা রয়েছে। তাকে ধরবার জন্য পুলিশ অনেকবার কমলাপুর এসেছে, কিন্তু গ্রামের মেয়েরা তাকে সবসময়ই আগলে রাখে, নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যায়, পুলিশ ব্যর্থ হয়। / একদিন ভোরে হঠাৎ পুলিশী হামলা হলো। পুলিশ ভেবেছিল, ঘুম থেকে ওঠার পর মেয়েরা নানা সাংসারিক কাজে ব্যস্ত থাকবে, সেই সুযোগে শীলাকে ফাঁদে ফেলা যাবে। যে পাড়ায় শীলা থাকতো, পুলিশ তার কাছাকাছি এসে গেছে। খবর পেয়েই মেয়েরা ব্যস্ত হয়ে উঠলো, তাকে অন্যপাড়ায় নিয়ে যাবার উপায় নেই। তখন একজন গৃহবধূ শীলাকে বললো, 'শিগগির পুকুরঘাটে চলুন।' সেখানে কয়েকজন তখন বাসন মাজছে।
>
> তারা ব্যাপারটা বুঝে বললো, 'দিদিমণি, ঘোমটা দিয়ে একগলা জলে নেমে পড়ুন।' শীলা তাই করলো। তখনই আর কয়েকজন মেয়ে এসে জলে নেমে শীলাকে ঘিরে দাঁড়ালো। তারা সকলেই যেন স্নান করছে। আর ঘাটে কয়েকজন বাসন মাজছে। সেই সময় পুকুরঘাটে এলো পুলিশ। / তখনই খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে এলেন নগনিদিদি। গ্রামের সর্বজনপরিচিতা বিধবা মহিলা। অত্যন্ত সাহসী এবং তেজি। নগনিদিদি একটা মুড়ো ঝাঁটা হাতে নিয়ে চিৎকার করতে লাগলেন, 'মেয়েরা পুকুরে চান করছে, ঘাটে দাঁড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> পুলিশের লোকেরা তাই দেখছে, লজ্জাশরম নেই ওদের। শিগগির চলে যাও।' / এই চিৎকারে পুলিশ হতভম্ব হলো। মেয়েদের অত ভিড়ের মধ্যে শীলাকে বার করা পুলিশের পক্ষে সম্ভব নয়। পুলিশের ছোটবাবু আমতা আমতা করে বললো, 'না, না, আমরা যাচ্ছি।' তারা চলে গেল। / একটু পরে মেয়েরা হেসে লুটোপুটি খেতে লাগলো। নগনিদিদি তখন ঝাঁটা ফেলে দিয়ে বিজয়গর্বে চলে গেলেন।

চিন্মোহন সেহানবীশ তাঁর লেখায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কবে বড়া-কমলাপুরে যাবার জন্যে বলেছিলেন তার উল্লেখ করেননি। বলেছেন শুধু, তিনি 'জেলে যাবার কিছুদিন আগে' মানিকের কাছে ঐ প্রস্তাব করেছিলেন। চিন্মোহনবাবু জেলে গিয়েছিলেন ১৯৪৯ সালে—কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হলে। কমল চট্টোপাধ্যায়ও লিখছেন: 'ঘটনাস্থল: বড়া-কমলাপুর, কাল: ১৯৪৯-এর প্রথমভাগ।'

কিন্তু আমরা তো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৯৪৭-এর ডায়েরিতেই পাচ্ছি 'হারানের নাতজামাই' গল্পের প্রাথমিক খসড়া:

> ৫। লুকানো নেতা খুঁজতে রাতদুপুরে পুলিশের আবির্ভাব—নেতাকে মেয়ের জামাই করা—জামাই এসে কি বলবে সকলের এই ভাবনা—জামাই খুব খুশি। *পূর্ব্বাশা*, মাঘ ১৩৫৩ 'হারানের নাতজামাই' [*অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*]

অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সম্পাদক যুগান্তর চক্রবর্তী ঐ গ্রন্থের নির্দেশপঞ্জিতে মানিকের ১৯৫০-এর ডায়েরি থেকে এই তথ্যও উদ্ধৃত করেছেন: ৪.১.৪৭ *পূর্ব্বাশা*, 'হারানের নাতজামাই' ৫০/ ২১.১০.৪৭ Eastern Expres 'হারানের নাতজামাই' অনুবাদ ৩০।

দেখা যাচ্ছে: ১৯৪৭-এই 'হারানের নাতজামাই' *পূর্ব্বাশা* পত্রিকায় প্রকাশিত, এমন কি তার ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশিত হয়ে গেছে। পরের বছর, ১৯৪৮-এই 'হারানের নাতজামাই' *ছোট বড়* নামক গল্পগ্রন্থে স্থান পায়।

পরিবেশ-পটভূমি থেকে মনে হয়, বড়া-কমলাপুরের তৎকালীন পরিস্থিতি নিয়েই 'হারানের নাতজামাই' ও 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্প দুটি লেখা হয়েছিল। 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্পটি ১৯৪৯ সালে ঐ নামের গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। 'হারানের নাতজামাই' ১৯৪৭-এ-ই লেখা হয়ে যায়—এই গল্পের ক্ষেত্রে স্মৃতিউল্লেখগুলি তুচ্ছ হচ্ছে নাকি সদাসর্বদাই?

১১-পৃষ্ঠার তীক্ষ্ণ একলক্ষ জমজমাট ছোটোগল্প। চরিত্র অনেকগুলি। ঘটনা পরপর দুই রাত্রির। ঘটনার কেন্দ্র একটিই। চাষীদের গ্রাম সালিগঞ্জের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোটো একটা পাড়া হাঁসতলার হারানের বাড়িতেই সব ঘটনা ঘটে। জোতদার চণ্ডী ঘোষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভুবন মণ্ডল চাষীদের একত্রিত করেছে, সাহস দিয়েছে, ধান কাটার ব্যবস্থা করেছে। চণ্ডী ঘোষ পুলিশের শরণাপন্ন। ভুবন মণ্ডল গ্রামে গ্রামে পালিয়ে বেড়ায়। কিছুতেই তাকে পুলিশ ধরতে পারে না। গ্রামেরই কেউ একজন (খুব সম্ভবত মথুর) পুলিশের কাছে খবর দিলে, দারোগা মন্মথ আটজন পুলিশ নিয়ে এসে হারানের বাড়ি ঘিরে ফেলে। তখন বুড়ো হারানের মেয়ে ময়নার মা ভুবন মণ্ডলকে তার জামাই হিশেবে পরিচয় দ্যায়। মন্মথ অগত্যা পুলিশ জোতদারের দুই লোক কানাই ও শ্রীপতিকে নিয়ে ফিরে যায়।

পুলিশকে বোকা বানানোর এই কৌশলের কথা গ্রাম-গ্রামান্তরে চাউর হয়ে যায়, চাষীরা এই নিয়ে হাসাহাসি করে। এদিকে ময়নার মা-র সত্যিকার জামাই জগমোহন সব শুনতে পেয়ে ক্রুদ্ধভাবে হারানের বাড়িতে আসে পরদিন। সে থাকতেই মন্মথ দারোগা আবার পুলিশ নিয়ে উপস্থিত হয়। হারানের বাড়িসুদ্ধ লোককে থানায় নিয়ে যাবে মন্মথ, তখন গ্রাম-গ্রামান্তরের অসংখ্য মানুষ জমায়েত হয়েছে হারানের বাড়ি ঘিরে। বোঝাই যাচ্ছে, পুলিশ ওদের কিছু করতে পারবে না। এই অবস্থায় গল্পটি শেষ হয়।

গল্প ছোটো। অনেকগুলি চরিত্র : ভুবন মণ্ডল, ময়না, ময়নার মা, মন্মথ, হারান, জগমোহন—কেন্দ্রীয় চরিত্র এগুলিই। অন্য চরিত্র আরো অনেক : গফুর আলি, গৌর সাউ, মোক্ষদার মা, ক্ষেন্তি, রসিক, নন্দ, নিতাই পালের বৌ, কানাই, শ্রীপতি, নামহীন আরো মানুষ। উজ্জ্বলতম চরিত্র নিঃসন্দেহে ময়নার মা। তারই কৌশলে ভুবন মণ্ডল পুলিশের কাছে ধরা পড়ে না। তার চেহারার বর্ণনাও দিয়েছেন লেখক : '...প্রৌঢ় বয়সের শুরুতেই তার মুখখানাতে দুঃখ-দুর্দশার ছাপ ও রেখা রুক্ষতা-কাঠিন্য এনে দিয়েছে। ধুতি পরা বিধবার বেশ আর কদমছাঁটা চুল চেহারায় এনে দিয়েছে পুরুষালি ভাব।' ময়নার মা-র চরিত্রটাই তৈরি হয়েছে তেজস্বিতায় : শুধু পুলিশকে সে বোকা বানায়নি—এর আগে পুরুষশূন্য গ্রামে পুলিশ এলে ঝাঁটা-বঁটি হাতে মেয়েদের দল নিয়ে সে তাদের গ্রাম ছাড়া করেছে। পুরো গল্পে ময়নার মার নব্বই বছরের বৃদ্ধ পিতা হারান ধ্রুবপদের মতো একটি কথাই বলে যায় : 'হায় ভগবান!'

মানিকের অসাধারণ বাস্তবতাবোধ পুরো গল্পে কোথাও টাল খায় না। বি.এ. পাশ দারোগা মন্মথই একমাত্র শুদ্ধ ভাষায় কথা বলে, বাকি সমস্ত গ্রামবাসীরই সংলাপ আঞ্চলিক ভাষায়। পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক ভাষায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন্মথ দ্বিতীয় রাতে আসে যখন, তখন 'তার চোখ সাদা'। এইটুকু মাত্র বলা হয়েছে। এইটুকুই তার আগের রাত্রির সঙ্গে পার্থক্য সূচনা করে : আগের রাত্রিতে সে এসেছিল একটুখানি রঙিন নেশা করে। এই বাস্তবতাময় গল্পে প্রয়োজনীয় কবিত্বের স্পর্শ লাগে যখন, তখন মানিক পরপর তিনটি উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করেন : 'ভীরু লাজুক কবি চাষী মেয়ে' ময়নার শরীর দেখে মন্মথের মনে হয় 'এ যেন কবিতা।...যেন চোরা হুইস্কির পেগ, যেন মাটির পৃথিবীর জীর্ণক্লিষ্ট অফিসিয়াল জীবনে একফোঁটা টসটসে দরদ।'

ভাষা

তিরিশের দশকের বা কল্লোলের কথাশিল্পীদের মতো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সাধু ও চলতি দুই রীতিতেই গল্প লিখেছেন। অন্যদের মতোই তারও স্বাভাবিক আভিমুখ্য ছিল চলতি রীতির দিকে। আশ্চর্য যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম রচিত গল্প 'অতসী মামী'ই চলতি রীতিতে লেখা। মানিকের প্রথম গল্পগ্রন্থ *অতসী মামীর* (১৯৩৫) গল্পগুলি রচনাকালের ক্রম অনুসারে সজ্জিত। এই হিশেবে দেখা যাচ্ছে 'অতসী মামী', 'নেকী', 'বৃহত্তর-মহত্তর', 'শিপ্রার অপমৃত্যু'—এই চারটি গল্পের পরে সাধু ভাষা ধরেছেন লেখক। 'সর্পিল', 'পোড়াকপালী', 'আগন্তুক', 'মাটির সাকী', 'মহাসঙ্গম', ও 'আত্মহত্যার অধিকার'—ছ'টি গল্পই সাধু ভাষায় লেখা। মানিকের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ *প্রাগৈতিহাসিক*-এর (১৯৩৭) দশটি গল্পই (পুনর্মুদ্রিত 'মাটির সাকী' সমেত) সাধু ভাষায় রচিত। মানিকের জীবদ্দশায় প্রকাশিত সর্বশেষ গল্পগ্রন্থ *লাজুকলতার* (১৯৫৪) পনেরোটি গল্পই চলতি ভাষায় প্রণীত। মধ্যবর্তী *বৌ* (১৯৪৩) গল্পগ্রন্থের তেরোটি গল্পই সাধু ভাষায় লেখা। সব-মিলিয়ে আমরা বলতে পারি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাধু ও চলতি দুই রীতিতেই গল্প লিখেছেন—তবে তিনি স্বাভাবিকভাবেই চলতি ভাষা প্রয়োগের দিকে ক্রম-অগ্রসর হয়ে গেছেন।

তবে সাধু ভাষা ব্যবহার করলেও মানিক প্রথমাবধি বাস্তবানুগ বলে সংলাপে চলতি ভাষা বা আঞ্চলিক ভাষাই ব্যবহার করেছেন—প্রয়োজন অনুসারে। প্রাগৈতিহাসিক গল্পগ্রন্থের পাশাপাশি দুটি গল্প উদাহরণ হিশেবে আমরা চিহ্নিত করতে পারি—'প্রাগৈতিহাসিক' (সংলাপে আঞ্চলিক বুলি) ও 'চোর' (সংলাপে চলতি শুদ্ধ বুলি)। আবার, সাধু ভাষা ব্যবহার করলেও মানিকের ধরনটা চলতি রীতির। উদাহরণ :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> একটি মেয়ে ছিল সনাতন চক্রবর্তীর—মোহিনী। একটা বাড়িও ছিল সনাতনের—বেশ বড়ো দোতলা বাড়ি। আর ছিল কিছু নগদ টাকা—কয়েক হাজার। মেয়ের বিবাহ দিবার অনেক আগেই মনে মনে একটা মতলব করিয়া রাখিয়াছিল সনাতন: ঠিক মতলব নয়—হিসাব, উত্তরাধিকারিণী হিসাবে তার মৃত্যুর পর মেয়েটাই যখন তার বাড়িটা পাইবে, বিবাহের সময় পণ হিসাবে জামাইকে সে দিবে না একটি পয়সাও। মেয়েকে গয়নাগাটিও দিবে কম, যত কম দিয়া পার করা যায়। বুড়া বয়সে যখন তার চাকরি থাকিবে না, জমানো টাকা কয়েকটা তখন মদের খরচ বাবদ লাগিবে না তাহার? কেউ কি তখন একটা পয়সাও তাকে দিবে মদের জন্য? বুড়া হইতে বা আর বাকিই কত!
>
> ['অন্ধ', *প্রাগৈতিহাসিক*]

এই কথকতার ভঙ্গি মানিকের চিরদিনের গদ্যরচনারই একটি বিশিষ্টতা। এই বিশিষ্টতায় ক্রিয়াপদ আর বাক্যের শেষে বসে না, যে-কোনো জায়গায় বসে যায়। মানিকের গদ্যরচনায় এর উদাহরণ অগণিত।

সামগ্রিকভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গদ্যরীতিতে কবিতার সংক্রমণ নেই। বস্তুত মানিকী রচনারীতির বিশিষ্টতাই তার কবিত্বহীনতায়। কিন্তু মানিকের সাহিত্যজীবনের একেবারে প্রথম পর্যায়ে, যেমন *দিবারাত্রির কাব্য* (১৯৩৫) উপন্যাসে তেমনি 'প্রাগৈতিহাসিক'-এর মতো গল্পে, এরকম বর্ণনা কবিতাতেই স্পর্শ করা যায়:

> দূরে গ্রামের গাছপালার পিছন হইতে নবমীর চাঁদ আকাশে উঠিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা/হয়তো ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনো দিন পাইবেও না।
>
> ['প্রাগৈতিহাসিক', *প্রাগৈতিহাসিক*]

কিন্তু এ নিছক কবিত্ব নয়—এর মধ্যে একটি সাংকেতিকতা লেগে রয়েছে। মানিকের কোনো-কোনো গল্পের শেষে এমনিভাবে আছে লেখকের মন্তব্য। সেই মন্তব্য আবার কখনো সাংকেতিকতা-দীপ্ত। যেমন:

> ঠিক সেই সময় মাথার উপর দিয়া একটা এরোপ্লেন উড়িয়া যাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে সেটা সুন্দরবনের উপরে পৌঁছিয়ে গেল মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনের পশুরা যেখানে আশ্রয় নিয়াছে।
>
> ['সরীসৃপ', *সরীসৃপ*]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্পকার মানিকের অতিসংক্ষিপ্ত মন্তব্যে কখনো সরসতা। বিয়ে-বাড়ির নানারকম আচার-অনুষ্ঠান উত্তেজনার পরে ইন্দু তার স্বামী হরেনের সঙ্গে পালকিতে স্বামীগৃহে চলেছে। গল্পের শেষ হচ্ছে এভাবে :

> তারপর আরো কত গ্রাম, কত মাঠ পার হইয়া সন্ধ্যার একটু আগে পালকি স্টিমারঘাটে পৌছিল। স্টিমার তখন সবে আসিয়া নোঙর ফেলিয়াছে। নদীর অপর তীরে একটি চিতা প্রায় নিভিয়া আসিতেছিল। আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া হরেন বলিল, 'পথে চিতা দেখলে শুভ হয়। তোমার আমার খুব মনের মিল হবে, হবে না?'/ যেন পথে চিতা না দেখিলে তাহাদের মনের মিল হইতে বাকি থাকিত!
>
> ['যাত্রা', *প্রাগৈতিহাসিক*]

কখনো-বা দুর্ধর্ষ মন্তব্যের তীক্ষ্ণতা :

> মনোহর অত্যন্ত চিন্তিত ও অন্যমনস্কভাবে স্নানাহার সম্পন্ন করল। বিকেলে সে আর রোগী দেখতে গেল না। সন্ধ্যার সময় গিন্নি আর ছেলেমেয়েদের সিনেমায় পাঠিয়ে দিয়ে সখিকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠাল। বললো, 'আমার ঘরে একগ্লাস জল দিয়ে যাও সখি।'/ জল? জলে কি মানুষের তেষ্টা মেটে?
>
> ['দিকপরিবর্তন', *সরীসৃপ*]

অতুলচন্দ্র গুপ্ত *Primeval and Other Stories*-এর ভূমিকায় যথার্থই মানিকের গদ্যরচনাকে 'নিরলঙ্কৃত' বলে বর্ণনা করেছিলেন। মানিকের গদ্যের স্বাতন্ত্র্যই তাঁর অলংকারহীনতায় কাটা-কাটা চোখা সংক্ষিপ্ত বাক্যে, কখনো-বা সরাসরি বক্তব্যজ্ঞাপক, কখনো তির্যক, কবিতাবর্জিত—রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বুদ্ধদেব বসুর গদ্যের বিপরীত। তাই বলে মানিক উপমা-উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করেন না, তা নয়। কিন্তু সেই ব্যবহার কখনো কবিতায় রাঙানো নয়, অকারণ নয়, বিষয়কেই স্পষ্টতর ব্যঞ্জিত করার জন্যে। যেমন, দু-চারটি উদাহরণ :

> তার মধ্যে গাবোকে বৌ সাজিয়ে তার কোলে হাড়ে চামড়ায় এক করা কুড়ানো বাচ্চাটাকে দিয়ে দুঃস্থ-গৃহস্থ সেজে ভিক্ষা করার অভিজ্ঞতা ছিদাম জীবনে ভুলবে না, ও যেন গজেন অপেরার যাত্রাগান।
>
> ['অমানুষিক', *পরিস্থিতি*]
>
> একটা মৃতদেহকে ধরে দাঁড় করিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবার মতো নিজের দেহটাকে সে উল্টো দিকে এগিয়ে নিয়ে চললো।
>
> ['সাড়ে সাত সের চাল', *পরিস্থিতি*]
>
> অমন মিষ্টি কোমল ফরশা রঙ জলে ধোয়া কাটা মাছের মতো কটকটে শাদা হয়ে গেছে।
>
> ['সখী', *ছোট বকুলপুরের যাত্রী*]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহত পশুর মতো ভুবন মধ্যে মধ্যে মা'র জন্য ছটফট করিয়া কাঁদে; বনমালীর শুষ্ক তৃণহীন জগতে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যায়।

['সরীসৃপ', *সরীসৃপ*]

জোঁকেরা তাহার রক্ত শুষিয়া শুষিয়া কচি পটোলের মতো ফুলিয়া উঠিয়া আপনা হইতে নিচে খসিয়া পড়িয়া যায়, সে টেরও পায় না।

['প্রাগৈতিহাসিক', *প্রাগৈতিহাসিক*]

পরনের বেনারসীর রঙের মতো সুশীলা সলজ্জ ভঙ্গিতে একটু হাসে, নববধূর মতো।

['যাকে ঘুষ দিতে হয়', *আজকাল পরশুর গল্প*]

বৈঠকখানার ভাঙা তক্তাপোশে বিছানো ছেঁড়া ময়লা সতরঞ্জির এক প্রান্তে কুণ্ডলী পাকানো ঘেয়ো কুকুরের মতো দলা পাকিয়া বসে আছে খালি গায়ে জবুথবু একটা মানুষ, মেঝেতে লোম-ওঠা বিড়ালটা ছাড়া আর কোনো জীবন্ত প্রাণী নেই ঘরে।

['টিচার', *খতিয়ান*]

দু-পাশের দোকানগুলির গ্রাম্য মূর্তির গায়ে শহুরে ভাবের তালি লাগানো—খালি গায়ে বুট-পরা মানুষের মতো।

['মাটির সাকী', *প্রাগৈতিহাসিক*]

কাঁচা-পাকা আমের মতো নতুন বৌকে সূর্যকান্তের লাগিতেছিল মিষ্টি আর টক।

['সাহিত্যিকের বউ', *বৌ*]

গায়ের রঙ তার খুবই ফরশা, কিন্তু কেমন যেন পালিশ নাই। দেখিলে ভিজা স্যাঁতসেঁতে মেঝের কথা মনে পড়িয়া যায়।

['কেরানীর বৌ', *বৌ*]

শব্দ ব্যবহারে মানিকের কোনো শুচিবায়ুগ্রস্ততা নেই। বাস্তবতাই তাঁর অন্বিষ্ট। শব্দ ব্যবহারেও তার পরিচয় আছে। একেবারে দেশজ প্রচলিত শব্দ থেকে ইংরেজি শব্দ—সবই তিনি প্রয়োগ করেন অবলীলায়। উদাহরণ :

আজেবাজে খেয়ালে—যেসব খেয়াল তাদেরি মানায়, তাদেরি ফ্যাসান, যারা ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচার প্রবৃত্তিটা পর্যন্ত কেঁচে দিয়ে মারতে পারে লাখে লাখে মা-বাপ-ছেলে-মেয়ে—অনর্থক অখুশি হতে রাজি নয় মানুষ।

['ছিনিয়ে খায়নি কেন', *খতিয়ান*]

বোবা হাবা চাষাগুলো শুধু বেপরোয়া নয়, একেবারে তুখোড় হয়ে উঠেছে চালাকিবাজিতে।

['হারানের নাতজামাই', *ছোট বড়*]

সত্যিকারের রোগা ক্যাংটা তরুণীকে চেয়ে চেয়ে দেখতে এত ভাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগে—রায়বাহাদুরের এত তীব্র ইচ্ছা করে টিপেটিপে ছেনেছুনে দেখতে সত্যিকারের কঙ্কালসার তরুণীকে।

['টিচার', *খতিয়ান*]

সকালে দাওয়ায় বসে মদন সারা গায়ে শীতের রোদের সেঁক খাচ্ছিল, হঠাৎ তার পায়ে খিঁচ ধরল ভীষণভাবে।/একেবারে সাত-সাতটা দিন তাঁত না চালিয়ে হাতে পায়ে কোমরে পিঠে কেমন আড়ষ্ট মতো বেতো ব্যথা ধরেছিল, তাতে আবার গাঁটে গাঁটে ঝিলিকমারা কামড়ানি। সুতো মেলে না, তাঁত চলে না, বিনা রোগে ব্যারাম ধরার মতো হদ্দ করে ফেলে।

['শিল্পী', *পরিস্থিতি*]

চরিত্রায়ণের জন্য বর্ণনার মধ্যেই চরিত্রানুগ শব্দ প্রয়োগ মানিকের একটি বিশিষ্ট কুশলতা। তার একটিমাত্র দৃষ্টান্ত এখানে চয়ন করি :

ওর জন্য কষ্ট হয় মাসির, ওর বাপের কথা ভেবে। মা বৌ যেন কেমন ব্যাভার করে ওর সঙ্গে।

['শিল্পী', *পরিস্থিতি*]

ক্রিয়াপদে মানিকীয় পদ্ধতি তাঁর গল্পগুচ্ছে অজস্র। এখানে শুধু একটি গল্পের প্রথম অনুচ্ছেদটি তুলে দিচ্ছি :

গাড়ি নূতন, বৌ নূতন, চাকরি নূতন। চাকরিটা জুটিয়াছে কৌশলে, শোভারানীকে পাশে বসাইয়া শহরের বাহিরে প্রকৃতির শোভা দেখিতে আর ফাঁকা হাওয়া খাইতে বাহির হওয়াটাও ঘটিয়াছে কৌশলেই। কাল বিকালে বাড়ির সকলে গিয়াছে এক ভাইপোর বিবাহ উপলক্ষে বর্ধমান, শোভারানীর বাপের বানানো অসুখের ছুতায় তারা দুজন থাকিয়া গিয়াছে। আজ বারাসাতে বাপের অবস্থা দেখিয়া হয় শোভা যাইবে বর্ধমান, না হয় শোভা যাইবে না; এই হইয়াছে ব্যবস্থা।

['চাকরি', *প্রাগৈতিহাসিক*]

মানিকের রচনায় মাঝে-মাঝেই 'সুভাষিত উক্তি' বা এপিগ্রামের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। মানিকের চিন্তার বিচিত্র বিশিষ্টতা এইসব উক্তির মধ্যেও পাওয়া যাবে। এরকম কয়েকটি :

১. কবির নেশা নারী, চোরের নেশা চুরি।

['চোর', *প্রাগৈতিহাসিক*]

২. একথা কে না জানে যে, পরের টাকা ঘরে আনার নাম অর্থোপার্জন এবং এ কাজটা বড়ো স্কেলে করিতে পারার নাম বড়লোক হওয়া।

['কুষ্ঠরোগীর বৌ', *বৌ*]

৩. ...নারীর মতো মালিকহীন টাকাও পৃথিবীতে নাই।

[ঐ, *ঐ*]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪. ...বড়লোক যদি হইতে চাও মানুষকে ঠকাও, সকলের সর্বনাশ করো। [ঐ, *ঐ*]

৫. প্রেম দুটি আত্মাকে কাছে আনে কিন্তু আত্মগত আত্মার চেয়ে কাছে-আসা আত্মার দূরত্ব বেশি। ['বৃহত্তর-মহত্তর', *অতসী মামী*]

সাধারণত মানিক ছোটো ছোটো বাক্য ব্যবহার করেন। তারই মধ্যে হঠাৎ তিনি চারিয়ে দেন দীর্ঘ জটিল বাক্য। এরকম কিছু :

উত্তেজিত বেদনায় হৃদয় ভাঙিয়া যাওয়ার সময় চার মিনিট তাহাকে ক্লোরোফর্ম করিয়া রাখার জন্য ভাগ্য ডাক্তারকে যে তিনশো টাকা ঘুষ দিতে হইয়াছে ইন্দু তাহা জানিতে পারিল না। ['যাত্রা', *প্রাগৈতিহাসিক*]

মনোহর মনোযোগ দিয়ে রোগী দ্যাখে, কম্পাউন্ডার ওষুধ তৈরি করে, চাকর দৈনিক বাজার থেকে বাঁচানো পয়সায় বড়লোক হয়, ঠাকুর দু-বেলা ভাত রাঁধে, দারোয়ান নিয়মিত গেট পাহারা দেয় আর সখি বাসন মাজে, কাপড় কাচে, গিন্নির ফাইফরমাশ খাটে। ['দিক পরিবর্তন', *সরীসৃপ*]

সে ছিল ওরকম অনেকের একজন। আধপেটা সিকিপেটার বেশি না খেয়ে, কখনো-বা দু'চারদিন স্রেফ উপোস দিয়ে দেশের চলতি দুর্ভিক্ষ ঠেকিয়ে টিকে থাকত, যুদ্ধের সুযোগে রক্তমাংসলোভী পোষা রাক্ষসগুলি চড়বড় করে দুর্ভিক্ষ চরমে তুলে দেওয়ায় যারা উৎখাত হয়ে গিয়েছিল। ['অমানুষিক', *পরিস্থিতি*]

না চেয়ে জীবনের প্রথাহীন খাপছাড়া বৈচিত্র্য জুটেছিল, চিরন্তন দীপশিখার ধোঁয়া থেকে কলঙ্ক তিলকের কালি সংগ্রহ করেও ভীতা সে তিলক পরেনি, বৈধব্যের বেদনায় আজো তার আপশোশ মিলিয়ে গেল না কেন? অনুতাপে আজ এত মাধুর্য কেন, মুক্তির গৌরবে দাহ? ['বিড়ম্বনা', *মিহি ও মোটা কাহিনী*]

তার মতো পর্দানশীন সাধারণ মেয়েকে (সাধারণ মেয়ে অবশ্য সে নয় কিন্তু) একদিন খানিকক্ষণ শুধু চোখে দেখিয়া, কয়েকটা প্রশ্ন করিয়া, সেলাই-এর কাজের একটু নমুনা দেখিয়া আর একখানা গানের সিকি অংশ শুনিয়া তার কি পরিচয় ওরা পাইয়াছিল শুনি? পছন্দ করে? ['সাহিত্যিকের বৌ', *বৌ*]

দীর্ঘবাক্য অনেক সময় মানিক তৈরি করেন অসমাপিকা ক্রিয়া পরপর প্রয়োগ করে :

সামনে রাখালের ঘর পেয়ে/ঝাঁপ ভেঙে/তাকে বাইরে আনিয়ে/রেইডিং পার্টির নায়ক মন্মথকে তাই জিজ্ঞেস করতে হয়, 'হারান দাসের কোন বাড়ি?' ['হারানের নাতজামাই', *ছোট বড়*]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপসংহার

সংকলন মানে আর-কিছু না—সমালোচনা। সমালোচনা মানে নির্বাচন। খারাপ গল্প থেকে উৎকৃষ্ট গল্পকে আলাদা করে নেওয়া। মুকুল ধরে তো অজস্র, সবই কি ফলে পরিণত হয়? যে-সব ফল পরিণত হচ্ছে, সেগুলির সব স্বাদ ও মিষ্টত্ব কি সমান? সৃষ্টিতেও তাই। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক—একই শিল্পীর রচনা হলেও তা-ই তার মধ্যে ফারাক থাকে নানারকম। আবার রুচিভেদ তো থাকে বিভিন্ন পাঠকের। (যেমন, অনেক পাঠক-সমালোচকই; যেমন, গুণময় মান্না মানিকের *পদ্মানদীর মাঝি* বা *পুতুলনাচের ইতিকথা*কে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস মনে করেন, কিন্তু নারায়ণ চৌধুরী পরিষ্কার বলেছেন মানিকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস *সহরতলী*।) আবার একই পাঠক ভিন্ন সময়ে ভিন্ন রচনায় সাড়া দেন। কিন্তু তারপরেও অধিকাংশ পাঠক-সমালোচকের একটি সাধারণ পাটাতন আছে। প্রসঙ্গত বলা উচিত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', 'নির্বাচিত গল্প', 'স্বনির্বাচিত গল্প', 'বাছাই গল্প' ইত্যাদি যে-নামগুলি এদের নামের পার্থক্য যা-ই থাক অভিপ্রায় সকলেরই এক : একজন লেখকের উৎকৃষ্টতম গল্পগুলির একত্রগ্রন্থন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে কয়েকটি গল্পসংকলন প্রকাশিত হয়েছে। সর্বস্পর্শী এরকম কয়েকটি সংকলনের পরিচয় :

জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প*, ১৯৫০। সূচিপত্র : ১ প্রাগৈতিহাসিক ২ টিকটিকি ৩ আত্মহত্যার অধিকার ৪ সরীসৃপ ৫ কুষ্ঠরোগীর বৌ ৬ হলুদ পোড়া ৭ সমুদ্রের স্বাদ ৮ বিবেক ৯ আফিম ১০ আজ কাল পরশুর গল্প ১১ যাকে ঘুষ দিতে হয় ১২ নমুনা ১৩ দুঃশাসনীয় ১৪ কংক্রীট ১৫ শিল্পী ১৬ হারানের নাতজামাই ১৭ বিচার ১৮ ছোট বকুলপুরের যাত্রী।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বনির্বাচিত গল্প। ১৯৫৬। সূচিপত্র : ১ বৃহত্তর-মহত্তর ২ নেকী ৩ চোর ৪ ফাঁসি ৫ ভূমিকম্প ৬ টিকটিকি ৭ বিপত্নীক ৮ সিঁড়ি ৯ মহাকালের জটার জট ১০ হলুদ পোড়া ১১ চুরি চুরি খেলা ১২ ফাঁদ ১৩ রাঘব মালাকর ১৪ প্রাক-শারদীয় কাহিনী ১৫ রক্ত নোনতা ১৬ হারানের নাতজামাই ১৭ ভিক্ষুক ১৮ ধান ১৯ বিবেক ২০ শিল্পী।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মানিকের ছোটোগল্পের অনুবাদ-সংকলন *Primeval and other stories*, ১৯৫৮। অনূদিত গল্পের সূচিপত্র : ১ প্রাগৈতিহাসিক ২ চোর ও ৩ সিঁড়ি ৪ সরীসৃপ ৫ সমুদ্রের স্বাদ ৬ জুয়াড়ীর বৌ ৭ হলুদ পোড়া ৮ যাকে ঘুষ দিতে হয় ৯ শিল্পী ১০ হারানের নাতজামাই ১১ ছোট বকুলপুরের যাত্রী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প*, ১৯৭১। সূচিপত্র : ১ প্রাগৈতিহাসিক ২ টিকটিকি ৩ আত্মহত্যার অধিকার ৪ সরীসৃপ ৫ কুষ্ঠরোগীর বৌ ৬ হলুদ পোড়া ৭ কে বাঁচায়, কে বাঁচে ৮ যাকে ঘুষ দিতে হয় ৯ দুঃশাসনীয় ১০ সাড়ে সাত সের চাল ১১ মাসি-পিসি ১২ শিল্পী ১৩ কংক্রীট ১৪ টিচার ১৫ ছিনিয়ে খায়নি কেন ১৬ হারানের নাতজামাই ১৭ ছোট বকুলপুরের যাত্রী ১৮ আর না কান্না।

প্রায় তিন দশকের অবিরল সাহিত্যচর্চায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে-বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার সাক্ষ্য শুধু তাঁর গল্পের অন্তর্বস্তুই দেবে না—এক-একটি গল্পগ্রন্থ গ্রন্থনার মনোভঙ্গিতেও পাওয়া যায়। তাঁর সর্বশেষ গল্পসংগ্রহ : *লাজুকলতায়* মানিক যা লিখেছিলেন, তা থেকেই পাওয়া যাবে তাঁর গল্প গ্রন্থনার মূলসূত্র : 'একটি গল্পসংকলনে মূল একটি সূত্রের ভিত্তিতে, অর্থাৎ সমাজ-জীবনের কোনো একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ অবস্থার ছোটো ছোটো কাহিনীর মধ্যে যে মিলটা স্বভাবত থাকে তাকে আশ্রয় করে গল্প চয়ন করা আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি।' সাহিত্যচর্চাই ছিল মানিকের জীবিকার উপায়—সেজন্যে তিনি সব সময় তাঁর ইচ্ছামতো গল্পসংকলন তৈরি করতে পারেননি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পগুলির ভূমিকাতেই আমরা তাঁর গল্পগ্রন্থনার বিশিষ্ট মনোভঙ্গি দেখতে পাই। *ফেরিওলা* গল্পগ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন : 'গল্পগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লেখা কিন্তু গল্পগুলির মধ্যে সমসাময়িক সামাজিক জীবনের মূলসূত্রের একটা যোগাযোগ আছে বলেই আমার বিশ্বাস।' *পরিস্থিতি* গল্পসমূহের ভূমিকায় লিখেছেন : 'চারিদিকে দ্রুত ও বিরাট পরিবর্তনে কতকগুলি ছাড়া ছাড়া দিকের ছাপ গল্পগুলিতে আছে, সব কিছু বদলে যাচ্ছে এইটুকুই শুধু গল্পগুলির একতা।' *আজকাল পরশুর গল্প* গল্পগ্রন্থের ভূমিকায় গল্পগুলি সাজানো যথাযথ হয়নি বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

www.amarboi.com

মানিক তাঁর নিজস্ব প্রকাশনা সংস্থা 'উদয়াচল পাবলিশিং হাউস' থেকে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৮৭) একটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন (হয়নি শেষ পর্যন্ত); ঐ উপলক্ষে ৭ জুন ১৯৩৯-এ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে মানিক যে চিঠি লিখেছিলেন, তার প্রাসঙ্গিক অংশ :

> আপনার গল্প কয়েকটি কিভাবে সাজাতে চাই মোটামুটি আপনাকে জানাচ্ছি। আপনি যদি পরিবর্তন করতে চান, আমাকে জানাবেন। কৈশোর বা বাল্যজীবন যে যে গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে সেইগুলিকে আমি প্রথমে দিতে চাই। অল্পবয়সী-মানুষ-প্রধান গল্প আপনার আর আছে কি? থাকলে ভিন্ন ভিন্ন গল্প হলেও বইটিকে সমগ্রভাবে একটি সুন্দর বৈশিষ্ট্য দেওয়া সম্ভব হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখা যাচ্ছে : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো একটি গল্পগ্রন্থের সবগুলি গল্প মিলে বিশেষ কোনো অখণ্ড সমগ্রতা বা ধারা (*পরিস্থিতি*র ভূমিকার কথাই ব্যবহার করছি) সৃষ্টি করতে চাইতেন।

এই দৃষ্টিতে দেখলে তাঁর এক-একটি গল্পগ্রন্থের চারিত্র স্পষ্টতর হবে। সবচেয়ে স্পষ্ট তো *বৌ* গল্পগ্রন্থটি। ১৯৪০-এ প্রকাশিত এই গল্পগ্রন্থে ছিল বিভিন্ন পরিচয়ের মানুষের আটটি গল্প। ১৯৪৬-এ প্রকাশিত *বৌ*-এর দ্বিতীয় সংস্করণে বৌ-কেন্দ্রিক আরো পাঁচটি গল্প যুক্ত হয়। এই তেরোটি গল্পের বাইরেও যে বৌ-কেন্দ্রিক আরো গল্প লিখবার ইচ্ছা ছিল মানিকের তা তাঁর ডায়েরি ও নোটবই থেকে বোঝা যায়। তেমনিভাবে *আজ কাল পরশুর গল্প* অনেকটাই মন্বন্তরকেন্দ্রিক গল্পের সংগ্রহ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়েও বেশ কিছু গল্প লিখেছিলেন মানিক। *ছোট বকুলপুরের যাত্রী* গ্রন্থে এই একই ধরনের নামের দুটি গল্প আছে—'নিচু চোখে দু'আনা আর দু'পয়সা' আর 'নিচু চোখে একটি মেয়েলি সমস্যা'। মানিকের সমস্ত রচনার মধ্যে যেমন তেমনি তাঁর গল্পগুচ্ছেও উদ্দাম সৃজনী আবেগের সঙ্গে একটি নিঃশব্দ জ্যামিতির শাসনও কাজ করে গেছে বলে মনে হয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতা

শব্দ-মদের বিরুদ্ধে

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা! বইটি হাতে পেয়ে মনো-নয়নের পলক পড়ে না, ভিতরটা ভরে যায় বিস্ময়ের কৌতূহলে উত্তেজনার ঢলে। সেই বিস্ময়পাত্র হাতে নিয়ে ঘুরি। যে দ্যাখে, সে অবাক। এ কোন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়! কেউ কেউ জিজ্ঞেস করেই বসেন : আমাদের চেনা সেই গল্প-উপন্যাস সৃজনকর্তারই নাকি। আপাতত গ্রন্থাধিকারী হয়ে সেই বিস্ময়ের জবাব দেবার ভার পড়ে আমার উপর—যে তার আনন্দ-বেদনা সবকিছু প্রকাশের মুখ্য মাধ্যম হিশেবে গ্রহণ করেছে শব্দকে, যে-শব্দ-মদে মাতাল হয়ে বুঁদ হয়ে আছে চুর হয়ে আছে পাগল হয়ে আছে আকণ্ঠ আত্মা ডুবে আছে।

উত্তেজনার ঢল নেমে গেলে শান্তজিজ্ঞাসার জবাবের পলি পড়তে থাকে। কেন মেনেছিলুম বিস্ময়। বিস্ময় তো এই কারণেই যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বতোভাবে স্বনিয়োগ করেছিলেন গল্প-উপন্যাস রচনায়। এমনকি অনেক গদ্যশিল্পীকে-যে দেখা যায় প্রবন্ধমাধ্যমে সরাসরি তাঁর বক্তব্য তুলে ধরতে, তাঁকে তো দেখি সেই ঠান্ডা মননের ঘর করতেও নারাজ—তাঁর ভাবনা-বেদনা প্রকাশের অনন্য উপায় হিশেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চিত-ও নির্দিষ্ট-ভাবেই গ্রহণ করেছিলেন গল্প-উপন্যাসকে। তাই তাঁর গল্পগ্রন্থের সংখ্যা যেখানে ষোলো (এবং এর বাইরেও অগুনতি গল্প ছড়ানো), উপন্যাসের সংখ্যা উনচল্লিশ (হয়তো পত্রিকায় ছড়ানো কিংবা অসমাপ্ত আরো দু-একটি আছে)—সেখানে তাঁর নাটক মাত্র একটি, প্রবন্ধগ্রন্থ মাত্র একটি (তা-ও মৃত্যুর পরে সংকলিত হয়ে বেরিয়েছিল)। সাহিত্য ব্যাপারে তাঁর স্বভাবসুলভ স্পষ্ট ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্দ্বিধ মত : 'লেখা ছাড়া অন্য কোন উপায়েই যে-সব কথা জানানো যায় না সেই কথাগুলি জানাবার জন্যই আমি লিখি।' ('কেন লিখি', *মানিক গ্রন্থাবলী*: দ্বিতীয় খণ্ড)। কিন্তু কী লেখা? কোন সাহিত্যমাধ্যমটি? '...লিখতে আরম্ভ করার আগেও বলে দেওয়া সম্ভব ছিল—যদি কোনদিন আমি লিখি ঝোঁকটা আমার পড়বে উপন্যাস লেখার দিকে। আমার বিজ্ঞান-প্রীতি জাত বৈজ্ঞানিকের কেন-ধর্মী জীবন-জিজ্ঞাসা, ছাত্রবয়সেই লেখকের দায়িত্বকে অবিশ্বাস্য গুরুত্ব দিয়ে ছিনিমিনি লেখা থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি কতগুলি লক্ষণে ছিল সুস্পষ্ট নির্দেশ যে, সাধ করলে কবি হয়তো আমি হতেও পারি, কিন্তু ঔপন্যাসিক হওয়াটাই আমার পক্ষে হবে উচিত ও স্বাভাবিক।' ('উপন্যাসের ধারা', ঐ)। অসামান্য এই আত্মজ্ঞান এই লেখকটিকে চিনিয়ে দেয় আমাদের : কোনোরকম লঘূকরণ নয়, দৃঢ় ও গোঁয়ার এক বিশ্বাস এই লেখককে চালিত করেছিল জীবনের—সম্পূর্ণ জীবনের রূপায়ণে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প না উপন্যাস শ্রেষ্ঠ—এই তর্কে প্রবেশ না-করেও বলতে পারি : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত ঔপন্যাসিক, উপন্যাস তাঁর মূল ক্ষেত্র। একমাত্র উপন্যাসটিতেই ধরা যায় জীবনের সামগ্র্যকে—ছোটোগল্প হাজার হলেও জীবনের টুকরোকে নির্বাচন করে, কবিতা সংবেদনকে, নাটক সংলাপকে, প্রবন্ধ মননকে—একমাত্র উপন্যাসের মঞ্জিল জীবনের সমগ্রতা, আর সে-মঞ্জিল স্বয়ং যাত্রাপথই, দেবালয় এখানে পথের অন্তিমে নয়—পথ জুড়েই বিরাজ করে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সমগ্র জীবনের—জীবনসন্ধিৎসার ধেয়ানী। সেজন্যেই কি তাঁর উপন্যাসমালা পড়ে হঠাৎ মনে হয় মানিক-পূর্ব সমস্ত বাংলা উপন্যাসই বুঝি রোমান্সলোকে ভ্রাম্যমাণ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কেন প্রধানত কবিতা-নাটক-প্রবন্ধ লেখেননি, এর জবাব রয়েছে এখানেই লুকোনো। সমগ্রের আকাঙ্ক্ষী যিনি, তাঁর পিয়াস মিটবে কেন এক-একটি টুকরোয়। সমগ্রের এই আকাঙ্ক্ষা অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই প্রথম জাগিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর বিন্যাসের সঙ্গে বিষয়ের বিবাহ খুব সুখের হলো না : সমকালীনতাকে পর্দার আড়ালে রেখে জীবনের পূজা সারা হলো না তাঁর। সমগ্রের প্রদীপ প্রজ্বলিত ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেও, তাঁর কবিতা ও উপন্যাস সমস্ত মিলেই তিনি সেই তীর্থের অভিসারী, কিন্তু উপন্যাসমাধ্যমটি যে নিষ্কম্প্র নিষ্ঠা দাবি করে যেন তার প্রতি সম্মান না-দেওয়ায় তাঁর মধ্যকেন্দ্রের আগে-পরে সৃষ্টি হলো শুধু খণ্ডিত, টুকরো, ছেঁড়া, আংশিক জীবন। এই সমগ্রতাচর্যা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশাল বিশিষ্টতা; অসংখ্য কাহিনীস্রষ্টা থাকা সত্ত্বেও, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যেতিহাসে হয়ে দাঁড়ালেন প্রধানত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঔপন্যাসিক, উপন্যাসের আত্মাকে এই প্রথম সর্বতোভাবে স্পর্শ করা হলো।

সমগ্রতাকাঙ্ক্ষী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর বহু বছর পরে তার এই কবিতাগ্রন্থের প্রকাশ তাই আমাদের কাছে এক আনন্দবহ আশ্চর্য-বিস্ময়। অথচ যে-কল্লোল যুগের বিলম্বিত ও পরিপক্ক ফল বলা হয়ে থাকে তাঁকে, সেই কালটুকরোর বহু সন্তান গদ্যে পদ্যে উভচারী : প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখের কথা মনে পড়বে সবার। আরো : জগদীশ গুপ্ত বা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো গদ্যধর্মী গদ্যলেখকেরাও কবিতার চর্চা করেছিলেন, এমনকি কবিতাগ্রন্থ প্রকাশও করেছিলেন। সব সত্ত্বেও, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে গদ্য এলাকার এমন নিজস্ব লেখক বলে মনে হয় যে তাঁর হাত দিয়ে-যে কবিতা নিষ্ক্রান্ত হতে পারে সেটা যেন এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। বিশেষত আমার মতো একালের বাংলাদেশের সাহিত্যকর্মীর কাছে—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দু-একটি কবিতা তাঁর সমকালীন পত্রিকাপত্রে মুদ্রিত হলেও তা আমাদের নজরে পড়েনি। এর একটি লাভের দিক এই : আজ *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা* বইটি প্রথমবারের মতো পেয়ে, এর প্রতিটি কবিতা প্রথমবারের মতো পড়ে, একটি অটুট অভিঘাত সৃষ্টি হয়েছে। অপ্রতিরোধ্য একটি তুলনা জাগছে আমার মনে—ঠিক এমনি বিস্মিত, আনন্দিত ও উত্তেজিত হয়েছিলুম, *জীবনানন্দ দাশের গল্প* যখন বই-এর দোকান থেকে কিনে এনেছিলুম। পরে পড়লাম জীবনানন্দের উপন্যাসও।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও জীবনানন্দ দাশ : এতদিনে বোধহয় স্পষ্ট হয়ে গেছে, তিরিশের বাংলা কথকতা ও কবিতার এই দুজনই শ্রেষ্ঠ পুরুষ। একজন সম্পূর্ণ কথক, আর একজন পরিপূর্ণ কবি। দুজনের ভিনদেশে সফর তাই আমাদের কৌতূহলকে অসীমে নিয়ে যায়। আর হয়তো এত বিস্ময় এই কারণেই, যে, জীবদ্দশায় ঐ সফর দুজনেরই ক্ষেত্রে ছিল আচ্ছাদিত; মৃত্যুর অনেক বর্ষ পরে, যখন তাঁদের কবি ও কথক হিশেবে প্রতিষ্ঠা সর্বব্যাপী, ঐ লুকোনো প্রদেশ আবিষ্কৃত হলো, আর আমাদের চড়িয়ে দিল বিস্ময়শীর্ষে। এই দুজনের সাহিত্যযাত্রাও প্রায় ভিন্নমুখী : প্রথম জীবনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গদ্যলেখায় (*দিবারাত্রির কাব্য*) কবিতা কেবল শিরোদেশেই ছিল না, ছিল উপন্যাসটির সমস্ত শরীরাত্মায়; আর, জীবনানন্দ দাশ তাঁর অন্ত্য-কবিতায় গদ্যমুহূর্তকে ক্রমাগত কোল দিচ্ছিলেন। সমস্ত সত্ত্বেও, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পূর্ণভাবে গদ্যময়; জীবনানন্দ সম্পূর্ণভাবে কবিতাক্রান্ত। তাঁদের এই আত্মস্বভাব তাঁদের ব্যতিক্রমী সৃষ্টিতেও একেবারে নিপট-নিপাট স্বাক্ষর রেখে গেছে : তাঁর গল্প-উপন্যাসে কবি জীবনানন্দ সর্বমুহূর্তে উপস্থিত, তাঁর কবিতায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গদ্যলেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিক্ষণে বর্তমান। সেখানেই বিস্ময় জ্বলে ওঠে আমাদের, যখন দেখতে পাই তাঁর গল্প-উপন্যাসে উঁকি পাড়ছেন সত্যিকার-কথক জীবনানন্দ, তাঁর কবিতায় যথার্থ-কবি মানিক। 'কবি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' কি 'ঔপন্যাসিক জীবনানন্দ দাশ' এরকম কোনো অত্যুৎসাহী সম্বোধন নিশ্চয় করব না আমরা, কিন্তু এক-মুহূর্তের জন্যেও-যে ওরকম উপাধি উদ্বুদ্ধ করে আমাদের, তাই তো সানন্দ বিস্ময় এক। বস্তুত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা তাঁর গদ্যরাষ্ট্রেরই অন্তর্ভূত, সংলগ্ন একটি নূতন প্রদেশ বড়জোর; তেমনি জীবনানন্দের গল্প-উপন্যাস তাঁর কবিতালোকেরই সম্প্রসার মাত্র, কোনো নবীন ও বিচ্ছিন্ন ও প্রতিযোগী ভূখণ্ড নয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা স্পষ্টতই দ্বিধাবিভক্ত: প্রথম ভাগে কৈশোরিক কবিতা তাঁর; দ্বিতীয় পর্যায় তাঁর মৃত্যুপূর্ব প্রৌঢ়তায়। ১৯২৪-২৯ প্রথম পর্ব; দ্বিতীয় পর্ব ১৯৪৬-৫৩। দেখা যাচ্ছে: কৈশোর ও প্রৌঢ়ত্বের মাঝামাঝি সময়ে, তাঁর আসল সৃজনসময়ে মানিক কবিতায় তেমন আসক্ত ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে আবার স্মরণ করা যেতে পারে তাঁর পূর্বোদ্ধৃত আত্মজ্ঞানের নমুনা।[১] কিন্তু কেবল আত্মজ্ঞান নয়, তার অনুধাবনেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে-আত্মপরিচয় দান করেছেন তা সাধকের। উপাস্যের সন্ধানে যিনি বিরামহীন শ্রম ও ধ্যান ও মোনাজাত করেছেন, তাঁকে সাধক ছাড়া আর কী বলব। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই প্রকৃত সাধক, পরম সাধক।

তার প্রথম কবিতায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচলেরই পৃষ্ঠপোষক—সেই প্রচল বিষয় ও বিন্যাস উভয়ত। 'ফুলমঙ্গল' শীর্ষে লিখেছেন অন্তত তিনটি কবিতা ('শেফালি', 'সূর্যমুখী', 'জবা'), গেয়েছেন যৌবনবন্দনা, 'সব্‌জে পাখি ও হল্‌দে পাখি' বা 'শাওন রাত'-এর মতো কবিতার শিরোনামই তাদের আত্মপরিচয়জ্ঞাপক, এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের কাব্যপ্রচলের ধারাবাহী। একালে অবলম্বন করেছেন সুপ্রচলিত অক্ষরবৃত্ত-মাত্রাবৃত্ত-স্বরবৃত্তের তিনরকম ছাঁদই। এরকম পঙ্‌ক্তি সেকালের আরো অনেক কবির কলম থেকেই নির্গত হতে পারত:

১. সব্‌জে পাখি শিস্ দেয়
'ইস্!' করে বন চম্‌কালো,
হল্‌দে পাখি মাথা নেড়ে
গম্ভীরে তার ধমকালো।
সব্‌জে পাখি সব্‌জে পাখি গো
আমার খুশি কোথায় রাখি গো।

[সব্‌জে পাখি ও হল্‌দে পাখি]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. নিবিড়তর গভীরতার মধুরতর নিশা
এমন যেন ছিলো না কোনো কালে,
গগনবধূ জানালো শুধু মুখর মূক-ভাষা
কেমনে হল নীরব আঁখিজলে।

[শাওন রাত]

শব্দললিতা, নিসর্গপ্রেম, ছন্দোঝংকার—এসব এখানে কোনো নূতন নির্মাণ নয়, প্রত্নের প্রতিধ্বনি। আর যে-ধরনের অন্ত্যমিল ব্যবহার করেছেন তিনি, তা কিছুতেই চেষ্টাজাগর অর্ধমিলের দৃষ্টান্ত নয়, অসচেতন প্রয়োগের উদাহরণ :

ওঠে/পাদপীঠে; দেখি/ফাঁকি; পথে/সাথে; আমারে/দূরে; মোহ/প্রবাহ; মেলি'/দুলি; মানে/শোনে; বসি/বাঁশী; সুরে/ফেরে; মানে/শ্রবণে; উড়ে/ধীরে; নিশা/ভাষা; বসি'/হাসি; পড়া/তারা; হাসি/ছেলেমানুষী; ইহারে/ইঁচড়ে; শুধু/মধু; ঘরে/পারে; দেখি/আঁখি; মেলে/ফুলে; ভরা/হারা; বাসি/হাসি; বেলা/জ্বালা; নিশা/বেশা; দিয়ে/বয়ে; পরিণয়ে/নিয়ে; পুরে/পড়ে; ছেঁড়া/তোড়া; খেলা/ভোলা; সেকি/সখি; ছেয়ে/ধুয়ে; অন্তে/প্রান্তে; যদি/বেদী; নিশা/ভাষা; ক্ষোভে/অনুরাগে; মধুরাতি/অনুভূতি; পুরোভাগে/জেগে; যৌবনে/অভিধানে; বালি/গুলি; মসি/হাসি; উদ্ভাসি/উর্বশী; নিশি/উর্বশী; আনে/মরুতৃণে; লোকে/যাহাকে; উর্বশী/উপবাসী; স্বৈরিণী/শ্মশান-চারিণী; ক্ষুধাতুরা/ভরা।

এরই মধ্যে তার স্বকণ্ঠ-যে কখনো জাগেনি, তা নয় :

সব পুড়ে গিয়ে শুধু রসহীন ছাই,
ছিল এ হৃদয় চেয়ে
নবীন হৃদয় গড়িতে চেয়েছি তাই,
প্রণয়ধারায় ধুয়ে।
দেহকামনার অন্তে—
নবীন প্রণয় জেগেছে হৃদয়প্রান্তে।

এরকম কিছু কবিতায় তাঁর পরবর্তী রুক্ষ কবিতার আভাস দ্যোতিত। গোবিন্দচন্দ্র দাস-যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত-জগদীশ গুপ্ত-প্রেমেন্দ্র মিত্র-অমিয় চক্রবর্তী যে এক-ধরনের রুক্ষ মাধুর্যের কবিতা লিখেছেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাথমিক ও পরবর্তী কবিতায় যেন রয়েছে তার ধারাবহনের সাক্ষ্য; বিশেষত প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার সঙ্গে তার কোনো-কোনো কবিতার সাযুজ্য স্বয়ম্প্রকাশ।[২]

প্রৌঢ়িক পর্যায়ের কবিতায় শব্দললিতা, ছন্দোক্বণন, নিসর্গপ্রেম—এক কথায়, পূর্ব প্রচল ও গতানুগতি কেটে গেল; তার বদলে দেখা দিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মভাষা, তাঁর এখনকার গদ্য আর কবিতা হয়ে উঠল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একই মানসের সন্তান। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ সময়কার কবিতা পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকে রচিত। অধিকাংশ কবিতাই তখন হয়ে উঠল গদ্যকবিতা; যে-কবি তিনরকম বাংলা ছন্দই জানতেন, তিনি বর্জন করলেন সেই ছন্দোঝংকারের প্রকাশরাস্তা। চতুর্থ দশকে যে-গদ্যকবিতা প্রবর্তিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ও তিরিশের কবিদের হাতে, পঞ্চম দশকে তা বহু ব্যাপকভাবে অবলম্বিত হয়, অবলম্বিত হয় প্রধানত মানিকেরই সহোদর বামপন্থী কবিদের হাতে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছন্দ ঝেড়ে ফেলে গদ্যছন্দ অবলম্বন করে অব্যবহিত পরিপার্শ্বে রূপাঙ্কনে মন দিলেন। পঞ্চম দশকে যে-অজস্র বামপন্থী[৩] কবি দেখা দিয়েছিলেন, তাঁদের রচনারই সহোদর মানিকের এইসব কবিতা। প্রায় সব গদ্যকবিতাতেই অব্যবহিত বস্তুর অ-রঙিন অবিকল চিত্রণ: 'বুড়ো সন্ত্রাসবাদী', 'সুকান্ত ভট্টাচার্য', 'চা', 'পরিচয়', 'কবিতা', 'সুন্দর', 'আমি', 'বাংলা ভাঙার কবিতা', 'শ্রাবণ মাস', 'মোড়', 'কিশোরী', 'দুর্ভিক্ষ', 'ডিসেম্বর', 'আদিম কবিতা' ও শিরোনামাহীন কবিতাগুচ্ছের অধিকাংশ। এর মধ্যে আছে শাণিত কবিতা:

১. তাড়িয়ে দিয়েছে বলেই তো এবার
ওদের যে তাড়াতে হবে,
জগৎ থেকে,
এটা বুঝে তুমি,
মার্কস লেনিন স্টালিনের
স্যাঙাৎ হয়েছ।

[বুড়ো সন্ত্রাসবাদী]

২. এবার চাষ করো,
গজাও।
গজাও বিদ্রোহ,
রাশি রাশি,
সবাই বাঁচুক—বিদ্রোহে।

[কয়েকটি শিরোনামাহীন/১১]

আরো নিশিত পঙ্‌ক্তিমালা:

১. স্বপ্নে দেখলাম কাঁকরের মত চাল,
লেলিহান শিখার মতো পুঁইডগা!

[সুন্দর]

২. মুথা ঘাসের মতো শীষে জমা এক ফোঁটা শিশিরে ফুটিয়ে
হীরার ধার,

[আমি]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. বলছে মাইনাস পাওয়ারের বাক্য

[কয়েকটি শিরোনামাহীন/১৫]

আছে মানিকের স্বভাবশোভন বাঁকা বাগ্‌ভঙ্গি :

১. বসন্তের কোকিল কেসে কেসে রক্ত তুলবে
সে কিসের বসন্ত!

[সুকান্ত ভট্টাচার্য]

২. সুন্দর পেয়ালা, চকমকি পাথরের রূপ যেন
পালিশ চোয়ানো মৃদুমন্দ,
তলায় গোপনে লেখা মেড ইন ইংলন্ড।

[চা]

৩. উত্তরে এই শীতল আঁধারে
ঘেঁষাঘেঁষি আমরা জ্বালি ডিবরি দীপের শিখা!
তোমার না হয় পূর্ণিমা রাত হবে
স্বপ্নে ঝলমল!
মোদের হবে দিন!

[কয়েকটি শিরোনামাহীন/৫]

দু-একটি কবিতা এত ছোটো, সুন্দর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ যে সবটাই উদ্ধার করা চলে :

আমি

এত চেষ্টা করেও আর আমি রইলাম না ভাই,
পালাম না থাকতে।
মুথা ঘাসের মতো শীষে জমা এক ফোঁটা শিশিরে ফুটিয়ে
হীরার ধার,
ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি চাঁদ সূর্যের প্রতিভায়—
শিশির ঝরে গেল, মুছে গেল প্রসাধন, আমি হলাম আমরা,
অসংখ্য মুথা ঘাস।

মোড়

আরেকটা মোড়।
দিক্‌বিদিকে পথবিপথের আরেক গোলকধাঁধা।
ছদ্মবেশী সূত্রপাতের আরেক হট্টগোল।
পিছুটানের আরেক বিরাট ঘাঁটি।
আগামী সব পোস্টে আঁটা নামের বিজ্ঞাপন,
ফলের ফুলের ছায়ার প্রলোভন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েকটি শিরোনামহীন/১৪

আকাশ ভেঙে পড়ল হঠাৎ শামিয়ানার মতো,
সভা শেষ হয়েছে, শামিয়ানা গুটাও!
বাঁশ আর রঙিন কাপড়ের টুকরো!

কয়েকটি শিরোনামহীন/১৭

সাবধান ত্রিলোচন,
ত্রি-নয়নে যেন না জ্বলে আগুন।
যে আগুনে পুড়ে যায় ঘর,
পুড়ে যায় জীবন নশ্বর।
আকাশ বাতাস পুড়ে যায়,
হাহুতাশ দাউদাউ জ্বলে
নেভাতে আনতে হয় বর্ষা অশ্রুজলে।

যে-বাঁকা প্রকাশপদ্ধতিতে মানিক বিশিষ্ট হয়ে ওঠেন, তা পরিষ্কার হবে অমিয় চক্রবর্তীর 'মাটি' (*পারাপার*) ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কয়েকটি শিরোনামহীন/১১' শীর্ষক অনন্য-বিষয় কবিতাদ্বয়ের তুলনামূলক স্থাপনায়। দুটি কবিতার প্রথম কয়েকটি ছত্র উদ্ধার করা যাক—

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় :

চাষ করো। '
মাটিতে চাষ করো।
চাষ করো ধান পাট ভুট্টার,
চাষ করো ললিতার ঠোঁটের পেলবতা,
চাষ করো ললিতার মুষ্টিমেয় কাঁচলির
ফোলা ফাঁপা উদর হওয়াটার কষ্ট,
চাষ করো বিশ্বাসঘাতক পুরুষের জীবনচর্চার,
চাষ করো।

অমিয় চক্রবর্তী :

ধান করো, ধান হবে, ধুলোর সংসারে এই মাটি
তাতে যে যেমন ইচ্ছে খাঁটি।
বসে যদি থাকো তবে আগাছায় ধরে বিন্দু ফুল
হলদে-নীল তারি মধ্যে, রুক্ষ মাটি তবু নয় ভুল—
ভুল থেকে সরে সরে অন্য কোনো নিয়মের চলা,
কিছু না-কিছুর খেলা, থেমে নেই হওয়ার শৃঙ্খলা,
সৃষ্টি মাটি এই মতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাইতে আরোই বেশি ভাবি
ফলাবো না কেন তবে আশ্চর্যের জীবনীর দাবী।

অথবা সজ্জিত করা যায় পাশাপাশি নজরুল ইসলাম, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতার তিনটি সাহসিক উক্তি; এখানেও দ্রষ্টব্য মানিক-দ্যুতির বঙ্কিম শতদ্রু বিচ্ছুরণ—

নজরুল ইসলাম :

আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন!
আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ-হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দেবো পদচিহ্ন!
আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!

['বিদ্রোহী', *অগ্নিবীণা*]

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত :

শূন্য নভে
রিক্ত প্রতিধ্বনি-স্ফীত অট্টহাসি ভরি,
উড়ায়ে মরুর বায়ে ছিন্ন বেদ-বেদান্তের পাতা,
বলেছি পিশাচহস্তে নিহত বিধাতা।

['বিস্মরণী', *অর্কেস্ট্রা*]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় :

বেদ বাইবেল কোরান কিনেছে
শিশিবোতলের বিক্রিওলা,
পুঁথির পাতা পুড়িয়ে আরাম করবে শীতের রাতে
ফুটপাথে!

[ডিসেম্বর]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা তাঁর জীবন ও সাহিত্যের সঙ্গে নিশ্ছেদ জড়িত—অন্য যে-কোনো লেখকশিল্পীর সম্বন্ধে এ উক্তি যে-ভাবে ও যতখানি সত্য, মানিক প্রসঙ্গে তার চেয়ে বেশি। সেই-যে *দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাসে তিনটি বিভাগে তিনটি নামকবিতা যোজনা করেছিলেন মানিক, তা যেমন ঐ উপন্যাসের ও উপন্যাসে নিহিত জীবন সামগ্র্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কিত, তেমনি মানিকের উত্তরকালীন কবিতা তাঁর সাহিত্য ও জীবনেরই নিপট চিত্রণ। মানিকের সমসাময়িক, তিরিশের প্রধান কবি যাঁরা, তাঁদের সবার কবিতা, কবিতার নিয়মেই শব্দকে ঈশ্বর রূপে প্রণতি জানিয়েছিল : জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে—এঁদের সবার কবিতাই শব্দপ্রয়োগের নিকষে বিচার্য। মানিক

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতার এই মূল ভূভাগ থেকে সরে গিয়ে তৈরি করে নিতে চেয়েছিলেন প্রতীপ একটি বিশ্ব—যেখানে সূক্ষ্মতম অনুভূতির চেয়ে জীবন প্রত্যয়ের দাম ছিল বেশি, কারুকাজের চেয়ে উক্তির প্রত্যক্ষতাই ছিল বেশি মূল্যবান, কল্পলোকের চেয়ে বহির্বাস্তবের রূপায়ণই ছিল যার অন্বিষ্ট। কখনো তাঁর স্বভাবশোভন একটু-বাঁকা বাক্‌ভঙ্গিতে, কখনো আতীব্র বিদ্রূপে, কখনো সরাসরি মানিক তাঁর জীবনবাণীর রূপ দিয়েছেন এইসব কবিতায়—যেমন তাঁর ছোটোগল্প এবং উপন্যাসেও। কথক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক কবিতার ভিতরে কাহিনীর শিকড় রোপণ করে যান, কিংবা কোনো মানবচরিত্রকে ছোটো-বড়ো পঙ্‌ক্তির বুননে ভরে রাখেন, অথবা কোনো কবিতায় অলক্ষ্যে ছোটোগল্পের আদল এসে যায়।

কয়েকটি কবিতায় কবিতা ও তাঁর নিজের কবিতা সম্পর্কে মানিকের ভাবনা বিধৃত। 'সুকান্ত ভট্টাচার্য' কবিতায় বলেছেন: 'তোমার তরুণ রশ্মি দেখে ভেবেছিলাম,/ বাঁচা গেল, কবিও পেয়ে গেছে নতুন যুগ।' কিংবা: 'কবি ছাড়া আমাদের জয় বৃথা।' এ কবিতা শেষ হয়েছে আতীব্র জিজ্ঞাসায়: 'বসন্তে কোকিল কেসে কেসে রক্ত তুলবে/ সে কিসের বসন্ত!' 'প্রথম কবিতার কাহিনী' নামক দীর্ঘ কবিতাটি এইদিক থেকে অতি মূল্যবান। মানিকের কবিতার নেপথ্যকাহিনী এখানে বিবৃত। প্রথমে; 'কবিতা লিখতে চেয়েছিলাম কৈশোরে।/ পিতৃপুরুষের স্বপ্নালু ঐতিহ্যের মিষ্টি নেশায়/ পীড়িত মনের অভিমানী বিদ্রোহে পুষ্ট সজ্ঞাতে/ অজস্র কেন-র ফুল ছুটিয়ে ছড়া গাঁথার সাধ।' কিন্তু প্রাণের জিজ্ঞাসাই পরিব্যক্ত হলো না; সুতরাং 'কবিতা লিখতে পারলাম না কৈশোরে।' তারপর: 'প্রথম যৌবনে ঘাঁটলাম দেবাশ্রমিক কবিতা।/ আর জীবনের নিচের তলায় বস্তির পচা পাঁক।' কিন্তু: 'কবিতা লেখা হল না প্রথম যৌবনেও।' তারপর: 'আশ্বাস এল একদল বাস্তব কবির।/ ইতিহাসের সুতোয় যারা মালা গাঁথছে মানের,/ জীবন-যুদ্ধের জয়লাভের, অগ্রসরের,/ কাজের।' মানিক, খুব সম্ভবত চল্লিশের দশকে উত্থিত বামপন্থী কবিদের ইঙ্গিত দিয়েছেন এখানে, বিশেষত সুকান্ত ভট্টাচার্যকে—তাঁকে নিয়ে আলাদা একটি কবিতাও লিখেছিলেন তিনি।[৪] দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশবিভাগ, রাশি-রাশি মৃত্যু—চল্লিশের দশকের এইসব প্রবলতুমুল সমাজ-রাজনৈতিক ঝঞ্ঝায় যাপিত মানিকের অনেকগুলি কবিতার উপজীব্যও তাই। 'প্রথম কবিতার কাহিনী' কবিতাটির রচনাকালও লক্ষণীয়: '১৯৪৬-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৭-এর এপ্রিল-মে।' খুব সম্ভবত সুকান্ত ভট্টাচার্যকে মনে রেখেই মানিক লিখেছিলেন: 'কিশোর সৈনিক একজন, সে লেখে কবিতা/ লেখে শৈশব থেকে, সংগ্রামী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শৈশব।/ লেখে আমার না-লেখা কবিতাগুলি', এক পঙ্‌ক্তি পরে লিখেছেন: 'একদিন চিরতরে থেমে গেল তার চলা,/ অসাড় হয়ে গেল বাড়ানো হাতখানি।' সুতরাং 'আমার কবিতা লেখা হল না অন্য কবিকে দিয়ে।' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যকে দিয়ে নিজের বক্তব্যের কবিতা লেখানো চরিতার্থ হলো না বলেই যেন দ্বিতীয় যৌবনে তিনি ফিরে এলেন কবিতায়। এবং সে-সব কবিতা এক-হিশেবে সুকান্তেরই না-লেখা কবিতার মতো মনে হয়। যে-সুকান্ত তাঁর পত্রগুচ্ছে অবিরাম প্রেম-প্রসঙ্গে নিমজ্জিত থেকেও কবিতাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন জনজাগরণের কাজে—অনেকটা তারই মতো।[৫] কিন্তু 'আমার কবিতা লেখা হল না অন্য কবিকে দিয়ে।' এই পঙ্‌ক্তি থেকেই কবিতাকে মানিক কী-চোখে দেখতেন, তা স্পষ্ট হয়ে যায়: কবির যে-অহম বা প্রবল আত্মতা, যার ফলে প্রতিটি কবি আলাদা ও স্বকীয় দুনিয়া তৈরি করে নেন, তা থেকে মানিক মুক্ত, স্বভাবতই মুক্ত, কবিতাকে বরং তিনি চাচ্ছিলেন প্রহরণ হিশেবে ব্যবহার করতে, জীবনের সংগ্রামে প্রকৃত সৈনিকের মতো ঐ প্রহরণ একজনের হাত থেকে খশে পড়তে দেখে মানিক তা তুলে নিয়েছিলেন। তাই মধ্যবয়সে নূতন মাধ্যমের কাছে আত্মনিবেদন: 'মাঝবয়সে মক্‌স করছি হাত, খুঁজছি ছন্দ,/ ভাঙছি আত্মপ্রীতি সংস্কারের দেওয়াল,/ ছিঁড়ছি বুদ্ধির জটিল জাল,/ শিখছি রণরঙ্গিণী কাব্যলক্ষ্মীর সাথে/ মারণ প্রেমের কায়দা কানুন।' তার ফলেই তাঁর এই কাব্যচেষ্টা। মানিকের কাছে, বস্তুত, 'কাব্য জীবনেরই রসায়ন।' তাই এই দীর্ঘ কবিতাটি শেষ হয় অগাধ আশাবাণীর প্রজ্বলনে: 'গা রে পাখি গান গা, দে রে ফুল গন্ধ,/ শিশির-ভেজা ঘাস বেঁচে থাক,/ বেঁচে থাক জীবনের রসঘন কবিতা।' জীবনের সঙ্গে কবিতার এ-ধরনের সমীকরণ চল্লিশের দশকে স্থাপিত হয়—উত্তর বামপন্থী বাঙালি কবিদেরই সহজীবী ও সহযাত্রী: স্মরণীয়, এঁরাও, মানিকেরই মতো, গদ্যকবিতাকে কবিতার প্রধান মাধ্যম হিশেবে নিয়েছিলেন।

'কবিতা' কবিতাটিতে শৌখিন 'শব্দবিলাসী'দের উদ্দেশে মানিকের বক্রোক্তি: 'কবিতা অবসরের জ্বর ব্যারাম/ না খেটে যার চলে তার সখের খাটুনি।' 'নূতন ঘৃণার প্রথম কবিতা'য় বলছেন: 'আমি মানুষের কবি, পৃথিবী আমার,/ আমি ঘৃণা করি।' 'কয়েকটি শিরোনামাহীন/৬' কবিতায় 'আমার কবিতা কাঁচা, কুঁড়ির মতো।/ কবিতাপতিরা এতকাল ছিল কোটিপতিও।/ অমৃতফল চুষে নিঙড়ে যত আঁটি তারা ফেলেছে ছুঁড়ে,/ ছাইগাদাতে আবর্জনায় পচা মাটিতে,/ তাদের দু'টি পেলব কচি নবজাত শিখা,/ আমার কবিতা।' এ-সব ছিন্ন লাইন থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা সম্পর্কে ভাবনা-বেদনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিষ্কার হয়ে যায়। কবিতাকে তিনি সুন্দরের বা কল্পনার প্রকাশমাধ্যম হিশেবে গ্রহণ করেননি, করেছিলেন তাঁর পূর্বোক্ত উপন্যাস-প্রাসঙ্গিক জীবন-সামগ্র্যের বাণী হিশেবে, বক্তব্য হিশেবে : শোষণের বিরুদ্ধে, নির্জিতের পক্ষে জাগরণের জন্যে। 'শব্দ-মদ' এই যৌগিক শব্দবন্ধ অন্তত তিনবার তিনটি কবিতায় তিনি প্রয়োগ করেছিলেন :

১. ঈর্ষা আতঙ্কে দিশেহারা,
মন বুদ্ধি অন্ন মাংস একসাথে চোলাই চলেছে শুঁড়িদের,
শব্দ-মদ বেচে কারবারে

[প্রথম কবিতার কাহিনী]

২. আমি কবি, শুঁড়ি নই।
শব্দ-মদ তৃষ্ণা নিয়ে এ লেখা প'ড়ো না

['স্বাধীনতার স্বাদ' থেকে/১]

৩. শব্দ-মদ বেচা শুঁড়িগুলো
কাব্যলক্ষ্মীর দেহ চিরদিন কচি রেখে দিল।
শুঁড়িগুলো সব ম'রে যাক,
কাব্যলক্ষ্মীর দেহে যৌবনের জোয়ার আসুক।

['ছন্দপতন' থেকে/১]

—শব্দমাতাল এই আমি শব্দ-মদের বিরুদ্ধে এই অভিযানকে, তার গহন আন্তরিকতাকে, তার দিল-খোলা সাহসকে শ্রদ্ধা না-জানিয়ে পারি না : ভিন্‌মেরু থেকে ভিন্‌মেরুবিজয়ীকে সালাম জানাই।

www.amarboi.com

তথ্যনির্দেশ

১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরে প্রাপ্ত দুটি খাতা থেকে গৃহীত তথ্যে ভর রেখে এরকম বলেছেন *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা* গ্রন্থের সম্পাদক যুগান্তর চক্রবর্তী। তাঁর মন্তব্যানুযায়ী এক-হিশেবে মানিকের নির্বাচিত কবিতাই এই গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। মানিকের খাতাপত্রে ও পত্রিকার পৃষ্ঠায় আরো বেশকিছু কবিতা ছড়িয়ে আছে। এই গ্রন্থভুক্ত নয় এরকম একটি কবিতা :

সুস্পষ্ট চিন্তার মধ্যে থাকে শুধু নিশ্চিত আশ্বাস
ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করা নিয়ে
আশা ও বিশ্বাস—
চিন্তাজাল বুনে যাও কেন,
অবিরাম আপনার মনে?

৮.৭.৫২ তারিখে লেখা এই কবিতাটি 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরী' (যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত, *এক্ষণ,* শারদীয় সংখ্যা-১৩৮১) থেকে উদ্ধৃত। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতা বা কবিতাংশ এক আত্মজিজ্ঞাসা, সম্বোধন এখানে নিজেকেই, ডায়েরিতে কবি অনেক সময় যে-পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তারই অনুরূপ। মনে পড়ে যায় ফের আমাদের 'বোধ'-এর কবি জীবনানন্দ দাশকে। অস্তিত্বের ও চৈতন্যের সমস্যা জীবনানন্দ ও মানিককে যেমন সারাক্ষণ-উত্তেজনায় ভরিয়ে রেখেছিল, তেমন করে আর কোনো বাঙালি লেখককে তাড়িত-পীড়িত-বিলোড়িত করেনি। এই দিক থেকে কবিতা ও কথকতার বাংলা ভূভাগে এঁরা দুজন প্রথম আধুনিক পুরুষ।

২. প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি লেখা থেকে জেনেছি :

> মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে তাঁর একটি হাতে-লেখা চটি খাতা দেখিয়ে অবাক করে দিয়েছিলেন। অবাক শুধু খাতার পাতায় পাতায় স্বরচিত কবিতা দেখে হইনি, হয়েছি তার চেয়ে বেশী কবিতাগুলির বিস্ময়কর মৌলিক স্বাতন্ত্র্যে।

['মিথুন-সমীক্ষণ : ছায়ানট' : প্রেমেন্দ্র মিত্র, 'জীবনানন্দ দাশের গল্প']

৩. এঁরা হচ্ছেন : সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, গোলাম কুদ্দুস, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মনীন্দ্র রায়, জগন্নাথ চক্রবর্তী, চিত্ত ঘোষ, অরুণ মিত্র, দীনেশ দাশ, কৃষ্ণ ধর, রাম বসু, লোকনাথ ভট্টাচার্য, সিদ্ধেশ্বর সেন প্রমুখ।

৪. মানিক তাঁর একটি পুত্রসন্তানের নামও রেখেছিলেন : সুকান্ত।

৫. মানিক তাঁর কবিতা থেকে সেইসব প্রেমিকাকে নির্বাসনই দিয়েছিলেন, বরং তাঁর কবিতায়ও স্থান পেয়েছিল 'একতলা দোতলা বন্দীশালা' :

> কোথা মন্দোদরী কাঁদে, কোন দিকে অশোক-কানন
> ছিল তাই রাবণের জানা,
> আমি তো জানি না বন্ধু হৃদয়ের কোন প্রান্তে
> নির্বাসিতা প্রেমিকারা থাকে।

[উত্তর-দক্ষিণ]

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় পর্ব

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধার্ঘ্য

১. পিতার সঙ্গে খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি করা চলে—পিতারও অনেকরকম দোষ থাকে। কিন্তু পিতৃত্বকে যে অস্বীকার করতে চাইবে, যে বলবে ঐতিহ্য বলে কিছু নেই—তাকে আমি অসভ্য অমানুষ বলব, তাকে আমি ধিক্কার দেবো।—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *মুখপত্র*-সম্পাদককে চিঠি, আ. ১৯৫২-৫৩।

২. ঐতিহ্য সম্পর্কে অন্ধ অনুরাগ বিপজ্জনক।—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, একটি হস্তলিপি থেকে।

AMARBOI.COM

'সন্ধ্যায় বাড়ি ভরে যেতো। শৈশবে দেখেছি দিলীপকুমার রায়, সত্যেন বসু, যামিনী রায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয় চক্রবর্তী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, এমনকি প্রমথ চৌধুরীকে। মার কাছে শোনা প্রমথ চৌধুরীকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে আমি "রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ" বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন মাতাল হয়ে এসেছিলেন—তখন যদিও বুঝিনি মাতাল, আমার ধারণা তিনি আমার মার প্রতি দুর্বল হয়েছিলেন—যার ছাপ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গল্পে পড়েছিল।'—একটি স্মৃতিচারণায় এ কথা লিখছেন বুদ্ধদেব বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা মীনাক্ষী দত্ত ('আমাদের ২০২', *৩০শে নভেম্বর: কবিতাভবন বার্ষিকী,* প্রথম সংখ্যা)। বুদ্ধদেব বসুর বিখ্যাত 'কবিতাভবনে' সেকালের প্রথিতযশা কবি-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিমান বহু ব্যক্তি আসতেন। তাঁদের মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলেন, তা জানা গেল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *ভেজাল* (অক্টোবর ১৯৪৪) গ্রন্থর্ভূত 'যে বাঁচায়' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল কবিতাভবন থেকে প্রকাশিত প্রতিভা বসু সম্পাদিত 'ছোটোগল্প গ্রন্থমালা'র একটিতে। কবিতাভবন থেকেই প্রকাশিত 'এক পয়সায় একটি' পুস্তিকামালা ছিল কবিতার, আর 'ছোটগল্প' ছিল ছোটোগল্পের ছোটো ছোটো পুস্তিকা। পরিকল্পক ছিলেন-যে বুদ্ধদেব বসু, সে তো অনায়াসে অনুমান করে নেওয়া যায়।

১৯৩৮ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। ১৯৪১ সালে ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ। ১৯৪২ সালে নজরুল ইসলাম চিরকালের মতো স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৪২-৪৩ সালে বাংলায় ভয়াবহ মন্বন্তর দেখা দিয়েছিল। তারপরও শিল্প-সাহিত্যের ধারা রোখে সাধ্য কার! ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে মানিক লিখেছিলেন অসাধারণ এক গল্পগ্রন্থ, প্রকাশিত হতে হতে কয়েক বছর লেগে যায়, *আজকাল পরশুর গল্প* (১৯৪৬)। প্রতিহত হলেও শিল্পসাহিত্যের ধারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিপুল বিলোড়নের মধ্যেও ছিল প্রবহমান।

দিলীপকুমার গুপ্তের হাতে সিগনেট প্রেস নামে একটি রুচিমান প্রকাশনসংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অক্টোবর ১৯৪৩-এ। এঁরা এঁদের প্রথম গ্রন্থপ্রকাশন-বৎসরেই অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থের সঙ্গে প্রকাশ করেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *ভেজাল* গল্পগ্রন্থটি। গল্প ছিল এই ১১টি: 'ভয়ংকর', 'রোমান্স', 'ধন জন যৌবন', 'মুখে ভাত', 'মেয়ে', 'দিশেহারা হরিণী', 'মৃতজনে দেহ প্রাণ', 'যে বাঁচায়', 'বিলামসন', 'বাস' এবং 'স্বামী-স্ত্রী'।

AMARBOI.COM

সিগনেট প্রেস আজও একটি রুচির প্রতিষ্ঠাকারী প্রকাশনসংস্থা হিশেবে বাঙালি পাঠকের কাছে পরিচিত। এঁদের কিছু বই আমার সংগ্রহে ছিল বা আছে বা দেখেছি। সত্যি নতুন, সুন্দর, রুচিঋদ্ধ। রবীন্দ্র-নজরুলোত্তর আধুনিক লেখক-কবিদের প্রতিষ্ঠায় ও পরিচায়নে সিগনেট প্রেসের একটি ভূমিকা ছিল, যেমন ছিল প্রচ্ছদশিল্পী হিশেবে সত্যজিৎ রায়ের আবিষ্কারে। বোঝাই যায়: সত্যজিৎ রায় কেবলমাত্র প্রচ্ছদশিল্পী ছিলেন না, বইয়ের অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণপারিপাট্যেরও হয়তো পরামর্শক ছিলেন। তবে অন্তরালবর্তী ডি. কে. অর্থাৎ দিলীপকুমার গুপ্তের সুরুচির কথা বুদ্ধদেব বসু, নরেশ গুহ প্রমুখ বলেছেন। বিস্তারিত লিখতে পারতেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—যাঁর সম্ভবত সর্বাধিক বই বেরিয়েছিল সিগনেট প্রেস থেকে; লিখতে পারতেন সত্যজিৎ রায়—যিনি ছিলেন সিগনেট প্রেসের অনুপম সব গ্রন্থপ্রচ্ছদের রচয়িতা। সিগনেট প্রেস প্রকাশিত গ্রন্থ ছিল সুনির্বাচিত। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের *পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ* বইটি সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতে দেখে নরেশ গুহের ভালো লাগেনি (*বিভাব,* 'টুকরো কথা সংকলন', আমন্ত্রিত সম্পাদক : নরেশ গুহ, সম্পাদক : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, ১৪০৯); কিন্তু নিছক সাহিত্যিক প্রমূল্যেই ওই বইকে অস্বীকার করা অসম্ভব।

সে যা-ই হোক, রবীন্দ্র-নজরুলোত্তর লেখকদের পরিচায়নে-প্রতিষ্ঠায় যেমন ডি.এম. লাইব্রেরী ও এম. সি. সরকারের ভূমিকা ছিল, তেমনি ছিল সিগনেট প্রেসের। কল্লোল যুগের বিখ্যাত ত্রয়ী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-প্রেমেন্দ্র মিত্র-বুদ্ধদেব বসুর বই যেমন প্রকাশ করেছিল সিগনেট প্রেস, তেমনি করেছিল জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে-র গ্রন্থাবলি। তেমনি 'কল্লোলের কুলবর্ধন' (অচিন্ত্যকুমার) বা 'belated Kollolean' (বুদ্ধদেব) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তত একটি বই বের করেছিল—এবং প্রকাশনার প্রথম বছরেই।

ভেজাল গল্পগ্রন্থটি সিগনেট প্রেস থেকে বেরিয়েছিল ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে। ১৯৪৬ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি সিগনেট প্রেস থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল এক পত্রে। সেখানে ছিল দুটি পরামর্শ: গ্রন্থনাম পরিবর্তনের এবং আরো অন্তত তিনটি নতুন গল্প যোজনার। দ্বিতীয় সংস্করণের চুক্তিপত্রও হয়েছিল, বইয়ের নাম দেওয়া হয়েছিল *রুচি ও অরুচি*। দুটি নতুন গল্পও সংযোজিত হয় : 'পশুর বিদ্রোহ' এবং 'রফা ও দফার কাহিনী'। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ে ডায়েরিতে দেখা যাচ্ছে ১৯৫০-এও সিগনেট প্রেস থেকে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের চিন্তাভাবনা চলছে, সেখানে তিনি গিয়েছেনও: 'সিগনেট প্রেস—প্রথম। জাহাজের ধরনে বাড়ি—পিছনদিকে বড়লোকি বাড়িতে দোকান। ২ জন দারোয়ান। নাম পাঠিয়ে প্রবেশ—নীলিমা দেবী। মন্তব্য যে বিয়ের মাসে শুধু বই বিক্রি! এক কপি *ভেজাল* পেলাম—২য় সংস্করণের ছাপানো সম্পর্কে জানাবে। সাহিত্যের নেশা, স্বপ্ন আর ব্যবসাবুদ্ধির মিশ্রণ!' '(১৩৫ ॥ ১০.৪.৫০, *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,* যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত, প্রথম দে'জ সংস্করণ, ১৯৯০) ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল *নতুন পাণ্ডুলিপি,* প্রস্তুত করেছিলেন কবি-সমালোচক নরেশ গুহ, ছোটো একটি পুস্তিকা, তাতে জানানো হয়েছিল : 'এগারোটি গল্প নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *ভেজাল* বইটি যখন বেরিয়েছিল তখন বইয়ের ওই অপ্রীতিকর নাম থাকা সত্ত্বেও সাড়া পড়েছিল পাঠক মহলে। নতুন সংস্করণে বইয়ের নাম বদলানো হচ্ছে—নতুন দুটি গল্পও যোগ করা হচ্ছে। *ভেজাল*-এর নতুন নাম হবে *রুচি ও অরুচি*। ছোটোগল্পের কারুকার্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানিকবাবু কিরকম পটু সেটা নতুন করে উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। *রুচি ও অরুচির* প্রতিটি গল্পের সঙ্গে একটি করে নতুন আঁকা ছবি থাকবে—মাখন দত্তগুপ্তের আঁকা।' (*বিভাব*, পূর্বোক্ত সংখ্যা)—এতখানি পরিকল্পনা সত্ত্বেও *রুচি ও অরুচি* বা *ভেজাল* গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। এক অস্থির চঞ্চল প্রতিভাবান লেখকের দুর্জ্ঞেয় দুর্ভাগ্যলিপি!

১৯৪৪ সালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। এবং আমৃত্যু পার্টির সদস্য ছিলেন। আমরা দেখেছি সম্ভবত এর আগেই বা সমকালেই হয়তো কবিতাভবন থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *যে বাঁচায়* গল্পটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়, যা পরে *ভেজাল* গল্পগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমবয়সী বুদ্ধদেব বসু কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ না-দিলেও প্রথমদিকে প্রগতি আন্দোলনের শরিক হয়েছিলেন, এমনকি একটি পুস্তিকাও প্রণয়ন করেছিলেন—যার উল্লেখ করেন না বুদ্ধদেব বসুর সম্প্রচারকগণ। পরে বুদ্ধদেব আত্যন্তিক কমিউনিজমবিরোধী হয়ে ওঠেন। এবং তাঁর সমালোচনাতে তার খানিকটা হলেও ছায়া পড়ে। তারপরও বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যিক দায়িত্বের শেষ নেই কোনো। ১৯৫৬ সালে বুদ্ধদেব বসু অনুবাদকর্মে পূর্ণ নিয়োজিত। তাঁর সম্পাদিত *কবিতা* পত্রিকার পৌষ ১৩৬৩ সংখ্যায় 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' শিরোনামে একটি শোকলেখন প্রকাশ করলেন তিনি। ওই সংখ্যাতেই কালিদাস, হেল্‌ডারলিন্‌ ও বোদলেয়ারের বুদ্ধদেব-কৃত কবিতাগুচ্ছ প্রকাশিত হয়েছিল। বুদ্ধদেবের এই বিশ্লেষণ আজকের দিনেও যথাযথ :

> দৈবাৎ, এবং অল্পের জন্য, কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক তিনি হননি, কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক স্থান সেখানেই চিহ্নিত ছিল; শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও 'যুবনাশ্বে'র সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা সুস্পষ্ট। ...তিরিশের দশকে যাঁরা তাঁর প্রথম রচনাবলী পড়েছেন, তাঁদের বুঝতে দেরি হয়নি যে সদ্যমৃত *কল্লোল*-এর সর্বশেষ, বিলম্বিত ও পরিপক্ক ফলের নামই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

কিন্তু এই প্রবন্ধের শেষাংশ কিরকম নিস্তাপ, নীরক্ত ও নির্বিশেষ মনে হয় :

> ...বর্তমান, প্রত্যক্ষ ও সমসাময়িকের মধ্যেই তিনি আজীবন শিল্পের উপাদান খুঁজেছেন, এবং তার যে-অংশটিকে শিল্পরূপ দিয়ে গেছেন, তা সাক্ষর ও বিত্তহীন সর্বসাধারণের সর্বাধিক পরিচিত। এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা।

তারপরও বুদ্ধদেবের লেখাটির ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা অসম্ভব; যেমন মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সজনীকান্ত দাস-কৃত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জিটি (*পরিচয়*, পৌষ ১৩৬৩) অসম্পূর্ণ বটে, তাও মূল্যবান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুদ্ধদেব বসুর *কবিতা* পত্রিকায় প্রকাশিত 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' প্রবন্ধের শিরোনামের নিচে ছোটো হরফে বন্ধনীর মধ্যে লেখা ছিল: 'জন্ম: জুন ১৯১০। মৃত্যু: ৩ ডিসেম্বর ১৯৫৬।' সজনীকান্ত দাসের *পরিচয়* পত্রিকায় প্রকাশিত 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' প্রবন্ধের একটি বাক্য এরকম: 'বিভিন্ন গল্পসংকলন-গ্রন্থে ও সাময়িকপত্রে তাঁহার জন্মবৎসর সম্পর্কে দুই ভিন্ন মত প্রচারিত হইলেও (১৯০৮ এবং ১৯১০ সন) তাঁহার মৃত্যু যে অকালমৃত্যু তাহাতে সংশয় নাই।' এখন অসংশয়িত জন্ম-মৃত্যু-তারিখ: ১৯ মে ১৯০৮ এবং ৩ ডিসেম্বর ১৯৫৬।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অগ্রসূরিদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের উল্লেখ করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। খুবই সংগত সেই উল্লেখ। প্রেমেন্দ্র মিত্র 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' রচনায় (*দেশ,* ২২ অগ্রহায়ণ ১৩৬৩) জানিয়েছেন, প্রথম জীবনে মানিক তাঁকে অগ্রজ গল্পকার হিশেবে কয়েকটি গল্পের পাণ্ডুলিপি দেখতে দিয়েছিলেন। লিখেছেন তিনি, 'বিস্ময়, আশ্চর্য অসামান্য একজন লেখকের আকস্মিক আবিষ্কারে, কৌতূহল তাঁর লেখার অদ্ভুত ব্যতিক্রমের মূল সম্বন্ধে, প্রশংসা তাঁর সহজাত অনায়াস রচনাকৌশলের জন্যে, আর যন্ত্রণা তাঁর স্রষ্টা মনের সেই দুর্বোধ বিফলতার আভাসে জীবনের গভীর প্রতিচ্ছবিও যাতে কেমন একটু বাঁকা হয়ে ছাড়া দেখা দেয় না। কি তাঁকে বলেছিলাম যথাযথভাবে মনে নেই। শুধু এইটুকু তাঁকে জানিয়েছিলাম যে সাহিত্য সম্বন্ধে যেটুকু বোধ আমার আছে তাতে তাঁর প্রতিভা আমার কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট।'—এখানে প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পর্কে দু-একটি লাইন যোগ করতে চাই।—বুদ্ধদেব বসুর পরিগ্রহণশক্তির প্রশংসা আমরা সকলেই করি, কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঔদার্য্য সম্পর্কে পাঠক প্রায় অনবহিত। এটা ঠিক: প্রেমেন্দ্র মিত্র অনেক লেখেননি, কিন্তু তাঁর উদারতা ও গ্রহিষ্ণুতা রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে যেমন, নজরুলের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি সমসাময়িক ও পরবর্তী কারো কারো জন্যে বিস্তারিত হয়েছিল। আরো: তিরিশের দশকের মহান দুই লেখক কবি জীবনানন্দ দাশ ও কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি প্রাথমিক প্রভাবিত করেছিলেন। এমন আর-কেউ নেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সম্পর্ক ছিল তাঁর। মানিক প্রেমেন্দ্র মিত্রকে তাঁর গল্পের মতো একসময় তাঁর কবিতাও দেখতে দিয়েছিলেন। জীবনানন্দের শেষ পর্যন্ত গভীর প্রত্যয় ছিল প্রেমেন্দ্র মিত্রের বন্ধুতায়। চল্লিশের দশকের প্রথম আধুনিক বাঙালি-মুসলমান কবিদের উপরে সর্বাধিক প্রভাবই ছিল না শুধু প্রেমেন্দ্র মিত্রের, তিনিই তাঁদের সবচেয়ে সহৃদয়তায় গ্রহণ করেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্লোল যুগ গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মানিক সম্পর্কে মন্তব্য সাহিত্য-পাঠকমাত্রেরই সুপরিচিত। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র*-এর চতুর্থ খণ্ডে (ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি) মানিকের *ভেজাল* গল্পগ্রন্থ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংকলিত হয়েছে। সেখানে 'প্রকাশকের কথা' নামে যে-মন্তব্য মুদ্রিত হয়েছে, তা অচিন্ত্যকুমারের গদ্যশৈলীই মনে করিয়ে দ্যায় :

> মানিকবাবু শাখার নন, শিকড়ের। যোগবিয়োগ গুণভাগের নন, লঘূকরণের। এই গল্পগুলি তাঁর জীবনদর্শনের বিশেষবোধক। কতখানি খাদ মিশিয়ে সোনা, গাদ মিশিয়ে মধু ও ক্লেদ মিশিয়ে রূপ তারি তিনি নির্ভুল ফর্মুলা কষে দিয়েছেন। মানুষের জীবনে প্রকাশ্যের চেয়ে প্রচ্ছন্নের ব্যঞ্জনা যে অনেক গভীর, তার সমস্ত গতি-বিরতির যে ব্যাখ্যাটা সহজগ্রাহ্য তারও চেয়ে যে একটা দুর্জ্ঞেয় ব্যাখ্যা আছে তার অবচেতনায়, তার সমস্ত সারল্য যে দুর্বোধ এক কুটিলতার কুণ্ডলী, তার সমস্ত প্রেরণা আসছে যে উর্দ্ধস্থ আকাশ থেকে নয়, আদিম ও মৌল মাটির অন্ধকার গর্ভ থেকে তারই উদ্‌ঘোষণ এই গল্পগুলিতে।

কল্লোল-গ্রুপেরই একজন ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন ভবানী মুখোপাধ্যায়। তিনি *নতুন সাহিত্য* পত্রিকার পৌষ ১৩৬৩ সংখ্যায় 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' প্রবন্ধে লিখছেন,

AMARBOI.COM

> বয়সে সে [মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়] আমার চেয়ে সামান্য কিছু বড় ছিল। তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল অচিন্ত্যকুমার। দীর্ঘায়ত দেহ, চোখে চশমা, পায়ে চটিজুতো আর প্রতিভাদীপ্ত মুখচ্ছবি আজো মনে আছে। গায়ের রঙ ময়লা হলেও যেন সাঁওতালি ছেলের লাবণ্য। ...মনে আছে শ্রদ্ধেয় শচীন সেনগুপ্ত একদিন প্রেমেন্দ্রকে প্রশ্ন করছেন, কার লেখা এখন বেশ সম্ভাবনাময়? প্রেমেন তৎক্ষণাৎ মানিকের নাম করল। মানিক তখন মাত্র কয়েকটি গল্প লিখেছে। কিছু পরেই সে এসে পড়ল, প্রেমেন শচীনদার সঙ্গে মানিকের পরিচয় করিয়ে দিল। মানিকের কী সলজ্জ ভঙ্গি, প্রশংসা গ্রহণে তার কী অপরিসীম কুণ্ঠা!

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল বিবেচিত শ্রদ্ধাবোধ। গোপাল হালদারের বা আর কারো কারো মতো তিনি কল্লোলের কর্মধারাকে অস্বীকার করেননি। অতীতকে অগ্রাহ্য করেননি, অনাগতকে সালাম জানিয়েছিলেন। এই লেখা প্রস্তুত করতে গিয়ে চোখে পড়ল, বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য নামে একজন মানিক-বিষয়ক লেখক তাঁর গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদের নামই রেখেছেন, 'ছোটগল্প : কল্লোলীয় অসম্পূর্ণতা থেকে পূর্ণতার দিকে যাত্রা'। এসব উক্তি সম্ভব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরম্পরার কাণ্ডজ্ঞান না-থাকলে। স্বয়ং মানিক কল্লোল যুগের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করেছেন তাঁর আত্মস্বভাবে, 'বাংলা সাহিত্যে কল্লোল এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ, 'কল্লোল যুগ' বাংলা সাহিত্যে এক বিপ্লবের যুগ, কল্লোল গোষ্ঠীর বা কল্লোলের আদর্শে আস্থাবান সমসাময়িক কবি-কথাশিল্পীরা দুর্দম, অপরাজেয় যৌবনের প্রতীক, নতুন আশা-আনন্দ, নতুন জীবনাদর্শের সূত্রধার।... কল্লোলের মাধ্যম যে নতুন জীবনচেতনা, যে নতুন সাহিত্যাদর্শ জন্মলাভ করেছিল, আজকের প্রগতিবাদী সাহিত্য তো সেই নতুন পথেরই অভিসারী।' (*নতুন সাহিত্য*, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩, ৭ : ২)

তবে কল্লোল-গ্রুপের একজন সৃষ্টিশীল লেখকও কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেননি। বিষ্ণু দে-র বাম আভিমুখ্য ছিল, কিন্তু পার্টি-সদস্য হননি। ১৯৪৪ সালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন এবং আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন। কিন্তু দলবাজি বা পার্টির আভ্যন্তরিক কলাকৌশল বা আখের গোছানোর ফিকির—কোনোটিই তাঁর আয়ত্তও ছিল না, লক্ষ্যও না। ১৯৫০ সালের ৯ সেপ্টেম্বর একটি চিঠিতে লিখছেন মানিক—

> প্রগতি আন্দোলনে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত কয়েকজনকে একান্তভাবে বিশ্বাস করে আমি সত্যিই ঠকেছি। যুদ্ধের বাজারে আমার আগেকার প্রকাশকদের চটিয়ে এঁদের বই দিয়েছি—তারা আরো বেশি রয়ালটি দিতে চাওয়া সত্ত্বেও। তার ফলে মার খেয়েছি, প্রগতিবাদী লেখক হিশেবে লজ্জায় মাথা হেঁট করতে হয়েছে। / ...যেহেতু আমি প্রগতিবাদী সেই হেতু প্রগতিবাদীদের বিশ্বাস আমার করতেই হবে—শতবার ঠকলেও।

AMARBOI.COM

মানিকের ডায়েরিতেও এসব বেদনা ও ক্রোধের কথা আছে। চিন্মোহন সেহানবীশ, মানিকের ঘনিষ্ঠ ছিলেন (কিন্তু যাকে বলে বন্ধু, তা বোধহয় মানিকের একজনও ছিলেন না), লিখেছেন—মানিক-যে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবেন তা তাঁরা বুঝতে পারেননি। একজন সৃষ্টিশীল লেখকের অন্তঃসন্ধান সহজে উপলব্ধি করা যায় না, বলব বরং—অগম্যপ্রায়।

দেবীপদ ভট্টাচার্য 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' শিরোনামের একটি স্মৃতিচারণায় (*অরণি*, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৭-৬৮) জানাচ্ছেন, ১৯৪২ সালের কথা—

> সে সময় আমাদের এক বন্ধু ছিলেন কবি আবুল হোসেন। *চতুরঙ্গ, কবিতা* প্রভৃতি পত্রিকায় লিখতেন। তিনি প্রস্তাব করলেন যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরিষদ থেকে নজরুল সম্পর্কে একটি সভা করা হোক। সেই সভায় স্বর্গত বিনয়কুমার সরকার সভাপতিত্ব করেন। এবং, বক্তাদের মধ্যে ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি যখন তাঁর কাছে প্রস্তাব নিয়ে যাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> তখন তাঁর চেহারা দেখে যুগপৎ বিস্মিত এবং ভীত হই। কালো কঠিন মুখ, এবং বহু রেখাযুক্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং একটু অস্বাভাবিক চাহনি, সব মিলিয়ে একটু অদ্ভুত ধরনের মানুষ বলে মনে হয়েছিল। ... মানিকবাবু সভায় এসে ভালো করে কিছুই বলতে পারলেন না, দীর্ঘ ছ ফুট দেহ নিয়ে অনেকটা স্বগত ভাষণের মতো কিছু বললেন। পরে আমাকে বলেন, 'আমি সভায় বলতে পারি না।'

বিষয়টা নিয়ে আমাদের জ্যেষ্ঠতম কবি আবুল হোসেনের সঙ্গে কথা বলি।

আবুল হোসেন ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতিতে অনার্স পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ.-তে ভর্তি হন। সেই সময় কবি গোলাম কুদ্দুসকে নিয়ে আবুল হোসেন ধর্মতলা স্ট্রিটে বিখ্যাত ৪৬ নম্বরে মাঝে-মাঝেই যেতেন। সেখানেই তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখেছেন। অন্যান্য সভাতেও। মানিক কাপড়চোপড় পরতেন খুব সাধারণ। শাদা পাঞ্জাবিতে ইস্ত্রিও থাকত না। তারাশঙ্কর আসতেন সেখানে—তাঁর ছিল খানদানি চাল। চিন্মোহন, হীরেন মুখার্জি—এঁদের সঙ্গে মেলামেশা ছিল। মানিককে কখনো আড্ডা দিতে দ্যাখেননি। প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, দেবীপ্রসাদ-কামাক্ষীপ্রসাদ ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখেছেন। কখনো দ্যাখেননি সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। গান হতো। দেবব্রত বিশ্বাস নিয়মিত আসতেন, গান গাইতেন। সুজাতা ও সুচিত্রা (মিত্র) দুই বোন আসত, রবীন্দ্রসংগীত গাইত। 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্র মন'—এই গানে শুরু হতো সভা। এরই রেশ ধরে বিষ্ণু দে বের করেছিলেন তাঁর *একসূত্রে* গ্রন্থটি। নজরুল-সংক্রান্ত যে-সভায় মানিক এসেছিলেন, সেটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ক্লাসরুমে। ক্লাসরুমগুলি ছিল বড়ো। সাধারণত এইসব জায়গাতেই সভা হতো। ওই সভা সম্পর্কে আবুল ভাইয়ের বিশেষ কিছু মনে নেই।

প্রাগুক্ত স্মৃতিচারণায় দেবীপদ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন আরো, 'মৃত্যুর কিছুকাল আগে হঠাৎ একদিন তিনি [মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়] আমার বাসায় আসেন। *যুগান্তর* পত্রিকায় পূজা-সংখ্যার গল্প দিতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখে আমার খুব কষ্ট হলো। শীর্ণ দেহ, নিকেলের চশমা, মলিন বেশ-বাস, ঘর্মাক্ত চেহারা, সব-মিলিয়ে সেদিন খুব বেদনা বোধ করেছিলাম। আমার মা তাঁকে কিছু খেতে দিলেন। তিনি খুব তৃপ্তি করে খেলেন।' কলকাতায় দেবীবাবু এই প্রসঙ্গে আমাকে বলেন, মানিককে সেদিন তাঁর মা পরে এক গেলাশ দুধ খেতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছিলেন। মানিক প্রসঙ্গে প্রগতিশীল প্রকাশকদের আচরণের প্রশংসা করেননি দেবীবাবু।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরিতে আমরা কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্বিরোধের পরিষ্কার সাক্ষ্য দেখতে পাই। একটি দৃষ্টান্ত : '*নতুন সাহিত্য*-এর বদলে *পরিচয়ে* লেখা গেলে ভালো হতো শুনেই অমরবাবুর কি গর্জন—"কান নেই, শুনতে পান না *পরিচয়ে* লেখা ছাপা বারণ ছিল? এসব চলবে না মানিকবাবু।" ভাল! ভাল!' (৫/৬/৫০) কমিউনিস্ট পার্টির এই অন্তর্বিরোধ মানিকের মৃত্যুর পরও তাঁর পিছু ছাড়েনি। *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*-এর সম্পাদক ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামাতা যুগান্তর চক্রবর্তী আমাকে জানিয়েছিলেন, *পরিচয়* পত্রিকায় ওই বইয়ের রিভিউ যন্ত্রস্থ হয়েও শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। এর কারণ কি 'গোপালবাবু [গোপাল হালদার] নেতা হতে উদ্যোগী।' (ওই তারিখেরই)—এরকম সব উক্তি? কলকাতাতেই আশির দশকের সূচনায় দৈনিক *আজকাল* পত্রিকায় দেখেছিলাম কথাশিল্পী অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তৃতীয় শ্রেণীর লেখক বলেছেন।

না, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অত সহজে খারিজ করা যাবে না। আক্ষরিক অর্থে অসাধারণ এই কথাশিল্পীকে। বাঙালি 'একদিন বুঝে নেবে তারে।' নেবেই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জন্মশতবার্ষিক স্মরণ
পত্রালাপ

১. ...লেখা থেকে **লেখককে বিচ্ছিন্ন** করা যায় না।
—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, '**শারদীয়া** সাহিত্যে ছোটগল্প', *পরিচয়,* ফাল্গুন ১৩৫৪

২. বিদ্রোহীদের জয় **তখনই হয়ে গেছে কিন্তু।** রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকেও নতুন জানলা খুলতে হয়েছে। ঐতিহাসিক সে জয়। সাহিত্যে শ্রেণীবিচার উঠে গেল, অন্তত বিষয়ারোপের দিক থেকে, 'ছোটলোকেরা' তখন সাহিত্যে ঢুকে পড়েছে। আর তাদের বার করে কে? হয়তো একটু বিকারের ঘোরেই ঢুকেছে, হয়তো সে অধিকার-ঘোষণা কিঞ্চিৎ বেশি ভাববিলাসী অস্বাস্থ্যের দিকেই ঝুঁকেছে, ব্যক্তিগত সম্বন্ধ নির্ণয়ের সামাজিক যুগে যেটা স্বাভাবিকও বটে। কিন্তু ঘোষণাটা লাভই হয়ে রইল।
—বিষ্ণু দে, 'গল্পে-উপন্যাসে সাবালক বাংলা', *পরিচয়,* শারদীয়া সংখ্যা ১৩৫৪

AMARBOI.COM

কল্যাণীয়াসু,

এসো, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে তোমার সঙ্গে একটু গল্প করা যাক।—

এই লেখার উপরে যে-উদ্ধৃতি দুটো দেখছ, সেগুলো *পরিচয়* পত্রিকার ১৯৪৬-৪৭ সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত। *পরিচয়* ততদিনে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ছেড়ে দিয়েছেন, পত্রিকাটি তখন তাঁর বিশ্বাসবৃত্তের একেবারে বিরোধী বলয়ের বন্ধুদের হাতে, কমিউনিস্টদের হাতে। বিষ্ণু দে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-সম্পাদিত *পরিচয়* পত্রিকায় ফের লিখেছেন, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল, বিষ্ণু দে-র কবিতার বই *চোরাবালির* দীর্ঘ অসামান্য প্রবেশক লিখেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ। *পরিচয়* পত্রিকা যখন কমিউনিস্টদের হাতে এল, তখনো বিষ্ণু দে থেকে গেলেন, কেননা ততদিনে বিষ্ণু দে-র মধ্যে বাম আভিমুখ্য দেখা দিয়েছে। কিন্তু বিষ্ণু দে-র একটি লেখা নিয়ে—এখানে উৎকলিত 'গল্পে-উপন্যাসে সাবালক বাংলা' নামের চমৎকার প্রবন্ধটি নিয়ে এমন তর্ক শুরু হলো, যে, তিনি *পরিচয়*-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়লেন, এবং তাঁর নেতৃত্বে একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন *সাহিত্যপত্র* নামে। বিষ্ণু দে-র শিষ্যরা—যাঁদের পরিহাসান্বিত নাম ছিল 'বৈষ্ণব'—তাঁরা বিভিন্ন সময়ে এই পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। সে যা-ই হোক, বিষ্ণু দে-র ওই প্রবন্ধ নিয়ে, এবং নীহার দাশগুপ্তের প্রবন্ধ 'শারদীয়া সাহিত্যে ছোটগল্প' (যার মধ্যে খোঁচা ছিল বিষ্ণু দে-র পূর্বোক্ত প্রবন্ধের মন্তব্য নিয়ে) নিয়ে *পরিচয়* পত্রিকার কয়েক সংখ্যায় জল ঘোলা হয়ে উঠল। তাতে অংশ নিলেন ফের বিষ্ণু দে, নীহার দাশগুপ্ত, অনিলকুমার সিংহ—এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং, যাঁর গল্প-উপন্যাস ছিল ওইসব রচনার একটি আলোচিত বিষয়।

'গল্পে-উপন্যাসে সাবালক বাংলা' প্রবন্ধে বিষ্ণু দে কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচুর প্রশংসাই করেছিলেন। উৎকলন করা যাক তিনটি অংশ :

১. ...মানিকবাবুর অস্থির কৌতূহল, জীবনের নানা স্তরের তথ্যজ্ঞান, থেকে থেকে তাঁর গভীর ও মর্মবেদ্য অন্তর্দৃষ্টির ঝলকানি, সেটাই আমাকে শ্রদ্ধানত করে।

২. মানিকবাবুর বা অচিন্ত্যবাবুর বই পড়তে পড়তেও মনে হয় দেশ-বিদেশের গল্পকারের কথা। *পদ্মানদীর মাঝি*, *সহরতলী*, *পুতুলনাচের ইতিকথা* ইত্যাদি উপন্যাসে ও নানা গল্পে মানিকবাবুর যে চমকপ্রদ দক্ষতায় আমরা মুগ্ধ হয়েছি, সে কৃতিত্ব আজ সংহত দৃষ্টিতে সেই নবসম্ভাবনায় ঐশ্বর্যবান, যেখানে জীবনের ব্যাপ্তিতে লেখা হয়ে ওঠে নৈর্ব্যক্তিক, মহৎ।

৩. *চিহ্ন* পড়ে মানিকবাবুর প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যায় বহুগুণ। কলাকৌশলে যে তাঁর পরীক্ষার বিশ্রাম নেই, তার প্রমাণ *চিহ্ন*। এই সিনেমাশোভন বহু ব্যক্তির জীবনে অবলম্বিত একটি কাহিনী এই রকম সামাজিক রূপ পায়নি ভার্জিনিয়া উলফে বা হেনরি গ্রীনের চলন্ত গল্পে। তার কারণ অবশ্যই মানিকবাবুর সামাজিক অবহিতি এবং বাস্তব ঘটনার সুযোগ।

নীহার দাশগুপ্তের 'শারদীয়া সাহিত্যে ছোটগল্প' প্রবন্ধে (*পরিচয়*, অগ্রহায়ণ ১৩৫৪), বিষ্ণু দে-র প্রত্যুত্তরে (পৌষ ১৩৫৪), নীহার দাশগুপ্তের পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় (*পরিচয়*, মাঘ ১৩৫৪), অনিলকুমার সিংহের প্রতিক্রিয়ায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(*পরিচয়,* মাঘ ১৩৫৪) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসের প্রসঙ্গ ও বিশ্লেষণ এসেছিল। সবার শেষে কলম ধরেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। নীহার দাশগুপ্ত ও অনিলকুমার সিংহ (*নতুন সাহিত্য* পত্রিকার সম্পাদক, বছর কয়েক আগে প্রয়াত) তো বটেই, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিষ্ণু দে-কে চূড়ান্ত আক্রমণ করেছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটিমাত্র যুক্তি বা উক্তি উদ্ধৃত করে দিই, 'বিষ্ণুবাবুর মার্কসিস্ট জ্ঞান যে কতদূর অপরিচ্ছন্ন তার আরেক প্রমাণ লেখা থেকে লেখককে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার যুক্তির মধ্যে পাই।'

তুমি আর আমি এখন রবীন্দ্রনাথে নিমজ্জিত। তাতে কী! রবীন্দ্রনাথ-যে বলেছেন 'কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে', তাতে কি পুরো আস্থা স্থাপন করা যায়, বলো? রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর জীবন সমান্তরালে মিলিয়ে দেখতেই হয়। অন্তত আমার রবীন্দ্রবিচার সব সময়ই রবীন্দ্রজীবনের সঙ্গে সাযুজ্যের সন্ধানে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-যে ওই—প্রতিক্রিয়াস্নাত বলব না প্রতিক্রিয়াক্রুদ্ধ বলব?—প্রবন্ধে বারবার বলছেন, 'লেখা থেকে লেখককে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।' তাকে আমি মাথা পেতে স্বীকার করে নিই। বিষ্ণু দে-কে মানিক বলেছেন তাঁর চিঠির 'অকারণ তিক্ততা ও অসংযম সীমা ছাড়িয়ে গেছে।' সেটা বরং মানিকের পত্রেই ঘটেছে; কিন্তু তাঁর পত্রে অসামান্য বিশ্লেষণের শক্তিতে মুগ্ধ হতেই হয়।

সে-প্রসঙ্গে পরে আসছি। তার আগে শোনো, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তিমানুষটি কেমন?—এবং তারপর তাঁর সাহিত্যকর্মের সঙ্গে মিলিয়ে নাও। আমি বিক্ষিপ্ত দু-চারটি প্রসঙ্গে বলি এখানে।—

বছর ২৬ বয়সে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় *বঙ্গশ্রী* পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক পদের জন্য একটি দরখাস্ত পাঠিয়েছিলেন। সেখানে সাতটি পয়েন্টে তিনি তাঁর গুণপনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। সেই চাকরির আবেদনপত্রের শেষ অনুচ্ছেদটি ছিল এরকম (চিন্তা করো, চাকরিপ্রার্থী একজনের অন্যের জন্যে সুপারিশ!) :

> পরিশেষে নিবেদন এই, আমি অবগত আছি শ্রীপরিমল গোস্বামী এই পদটির জন্য আবেদন করিবেন। আমার চেয়েও তাঁহার চাকুরির প্রয়োজন বেশি। মহাশয় যদি ইতিমধ্যে তাঁহার সম্বন্ধে অনুকূল বিবেচনা করিয়া থাকেন তবে অনুগ্রহপূর্বক আমার এই আবেদন প্রত্যাহার করা হইল বলিয়া ধরিয়া লইবেন। কারণ, শ্রীপরিমল গোস্বামী মহাশয়ের সহিত আমি প্রতিযোগিতা করিতে ইচ্ছুক নহি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাধারণ বিশ্লেষণক্ষমতার কথা কে না জানে! আমার আম্মা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বৌ* গল্পগ্রন্থটি পড়ে তাঁর বিভিন্ন বৃত্তির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের স্ত্রীদের মনোবিশ্লেষণী ক্ষমতায় বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। কেবল গল্প-উপন্যাসে নয়, মানিক তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবহতত্ত্ববিদ সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর ৩২/৩৩ বছর বয়সে যে-চিঠি লিখেছিলেন তাও দশটি বিশ্লেষণী পয়েন্টে বিভাজিত। এবং তাঁর নামস্বভাবী স্পষ্টতায় রচিত। ওই ৩২/৩৩ বছর বয়সেই (মনে রেখো: মানিক বেঁচেছিলেন মাত্র ৪৮ বছর—১৯০৮-৫৬: এই তাঁর আয়ুষ্কাল) লিখেছেন তিনি, 'কলেজে পড়িবার সময় আমি স্থির করিয়াছিলাম, সাহিত্যক্ষেত্রে বড় হইব। আমি তাহা প্রতিপালন করিয়াছি।' ওই চিঠিতে লিখেছেন, 'চিঠিতে নেকামিপূর্ণ মন রাখা কথা লিখিয়া দশজনের কাছে আপনার নিন্দা করা কোনোদিন আমার দ্বারা হইয়া উঠে নাই। আপনার সম্বন্ধে আমার কোনো নালিশ থাকিলে সোজাসুজি আপনাকেই জানাইয়াছি।' দীর্ঘ পত্রটির প্রথম পয়েন্টটিতেই বড়ো ভাইকে লিখছেন সরাসরি, '...আপনার জন্যই আমাদের সংসারে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে এবং ভাইয়েরা কেহই জীবনে উন্নতি করিতে পারে নাই। আমি আপনাকে দায়ী করিতেছি না, কিন্তু আপনিই ইহার প্রধান কারণ।' ১২ পৃষ্ঠার দীর্ঘ পত্রটির শেষ দিকে লেখা আছে, 'বহুদিনের চিন্তা ও বিশ্লেষণের পর আমি যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছি তাহাই আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র।'—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র সাহিত্যই এমনই ঘোষণা দিচ্ছে: 'বহুদিনের চিন্তা ও বিশ্লেষণের পর আমি যা সত্য বলে জেনেছি, তা-ই আপনাদের বলবার চেষ্টা করেছি মাত্র।' মানিক তাঁর *জননী* (মার্চ ১৯৩৫) উপন্যাস থেকে *মাশুল* (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৫৬) উপন্যাস পর্যন্ত, *অতসী মামী* (আগস্ট ১৯৩৫) থেকে *স্বনির্বাচিত গল্প* (জুন ১৯৫৬) পর্যন্ত জীবৎকালে প্রকাশিত তাবৎ গ্রন্থে এবং রচিত-কিন্তু-অপ্রকাশিত-অগ্রন্থিত অগণন রচনায় এই সততা, সাহস, সত্যসন্ধিৎসা, ভাবনা-বেদনা ও বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণের এক অপরূপ আলেখ্যমঞ্জরী রেখে গেছেন আমাদের জন্যে।

'লেখক হচ্ছে কলম-পেষা মজুর।'—মনে করতেন মানিক। জীবনানন্দের মতোই তিনি মনে করতেন, 'পৃথিবীতে নেই কোনো বিশুদ্ধ চাকরি।' মানিক অল্পকালই চাকরি করেছেন, প্রেস ও প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠানও করেছেন কিছুকাল—কোনোটাই তাঁর ধাতে পোষায়নি। চাকরি, ব্যবসা—এসব করবার জন্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়নি।

মানিকের স্পষ্টবাদিতার নমুনা দ্যাখো।—এক পত্রিকা-দফতরে চাকরি করেছেন কিছুকাল। সেখানে একটি মাসিক সাহিত্যসভা হতো। পত্রিকার মালিকেরও শখ ছিল লেখালেখির। একবার মানিক সেই সাহিত্যসভায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপস্থিত ছিলেন। পত্রিকার মালিক-লেখক তাঁর একটি লেখা পড়লেন। সেই লেখা সম্পর্কে মানিকের বলবার পালা যখন এল, তখন তিনি সরাসরি জানিয়ে দিলেন তাঁর অপছন্দের কথা।

একবার এক মিছিলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা গেল। তাঁর চেনা এক ভদ্রলোক তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, মিছিলটা কিসের? মানিক বললেন, তা তিনি জানেন না।—মিছিল মানে প্রতিবাদ। প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করছেন মানিক, সে যে-কোনো প্রতিবাদই হোক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হিশেব-কষা বুদ্ধিজীবী-বিবৃতিজীবী ছিলেন না।

নতুন সাহিত্য-সম্পাদক অনিলকুমার সিংহ একটি ঘটনার কথা জানিয়েছেন, 'একবার *শারদীয় স্বাধীনতা*-র গল্পের টাকা পেতে অনেক বিলম্ব হচ্ছিল। পরে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ জানালেন তাঁরাই নাকি টাকাটা নিজেদের তহবিল থেকে তুলে পার্টি তহবিলে দিয়ে দিয়েছেন। খবরটা শুনে মানিকবাবু রীতিমতো বিচলিত হলেন। বললেন, এ কেমন কথা! আমার টাকা আমি দান করব। *স্বাধীনতা*-কর্তৃপক্ষকে আমার টাকা দান করার এখতিয়ার কে দিয়েছে?'—এরকম স্বাধীনচেতা মানুষকে পার্টি কি পছন্দ করবে? করেওনি।

এ-ই হচ্ছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।—তাঁর কালের নামী লেখক-কবিদের মধ্যে একমাত্র তিনিই ব্যতিক্রম, যিনি রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে ১২টি বই প্রকাশিত হলেও একটিও পাঠাননি রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের জন্যে। অমন-যে 'নির্জনতম কবি' জীবনানন্দ দাশ, তিনিও রবীন্দ্রনাথকে কবিতাগ্রন্থ পাঠিয়ে তাঁর মতামতের জন্যে কাতর অনুরোধ করেছেন; অমন-যে রবীন্দ্রদ্রোহী বুদ্ধদেব বসু, তিনিও রবীন্দ্রনাথকে বই পাঠিয়েছেন মতামতের জন্যে; এমনকি ঠোঁট-কাটা সমর সেন, সবাইকে যিনি বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করেন, তিনিও রবীন্দ্রনাথকে চিঠিতে লেখেন, 'আমার কবিতার বইয়ের এক কপি আপনার ঠিকানায় পাঠিয়েছি। আপনার কেমন লেগেছে জানতে পারলে বাধিত হবো।'

'প্রতিভা' নামে এক অসাধারণ প্রবন্ধে মানিক জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'প্রতিভা...দক্ষতা অর্জনের বিশেষ ক্ষমতা। আর কিছুই নয়।' দিবারাত্রির পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ওই দক্ষতা এমনভাবে অর্জন করেছিলেন, যা অসাধারণ প্রতিভাবানের পক্ষেই সম্ভব।

অনন্যসাধারণ এই কথক এক বিশুদ্ধ বিশ্বাসে লিখেছিলেন, '...বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার অভাব খানিকটা মিটিয়েছি নিশ্চয়।' কিন্তু সাব-ডেপুটি কালেক্টর পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিজীবনে অভাব মেটেনি। লুম্বিনি পার্ক মানসিক হাসপাতালে যেতে হয়েছে। মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে শোচনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে।

হ্যাঁ, তুমি তাঁর জীবনের এসব টুকরো তথ্যপঞ্জি থেকে এতক্ষণে ঠিকই ধরতে পেরেছ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্রয়েডিজম বা কমিউনিজম কোনোটা নিয়েই ব্যবসা করতে পারেননি। কেননা আজকালকার ফিকিরচাঁদদের সঙ্গে তাঁকে মেলানো যাবে না। কোত্থেকে পেয়েছেন এই আশ্চর্য চারিত্রবল? সে কি তাঁর পিতার কাছ থেকে যিনি তাঁর দরিদ্রতম সন্তানের সঙ্গে থাকাটাই শ্রেয় জ্ঞান করেছেন? অথবা প্রকৃতির এক আশ্চর্য উন্মীলন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্যাখো, অনামিকা, আজ মনে হয় সবই এক দৈব সংঘটন। আমি তখন ঢাকা কলেজের ছাত্র। সে কতকাল আগের ঘটনা। এক গ্রন্থভুক কিশোরের হাতে এসে পড়েছিল বাংলা সাহিত্যের সেরা সব বই—কবিতার, ছোটোগল্পের এবং তারই মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাধারণ সেই উপন্যাস, *পুতুলনাচের ইতিকথা*। যা পড়ে বলে উঠেছিলাম : আশ্চর্য, আশ্চর্য, আশ্চর্য, আশ্চর্য, আশ্চর্য, আশ্চর্য, আশ্চর্য! হ্যাঁ, পর-পর সাতবার বলেছিলাম। সে বিস্ময় এখনো যায়নি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি-কোনো উপন্যাসে আছে এক ব্যক্তির স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে, সেদিনই সে গেছে সিনেমা দেখতে। আশ্চর্য না? কিন্তু কোথাও আশ্চর্য মনে হয় না। *পুতুলনাচের ইতিকথা*র মতি আর কুমুদের কথা মনে আছে তোমার? সেই ভেসে-যাওয়া যুগল নারী-পুরুষ? মানিক বলেছিলেন, হয়তো তাদের কথা বলবেন আর কোথাও। কিন্তু লেখেননি আর-কখনো। *ইতিকথার পরের কথা* নামে যে উপন্যাস লিখলেন মানিক, সে এক আলাদা পার্বত্য অভিযান। আসলে জীবনে তো এই-ই হয়। জীবনে কত মানুষের সঙ্গে দেখা হলো তোমার-আমার, এই জীবনে ও পৃথিবীতে আর হয়তো কখনো দেখব না তাদের। উপন্যাস জীবনের নিকটতম শিল্পরূপ। সেখানে এ রকম রূপায়ণ তো ঘটবেই। কিন্তু মানিকের আগে দেখিয়েছে কে? 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পও পড়েছিলাম আগে। সেও এক আবিষ্কার। মানিক নিজেই 'অতসী মামী'র মতো গল্প *দিবারাত্রির কাব্য* নামে উপন্যাসকে 'রোমান্সে-ঠাসা' বলেছেন, বলেছেন রোমান্টিক। উত্তরকালে মানিক *পুতুলনাচের ইতিকথা*র একটি ভাষ্য প্রণয়ন করেছেন। মানিকের এসব আত্মমূল্যায়ন আমরা স্বীকার করি না। সৃষ্টিকর্ম শিল্পীকে ছাড়িয়ে চলে যায়। আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের একটির পর একটি স্তর অতিক্রম করেছেন। নজরুল ইসলামের মতো জীবনের উপান্ত পর্বে শ্যামা-মাতার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। বেঁচে থাকলে হয়তো তাঁর রচনায় তার কোনো প্রতিবিম্বন দেখা যেত। একটি কথা বলা যায় : মানিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্ধানের শেষ ছিল না কোনো—যেমন ছিল না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, যেমন ছিল না কাজী নজরুল ইসলামের। রবীন্দ্রনাথের ৮১ বছর বয়সে মৃত্যু—আমাদের বিবেচনায়—অকালমৃত্যু; কাজী নজরুল ইসলামের ৪৩ বছর বয়সে নিস্তব্ধতা ও অকালস্তব্ধতা; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৪৮ বছর বয়সে অকালপ্রয়াণ একটি সচলতার অবসান।

১৯২৮-৫৬—এই ২৮ বছর তো মানিকের প্রকাশ্য সাহিত্যযাত্রা। এর মধ্যে ১৯৪৪ সালে মানিক কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। অর্থাৎ একটি পরিষ্কার বিভাজনরেখা ১৯২৮-৪৪—এই ১৬ বছর এবং ১৯৪৪-৫৬—এই ১২ বছর। অথবা হিশেবটা এভাবে করা যায়—১৫ বছর যোগ ১৩ বছর। প্রথম ১৬ বছরকে অস্বীকার করব, না শেষ ১২ বছরকে অমান্য করব? ফ্রয়েডি পিরিয়ড বা কমিউনিস্ট যুগ—দুইকেই আমরা সমান গুরুত্ব দিতে চাই। মহৎ একজন লেখকের প্রতিটি দৃক্‌কোণ মহত্ত্বপূর্ণ। যিনি 'সব সময় সর্বত্র জীবনকে দর্শন করার বিরামহীন শ্রম' চালানোয় প্রতীত ছিলেন, তাঁকে আনুপূর্ব বুঝে নিতে হবে। নজরুল ইসলামেরও এ রকম পরিষ্কার দুটি এলাকা: কবিতার যুগ এবং সংগীতের যুগ—বিশের দশকে কবিতায় উত্থাপন করেছেন নিজেকে, তিরিশের দশকে সংগীতে নিমজ্জিত। কিন্তু পরম্পরা থাকেই। যতই বাস্তবতার গুণগান করুন মানিক, তিনি তাঁর অন্তর্গত প্রবণতাকে কখনোই রোধ করতে পারেননি। মানিকের প্রিয় কবি ছিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য, এতই প্রিয় যে নিজের সন্তানের নামও রেখেছিলেন ওই নামে, প্রিয় ছিলেন নজরুল ইসলামও, নিজেও কবিতা লিখেছেন, কিন্তু তাঁর গদ্যের কবিতাশক্তি প্রবলতর। উদাহরণ: *দিবারাত্রির কাব্য* কিংবা 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের সেই পরমাশ্চর্য উপসংহার—'হয়তো ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনোদিন পাইবেও না।' রবীন্দ্রনাথের *শেষের কবিতা* (যার সংলাপের পর সংলাপ কবিতার পর কবিতা তোমার মুখস্থ এবং তোমার আশ্চর্য মধুকণ্ঠে শুনিয়ে আমাকে আনন্দ আর বেদনা উপহার দাও) আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *দিবারাত্রির কাব্যর* মধ্যে প্রকাশকালের ব্যবধান মাত্র কয়েক বছরের। দুটি উপন্যাসই কবিত্বের পরাকাষ্ঠা—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসটি মনে হয় কবির রচনা আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসটি মনে হয় কথাশিল্পীর সৃজন। এইখানে এই দুই লেখকশিল্পীর মৌলিক ব্যবধি—যুগান্তরের ব্যবধি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমবয়সী কবি বুদ্ধদেব বসু মানিকের অকালমৃত্যুর পরে মানিক-বিষয়ে একটি মূল্যায়নধর্মী প্রবন্ধ লিখেছিলেন। মানিক একসময় 'কবিতা-ভবনে'ও যেতেন। 'কবিতা-ভবন' প্রকাশিত গল্পগ্রন্থিকায় তাঁর একটি গল্পও বেরিয়েছিল। ১৯৪৪ সালে মানিক কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। এদিকে বুদ্ধদেব বসু প্রগতিবাদী শিবিরে অল্পকালের জন্যে সন্নিহিত হলেও, পরে বিরুদ্ধবাদী হয়ে ওঠেন। অশোক মিত্রের আত্মজীবনী থেকে মনে হয়, ১৯৪৬ সাল বা তার কাছাকাছি সময়ে মানিক বুদ্ধদেবের সংস্পর্শ ছেড়েছিলেন। একথা মনে না-হয়ে পারা যায় না, বুদ্ধদেবের আত্যন্তিক কমিউনিজম বিরোধিতার কারণ কী। রুশ বিপ্লবের বিশাল ঘটনাকে কী করে অস্বীকার করলেন তিনি, বুদ্ধদেবের মতো গ্রহিষ্ণু মানুষ? কিন্তু বুদ্ধদেবের অন্য একটি মন্তব্যও মনে হয়।

জীবনানন্দ দাশকে বুদ্ধদেব বলেছিলেন 'নির্জনতম কবি'। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যে 'নির্জনতম' অভিধাটি বোধহয় আরো প্রযোজ্য। মানিকের কোনো বন্ধুবান্ধবের নাম আমরা জানি না। সুবোধ রায় নামে জীবনানন্দের শেষদিককার এক বন্ধুর কথা জানি আমরা, যাঁর সঙ্গে কবি হাঁটতে বেরোতেন। সুবোধ রায় জীবনানন্দের মৃত্যুর পরে তাঁর সম্পর্কে দুটি স্মৃতিচারণ রচনা করেছিলেন। কলকাতায় আশির দশকের প্রথমদিকে কেউ-একজন বলেছিলেন আমাকে, চিন্মোহন সেহানবীশের কাছে মানিক-সম্পৃক্ত অনেক-কিছু জানা যেতে পারে। কলকাতার বইমেলায় একবার চিন্মোহন সেহানবীশ-নীহাররঞ্জন রায়কে দেখেছিলাম। এগিয়ে গিয়ে কথা বলা হয়নি। প্রসঙ্গত, কলকাতার সাহিত্যিক পরিবেশের কথাও তোমাকে একটু বলতে পারি। মানিককে তাঁর অগ্রজ লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র যেমন উৎসাহিত করেছিলেন, তেমনি মানিকও পরবর্তী সমরেশ বসুকে একটি গল্প *পরিচয়* পত্রিকা থেকে ফেরত দিয়ে সমরেশকে উৎকৃষ্টতর গল্প লেখার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন—সমরেশ সানন্দে সে-কথা নিজেই জানিয়েছেন।

বুদ্ধদেব, জীবনানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার, বিষ্ণু দে—তিরিশের অনেক শ্রেষ্ঠ কবিই মানিককে সহৃদয়তায় গ্রহণ করেছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত *পরিচয়* বা সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত *পূর্বাশা* পত্রিকায় মানিক উপস্থিত থেকেছেন লেখক হিশেবে। তাঁর অসুস্থতার সময় তারাশঙ্কর যথাসাধ্য করেছেন।

হ্যাঁ, সেটা বলছি। তার আগে আরো একটু বলতে হবে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় প্রতীক, রূপক, সংকেত ঢের আছে; কিন্তু মানুষটি ছিলেন ছলচাতুরীহীন, নিষ্কপট, খোলাখুলি। আর এক 'কেন?' জিজ্ঞাসায় বিদ্ধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওই জিজ্ঞাসা, যার মানে জানবার ইচ্ছা, সেটা ছাড়া তুমি এগোতেই পারবে না। তারাশঙ্কর তাঁর অসুস্থতার সময় সহায়তা করেছেন, কিন্তু কেন? স্ত্রীর সন্তান হয়েই মৃত্যুবরণ করল, স্ত্রী খুশি, তাঁরও তো সন্তান, কিন্তু সন্তান হারানোর শোক বা আনন্দ কোনোটাই মানিককে স্পর্শ করছে না, তিনি প্রশ্ন করছেন—জননী তার সন্তানের মৃত্যুতে আনন্দিত হবে কেন? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অন্তঃসন্ধানী, যেমন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ বা নজরুল বা জীবনানন্দ। তাই চিন্মোহন সেহানবীশরা বুঝতে পারেননি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়ার আকস্মিকতার রহস্য। আর যে-রাহস্যিকতার কথা মানিক-বিশ্লেষকেরা এড়িয়ে যান, তা তাঁর শ্যামা-মাতার প্রতি নির্ভরতা। একটি কথা মনে রেখো : একজন লেখক যে-সব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে পার হলেন, আলোচনা-সমালোচনায় তার কোনোটিকেই এড়িয়ে যাওয়া যায় না, অন্তত তাতে তাঁকে সম্পূর্ণাঙ্গ জানা হবে না। যেমন, রবীন্দ্রনাথের আস্তিকতাকে তোমরা একটু আড়াল করতে চাও। তা করলে কিন্তু তোমার রবীন্দ্রবিচার পূর্ণতা পাবে না। মানিক যখন যেটা ধরেছেন, দৃঢ়বদ্ধ থেকেছেন তার মধ্যে। তাঁর স্ত্রী কমলা বন্দ্যোপাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, 'আমার শ্বশুরমশাই টালিগঞ্জের বিরাট বাড়িটা বিক্রি করে টাকাটা ছেলেদের মধ্যে ভাগ করে দেন। এক-একজন আট-ন হাজার টাকা পান। সেই টাকাটা আমি চোখেও দেখলাম না, সব পার্টিকেই দিয়েছিলেন। আমাকে জানাননি।' অনামিকা, এই হচ্ছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য বিখ্যাত কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে মানিকের দুর্দিনে তারাশঙ্কর কী যেন কাজ দিয়েছিলেন, তারাশঙ্করের এক চিঠিতে পড়েছি, সুভাষ সেটি সম্পন্ন করেননি। মানিকের মৃত্যুর পরে সুভাষ একটি কবিতা লিখেছিলেন বড়ো দুঃখ করে। বরং পরবর্তী কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র মানিক সম্পর্কে একটি মূল্যবান ব্যক্তিগত সারণিক রচনা করেন। আরেকজন কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মানিক সম্পর্কে প্রথম গ্রন্থ নিতাই বসুর রচনাকে উৎসাহিত করেছিলেন। কবিতা লিখেছিলেন মঙ্গলাচরণ। রাম বসু কবিতাগ্রন্থ উৎসর্গ করেছিলেন। বামাবর্তের কবিদের আরো কেউ-কেউ শ্রদ্ধার্ঘ্য রচনা করেছিলেন।

পরিচয় পত্রিকার মালিক বেঁচে থাকতেই তারাশঙ্করকে বেশি মূল্য দেওয়া হয়েছিল। এত সহজ এই বিচার? তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে আমার কাছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কেই মহত্তম মনে হয়। কেন?—মানিকের নিজের বিবরণ অনুযায়ী তিনি বাস্তবতার দাবি মিটিয়েছেন সেজন্যে নয়। তিনি বহির্বাস্তবতা আর অন্তর্বাস্তবতাকে মিলিয়ে দিয়েছেন, সেজন্যে। বাস্তবের অন্তরালশায়ী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাহস্যিকতাকেও ধারণ করেছেন, সেজন্যে। অবাকই লাগে ভাবতে : পঞ্চাশের দশকের সেরা একজন কথাশিল্পী শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বারবার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছেন তাঁর প্রিয় ঔপন্যাসিক। কিন্তু তার *কুবেরের বিষয়-আশয়* মানিকের *পুতুলনাচের ইতিকথার* পরবর্তী পদক্ষেপ।

মানিকের পূর্বধারা আছে বঙ্কিমচন্দ্রে-রবীন্দ্রনাথে-শরৎচন্দ্রে, আর উত্তরধারা প্রবাহিত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ-জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী-রমেশচন্দ্র সেনের মধ্য দিয়ে।

তোমাকে লেখা এই চিঠিতে সবশেষে আসি মানিকের অন্তশ্চারিত্রের আরেকটু বিশ্লেষণে। মানিক জানিয়েছেন, '...যে বলবে ঐতিহ্য বলে কিছু নেই—তাকে আমি অসভ্য অমানুষ বলব, তাকে আমি ধিক্কার দেবো।' আবার একই সঙ্গে বলছেন, 'ঐতিহ্য সম্পর্কে অন্ধ অনুরাগ বিপজ্জনক।' এই চিঠির উপরে বিষ্ণু দে-র লেখাটি লক্ষ্য করো। বিষ্ণু দে বলছেন, 'ছোটলোকেরা তখন সাহিত্যে ঢুকে পড়েছে আর তাদের বার করে কে?' কল্লোল যুগের লেখকদের কথা বলেছেন এখানে বিষ্ণু দে। মানিক নিজেই কল্লোল যুগ সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রকাশ করেছেন, তাঁর নিজের সমগ্র সাহিত্যকর্মে ছোটলোকদেরই বিস্তার; আবার, তাঁর নিজের সৃষ্টিতে কল্লোলের সীমাবদ্ধতাও তিনি নির্দেশ করেছেন। মানিককে খুঁজতে হবে তাঁর এই নির্দেশিত পথে, যেখানে ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুনের বিবাহ নিষ্পন্ন হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আর বিষ্ণু দে দুজনার মধ্যে যত দ্বন্দ্বই হোক—মানিকের জন্যেই অবশ্য, বিষ্ণু দে মানিক সম্পর্কে কোনো কটূক্তি করেননি—মানিক আর বিষ্ণু দে একই দুর্ভাগ্যের অংশীদার। কমিউনিস্ট মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাম-ঘেঁষা বিষ্ণু দে-কে তাঁদের গোষ্ঠী যেমন বুঝতে পারেননি, তেমনি অন্যরাও তাঁদের গ্রহণ করেননি। দুজনার মহত্ত্বের পরিমাপের জন্যেই অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।

তোমরা কি দেখে যেতে পারবে?—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতোই এই প্রশ্ন তুলে, চিঠি শেষ করে, একটু সবুজ রঙ খুঁজছি। এখন, নিসর্গের কাছে শুশ্রূষা চাই। পাখি-পতঙ্গের কাছে। তোমরা খোঁজো মানুষের মধ্যে। তোমার

শিল্পী
৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিশেষ

জীবনপঞ্জি

জন্ম : ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫ : ১৯ মে ১৯০৮। স্থান : সাঁওতাল পরগনার দুমকা শহর। পৈতৃক নিবাস : বিক্রমপুর, ঢাকা। পিতৃদত্ত নাম : প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাক-নাম : মানিক। পিতা : হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়। (মৃত্যু ১৯৫৮—মানিকের মৃত্যুর বছর দুয়েক পরে)। মাতা—নীরদা দেবী (মৃত্যু ১৯২৪—টাঙ্গাইলে)। পিতামাতার ১৪ সন্তানের মধ্যে চতুর্থ পুত্র মানিক। হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত আত্মজীবনী পাওয়া গেছে। পিতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, সেটেলমেন্ট বিভাগের কানুনগো এবং পরে সাবডেপুটি কালেক্টর। পিতার চাকরিসূত্রে মানিক পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও বিহারের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছেন ও থেকেছেন। চঞ্চল দুরন্ত যুবা মানিক প্রথম যৌবনে এসেছিলেন 'অনুশীলন সমিতি'র সংস্পর্শে।

শিক্ষা : কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশনের শিক্ষারম্ভ। পরে পড়েন বিভিন্ন স্কুলে—টাঙ্গাইলে, কাঁথি মডেল হাইস্কুলে, মেদিনীপুর জেলা স্কুলে। মেদিনীপুর জেলা স্কুল থেকেই প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (১৯২৬)। তারপর বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ান মিশন থেকে প্রথম বিভাগে আই.এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯২৮)। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অঙ্কে অনার্স নিয়ে বি.এস-সি, ক্লাসে ভর্তি। কিন্তু ততদিনে সাহিত্যচর্চার নেশা জমে উঠেছে। ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দেই লেখক হিশেবে আত্মপ্রকাশ—*বিচিত্রা* পত্রিকায় 'অতসী মামী' নামক গল্প প্রকাশিত (পৌষ ১৩৩৫)। ফলে বি.এস-সি পরীক্ষায় দুবারই অকৃতকার্য হন (১৯৩১, ১৯৩২)। সাহিত্যকর্মে এমনভাবেই লিপ্ত হয়ে পড়েন যে একাডেমিক শিক্ষার ইতি ওখানেই ঘটে।

কর্ম : সাহিত্যই ছিল মানিকের উপার্জনের উপায়। দু-একবার সাহিত্যসম্পৃক্ত দু-একটি কর্ম থেকে জীবিকানির্বাহের চেষ্টা করেন। ১৯৩৪ সালে কয়েক মাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০/বি পঞ্চানন ঘোষ লেন থেকে প্রকাশিত *নবারুণ* পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৩৭-৩৮ সালে *বঙ্গশ্রী* পত্রিকার সহসম্পাদক হিশেবে কাজ করেন (তৎকালীন সম্পাদক : কিরণকুমার রায়)। ১৯৩১ সালে অনুজ সুবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় 'উদয়াচল প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস' নামে প্রেস ও প্রকাশনসংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এখান থেকেই মানিকের পঞ্চম গল্পগ্রন্থ *বৌ* প্রথম প্রকাশিত হয়—প্রথম সংস্করণে (১৯৪০) আটটি গল্প ছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৪৬) যুক্ত হয় আরো পাঁচটি গল্প। প্রেস চালাতে পারেননি। ১৯৪৩ সালে ভারত সরকারের পাবলিসিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে কয়েক মাস অধিষ্ঠিত ছিলেন। লেখাই ছিল মানিকের মূল পেশা। ১৯৪৩ সালে 'ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'র সদস্য। ১৯৪৪ সালে ফ্যা-বি-লে-ও-শি-সংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য। ১৯৪৫ সালে 'প্রগতি লেখক সংঘে'র (ফ্যা-বি-লে-ও-শি-স-এর পরিবর্তিত নাম) সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য। ১৯৪৬ সালে মানিক ও স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য সংঘের যুগ্ম সম্পাদক। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় দাঙ্গাবিরোধী ভূমিকা। ১৯৪৯ সালে সংঘের চতুর্থ বার্ষিক সম্মিলনীতে সভাপতিত্ব করেন।

বিবাহ : ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় কন্যা কমলা দেবীর সঙ্গে বিবাহ। চার পুত্র-কন্যা : শান্তা ভট্টাচার্য, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, শিপ্রা চক্রবর্তী ও সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রন্থ : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবদ্দশায় উপন্যাস-গল্প-নাটক-গ্রন্থাবলি মিলিয়ে ৫৭টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম গ্রন্থ *জননী* উপন্যাস, ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত; সর্বশেষ গ্রন্থ, *মাশুল* উপন্যাস, ১৯৫৬ সালে, মৃত্যুর এক মাস আগে প্রকাশিত। মানিকের মৃত্যুর পরে তাঁর উপন্যাস-গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ-রচনাবলি মিলিয়ে অন্তত ২৫টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তেরো খণ্ডে প্রকাশিত *মানিক গ্রন্থাবলী* (১৯৬৩-৭৬) এবং *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* (১৯৭৬)। এই গ্রন্থাবলির বাইরেও মানিকের বহু অগ্রন্থিত রচনা পত্রপত্রিকায় প্রকীর্ণ অবস্থায় রয়েছে আজও।

পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রচনা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা সমকালীন সব ধরনের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে—*বিচিত্রা, বঙ্গশ্রী, পূর্ব্বাশা, আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, সত্যযুগ, প্রবাসী, দেশ, চতুরঙ্গ, নরনারী, নতুন জীবন, বসুমতী, গল্পভারতী, মৌচাক, পাঠশালা, রংমশাল, নবশক্তি, স্বাধীনতা, আগামী, কালান্তর, পরিচয়, নতুন সাহিত্য, দিগন্ত, সংস্কৃতি, মুখপত্র, প্রভাতী, উল্টোরথ, এলোমেলো, ভারতবর্ষ, মধ্যবিত্ত, চতুষ্কোণ, ক্রান্তি, হিমাদ্রি, শারদশ্রী, অগ্রণী, সংবাদ, শারদী, সোনার বাংলা, অনন্যা, সচিত্র ভারত, কৃষক, পূর্ণিমা, রূপান্তর, স্বরাজ* প্রভৃতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসুস্থতা : ১৯৩৫ সালে, যে-বছর মানিক গ্রন্থকার হিশেবে প্রথম আবির্ভূত হন, সে-বছরই আক্রান্ত হন মৃগী রোগে। এই রোগ তাঁর মৃত্যুকাল অবধি সঙ্গী ছিল। তাঁর ডায়েরিতে এই রোগ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতেন মানিক।

কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান : ১৯৪৪ সালে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। তাঁর লেখায় একটি বিশাল পরিবর্তন সূচিত হয়। ১৯৪৭ সালে *পরিচয়* পত্রিকায় কবি বিষ্ণু দে-র সঙ্গে এক সাহিত্যিক বিতর্কে অবতীর্ণ হন।

আধ্যাত্মিকতা/ ধার্মিকতা : কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদানের ঠিক দশ বছর পরে, ১৯৫৪ সালে, মানিকের ডায়েরিতে আধ্যাত্মিকতার সূচনা হয়: 'কোনো প্রতীক অবলম্বন না করলে প্রণামের সময় মন বিক্ষিপ্ত হয় কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে প্রতীক প্রতীক—মা কে বা কেমন জানি না।' (২৮-৪-৫৪) লেখায় অবশ্য আধ্যাত্মিকতার ছাপ পড়েনি কখনো। হয়তো মাত্র ৪৮ বছর বয়সে অকালপ্রয়াণ না-করলে রচনায় আধ্যাত্মিকতার স্বাক্ষর পড়ত।

শেষ জীবন ও মৃত্যু : লেখাই ছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপজীবিকা। ফলত, দারিদ্র্য ছিল তাঁর চিরসঙ্গী। ক্রমাগত বিশ্লেষণাত্মক গল্প-উপন্যাস রচনা, অসুখ, অর্থাভাব, সামাজিক-রাজনৈতিক ক্লিষ্টতা মানিককে বিপর্যস্ত করে দেয়—হয়তো সে-সব বিস্মরণের জন্যেই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, যা থেকে—অনেক চেষ্টা করেও—শেষ পর্যন্ত মুক্তি পাননি। নির্জনস্বভাব, বন্ধুহীন, একাকী মানুষ ছিলেন মানিক। তাঁর কোনো গ্রন্থ কোনো প্রিয়জনকে উৎসর্গ করেননি মানিক। একটিমাত্র উৎসর্গ, *স্বাধীনতার স্বাদ* (১৯৫১) উপন্যাসের উৎসর্গপত্রটিও মানিকের রচনার মতোই অদ্ভুত ও বিস্ময়কর: 'সম্প্রদায় নির্বিশেষে জনসাধারণকে এই বইখানা উৎসর্গ করলাম—জনসাধারণই মানবতার প্রতীক'। ১৯৫৬ সালের ৩০ নভেম্বর মানিক অজ্ঞান হয়ে যান, ২ ডিসেম্বর নীত হন নীলরতন সরকার হাসপাতালে, ৩ ডিসেম্বর মৃত্যু।

মৃত্যুত্তর শ্রদ্ধার্ঘ্য : ৭ ডিসেম্বর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে বিশাল শোকসভা। *অগ্রণী*, *নতুন সাহিত্য* ও *পরিচয়*—এই তিনটি পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে (পৌষ ১৩৬৩)। *উল্টোরথ* ও *মাসিক বসুমতী* পত্রিকাও একগুচ্ছ শ্রদ্ধার্ঘ্য রচনা প্রকাশ করে (পৌষ ১৩৬৩)। *কবিতা* ও *শনিবারের চিঠি*র মতো বিপরীতধর্মী পত্রিকাও স্মারক রচনা প্রকাশ করে (পৌষ ১৩৬৩)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থপঞ্জি

উপন্যাস

১. জননী (১৯৩৫)
২. দিবারাত্রির কাব্য[১] (১৯৩৫)
৩. পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬) (দ্বি সং ১৯৩৯) (প সং ১৯৫১) (ষষ্ঠ সং ১৯৫৪)
৪. পুতুলনাচের ইতিকথা[২] (১৯[illegible]) (দ্বি সং ১৯৪৭) (তৃ ১৯৫০) (চ সং ১৯৫২) (প সং ১৯৫৬)
৫. জীবনের জটিলতা (১৯৩৬)
৬. অমৃতস্য পুত্রাঃ (১৯৩৮) (দ্বি সং ১৯৫০)
৭. সহরতলী (প্রথম পর্ব) (১৯৪০)
৮. সহরতলী[৩] (দ্বিতীয় পর্ব) ১৯৪১) (দ্বি সং ১৯৫৩)
৯. অহিংসা[৪] (১৯৪১)
১০. ধরা-বাঁধা জীবন (১৯৪১) (দ্বি সং ১৯৪৭)
১১. চতুষ্কোণ (১৯৪২)
১২. প্রতিবিম্ব (১৯৪৩) (দ্বি সং ১৯৪৭)
১৩. দর্পণ[৫] (১৯৪৫) (দ্বি সং ১৯৫১)
১৪. সহরবাসের ইতিকথা (১৯৪৬) (দ্বি সং ১৯৫৩)
১৫. চিন্তামণি[৬] (১৯৪৬)
১৬. চিহ্ন (১৯৪৭)
১৭. আদায়ের ইতিহাস (১৯৪৭)
১৮. জীয়ন্ত[৭] (১৯৫০)
১৯. পেশা (১৯৫১)
২০. সোনার চেয়ে দামী (প্রথম খণ্ড : বেকার) (১৯৫১)
২১. স্বাধীনতার স্বাদ[৮] (১৯৫১)
২২. ছন্দপতন (১৯৫১)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৩. সোনার চেয়ে দামী (দ্বিতীয় খণ্ড : আপোষ) (১৯৫২)
২৪. ইতিকথার পরের কথা (১৯৫২) (দ্বি সং ১৯৫৬)
২৫. পাশাপাশি (১৯৫২)
২৬. সার্বজনীন (১৯৫২)
২৭. নাগপাশ (১৯৫৩)
২৮. আরোগ্য (১৯৫৩)
২৯. চালচলন (১৯৫৩)
৩০. তেইশ বছর আগে পরে (১৯৫৩)
৩১. হরফ (১৯৫৪)
৩২. শুভাশুভ (১৯৫৪)
৩৩. পরাধীন প্রেম[৯] (১৯৫৫)
৩৪. হলুদ নদী সবুজ বন (১৯৫৬)
৩৫. মাশুল (১৯৫৬)

মরণোত্তর প্রকাশ

৩৭. প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান[১০] (১৯৫৬)
৩৮. মাটি-ঘেঁষা মানুষ[১১] (১৯৫৭)
৩৯. মাঝির ছেলে[১২] (কিশোর-উপন্যাস, ১৯৫৯)
৪০. শান্তিলতা (১৯৬০)
৪১. মাটির কাছের কিশোর কবি[১৩] (কিশোর-উপন্যাস)
৪২. মশাল[১৪] (কিশোর-উপন্যাস)

ছোটোগল্প

১. অতসী মামী (১৯৩৫)
২. প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭)
৩. মিহি ও মোটা কাহিনী (১৯৩৮)
৪. সরীসৃপ (১৯৩৯)
৫. বৌ (১৯৪০) (দ্বি সং ১৯৪৬)
৬. সমুদ্রের স্বাদ (১৯৪৩) (দ্বি সং ১৯৪৬)
৭. ভেজাল (১৯৪৪)
৮. হলুদপোড়া (১৯৪৬)
৯. আজ কাল পরশুর গান (১৯৪৬)
১০. পরিস্থিতি (১৯৪৬)
১১. খতিয়ান (১৯৪৭)
১২. ছোট বড় (১৯৪৮)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩. মাটির মাশুল (১৯৪৮)
১৪. ছোট বকুলপুরের যাত্রী (১৯৪৯)
১৫. ফেরিওলা (১৯৫৩)
১৬. লাজুকলতা (১৯৫৩)

নাটক

১. ভিটেমাটি (১৯৪৬)

প্রবন্ধ

১. লেখকের কথা (১৯৫৭)

কবিতা

১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা (১৯৭০)

রচনাসংগ্রহ

১. মানিক গ্রন্থাবলী (প্রথম ভাগ, ১৯৫০)
২. মানিক গ্রন্থাবলী (দ্বিতীয় ভাগ, ১৯৫২)
৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প (জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ১৯৫০) (দ্বি সং ১৯৬৫)
৪. স্বনির্বাচিত গল্প (১৯৫৬)
৫. গল্প-সংগ্রহ (১৯৫৭)
৬. ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৫৮)
৭. উত্তরকালের গল্পসংগ্রহ (১৯৬৩)
৮. মানিক গ্রন্থাবলী : প্রথম খণ্ড (১৯৬৩)
৯. মানিক গ্রন্থাবলী : দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৬৭)
১০. মানিক গ্রন্থাবলী : তৃতীয় খণ্ড (১৯৭০)
১১. মানিক গ্রন্থাবলী : চতুর্থ খণ্ড (১৯৭০)
১২. মানিক গ্রন্থাবলী : পঞ্চম খণ্ড (১৯৭১)
১৩. মানিক গ্রন্থাবলী : ষষ্ঠ খণ্ড (১৯৭১)
১৪. মানিক গ্রন্থাবলী : সপ্তম খণ্ড (১৯৭২)
১৫. মানিক গ্রন্থাবলী : অষ্টম খণ্ড (১৯৭৩)
১৬. মানিক গ্রন্থাবলী : নবম খণ্ড (১৯৭৩)
১৭. মানিক গ্রন্থাবলী : দশম খণ্ড (১৯৭৩)
১৮. মানিক গ্রন্থাবলী : একাদশ খণ্ড (১৯৭৪)
১৯. মানিক গ্রন্থাবলী : দ্বাদশ খণ্ড (১৯৭৫)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০. মানিক গ্রন্থাবলী : ত্রয়োদশ খণ্ড (১৯৭৬)
২১. কিশোর বিচিত্রা (১৯৬৮)
২২. চারটি উপন্যাস (১৯৭১)
২৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প (যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত, ১৯৭১)
২৪. অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত, ১৯৭৬; দে'জ সংস্করণ : ১৯৯০)
২৫. বাছাই গল্প (নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত, ১৯৮১)

তথ্যনির্দেশ

১. *দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাসের নামপত্রে বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ ছিল: '(একটি বস্তুসংকেতের কল্পনামূলক কাহিনী)'।
২. *পুতুলনাচের ইতিকথা* উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড রচনার পরিকল্পনা ছিল মানিকের; হয়নি।
৩. *সহরতলী* উপন্যাসের তৃতীয় পর্ব লেখার পরিকল্পনা ছিল মানিকের।
৪. *অহিংসা* উপন্যাস *পরিচয়* পত্রিকায় প্রকাশকালে 'প্রথম ভাগ' বলে উল্লেখ ছিল। দ্বিতীয় ভাগ লেখা হয়নি।
৫. *দর্পণ* উপন্যাসের শেষে লেখা আছে 'প্রথম ভাগ', অর্থাৎ লেখকের আরও খণ্ড রচনার অভিলাষ ছিল। *দর্পণ* উপন্যাসটি *প্রভাতী* পত্রিকায় আংশিক প্রকাশিত হয়েছিল 'জাগো জাগো' নামে। গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে লেখক নাম পরিবর্তন করেন।
৬. *চিন্তামণি* উপন্যাসটি 'রাঙামাটির চাষী' নামে *পূর্ব্বাশা* পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।
৭. *জীয়ন্ত* উপন্যাস *পরিচয়* পত্রিকায় প্রকাশকালে শেষ কিস্তির শেষে 'প্রথম ভাগ' কথাটি লেখা ছিল। দ্বিতীয় ভাগ পরে আর লিখিত হয়নি। *জীয়ন্ত* উপন্যাসের প্রথম কিস্তি *পরিচয়* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল 'কলম-পেষার ইতিকথা' নামে। *পরিচয়* পত্রিকায় প্রকাশিত *জীয়ন্ত* উপন্যাসের শেষ পাঁচটি কিস্তি (অগ্রহায়ণ ১৩৫৫, পৌষ ১৩৫৫, মাঘ ১৩৫৫, ফাল্গুন ১৩৫৫ এবং চৈত্র ১৩৫৫) গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে বর্জিত হয়।
৮. *স্বাধীনতার স্বাদ* মাসিক *বসুমতী* পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশকালে নাম ছিল 'নগরবাসী'।
৯. *পরাধীন প্রেম* উপন্যাসের একাংশ *অনন্যা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল 'বাস্তবিক' নামে।
১০. *উল্টোরথ* পত্রিকায় *প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান* 'প্রাণেশ্বর' নামে প্রকাশিত হয়েছিল।
১১. *মাটি-ঘেঁষা মানুষ* লেখকের অকালমৃত্যুর ফলে অসম্পূর্ণ থাকে। 'একটি চাষীর মেয়ে' নামে মাসিক *বসুমতী* পত্রিকায় আংশিক প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পূর্ণ করেন কথাশিল্পী সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।
১২. *মাঝির ছেলে* লেখকের একমাত্র সম্পূর্ণ কিশোর-উপন্যাস।
১৩. *মাটির কাছের কিশোর কবি* অসম্পূর্ণ কিশোর-উপন্যাসটি সম্পূর্ণ করেন শিশুসাহিত্যিক খগেন্দ্রনাথ মিত্র।
১৪. *মশাল* লেখকের অসম্পূর্ণ কিশোর-উপন্যাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~